প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ঃ মে, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

EBG 07 : 26

	রচনা	সম্পাদনা
একক 97-99	অধ্যাপক বিকাশকান্তি মিদ্যা	অধ্যাপক পুলিন দাশ

EBG 07 : 27

	রচনা	সম্পাদনা
একক 100-102	অধ্যাপক বিকাশকান্তি মিদ্যা	অধ্যাপক মানস মজুমদার

EBG 07 : 28

	রচনা	সম্পাদনা
একক 103-106	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত	অধ্যাপক দিলীপ কুমার নন্দী

EBG 07 : 29(A) & 29 (B)

	রচনা	সম্পাদনা
একক 107-108	অধ্যাপক পাপিয়া জয়সোয়াল	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

সংশোধন ও পুনঃসম্পাদনা :

ড. মনন কুমার মণ্ডল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

ড. মনোরঞ্জন গোস্বামী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG—7

বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়

26

একক 97 ❑ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও উপকরণসমূহ 7-16

একক 98 ❑ লোকসাহিত্যের উপকরণসমূহ ও তাদের আলোচনা 17-76

একক 99 ❑ বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 77-98

পর্যায়

27

একক 100 ❑ মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রহ—সম্পাদনা-প্রকাশ 99-113

একক 101 ❑ মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য পালা 114-142

একক 102 ❑ লোকসাহিত্য 143-169

পর্যায়

28

একক 103 ❑ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি 170-186

একক 104 ❑ সদ্‌গতি (হিন্দী) 187-200

একক 105 ❑ বাচ্চা (উর্দু) 201-216

একক 106 ❑ কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা (তামিল) 217-236

পর্যায়
29(ক)

একক 107 ❑ নাটক—চোপ্, আদালত চলছে 237-314

পর্যায়
29(খ)

একক 108 ❑ চেম্মীন/তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই (মালায়লম উপন্যাস) 315-346

একক ৯৭ ❐ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও উপকরণসমূহ

গঠন ঃ

৯৭.১ উদ্দেশ্য

৯৭.২ প্রস্তাবনা

৯৭.৩ লোকসংস্কৃতি কি

৯৭.৪ লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ

৯৭.৪.১ লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী উদাহরণ

৯৭.৫ লোকসাহিত্য কি ও তার সংজ্ঞা

৯৭.৬ লোকসাহিত্যের উপকরণ

৯৭.৭ সারাংশ

৯৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৯৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা আমাদের দেশজ সংস্কৃতির স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন। জানতে পারবেন আমাদের ঐতিহ্যের শিকড়বাহিত সংস্কৃতি ও তার বিভিন্ন দিকের পরিচয়। সংস্কৃতি সাধারণত দু'রকমের— শিষ্ট সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি। এই এককটি পাঠ করে আপনারা জানবেন—

সংস্কৃতি কি?

শিষ্ট সংস্কৃতি কি সে সম্পর্কেও আপনারা অবহিত হবেন।

আলোচ্য এককটি পাঠ করে পরিচিত হবেন লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তার শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে।

এককটি আপনাদের সাহায্য করবে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও তার উপকরণ সম্পর্কে অবহিত হতে।

৯৭.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতি হল সভ্যতার উৎকর্ষ। শ্যামাবিষয়ক গানে আছে, 'এমন মানব জমিন রইল পতিত / আবাদ করলে ফলতো সোনা।' এই মানব জমিন কর্ষণ করে তাতে ফলানো উৎকৃষ্ট ফসল-ই হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি শব্দটির আগে বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাতে কৃষির গন্ধ পেয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-ই শব্দটিকে পাল্টানোর পক্ষপাতী ছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক মারাঠী বন্ধুর মাধ্যমে মারাঠী শব্দ ভাণ্ডার থেকে সংস্কৃতি শব্দটি বাংলায় আনেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেটিকে সোৎসাহে গ্রহণ করেন।

ইংরাজি Culture শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, Culture-এর নেপথ্যে আছে লাতিন Cultura শব্দটি, যার ভিত্তিভূমি লাতিন COL ধাতু। অর্থ কৃষ — যার অর্থ চাষ করা, যত্ন করা, পূজা করা। কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতি — উভয় ক্ষেত্রেই 'কৃষ' ধাতুর প্রভাব থেকে গেছে — তাই মানবজমিনে আবাদ করে ফলানো সোনাই বোধ করি কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতি। সংস্কৃতির এ ব্যাখ্যায় আপনারা খুঁজে পাবেন জীবনযাপনের এক পরিমার্জিত দিকের পরিচয়। সেখানে সংস্কৃতি কিছুটা সীমায়িত। সংস্কৃতির ব্যাপক ব্যাখ্যায় কিন্তু মানুষের জীবন- চর্যার আদ্যোপান্ত জুড়ে সংস্কৃতির বিস্তার। তার জীবন যাপনে পালিত সকল কিছুই সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে এসে যায়। যাই হোক, সংস্কৃতির সাধারণত দুটি ধারা — নাগরিক সংস্কৃতি বা শিষ্ট সংস্কৃতি, আর গ্রামীণ সংস্কৃতি বা লোকায়ত সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতি। নাগরিক সংস্কৃতি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের উদ্দেশ্য লোকসংস্কৃতি। পরবর্তী অংশে আপনারা লোকসংস্কৃতি কি জানতে পারবেন, তা আপনাদের লোকসাহিত্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

৯৭.৩ লোকসংস্কৃতি কি

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের জনৈক পণ্ডিত উইলিয়াম থামস্ The Athenaeum পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে সর্বপ্রথম 'Folk Lore' শব্দটি ব্যবহার করেন। শব্দটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে পণ্ডিতদের বিতর্কের অন্ত নেই। অন্ত নেই মতবিরোধের এর বাংলা প্রতিশব্দটি নিয়েও। কেউ কেউ মনে করেন Folk Lore শব্দটি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চালু জার্মান শব্দ Volkskunde শব্দটির ইংরাজি অনুবাদমাত্র। Volk শব্দটির সঙ্গে Folk শব্দটির ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। ধ্বনি বা উচ্চারণগত সাদৃশ্য উচ্চারণেই বোঝা যায়, অর্থগত মিল হল, কথা দুটির অর্থ Common People বা সাধারণ গণ-সমাজ, সমাজের আদিবাসী বা Primitive People ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জনসমাজ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে জার্মান Volkskunde-র তুলনায় ইংরাজি Folk Lore শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। Folk Lore শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে মতভেদের অন্ত থাকে না। আসলে Folk শব্দটি নিয়ে কোন ঝামেলা নেই, এখানেও ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্যে বাংলা 'লোক' শব্দটি 'Folk' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে মেনে নিতে কোন মতবিভেদ তেমন নেই। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয় 'Lore' শব্দটি নিয়ে। প্রাচীন ইংরাজিতে শব্দটি ছিল Lar, ডাচ ভাষায় Lier এবং জার্মান ভাষায় Lehre শব্দটির মূল উৎস প্রাচীন টিউটনিক ভাষায় বিদ্যমান, যার অর্থ জ্ঞান দান বা আহরণ করা। আরো পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে — প্রাচীন বিশ্বাস, কাহিনী বা ঐতিহ্যগত শিক্ষা প্রভৃতিকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় Wisdom of the Flok. আরো পরে শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

Folk Lore শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে একাধিক শব্দ পাওয়া যায় — লোকসংস্কৃতি, লোককৃষ্টি, লোককলা, লোকযান, লোকবার্তা, লোকচারণা, লোকায়ন, লোকশ্রুতি, লোকবিদ্যা, লোকতত্ত্ব ইত্যাদি। প্রতিশব্দগুলোর তুলনায় জনপ্রিয় প্রতিশব্দ হিসেবে লোকসংস্কৃতি-ই বহুল ব্যবহৃত এবং আমাদের আলোচনায় ওই শব্দটিই ব্যবহৃত হবে। আসলে Folk Lore-এর সহজ ইংরাজি প্রতিশব্দ হিসেবে Folk Culture কেউ কেউ ব্যবহার করেন। তা থেকে লোকসংস্কৃতি শব্দটি আসা খুবই সহজ। তবে ইংরাজি Lore এর সঙ্গে সংস্কৃতি শব্দের বিষয়গত সাদৃশ্যই লোকসংস্কৃতি শব্দটির জনপ্রিয়তার কারণ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	লোকযান
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য	লোকশ্রুতি
ড. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা	লোকবার্তা
রামনরেশ ত্রিপাঠী	গ্রাম্যসাহিত্য
কেশরীনারায়ণ শুক্লা	লোকবাঙময়
ড. মযহারুল ইসলাম	লোকলোর
ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক	লোকচারণা
অরুণ রায়	লোকায়ন

ফোকলোর

লোকবিজ্ঞান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
লোকবিদ্যা	রমাপ্রসাদ চন্দ
লোকচর্যা	ড. সুকুমার সেন
লোকসংস্কৃতি	ড. কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়
জনসাহিত্য	ড. প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী
লোকঐতিহ্য	ড. আনোয়ারুল করিম
লোকবৃত্ত	শঙ্কর সেনগুপ্ত
লোককৃতি	ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়

ইংরাজি Folk শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ‘লোক’ শব্দটিকে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত, তা পূর্বে উচ্চারিত বাংলা প্রতিশব্দগুলোর প্রথম অংশ শুনেই আপনারা বুঝেছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই লোক বলতে আমরা কি বুঝবো বা কাদের বুঝবো? লোক বলতে সাধারণত People বা জনসাধারণ বোঝায়। কিন্তু Folk Lore এর ‘লোক’ বলতে সকল মানুষকে না বুঝিয়ে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে বোঝায়। এই Folk বা লোকসম্পর্কিত ধারণার দুটো দিক আছে। একটি পুরাতন, অপরটি আধুনিক। পুরাতন ধারণা অনুযায়ী তাদেরকেই আমরা লোক বা Folk বলে বুঝবো — যারা গ্রামীণ, কৃষিজীবী, নিরক্ষর সংহত সমাজের বাসিন্দা। যারা গোষ্ঠী পরম্পরায় ঐতিহ্যবাহিত মৌখিক সংস্কৃতির ধারক। যাদের ব্যক্তি পরিচয়ের তুলনায় গোষ্ঠী পরিচয়-ই মুখ্য, এমন জনসাধারণ। অর্থাৎ আরো সোজাভাবে গ্রামের কৃষিজীবী নিরক্ষর গোষ্ঠীবদ্ধ জনসাধারণই লোক বা ‘Folk’, যারা ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সংস্কৃতির ধারক। এই গ্রামীণ জনসাধারণের সংস্কৃতি হল গ্রামীণ সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি বলতে সেদিক থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝাতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসংস্কৃতি বলতে সেদিক থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই বোঝাতো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসংস্কৃতি আজ কেবলমাত্র গ্রামকেন্দ্রিকতায় বন্দী জড় / মৃত একটা বিষয় নয়। লোকসংস্কৃতি আজ গতিশীল বিজ্ঞান। ‘লোক’-এর সীমার তাই ঘটেছে বিস্তার। ‘লোক’ বলতে এখন আর কেবলমাত্র গ্রামের ওই কৃষিজীবী ঐতিহ্যবাহী নিরক্ষর জনগণকেই বোঝায় না। আজ ‘লোক’-এর সংজ্ঞার বিস্তার ঘটেছে, এখন ‘লোক’ বলতে আমরা বুঝি — সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোন সূত্রে যদি বেশ কিছু মানুষ একত্রিত বা সঙ্ঘবদ্ধ হন, তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংহত নির্দিষ্ট ওই জনসাধারণকেই ‘লোক’ বলি। এই সংজ্ঞায় ‘লোক’ বলতে যাদের বুঝি তারা আর কেবল গ্রামীণ কৃষিজীবী সম্প্রদায় নন, নন কেবল নিরক্ষর সংহত সমাজের সদস্য — এখানে গ্রাম-শহরের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মৌখিক ও লিখিতের, কৃষি ও শিল্পের সকল ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। নিরক্ষরের পাশাপাশি, শিক্ষিত মানুষও হয়ে যান লোক বা Folk, ‘ লোক’ শব্দের এই ব্যাপক ব্যাখ্যায় ‘লোকে’র পরিধি বাড়লেও লোকসংস্কৃতির ধারণাটি কিন্তু আজো তার পুরাতন পরিচয়ে বন্দী থেকে গেছে। সেক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করলে সে সম্পর্কে আপনাদের ধারণা স্পষ্ট হবে এবং লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটিও বোঝা যাবে। নীচের রেখাচিত্রটির সাহায্যে লোকসংস্কৃতির বিস্তার ও বৈচিত্র্য বোঝা যাবে—

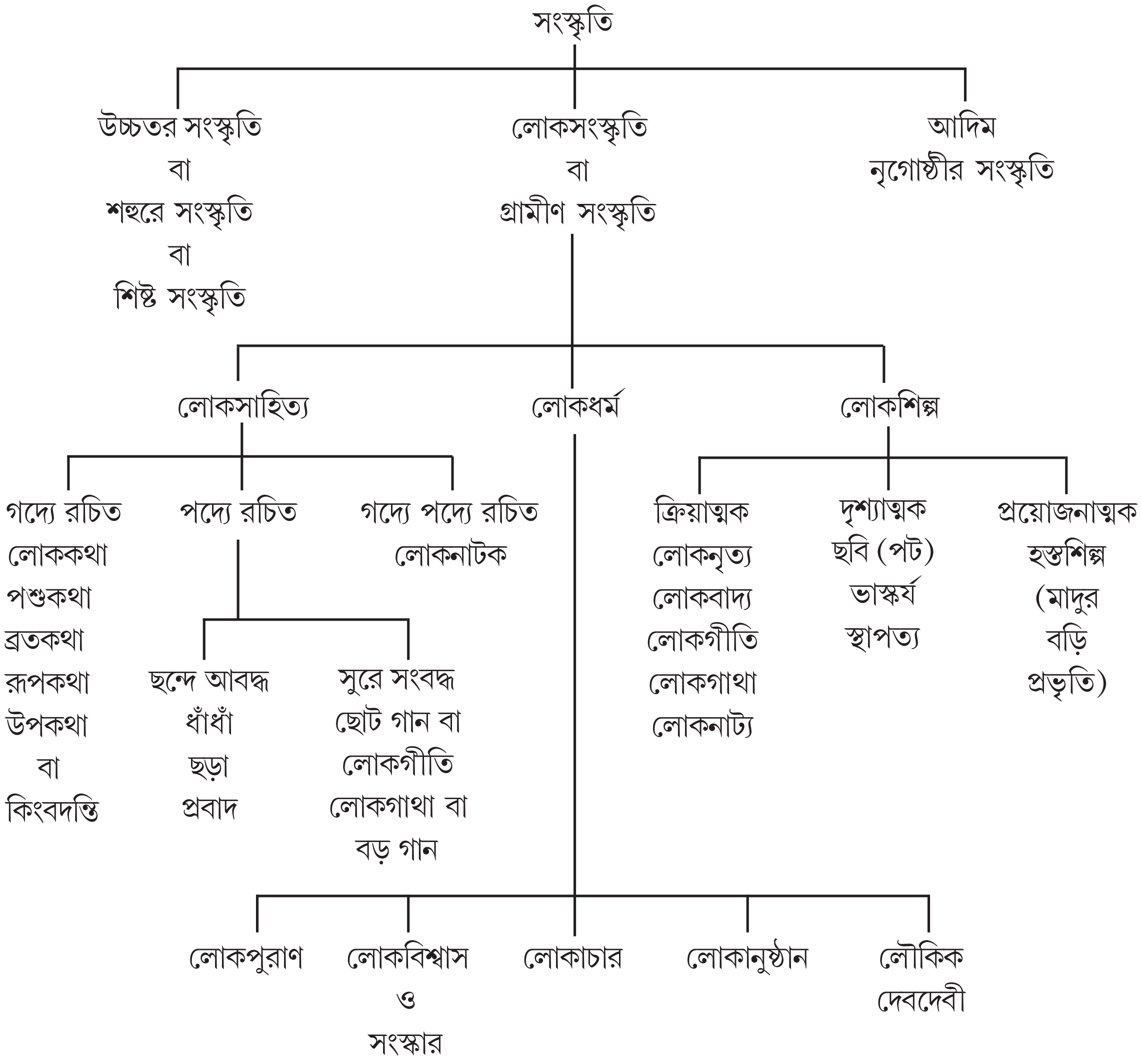

অনুশীলনী-১

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন —

১। (ক) ‘সংস্কৃতি’ বোঝাতে আগে বাংলায় কোন্ শব্দটি ব্যবহৃত হত?

(খ) কোন ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি ব্যাহৃত হয়েছে?

(গ) ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি কে কোথা থেকে বাংলায় আনেন?

(ঘ) ‘লোকসংস্কৃতি’ শব্দটি কোন্ ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত?

২। (ক) ইংরাজি শব্দ ‘Folk Lore’ এর কয়েকটি বাংলা প্রতিশব্দ লিখুন।

(খ) ‘Folk Lore’ শব্দটিকে কে কোথায় ও কবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন?

(গ) ‘লোক’ (Folk) ও ‘ লোকসংস্কৃতি’ (Folk Lore) বলতে আপনি কি বোঝেন লিখুন?

৯৭.৪ লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ ও তার পরিচয়

(ক) বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

(খ) বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

(গ) অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

(ঘ) বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

(ঙ) খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

(চ) অঙ্কন ও লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতির এই যে শ্রেণী এর কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো সাধারণত ঐতিহ্যবাহিত, অলিখিত বা মৌখিক, সংহত সমাজের সৃষ্টি অর্থাৎ এর কোন ব্যক্তিস্রষ্টা নেই। মূলত লোকসংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলো তার পুরাতন ধারণাকে আজও বহন করছে, অন্যদিকে কিছু পুরাতন ধারণার মধ্যে বিবর্তন এসেছে, যেমন — লোকসংস্কৃতি অলিখিত বা মৌখিক হলেও সংরক্ষণের চাহিদায় এর কিছু কিছু রূপকে লিখে রাখতে হয়, টেপ রেকর্ডারে রাখতে হয় বন্দী করে। লিখন নির্ভর লোকসংস্কৃতি আছে কিছু। অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি আর কেবল গ্রামীণ নয়, নয় কেবলমাত্র কৃষিজীবন কেন্দ্রিক কিংবা একমাত্র নিরক্ষরের সম্পদ। আজ শিক্ষিত নাগরিক মানুষের মধ্যেও লোকসংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে।

৯৭.৪.১ শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী লোকসংস্কৃতির উদাহরণ ঃ

(ক) **বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ** লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী মৌখিক সত্তাটি ধরা পড়ে এই বাক্‌কেন্দ্রিক বা কথাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে। সাধারণত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকগীতি, মন্ত্র, গীতিকা, লোকনাট্যের সংলাপ অংশ এই শাখার অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় —

‘ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো

বর্গী এলো দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে

খাজনা দেবো কিসে।’ — দোলনায় ঘুমপাড়াতে গিয়ে মায়ের মুখের এই যে ছড়া, কিংবা, ‘একটুখানি মামা, গা বোঝাই জামা’ (পেঁয়াজ) ধাঁধাটি অথবা ‘জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা’ — প্রবাদটি এই বাক্‌কেন্দ্রিক শ্রেণীর উদাহরণ। যথাসময়ে আরো উদাহরণের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

(খ) বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ লোকজীবনে ব্যবহৃত সকল বস্তুই এই শ্রেণীর উদাহরণ। যেমন — লাঙল, জোয়াল, কাটারি, জাল, ঝুড়ি, চুপড়ি, সরা, হাঁড়ি, বঁড়শি, দোয়রি, হাতা, খুন্তি ইত্যাদি।

(গ) অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও একরকম শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা বাহিত হয়, সে শিষ্ট সমাজে যেমন, লোকসমাজেও তদ্রুপ। যেমন, লোকনৃত্য — ছৌ, রায়বেঁশে, কাঠি নৃত্য, বউ নৃত্য ইত্যাদি। লোকভঙ্গি কোন শব্দ না করে আকারে ইঙ্গিতে কিছু দেখানো। লোকসার্কাস — ঢালি খেলা, বেদের দলের বিভিন্ন খেলা ইত্যাদি।

(ঘ) বিশ্বাস-সংস্কার বা আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশেষ আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি থেকে। এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকউৎসব, লোকচিকিৎসা, লোকবিজ্ঞান, লোকমেলা, লোকপার্বণ, লোকপূজা, গাছে গাছে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। মূলত অনুকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বংশ বা লোকপরম্পরায় মৌখিক রীতিতে লোকসংস্কৃতির এই শাখা বাহিত হয়। মানসিক ব্যাপার জড়িত থাকার ফলে এর প্রভাব সমাজের খুব গভীরে। বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারও লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে অবলুপ্ত করতে পারে না।

(ঙ) খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ এই শাখাটি একটি মিশ্রশাখা। এর মধ্যে একই সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক ও বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিরও যেমন যোগ আছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আছে বিশ্বাস-সংস্কারের দিকটিও। সাধারণত নিরক্ষর জনসাধারণ নিজেদের শরীর চর্চার জন্য এবং আনন্দ বিধানের জন্য বহু খেলাধূলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। এই খেলাধূলাগুলোকে এককথায় লোকক্রীড়া বলে। এই লোকক্রীড়াগুলোই এই পর্যায়ের মুখ্য উপাদান। উদাহরণস্বরূপ- হা-ডু-ডু, ডাংগুলি, নোন্তা, বউ বাসন্তি, কানামাছি, কুমীর কুমীর, বাঘবন্দী, নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই, দাড়িয়াবান্ধা, খোটান ইত্যাদি।

(চ) অঙ্কন ও লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ঃ লোকসংস্কৃতি যদিও মূলত অলিখিত বা মৌখিক। তবু এর একটা দিক অঙ্কন ও লিখনকেন্দ্রিক। লোকসাহিত্য সংরক্ষণের জন্য অধুনা লিখন একটি অপরিহার্য মাধ্যম হলেও, লোকসংস্কৃতির বেশ কতকগুলো উপাদান আছে যেগুলোর ঐতিহ্যবাহিতা ধরতে গেলে লিখন অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, যেমন — লোককবিতা, এপিটাফ বা সমাধিস্তম্ভে লিখিত কবিতা, লেট্রিনালিয়া বা গণ-শৌচাগারের দেওয়ালে লিখিত কবিতা, চেইন লেটারস (সন্তোষী মার চিঠি, কোন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারক চিঠি), রুমাল, কাঁথা বা হাতপাখার উপর সেলাইয়ে লিখিত কবিতা বা কাপড়ের উপর সেলাই এর মাধ্যমে লিখিত কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা কবিতা (যেমন — 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'; 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে'।) ইত্যাদি।

আর অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারাটি লুকিয়ে আছে আলপনা, ঘটচিত্র, পটচিত্র, মুখোশ তৈরি ইত্যাদির মধ্যে। সাধারণত, ব্রত, বিবাহ, উৎসব, গৃহসজ্জা ইত্যাদিতে আলপনা দেওয়া হয়। সেখানে একদিকে যেমন থাকে সৌন্দর্যবোধের পরিচয়, তেমনি ঐতিহ্যবাহিত বিশ্বাস সংস্কারের দিকটিও।

এই গেল সংক্ষিপ্তভাবে লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও উপাদানের পরিচয়।

অনুশীলনী - ২

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

(ক) লোকসংস্কৃতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করুন।

(খ) বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলতে কি জানেন, উদাহরণ দিয়ে লিখুন।

(গ) বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) লোকসংস্কৃতির কোন্ দিকগুলো অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অঙ্গ লিখুন।

(ঙ) বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যা জানেন উদাহরণসহ লিখুন।

(চ) খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির পরিচয় দিন।

(ছ) অঙ্কন ও লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আপনার ধারণা বুঝিয়ে লিখুন।

৯৭.৫ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা হল লোকসাহিত্য। লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগে যাকে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলে আপনারা জেনেছেন, আসলে সেটাই হল লোকসাহিত্য। সংস্কৃতির মতো সাহিত্যেরও দুটি শ্রেণী—লোকসাহিত্য ও শিষ্টসাহিত্য। লোকসমাজ-সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকসংস্কৃতির মতো লোকসাহিত্যেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন—

- লোকসাহিত্য মূলত বাক্‌কেন্দ্রিক।
- লোকসাহিত্যের শিষ্ট সাহিত্যের মতো লিখিত রূপ নেই, 'Folk Literature is simply literature transmitted orally.' লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক। অর্থাৎ স্মৃতি আশ্রিত ও শ্রুতি বাহিত।
- কেবল মৌখিক নয়, ঐতিহ্যবাহীও, অর্থাৎ লোকপরম্পরায় লোকসাহিত্য মুখে মুখে বাহিত হয়। মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হওয়ার পর এই শ্রেণীর লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা লোকসাহিত্য বলি সেগুলোর বহু অংশ আজ লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।
- লিখনপদ্ধতির সূত্র ধরে লোকসাহিত্য শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েছে যেমন তেমনি আবার শিষ্ট সাহিত্যের অনেক বিষয়ও লোকপরম্পরায় বাহিত হয়ে লোকসাহিত্যে পরিণত হয়ে গেছে।
- লোকসাহিত্য মূলত বাক্‌কেন্দ্রিক কিন্তু কথাসর্বস্ব নয়। তার সঙ্গে শিল্প মাধ্যমের আরো একাধিক অনুষঙ্গ থেকে গেছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেমন, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। লোকনাট্যের সংলাপগুলো লোকসাহিত্যের বা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান হলেও এর অভিনয়গত দিকটির মধ্যে আছে অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান বা অভিনয় কেন্দ্রিকতা। আছে নাট্যশিল্পের একাধিক উপাদান। আবার লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও বাক্‌কেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে যুক্ত আছে যন্ত্রানুষঙ্গ ও গীত হওয়ার দিকটি।
- লোকসাহিত্য মৌখিক বা অলিখিত ও ঐতিহ্যবাহী হলেও সংরক্ষণের সুবিধার্থে লোকসাহিত্যের একটা লিখিতরূপ বর্তমানে স্বীকৃত।

  লোকসাহিত্য তার ঐতিহ্যবাহী রূপের সমান্তরালে বিবর্তিত রূপকেও জায়গা করে দিচ্ছে। অর্থাৎ লোকসাহিত্য আর কেবল ঐতিহ্যকেন্দ্রিক থাকছে না। লোকসাহিত্য ঐতিহ্য স্বীকরণের পাশাপাশি বর্তমানকেও ধারণ করছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক মৌখিক সাহিত্যও লোকসাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করছে।

- লোকসাহিত্যের প্রাচীন ধারণায় তা কেবল গ্রাম্যসাহিত্য বলেই পরিচিত ছিল। গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের সাহিত্যই (যা মূলত মৌখিক) ছিল একসময় লোকসাহিত্য। কিন্তু এখন লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট পাল্টানোর সমান্তরালে লোকসাহিত্যের পরিধি বিস্তারিত হয়েছে। লোকসাহিত্য আর কেবল গ্রাম্যসাহিত্য নয়, নয় কেবলমাত্র কৃষিজীবীদের সাহিত্য। তা গ্রামের গণ্ডি ছেড়ে নাগরিক জীবনেও প্রবেশ করেছে। লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তা নিরক্ষর জনগণের সাহিত্য। এ পরিচয়ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লোকসাহিত্য আর নিরক্ষরের সাহিত্য নয়, তা শিক্ষিত মানুষেরও সাহিত্য। তবে, লোকসাহিত্য তখনই শিক্ষিত মানুষের বা নাগরিক মানুষের লোকসাহিত্য হয়, যখন নাগরিক শিক্ষিত মানুষ 'লোক' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। যখন কোন একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সামাজিক বেশ কিছু মানুষ এক হন বা সংহত হন, সে গ্রামের নিরক্ষর কিংবা শহরের শিক্ষিত, কৃষিজীবী কিংবা কারখানার শ্রমিক তখন সে সংহত জনসমষ্টিকে এককথার লোক বা Folk বলা যায়। আর এই 'লোক' সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য মুখ্যত মৌখিক এবং ঐতিহ্যবাহী।

তাই লোকসাহিত্য কি বা তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের আগে জানা দরকার 'লোক' বলতে আমরা কি বুঝি। 'লোকে'র ধারণা আপনারা পেয়েছেন। সেই লোকসমাজের 'সৃষ্ট' সাহিত্য লোকসাহিত্য, সৃষ্ট কিন্তু লিখিত নয়, এই কারণে যে, লোকসাহিত্য মুখ্যত মৌখিক। লোকসাহিত্য মৌখিক কথা নির্ভর। তার কোন লিখিত রূপ যেমন (সংরক্ষণ ব্যতীত) দরকার হয় না, তেমনি তার কোন নির্দিষ্ট রচয়িতা বা স্রষ্টা নেই। শিষ্ট সাহিত্য যেখানে ব্যষ্টির সৃষ্টি, লোকসাহিত্য সেখানে সমষ্টির সৃষ্টি। লোকসমাজের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর সামাজিক সংহতি। লোকসমাজ এমনই সংহত যে, এর যে কোন সৃষ্টিতে স্রষ্টা খুঁজে পাওয়া ভার—লোকসংস্কৃতির যে কোন দিকেই একথা সত্য। তাই বলে, লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির যে কোন রূপ কখনই লোকসমাজের সকল মানুষ একজায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে সৃষ্ট নয়, তার এক একটা ধারার সৃষ্টির পিছনে কোন না কোন একক মানুষের ভূমিকা শুরুতে হয়তো ছিল, কিন্তু সংহত সমাজের সমবেত আওয়াজের ভীড়ে হারিয়ে গেছে সেই একক মানুষের একক চেষ্টার নজির।

তাই সব মিলিয়ে, লোকসাহিত্য হল সংহত একদল মানুষের সমবেত সাহিত্য সৃষ্টি, যা মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যবাহী, যার সৃষ্টি লিখন নয়, মুখের ভাষাকেন্দ্রিক।

৯৭.৬ লোকসাহিত্যের উপকরণ

সাহিত্য হল সহিতের ভাব, যা সহিতত্ত্ব স্থাপন করে, তাই সাহিত্য, সাধারণ সাহিত্যের একটা লিখিত রূপ থাকে। এই লিখিতরূপের প্রকাশ কখনও গদ্যে, কখনও পদ্যে। গদ্য ও পদ্যকে অবলম্বন করে শিষ্ট সাহিত্যের নানান উপকরণের আবির্ভাব—কাব্য, কথাসাহিত্য ও নাটক। কাব্য আবার নানান রকম—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি। কথাসাহিত্য—উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি। নাটক—ট্র্যাজেডি, কমেডি, একাঙ্কনাটক ইত্যাদি। এসব গেল শিষ্ট সাহিত্যের উপকরণসমূহ। শিষ্টসাহিত্যের সমান্তরালে লোকসাহিত্যের যে অলিখিত ধারা প্রবহমান তা এক ছাঁচে ঢালা কোন উপকরণে সীমাবদ্ধ নয়। লোকমানস ও তাদের অবসর বিনোদনের নানান পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকসাহিত্যও নানা প্রকরণে বিভক্ত। তবে শিষ্ট সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তা

লিখিত। বইয়ের পাতাতেই শিষ্ট সাহিত্যের একরকম মুক্তি সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে কোনরূপ লিখিত আকার পায় না বলেই লোকসাহিত্য আবার একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কাজে-কর্মে, আনন্দে-বিষাদে, অবসর বিনোদনে লোকসাহিত্যের উপকরণ নিত্যক্রিয়াশীল। বাক্‌কেন্দ্রিক এই লোকসাহিত্যের একাধিক উপকরণ—ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য, মন্ত্র ইত্যাদি।

৯৭.৭ সারাংশ

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম্ থমস্ সর্বপ্রথম ''Folk Lore'' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে নানা শব্দ পাওয়া গেলেও লোকসংস্কৃতি শব্দটিই অধিক ব্যবহৃত। গ্রামের কৃষিজীবী নিরক্ষর গোষ্ঠীবদ্ধ জনসাধারণই 'লোক' বা 'Folk'। এই গ্রামীণ জনসাধারণের সংস্কৃতি হল লোকসংস্কৃতি।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তার কোনো ব্যক্তিস্রষ্টা নেই। মোট ছটি ভাগে লোকসংস্কৃতিকে ভাগ করা যায়—বাক্‌কেন্দ্রিক, বস্তুকেন্দ্রিক, অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক, বিশ্বাস—সংস্কারকেন্দ্রিক, খেলাধূলাকেন্দ্রিক এবং অঙ্কন ও লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি।

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা। লোকসাহিত্য মূলত বাক্‌কেন্দ্রিক, ঐতিহ্যবাহী এবং মৌখিক। লোকসাহিত্য ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য, মঞ্চ ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে গড়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতি শিষ্ট সংস্কৃতির মত আলোকদূতী নয়, মৃত্তিকা সহচরী। অঞ্চলবদ্ধ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আচারে-অভ্যাসে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, সামাজিক-সংগঠনে জাত হয়ে আঞ্চলিক উৎসব-পার্বণে, লোকভাষা-নির্ভর সাহিত্যে, যূথনৃত্যে, যূথসঙ্গীতে তা বিকশিত হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতির ভিত্তি হল অঞ্চলবিশেষের ভৌম-প্রকৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাস, জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য তাদের সমাজবন্ধন।

অনুশীলনী - ৩

সঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন ঃ

১। (ক) লোকসাহিত্য বলতে আপনি লোকসংস্কৃতির কোন ধারাকে বোঝেন — ☐ বাক্‌কেন্দ্রিক ☐ বস্তুকেন্দ্রিক ☐ বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক।

(খ) লোকসাহিত্য বলতে আগে বোঝান হোত কেবল — ☐ নাগরিক সাহিত্যকে ☐ গ্রাম্য সাহিত্যকে ☐ গ্রাম্য ও শহুরে সাহিত্যকে।

(গ) লোকসাহিত্য মূলত — ☐ লিখিত ☐ অলিখিত ☐ লিখিত-অলিখিত কোনটাই নয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন—

২। লোকসাহিত্য ও শিষ্টসাহিত্যের পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩। লোকসাহিত্যের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক কি বুঝিয়ে বলুন।

৪। লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৫। লোকসাহিত্য সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণা কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তা আলোচনা করুন।

৬। লোকসাহিত্য বলতে আপনি কি বোঝেন লিখুন।

৭। লোকসাহিত্যের কয়েকটি উপকরণের নাম লিখুন এবং তারা লোকসংস্কৃতির কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হতে পারে, তা দেখান।

৯৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোকসাহিত্য

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোকসংস্কৃতি

৩। ড. মযহারুল ইসলাম — ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন

৪। ড. আশরাফ সিদ্দিকী — লোকসাহিত্য

৫। রবীন্দ্রনাথ — লোকসাহিত্য

একক ৯৮ ❒ লোকসাহিত্যের উপকরণসমূহ ও তাদের আলোচনা

গঠন ঃ

৯৮.১ উদ্দেশ্য

৯৮.২ প্রস্তাবনা

৯৮.৩ ছড়া

৯৮.৩.১ শিষ্টছড়া ও লোকছড়া

৯৮.৩.২ ছড়ার বৈশিষ্ট্য

৯৮.৩.৩ ছড়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

৯৮.৩.৪ ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য

৯৮.৩.৫ ছড়ার খেয়ালীজগৎ

৯৮.৩.৬ ছড়ায় কবিত্ব ও স্বপ্ন

৯৮.৩.৭ ছড়ায় সমাজজীবন

৯৮.৩.৮ অন্যত্র ছড়ার ব্যবহার

৯৮.৩.৯ সারাংশ

৯৮.৪ প্রবাদ

৯৮.৪.১ প্রবাদ ও লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা

৯৮.৪.২ প্রবাদের গঠন

৯৮.৪.৩ প্রবাদের বিষয়বস্তু

৯৮.৪.৪ প্রবাদে সংসারজীবন

৯৮.৪.৫ প্রবাদে গার্হস্থ্যজীবন ও সমাজজীবন

৯৮.৪.৬ সারাংশ

৯৮.৫ ধাঁধা উদ্ভব ও সাহিত্যে ধাঁধার পরিচয়

৯৮.৫.১ ধাঁধার প্রকৃতি ও পরিচয়

৯৮.৫.২ ধাঁধার আঙ্গিক গঠন

৯৮.৫.৩ ধাঁধার বিষয়বস্তু

৯৮.৫.৪ প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধা

৯৮.৫.৫ গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক ধাঁধা

৯৮.৫.৬ ধাঁধার অন্যান্য ব্যবহার

৯৮.৫.৭ ধাঁধা পরিবেশনের সময়

৯৮.৫.৮ সারাংশ

৯৮.৬ লোকসংগীত
৯৮.৬.১ বাংলা লোকগীতির প্রকৃতি
৯৮.৬.২ বাংলা লোকগীতির শ্রেণীবিভাগ
৯৮.৬.২.১ ব্যবহারিক সঙ্গীত
৯৮.৬.২.২ কর্মসঙ্গীত
৯৮.৬.২.৩ আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত
৯৮.৬.৩ আঞ্চলিক সঙ্গীত
৯৮.৬.৪ লোকসঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্র
৯৮.৬.৫ সারাংশ
৯৮.৭ গীতিকা লোকসংগীত ও গীতিকা
৯৮.৭.১ গীতিকার নানারূপ ও বৈশিষ্ট্য
৯৮.৭.২ ব্যালাড ও গীতিকা
৯৮.৭.৩ গীতিকার প্রতিশব্দ
৯৮.৭.৪ গীতিকার ত্রি-ধারা
৯৮.৭.৫ সারাংশ
৯৮.৮ লোককথা
৯৮.৮.১ লোককথার প্রকৃতি ও পরিবেশ
৯৮.৮.২ লোককথার নানারূপ
৯৮.৮.৩ লোককথার অভিপ্রায়
৯৮.৭.৪ লোককথার ভবিষ্যৎ
৯৮.৭.৫ সারাংশ
৯৮.৯ লোকনাট্য
৯৮.৯.১ লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য
৯৮.৯.২ লোকনাট্যের মিশ্রধর্মিতা
৯৮.৯.৩ লোকনাট্যে গণসংযোগ ও আধুনিক নাটক
৯৮.৭.৪ লোকনাট্য পরিচয়
৯৮.৭.৫ লোকনাট্যের ভবিষ্যৎ
৯৮.৭.৬ সারাংশ
৯৮.১০ মন্ত্র
৯৮.১০.১ ঋক্‌বেদ ও মন্ত্র

৯৮.১০.২ মন্ত্রের উদ্ভব

৯৮.১০.৩ মন্ত্রের ব্যবহার

৯৮.১০.৪ মন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

৯৮.১০.৫ মন্ত্রে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

৯৮.১০.৬ মন্ত্রের সাহিত্যিক দিক

৯৮.১০.৭ সারাংশ

৯৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৯৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা বাংলার অলিখিত বা মৌলিক সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন। জানতে পারবেন শিষ্ট বা লিখিত কিংবা নাগরিক সাহিত্যের সমান্তরালে বাংলার এক অলিখিত সাহিত্যের ভাণ্ডারের খবর। একক কোন মানুষের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উৎস থেকে উঠে আসা সাহিত্য নয়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা ও হৃদয়ের সরলতা থেকে উঠে আসা এই সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করাই এই এককের উদ্দেশ্য। আলোচ্য এককটি পাঠ করে আপনারা—ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসংগীত, লোককথা, লোকনাট্য, গীতিকা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন। প্রতিনিয়ত আমরা যে মৌখিক সাহিত্যের ধারা দেখি, শুনি তার সম্পর্কে আপনারা এ পর্যায়ে জানতে পারবেন।

৯৮.২ প্রস্তাবনা

বাঙালি সংস্কৃতির এখন বড়ই দুর্দিন। এর মধ্যে আবার আরও খারাপ অবস্থা বাংলার লোকসংস্কৃতির, বিশেষত লোকসাহিত্যের। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সেই বিখ্যাত পংক্তি দুটির কথা মনে পড়ে যায়—'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই!'

কাজলা দিদি তো মারা গেছেই। সেই সঙ্গে সন্ধ্যা হলে শীতে আগুন জ্বেলে কিংবা গরমের রাতে তারা ভরা আকাশের নীচে উঠোনে ঠাকুরমা—দিদিমাদের আসর পেতে বসা আর চারদিকে নাতি-নাতনীদের ভীড়— সেই গল্পের আসর আর বসে না, বসলেও তেমন করে জমে না। তার চেয়ে টি.ভি. কিংবা ভি.ডি.ও-র সামনে বসে পড়ায় অনেক মজা। রূপকথার গল্প এখনকার প্রজন্মের কাছে আজব ও উদ্ভট মনে হয়। তার চেয়ে অরণ্যদেব, টিনটিন, চাচা চৌধুরী তাদের অনেক বেশি মজার খোরাক জোগায়। স্বাভাবিকভাবে আজকের এই জেট-যুগে বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার শুধু গুরুত্ব হারাচ্ছে না, চলে যাচ্ছে অবলুপ্তির পথে। এমন অবস্থায় লোকসমাজে প্রচলিত মৌখিক সেই সাহিত্যের ধারাকে একটু বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ, সাহিত্যের এই অলিখিত ধারা, এ কেবল নিরক্ষর সংহত লোকসমাজের খেয়ালী মনের প্রকাশ নয়। এর মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যার নানাদিক কোন না কোনভাবে জড়িত থেকে গেছে। তাই

আপাতভাবে গুরুত্বহীন, অসংলগ্ন এই সৃষ্টি একেবারেই কিন্তু অপাংক্তেয় নয়। এই এককটিতে লোকসাহিত্যের সেই বিভিন্ন উপকরণ বা ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আপনারা বাংলার বিলুপ্ত প্রায় সেই মৌখিক সাহিত্য ধারা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৯৮.৩ ছড়া

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ছড়া। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Rhyme। সাহিত্যের যেমন দুটি ধারা—লোকসাহিত্য ও শিষ্টসাহিত্য, ছড়ারও তেমনি দুটি ধারা বিদ্যমান। এখন শিষ্টসাহিত্যেও ছড়া লিখিত হয়। আমাদের আলোচনার বিষয় লোকসাহিত্যের ছড়া। এ জাতীয় ছড়ার কোন স্রষ্টা পাওয়া ভার। কারণ, ছড়া মূলত ঐতিহ্যবাহিত। এ সংহত সমাজের সৃষ্টি, এ সমাজে ব্যক্তিকণ্ঠের ভূমিকা নেই। লোকসাহিত্যের এই বিশেষ, উপকরণটির তাই নির্দিষ্ট কোন স্রষ্টা নেই। লোকসাহিত্যের এই বিশেষ, উপকরণটির তাই নির্দিষ্ট কোন স্রষ্টা নেই। লোকসাহিত্যের অন্যান্য রচনা ও গোষ্ঠীগত রচনা (communal authorship) ছড়াও তাই। তাই বলে এই নয় যে, লোকসমাজের সকল মানুষ একত্রিত বসে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকতে পারে, কিন্তু লোকসমাজে যেহেতু ব্যক্তি প্রচেষ্টার স্বতন্ত্র কোন স্বীকৃতি নেই, সমষ্টিচেতনা বা গোষ্ঠী চেতনা সেখানে মুখ্য, তাই সেখানে স্রষ্টার একক অস্তিত্ব অনুসন্ধান বৃথা।

৯৮.৩.১ শিষ্ট ছড়া ও লোকছড়া

ছড়া এক অর্থে লোককবিতা। কয়েকটি পংক্তির চরণান্তিক মিল বিশিষ্ট আবৃত্তিযোগ্য লোক সমাজে প্রচলিত কবিতাই ছড়া। শিষ্ট সাহিত্যের ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্যের ছড়ার অনেক বৈসাদৃশ্য। প্রথম ধরনের ছড়ার একজন নির্দিষ্ট রচয়িতা থাকে, দ্বিতীয় ধরনের ছড়া মূলত প্রচল ঐতিহ্যবাহী এবং মৌখিক। এর কোন স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শিষ্টসাহিত্যের ছড়াও অনেক সময় জনপ্রিয়তার আধিক্যে ঐতিহ্যবাহী হয়ে পড়ে। শিষ্ট সাহিত্যের ছড়া বিষয় সচেতন, পারম্পর্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ। অন্যদিকে লোকসাহিত্যের ছড়া অনেকটা আকাশে ভাসমান মেঘের মতো-দ্রুত পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু-স্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান, এবং সহজেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গম্য।

৯৮.৩.২ ছড়ার বৈশিষ্ট্য

- ছন্দোবদ্ধ চরণান্তিক মিলবিশিষ্ট স্বল্পায়তনের লোক কবিতা হলো ছড়া।
- সাধারণত ছড়ায় ভাবৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।
- যদি কোন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তা অসংলগ্নভাবে প্রকাশ পায়।
- ছড়া সাধারণত আবৃত্তিমূলক।
- এর বিষয়বস্তু ও ব্যবহার মূলত নারী ও শিশুকেন্দ্রিক, অনেকের কাছে ছড়া তাই মেয়েলি এবং ছেলেভুলানো।
- তবে ছড়া কেবল নারী ও শিশুর একান্ত সম্পদ নয়, এর মধ্যে পরিণত বুদ্ধির মানুষের মানবজগতের অনেক খোরাক নিহিত আছে।
- সব ছড়ার-ই একটি প্রত্নরূপ বা (Archetype) থাকে।

- লোকজীবনের সূচারু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ছড়ার আপাত অসংলগ্নতার ভিতরেও অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৯৮.৩.৩ ছড়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

- ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।
- 'ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।'...'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।...সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে।... তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য, তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।'
- 'ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই, সে কথা নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে।'
- ছড়া 'স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।'...'প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এই জন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।'
- 'ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিশ বা আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না।'
- 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু-স্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই।'
- 'জ্যোতির্বিদগণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোতির্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকা রাশির মধ্যে ও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টি পথে পড়ে।'
- 'কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে, ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।'
- 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিদ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

- প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।
- ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।
- 'ছড়ার সকলকথাই ভাঙাচোরা, হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেলানো।'

৯৮.৩.৪ ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য

বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হয় ছড়া কেবল ছেলেভুলানো ও মেয়েলি। কিন্তু ছড়ার যা বিষয়বস্তু, তাতে ছড়া কেবল শিশু ও নারীকেন্দ্রিক নয়। জীবনের অনেক বৃহত্তর ও মহত্তর দিকও লোকমানসসঞ্জাত হয়ে ছড়ার সংক্ষিপ্ত ছন্দোবদ্ধে ধরা পড়েছে। প্রথমত ছড়া নারীকেন্দ্রিক বা মেয়েলি। শিশুসন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্য দোলনা দোল দিতে দিতে মায়েরা ছড়া আবৃত্তি করে ওঠেন।

সে ছড়াকে একই সঙ্গে মেয়েলি ছড়া বলা যায়, ছেলেভুলানো বলা যায়, আবার ঘুমপাড়ানিও বলা যায়, কিন্তু সন্তানকে ঘুমপাড়াতে মা যে ছড়া বলেন, তার বিষয়বস্তু কেবল ঘুমপাড়ানি নয়, ছেলেভুলানিও নয়। তার মধ্যে সমাজ ইতিহাসের অনেক কঠিন সত্য যেমন ধড়া পড়ে, তেমনি পারিবারিক, রাষ্ট্রিক জীবনের যন্ত্রণাও উপেক্ষিত থাকে না। শিশুকন্যাকে দোলনায় ঘুমপাড়াতে গিয়ে মা যখন গেয়ে ওঠেন—

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে যখনি

নিয়ে যাবে তখনি। — তখন ছন্দের দোলায় শিশু-সন্তানটি ঘুমিয়ে হয়তো পড়ে, কিন্তু ওই যে 'বর আসবে যখনি / নিয়ে যাবে তখনি' — ওর মধ্যে শিশুকন্যার বিবাহ বা বিদায়ের যে পালা লেখা আছে তাকে এড়ানো যায় না কিছুতেই। ছড়াটি ঘুমপাড়ানি হলেও এর মধ্যে শিশুকন্যা বিবাহের ইতিহাসটি নিহিত থেকে গেছে। বাঙালি সমাজের বাল্যবিবাহ প্রথা বা গৌরীদান প্রথাটি এই ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে।

'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।'—ছড়াটি এক অর্থে ঘুমপাড়ানি বা ছেলেভুলানি হলেও এর মধ্যে ধরা রয়েছে বাংলায় বর্গী আক্রমণের অতীত ইতিহাসের স্মৃতি। আসলে, কেবল ছড়ায় নয়, লোকসাহিত্য কিংবা লোকসংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেক শাখায় সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার প্রভাব থেকে গেছে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে অন্যান্য বিদ্যার এই যোগসূত্র গড়ে ওঠার পিছনে লোকমানসের সচেতন কোন ভূমিকা নেই। তাদের স্বাভাবিক জীবন চর্যার মধ্যে এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গেছে। লোক সমাজের খেয়ালী সৃষ্টি ছড়ার মধ্যেও জীবনের নানাদিক সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

৯৮.৩.৫ ছড়ার খেয়ালী জগৎ

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছড়া একটু অধিক খেয়ালী মনের সৃষ্টি। ছড়া সৃষ্টির অন্তরালে এই খেয়ালীপনাই ছড়ার অবয়ব ও আচরণকেও অনেক সময় মেঘের মতো বায়বীয় ও ক্ষণপরিবর্তনশীল করে গড়ে তুলেছে। ছড়ার সেই খেয়ালীজগৎ বাস্তব-অবাস্তবে মেশানো, সে জগৎ আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। তবে শিশুর কাছে সে জগৎ সত্য। কারণ ছড়ার খেয়ালীপনা শিশুর খেয়ালীপনার মতো। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দুপারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।—ছড়াটির এ অংশ পর্যন্ত বাস্তবতার অভাব নেই, মোটামুটি পারম্পর্য বজায় রেখে এগিয়েছে। কিন্তু—

ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।
ঝুনুঝুনু চুলগাছাটি ঝাড়তে লেগেছে।।
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।।
দাদা যাবে কোন্ খান দে, বকুলতলা দে।।
বকুলফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দিবাজে, সীতে নাথের খেলা।।
সীতেনাথ বলে রে ভাই, চাল কড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে।

সোনা-মুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে।। —ছড়াটির প্রথম অংশের বাস্তব ধারাবাহিকতা দ্বিতীয় অংশে গিয়ে অদ্ভুত এক খাম-খেয়ালীপনাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে ছড়া ছেলে ভুলানো, ছড়ার জগৎ স্বপ্নবৎ এবং মেঘের মতো নিত্যপরিবর্তনশীল।

৯৮.৩.৬ ছড়ায় কবিত্ব ও স্বপ্ন

ছায়াপথের নীহারিকার মধ্যে এক এক জায়গায় বাষ্প যেমন সংহত হয়ে নক্ষত্রে পরিণত হওয়ার উপক্রম করে। ছড়ার মধ্যেও তেমনি অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সে কবিত্ব লোককবিত্ব, শিশুকবিত্ব। সেখানে ছড়ার স্রষ্টা-শ্রোতা এবং ছড়াব চরিত্র শিশু ও তার জননী। —সন্তান ও তার জননীর মধ্যেকার সম্পর্ক স্নেহে, মায়া ও মমতায় স্বর্গীয়। —সন্তানকে কেন্দ্র করে সেখানে মায়ের আদরের আতিশয্য অনেক অসম্ভবকে ছড়ায় সম্ভব করে তোলে। যেমন—

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।।
খোকা বলে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।।

খোকা কখনও পাখি হতে পারে না। অথচ মায়ের আদরে তা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় শিশুর মতো কবির স্বপ্নে। শুধু খোকার পাখি হওয়া নয়, মায়ের অনাহারে দিব্যি সুস্থ থেকে যাওয়াও সম্ভব ছড়ার মধ্যে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।। —কোলের সন্তানকে বনে গিয়ে সেখানে খাবার জিনিষের অভাবে মা সন্তানের চাঁদ মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেবেন দিনের পর দিন। বাস্তবে স্নেহ-ভালোবাসার এ স্বর্গ-পুরী রচনা তো সম্ভব নয়, অথচ ছড়ার জগতে সবই সম্ভব। আসলে ছড়ার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, শিশুর জগৎ। আর শিশুর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই, সবই সম্ভব। তাই খোকা যেমন পাখি হতে পারে, মা তেমনি তার 'মুখ নিরখি' অনাহারে কাটিয়ে দিতে পারেন দিনের পর দিন।

৯৮.৩.৭ ছড়ায় সমাজ জীবন

ছড়া মাত্রেই খামখেয়ালী বা স্বপ্নময় কিংবা মেঘের মতো সঞ্চরণশীল এমন কিন্তু নয়। অনেক ছড়ায় তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।' যেমন—

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন "শ্বশুর বাড়ি সংসার কাঁদায়ে।।
... ...
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে।।
... ...
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন ভাতার খাকী বলে।। —কন্যা বিদায়ের যন্ত্রণা বাঙালি জীবনের চিরন্তন যন্ত্রণা। পুত্র সন্তান নিজের, কিন্তু কন্যাসন্তান পরের — এ ধারণা বাঙালিমানসে বদ্ধমূল হয়ে থাকলেও, কন্যা বিদায়কালে আপনজনেরা স্থির থাকতে পারে না। কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত সবাই কোন না কোন ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তবে সবার কান্নাকে ছাপিয়ে যায় বোনের কান্নার সততা। দিদির সঙ্গে খুনসুটি সূত্রে যে বোন দিদিকে ভাতারখাকি বলে গাল দিয়েছিল। দিদির কুমারী কালে সে গালের কোন সার্থকতার প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু আজ যখন দিদি স্বামীর ঘরে যাচ্ছে, তখন সেই গালটির কথা স্মরণ করে দিদির প্রতি অভিশাপের সম্ভাবনার কথা ভেবে বোনটি আর স্থির থাকতে পারছে না।

শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে আপনজনের কান্নায় কষ্ট পেলেও সদ্যবিবাহিতা কন্যার তরফে সান্ত্বনার একটাা যুক্তি থাকে—

দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।।
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর।।

নারীজীবনের এ এক অদ্ভুত দিক। জন্মের পর যারা লালন-পালন করল, সেই মা-বাবার সকল বাঁধন কেটে নারী চলল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষের সংসারে — অন্যের বাবা-মাকে বাবা-মা বলতে। এ যেন এক জীবনবৃত্ত। আজ মেয়ে, কাল মা, পরে শাশুড়ি। তাই পরের ঘরে যেতে কন্যার মধ্যে কষ্ট থাকলেও সান্ত্বনা আছে। তবে সান্ত্বনার যুক্তিও যন্ত্রণায় পরিণত হয়ে যায় শ্বশুরঘর যখন প্রতিকূল হয়ে ওঠে—

অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর।।
পরের বেটা মারলে চড়।
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি।।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা-'চল্ শ্বশুরবাড়ি'।

নারীচরিত্রের এই দুর্বিষহ যন্ত্রণার কথা কোন ইতিহাস লিখে রাখে না। লোক-মানসে ধরা বাঙালি সমাজের এই ছবি প্রতিফলিত হয় ছড়ার মধ্যে।

৯৮.৩.৮ অন্যত্র ছড়ার ব্যবহার

বাংলা ছড়ার সাধারণরূপের পাশাপাশি তার আরো কয়েকটি রূপ পাওয়া যায়—যেমন, লোকক্রীড়ায় ও ব্রতকথায়। লোকক্রীড়া সাধারণত অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক হলেও, কিছু কিছু লোকক্রীড়ায় অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি মৌখিক ছড়াও থাকে। যেমন, কবাডি, ইকিড়-মিকিড়, গাছদুয়া-গাছদুয়া, কুমীর কুমীর ইত্যাদি অনেক লৌকিক ক্রীড়াতে খেলা সংশ্লিষ্ট ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। খেলার মতো বাংলার বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতের মধ্যেও বিশেষত ইতুব্রত, পুন্যিপুকুর ব্রত, পৃথিবীব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত ইত্যাদিতেও ছড়ার ব্যবহার লক্ষিত। ব্রতের ছড়াগুলো মূলত মানসিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা জানানোর। এর মধ্যে আত্ম ও সংসার-সুখ কামনায় নারী মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, অথচ তাতে সাংসারিক সুখ-দুঃখ জড়িয়ে আছে এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠানেও ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের মধ্যে ভাগাড়েতে মরা গরু ফেলার সময়, পৌষ মাসে ধানের বিচালির গাদা দেওয়া ইত্যাদির সময় ও ছড়ার ব্যবহার হয়। এ সমস্ত ছড়ার সঙ্গে অনেক সময় যাদু-বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে। এবং যাদু-বিশ্বাস সংক্রান্ত ছড়ার সঙ্গে মন্ত্রেরও অনেক সময় যোগ থেকে যায়।

বাংলা লোকছড়ার ভাণ্ডার নানান বিষয়ে সমৃদ্ধ। তার মধ্যে কল্পনা, অসম্ভব ও পারম্পর্যহীনতার রঙিন মেঘের মতো বিষয়ও যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সমাজ-ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ধর্ম, ভূগোল, ভাষাতত্ত্বের বিষয়ও লক্ষিত হয়। সব মিলিয়ে বাংলা ছড়া লোক মানসের মধ্যে দিয়ে সমাজ-মানসের নানান দিককে স্থান দিয়েছে এবং দিয়ে চলেছেও। লোকসংস্কৃতির মতো বাংলা ছড়াও গতিশীল একটি ধারা।

৯৮.৩.৯ সারাংশ

বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ছড়া, ছড়া মূলত ঐতিহ্যবাহিত এবং সংহত সমাজের সৃষ্টি, লোকসমাজে প্রচলিত কয়েকটি পংক্তির চরণান্তিক মিল বিশিষ্ট আবৃত্তিযোগ্য কবিতাকেই ছড়া বলা হয়।

সাধারণভাবে দেখলে মনে হয় ছড়া ছেলে ভুলানো ও মেয়েলি, কিন্তু জীবনের অনেক বৃহত্তর ও মহত্তর দিকও চড়ার মধ্যে ধরা পড়ে। আসলে শুধু ছড়ায় নয়, লোকসাহিত্যের প্রত্যেক শাখায় সমাজতত্ত্ব,, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

ছড়ার সাধারণরূপের পাশাপাশি আরো কয়েকটি রূপ পাওয়া যায়। যেমন —লোকক্রীড়ায় ও ব্রতকথায়।

সবমিলিয়ে বাংলা ছড়া লোক-মানসের মধ্যে দিয়ে সমাজ-মানসের নানদিককে স্থান দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বাংলা ছড়াও লোকসংস্কৃতির মতো গতিশীল একটি ধারা।

রেখাচিত্র-১

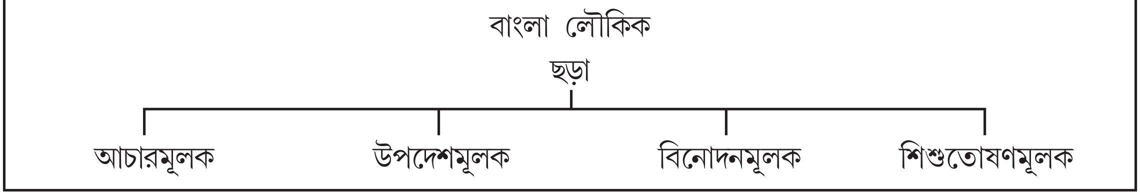

রেখাচিত্র-২

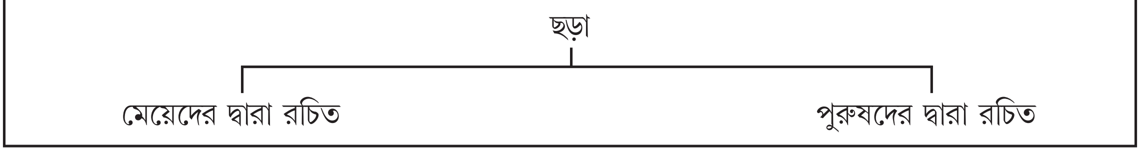

রেখাচিত্র-৩

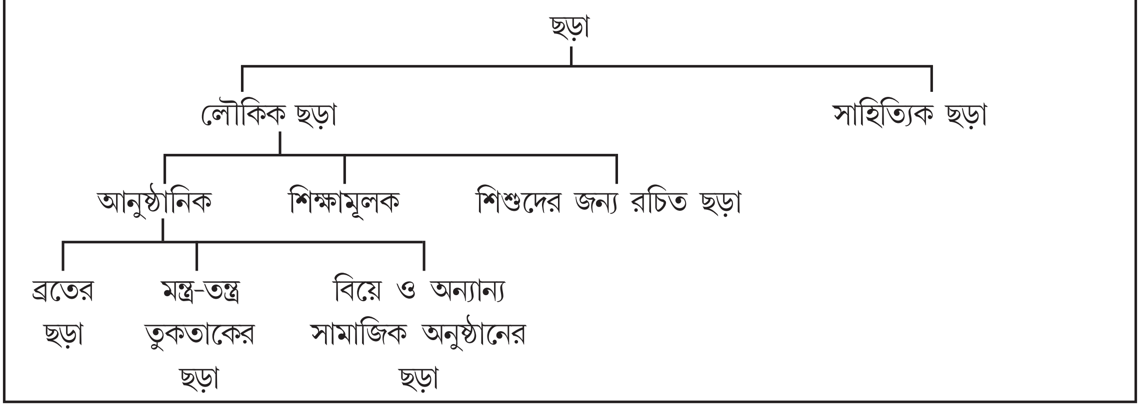

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন —

১। লোকছড়া ও শিষ্টছড়ার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

২। লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

৩। বাংলা লোকছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব্যক্ত করুন।

৪। ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

৫। ছড়ার খেয়ালী জগতে পরিচয় দিন।

৬। ছড়ায় কবিত্ব ও স্বপ্নজগতের পরিচয় দিন।

৭। ছড়ায় প্রকাশিত সমাজ-জীবনের পরিচয় দিন।

৮। পারিবারিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা কিভাবে ছড়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, তা দেখান।

৯। সামাজিক জীবনের অন্যান্য কাজের ছড়া কিভাবে ব্যবহৃত হয় দেখান।

১০। **সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) দিন —**

(ক) ব্রতের ছড়ায় প্রকাশিত হয়—মানসিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা ☐ দৈহিক যন্ত্রণা ☐ আনন্দবার্তা ☐

(খ) কবাডি, ইকির-মিকির এই লোকক্রীড়া দুটি একই সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গি ও — আচারঅনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ☐ বাককেন্দ্রিক ☐ বস্তুকেন্দ্রিক ☐

(গ) ছড়া লোকসংস্কৃতির — বস্তুকেন্দ্রিক দিক ☐ বাক্‌কেন্দ্রিক দিক ☐ অঙ্কনকেন্দ্রিক দিক ☐

৯৮.৪ প্রবাদ

লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ হল প্রবাদ। প্রবাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ—‘প্রচলিত কথা’, ‘জনশ্রুতি’ প্রভৃতি। প্রবাদগুলিতে সাধারণত সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা প্রভৃতি গুণ থাকে। লোক সাহিত্যের অন্যান্য উপকরণ থেকে প্রবাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রবাদের মধ্যে কল্পনার কোন জায়গা নেই। প্রবাদ সম্পূর্ণভাবে সমাজ-সম্পৃক্ত। লোকসমাজের দীর্ঘ সমাজ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ-ই হল প্রবাদ। প্রবাদ হল প্রকৃষ্ট বাদ বা কথা, যার পর আর কথা থাকতে পারে না। প্রবাদ বা প্রবচন হল কোন জাতির বা গোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি ‘A Proverb is a short sentence based on long experience.’ অর্থাৎ প্রবাদ হল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এই বাক্যটি প্রথম স্প্যানিশ ভাষায় রচিত হয়েছিল। রচয়িতা হলেন স্প্যানিশ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক Miguelde Cervantes।

৯৮.৪.১ প্রবাদ ও লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা

ছড়ার মধ্যে সমাজ-ইতিহাস-ভূগোলের প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে কল্পনা ও উদ্ভটত্ব এবং পারম্পর্যহীনতা লক্ষিত হয়। ধাঁধায় থাকে বাস্তব একটা রহস্যের আবরণে ঘেরা লোককথা গদ্যে রচিত কল্পলোকের দীর্ঘ কাহিনী। গীতিকা পদ্যছন্দে রচিত হলেও তার দীর্ঘ অবয়ব এবং কাহিনীভিত্তিক গঠন প্রবাদের থেকে পৃথক। লোকগীতির

অবয়ব গীতিকার চেয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও তার আবেগ ও বিশ্বাস-সংস্কার প্রবাদ থেকে তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। লোকনাট্য সমাজভিত্তিক হলেও, তার উৎসে অনেকক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট; আর মন্ত্রের মধ্যে আছে বিশেষ জাদুবিশ্বাস, প্রবাদ আদৌ যার ওপর নির্ভরশীল নয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাদ সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, অথচ সমাজ-অভিজ্ঞতা ও সামাজিক সত্যে সমৃদ্ধ। প্রবাদের সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার পার্থক্য কেবল আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুগত নয়। পরিবেশ ও পরিবেশনেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ছড়া পরিবেশিত হয় সাধারণত ঘুমপাড়ানি পরিবেশে, কোন আচার-অনুষ্ঠান বা ব্রতপালনে এবং লোকক্রীড়ায়, ধাঁধা রাত্রে, লোককথা রাত্রের অবসরে, গীতিকা ও লোকনাট্য আসর পেতে, মন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান ও লোকচিকিৎসায়, লোকগীতি কাজে-অকাজে, অনুষ্ঠানে অবসরে আর প্রবাদ পরিবেশনের কোন স্থান-কাল-পাত্রের বিধিবদ্ধতা নেই, কাজে-অকাজে দিনে-রাতে সর্বক্ষণ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রবাদ যেহেতু সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, তাই জীবনের যেকোন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায় প্রবাদ পরিবেশিত হয়ে থাকে।

প্রবাদ পরিবেশনে একটা বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল, তা হল প্রবাদ মূলত উপমাধর্মী বা তুলনাবাচক। বিশেষত বক্রোক্তি ও রূপক প্রবাদের প্রধান অবলম্বন। কোন কিছু দেখে অতীতের কোন অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতির কথা মনে পড়লেই প্রবাদের ব্যবহার হয়। প্রবাদের বিশেষ স্বভাব হল প্রবাদ সমাজ-শিক্ষক। বিশেষ এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক / পারিবারিক / ব্যক্তিক যে কোন স্বভাবকে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের ভিত্তিতে সমালোচনা করে। প্রবাদ সর্বদা অভিজ্ঞতা এবং অতীত নির্ভর। প্রবাদ সামাজিক সত্যের উপর নির্ভরশীল। প্রবাদ যেহেতু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, তাই এর মধ্যে মিথ্যার তেমন জায়গা নেই, কোনরকম ফাঁকি বা অসংগতি বা অন্যায় প্রবাদ বরদাস্ত করে না।

৯৮.৪.২ প্রবাদের গঠন

প্রবাদের গঠন অতিসংক্ষিপ্ত, লোকসাহিত্যের এই উপকরণটির নেপথ্যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করলেও, এর অবয়বটি কিন্তু সবচেয়ে ছোট। প্রবাদের আঙ্গিক অনেকটা ধাঁধার মতো। সংক্ষিপ্ত, ছন্দোবদ্ধ। তবে ধাঁধাতে থাকে রহস্যের আবরণ, প্রবাদে মুক্ত মনের পরিচয়। সমাজ পর্যবেক্ষণ ও নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার। তবে, প্রবাদ সর্বদা সংক্ষিপ্ত নয়। কখনো কখনো ছড়াধর্মী প্রবাদও পাওয়া যায়। পাওয়া যায় সংলাপধর্মী প্রবাদও। প্রবাদের পরিমিত অবয়ব প্রবাদের মধ্যে রচনাগত বা বিষয়গত কোনরূপ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রবাদের অবয়বভিত্তিক কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া যায়—

সংক্ষিপ্ত অবয়ব	ঃ	অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে মনস্তাপ।। অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।।
একাধিক পংক্তির প্রবাদ	ঃ	ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে। আনাড়ির ঘোড়া লয়ে, বুদ্ধিমানে চড়ে।।
ছড়াধর্মী প্রবাদ	ঃ	নিমতেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খর। তার চেয়ে অধিক তেতো, বোন সতীনে ঘর।। আক্কালে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ। স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ।।

সংলাপধর্মী ঃ কাঁথ খানরে কাঁথ খান

ভাসুর কি পাঁকালমাছ খান।

খান খান খান পেলে পাঁচ দশ খান খান,

এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান।

ভাসুর-ভাদ্রবৌ-এ কথা বলা নিষিদ্ধ। বাড়িতে কেউ নেই। অথচ নতুন বউ জানেনা ভাসুর পাঁকাল মাছ খান কিনা! তাই রান্নাঘর ও ভাসুরের ঘরের মাঝখানের কাঁথ বা মাটির দেওয়াল হয়েছে মাধ্যম। তার কাছে নতুন বৌ প্রশ্ন করলে ভাসুর দেয় উত্তর। ভাসুরও তেলের অপেক্ষায় নাইতে পারছিলেন না। তিনি এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। এভাবে বাংলা প্রবাদের মধ্যে নাটকীয় সংলাপে সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা ও সম্পর্কের কথা প্রকাশিত।

সাধারণত দুই পংক্তির প্রবাদে চরণান্তিক মিল দৃষ্ট হয়। আগেই উদাহরণ পেয়েছেন। এক পংক্তির প্রবাদে শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষিত হয়—'অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু'।। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, অন্নবিনা ছন্ন ছড়া।' এক পংক্তির প্রবাদ অনেক সময় মিত্রাক্ষর হয়—'অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি।' 'অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।' অনেক সময় গদ্যধর্মী প্রবাদও দৃষ্ট হয়—'অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।' 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।' একই শব্দের পুনরুক্তিও লক্ষ্য করা যায় অনেক প্রবাদে—অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে। ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারনে।'

প্রত্যেক ভাষায় এমন কতকগুলো বাগভঙ্গি থাকে, তাকে অনেকটা প্রবাদের মতো মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো প্রবাদ নয়। ইংরাজিতে এদের বলে Proverbial Phrase বা বাংলায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। যেমন, 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা', 'কোমর বেঁধে কাজে লাগা' ইত্যাদি। আসলে প্রবাদে একটি সম্পূর্ণভাব প্রকাশ পায়, এই প্রকার বাক্যাংশ দ্বারা তেমন কোন সম্পূর্ণভাব প্রকাশ পায় না। এগুলো বাক্যের ভাব বা অর্থ প্রকাশের সহায়ক মাত্র, কিন্তু কোনও স্বাধীন বাক্য নয়, সেজন্য এদেরকে বাক্যাংশ বলা হয়েছে।

৯৮.৪.৩ প্রবাদের বিষয়বস্তু

প্রবাদ হল দীর্ঘলোক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। এই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ভরা প্রত্যক্ষজীবনের রকমারি বিষয়বস্তুতে। সেখানে মানুষ তার প্রধান প্রতিপাদ্য। মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, পেশাভিত্তিক জীবন যেমন প্রবাদের তির্যক দর্পণে আলোচিত ও সমালোচিত হয়; তেমনি প্রত্যক্ষ জীবনের লৌকিক দর্শনে সহজবোধ্য সত্য ও প্রবাদের বিষয়বস্তু আছে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়, আছে সাধারণ সমাজ-নীতি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, লোক চিকিৎসা, ঐতিহাসিক ঘটনা, লৌকিক কাহিনী — সব মিলিয়ে কল্পনা নয় বাস্তব জীবনের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

প্রবাদ লোক সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম বাহন; বিস্তৃত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধনে সংহত হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্ততা ও সার্বজনীন মানবিক ভিত্তির জন্য প্রবাদ যেমন নিজস্ব সমাজের মধ্যে সহজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে, তেমনই দেশান্তরেও তা সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে। প্রবাদ শুধু দেশান্তরে বিস্তার লাভ করে না। নানান দেশের প্রবাদের মধ্যে বিষয়গত ও ভাবগত মিলও লক্ষিত হয়। কারণ, অভিজ্ঞতার

সাদৃশ্য, মানুষকে মূলত একইরকম শিক্ষা দেয়। অভিজ্ঞতালব্ধ বলে প্রবাদের একটা বড়ো ভূমিকা হল প্রবাদ মূলত শিক্ষামূলক। এক অর্থে বলা যায় প্রবাদের ভূমিকা সামাজিক জীবনে অনেকটা সমাজ-শিক্ষকের মতো। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয় যে লোকসমাজ প্রবাদের মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্যসূত্রে পেয়ে যাওয়া দীর্ঘলোক অভিজ্ঞতা তাদের অনেকটা বিদ্যালয় শিক্ষার অভাবপূরণ করে দেয়। প্রবাদের সংক্ষিপ্ত অবয়ব লোক-সমাজের স্মৃতির উপর কোনও অনাবশ্যক ভার হয়ে দাঁড়ায় না। তাদের মধ্যে সহজ যোগসূত্রে গেঁথে যায় প্রবাদের বিচিত্র বিষয় লোকসমাজের সমাজ-শিক্ষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

৯৮.৪.৪ প্রবাদে সংসার জীবন

বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোকে টুকরো জগৎ বা আস্ত জগতের ভাঙা টুকরো বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাংলা প্রবাদ সম্পর্কে ঠিক ওই একই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছড়াতে বাংলার মায়েদের যে কল্পনাবহুল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা প্রবাদে বাঙালি নারীর ঠিক উল্টোচিত্র প্রতিফলিত। প্রবাদ ভাবের সৃষ্টি নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা, সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। বাংলা প্রবাদের প্রবাদ পুরুষ সুশীল কুমার দে'র 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থের ভূমিকা অংশ থেকে ঋণ নিয়ে বলা যায়, ‘‘প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙালি ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ ও হাস্য-কৌতুকের কণা শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালির দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমা অসহিষ্ণুতা, পানা পুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, ভাল ও মন্দ লইয়া রক্তমাংসে গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ; তাই বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন নিখুঁত ঘরোয়া চিত্র অন্যত্র পাওয়া যায় না।’’

এখানে বাঙালি মায়ের স্নেহ-কোমল রূপের অভাব নেই -
চিঁড়ে বল, মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নেই।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই।।
মা নেই যার, না' নেই তার।।
মোরে বল কালো কালো, যার ছেলে তার মায়ের ভালো।।

মা ও সন্তানের এই সম্পর্কের মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয় যথাকালে ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনার পর। যে ছেলে ছিল চোখের মণি, সেই ছেলে এখন —

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।
কিংবা, বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা।।

বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া সন্তান আজ— 'বুকে খেয়ে মুখে মারে' মা জেনে গেছেন— 'যতক্ষণ দুধ, ততক্ষণ পুত, পুত্র আজ আর 'মায়ের পুত নয়, শাশুড়ির জামাই।' সন্তান গর্ভে ধারণ করে মায়ের আজ দুঃখের অন্ত নেই—

বেটা বিয়লাম, বউকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি।।

স্বাভাবিকভাবে ছেলের মা বা বউয়ের শাশুড়ির রাগ গিয়ে পড়ে বাড়িতে আসা নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী নতুন বউয়ের উপর—

শুন ভাই কলির অবতার।
কোণের বউড়ী বলে - ভাতার ভাতার।।
মা চায় আঁতপানে, মাগ চায় ভাত পানে।।

বউকে শাশুড়ি এক নজরে দেখতে পারে না—

বউয়ের চলন-ফেরন যেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিখ কেঁকায় যেমন।।
লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে।
মেঘে মেয়ে বেলা যায়, কনে-বউ সাতবার খায়।।

এহেন নতুন বউ চাল মাপার সরাটি ভেঙে ফেলে, শাশুড়ির শাসন থেকে মুক্ত হবে বলে, কিন্তু তাতেও শাশুড়ি জব্দ হয় না—

ছোট সরাটি ভেঙে গেছে, বড় সরাটি আছে।
নাচ-কোঁদ কেন বউ, আমার হাতের আটকাল আছে।।

শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্বে ননদ স্বাভাবিকভাবে মায়ের পক্ষে, কারণ মা সব সময় মেয়ের পক্ষে—

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায়।।

অবিবাহিতা কিংবা বিবাহিতা হোক না কেন ননদ এসে পক্ষ নেয় বউয়ের শাশুড়ির, তাকে সমর্থন করে পাড়া প্রতিবেশী—

কাছের গোড়ায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়।
তার কথা কি কখনো লঙ্ঘন হয়।।
আদর বিবি চাদর গায়, ভাত পায় না ভাতার চায়।।
কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই।।

শাশুড়ি-ননদিনী-পাড়া প্রতিবেশীর সাঁড়াশি আক্রমণে স্বাভাবিকভাবে—

লোহা জব্দ কামার বাড়ি, বউ জব্দ শশুর বাড়ি।
বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।।

এহেন শাশুড়ি ও ননদের প্রতি বউয়ের অন্তরে ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা সঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই সে সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—

শাশুড়ি মলো সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে।
ননদেরও ননদ আছে।।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়।।

এহেন অত্যাচারিত বউ যেদিন সুযোগ পায় সেদিন শাশুড়ি মৃত্যু শয্যায়, বউয়ের মা এসে জিজ্ঞেস করে— একলা ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা।

মেয়ে জবাব দেয়— নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দুটো পা।

আর ননদের প্রতি প্রতিশোধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে—

ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে-আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে-নাচাতে।।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে।।

সংসার জীবনের এই দ্বন্দ্বমুখর দিকটিই যে কেবল প্রবাদের বিষয়বস্তু, তা নয়।

৯৮.৪.৫ প্রবাদে গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ জীবন

প্রবাদ সমাজ জীবনের দর্পণ। প্রবাদের আয়নায় সমাজ জীবনের সকল দিকই প্রতিবিম্বিত। পরিবার জীবনের সকল মিষ্টি-মধুর, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক ও সম্বন্ধই প্রবাদের বিষয়বস্তু হয়ে ধরা দিয়েছে। প্রবাদ আলোচনায় বিজ্ঞ সমালোচকের প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য, ''শুধু পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালির গৃহের সামাজিক জীবনের এমন দিক নাই, যাহা হইতে বাংলা প্রবাদ বাক্যের উপকরণ আহৃত হয় নাই এবং গৃহস্থালীর এমন কোন বস্তু নাই, যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। নেকড়া কানি, ছেঁড়া চাটাই, কানাকড়ি, ভাঙ্গাকুলো, ছাইয়ের গাদা, ঘটি বাটি, হাঁড়ি শরা, ঘড়া কলসী, থালা কাঁসি, ঢেঁকি চরকা, ছুঁচ চালুনি, ধানচাল, ভাত কাপড়, নুন তেল, শাক, মাছ, ঘি, বড়ি, পিঠে আসকে, খই, কলা, মুড়িমিছরি, লাউ, কুমড়ো, আম-কাঁঠাল, ওল, ঘোল, তেঁতুল, আমড়া, আদা, সুপারি, শালু শামুক, তামা-তুলসী, দা-কাটারি, বঁটি-ঝাঁটা, কুড়ুল-কোদাল, ঢাক, ঢোল, জাঁক জমক, কোঁচা কামিজ, হাট বাজার, চাষবাস, কুটনো কাটা, বাটনা বাটা, ঘরদোর, চাল-চুলো, পথ ঘাট— এমনকি গৃহপালিত গরু মোষ, ভেড়া ছাগল, হাতী ঘোড়া, কুকুর বেড়াল হইতে কাক বক, ছুঁচো ইঁদুর, সাপ ব্যাং পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাস্তব ভাব ও ভাষায়, শ্লেষ ও কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ, জ্ঞান-এর নিরবচ্ছিন্ন খোরাক যোগাইয়াছে।''

যেমন গৃহস্থালীর নানা দিক ও দ্রব্যের, তেমনই সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরো ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রুপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা, গয়লা, তাঁতী, নাপিত, কলুকামার, বেনে সেকরা, ন্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম,

কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিঁদু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাঁচড়, ছোট বড়, ধনী কৃপণ, গরীব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কানা খোঁড়া, হাগুপ্তী নাচুপ্তী, ভড়; ভন্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি, আয়েশ আমিরি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পরচর্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গা স্নান তীর্থযাত্রা, চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটুপূজা, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, পানা পুকুর ভাঙ্গা বেড়া, খালবিল, খানা নর্দ্দমা, গু গোবর, ভাগাড় আঁস্তাকুড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশ বন— কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই।'' সমাজের নানাশ্রেণীর কাজকর্ম্ম 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চন্ডীপাঠ' পর্যন্ত নানান বিষয় প্রবাদের আওতায় পড়েছে। কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-ব্যবহার নয়, সমাজের নানান কৌতুককর বিষয়, আবহবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, লোক চিকিৎসা, কিংবদন্তী, ঐতিহাসিক কোন ঘটনাও প্রবাদের বিষয়বস্তু হয়েছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক্ -

গৃহস্থালীর দ্রব্য বিষয়ক	ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানভানে। ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ।। পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো। চালুনী বলে - ধুচনী ভায়া, তুমি বড় ফুটো। তোর চুপড়ি খসা, মোর চুপড়ি বসা।। ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই। মেটে হুকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই।। ইত্যাদি
বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষ	উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে, কথা কইবে এতিন ছেড়ে।। বামুন, মুচ্ছুদ্দি, ধোপা, গোমস্তা, তার নেই কোন বুঝ-ব্যবস্থা।। বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়া।। বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চন্ডী পড়ে।। লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।। নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, যুগী বৈরাগীর নেইক ওর।। কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।। বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত।।
ধর্মীয় সম্প্রদায়	গরুর মধ্যে এঁড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে। খাওয়ালে দাওয়ালেও মারে তেড়ে।। কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে বড় দড়। না মানবে কোরান কেতাব, হুজ্জৎ করবে বড় হিঁদুদের দুগ্‌গোপুজো, উপরে চিকন-চাকন, ভেতরে খড়ের বুজো।।

সামাজিক মানুষের বাহ্য আড়ম্বরের আড়ালে অন্তঃসারশূন্যতা প্রবাদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে যায়নি—

বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।।
ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।।
ঘরে নেই ভাত, দোরে চাঁদোয়া।।

ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।।
দুর্গাপূজায় শাঁক বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।।
ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজার ঢাক।।
বাড়ির মধ্যে একটি ঘর, তার আবার সদর অন্দর।।

আত্মছিদ্রের কথা ভুলে পরছিদ্রের অন্বেষণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রবাদ সে বিষয়কেও জায়গা দিয়েছে তার সমালোচনায়—

রসুন বলে - পেঁয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মরে যাই।।
রসুন বলে - কাঁচকলা ভাই, তোর বড় খোসা।।
পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সর্ষে।।
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, এমন দিন সবার আসে।।

আপন-পর সম্পর্কে সচেতনতা—

আপন বেলা আঁটাসুঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি।।
পরের ভিটায় জরীপ এলে - মাপ রে মাপ।
নিজের ভিটায় জরীপ এলে - বাপ রে বাপ।।
আপন বেলায় ছ'কড়ায় গন্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গন্ডা।।
আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টেবোগালি।।
পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি।।

অন্যের বা পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা—

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই।।
পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায়।।
পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।।
আপনি বাঁচলে বাপের নাম।।
ছিঁড়ি কুটি নিজের সূত, মারি ধরি নিজের পুত।।
তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঙিনা চষি।।

নারী-পুরুষের সম্পর্ক—
পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি।
পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা।।
ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুন।।
বেশি হলে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল।।
পিরীত যখন ফোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে।।
লোক দেখানো ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা।
দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ।।

যতদিন রস, ততদিন বশ।
পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়।।
যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।।

লোকচিকিৎসা বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা—

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও।।
আলো হাওয়া বেঁধে না, রোগে-ভোগে সেধো না।।
খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি কভু না লাগে।।
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে।।
বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা।।
যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয়।।
খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।।
শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা।
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেসো।।

আবহাওয়া ও কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদ (খনার বচন)—

বাদল বামুন বাণ।
দক্ষিণা পেলে যান।।
ঊন বর্ষা দু'নো শীত।।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।।
যদি বর্ষে মকরে, মাটি হয় টিকরে।।
দিনে পান, রাতে ধান।।

— প্রবাদের সংখ্যা এত অজস্র ও তার বিষয় এত বিচিত্র ও বহুমুখী, জীবনের সামগ্রিক দিক এমন বৃত্তাকারে প্রবাদের অভিজ্ঞতায় আবৃত যে, প্রবাদের বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ইতি টানা বড়ই দুরূহ।।

৯৮.৪.৬ সারাংশ

প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ, এর মধ্যে কল্পনার কোনো জায়গা নেই, লোক সমাজের দীর্ঘ সমাজ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ-ই হ'ল প্রবাদ। এর গঠন অতি সংক্ষিপ্ত হলেও এর ভূমিকা অনেকটা সমাজ শিক্ষকের মতো। প্রবাদ ভাবের সৃষ্টি নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা, সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। প্রবাদের প্রথম ভাবগত লক্ষণ হল দুই সমান্তরাল ধারণার বিরোধ। দ্বিতীয় লক্ষণটি হল, দুটি ধারণার সমান্তরাল প্রকাশ আর তৃতীয় লক্ষণটি হচ্ছে দুটি ধারণার মধ্যে যেটি নেতিবাচক তার প্রতিষ্ঠা।

প্রবাদ সমাজ জীবনের দর্পণ। পারিবারিক জীবনের সকল রকমের সম্পর্কই প্রবাদের বিষয়বস্তু হয়ে ধরা দিয়েছে। তবে পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালির ঘরের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের ছবিও প্রবাদে পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবাদের কাঠামো

দুই ছত্রের প্রবাদ	চার ছত্রের প্রবাদ	এক ছত্রের গদ্য বাক্য দুই ভাগে বিভক্ত	এক ছত্রের গদ্য বাক্য একটি মাত্র ধারণা	দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ সমবায়

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) দিন ঃ

(ক) প্রবাদ লোকসংস্কৃতির
- বাক্‌কেন্দ্রিক ধারা ☐
- বস্তুকেন্দ্রিক ধারা ☐
- বিশ্বাসকেন্দ্রিক ধারা ☐

(ক) প্রবাদ ব্যবহৃত হয়
- দিনে ☐
- দিনে-দুপুরে ☐
- দিনের সর্বক্ষণ ☐

(ক) প্রবাদ
- অভিজ্ঞতা নির্ভর ☐
- বুদ্ধি নির্ভর ☐
- কর্ম নির্ভর ☐

৯৮. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন —

ক) প্রবাদের গঠন বিষয়ে আলোচনা করুন।

খ) সংলাপধর্মী প্রবাদের পরিচয় দিয়ে প্রবাদের গঠন আলোচনা করুন।

গ) আবহাওয়া ও কৃষি সংক্রান্ত প্রবাদের পরিচয় দিন।

ঘ) প্রবাদে কিভাবে লোকচিকিৎসার প্রকাশ ঘটেছে দেখান।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন —

ক) প্রবাদের সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান।

খ) প্রবাদের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

গ) প্রবাদে সংসার জীবনের দ্বান্দ্বিকরূপের পরিচয় দিন।

ঘ) গৃহস্থালীর সামগ্রী কিভাবে প্রবাদে জায়গা করে নিয়েছে দেখান।

ঙ) সমাজজীবনের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রবাদে কেমনভাবে এসেছে দেখান।

চ) বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের প্রতি প্রবাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

৯৮.৫ ।। ধাঁধা ।। উদ্ভব ঃ সাহিত্যে ধাঁধার পরিচয়

''বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলাদিদি কই।''— যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিখ্যাত কবিতা 'কাজলাদিদি'র কাজলাদিদি তার বোনকে 'শোলোক' বলত। এই 'শোলোক' আর কিছু নয়, বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ধাঁধা। বাংলা লোক সমাজে ধাঁধা নানান নামে প্রচলিত।— প্রহেলিকা, শ্লোক, শোলোক, শুলুক, শিলেক, হেঁয়ালি, ধাঁধা ইত্যাদি। ধাঁধা এসেছে ধন্দ থেকে। ইংরাজিতে ধাঁধাকে বলা হয় 'riddle'। ধাঁধা নিয়ে ধাঁধা আছে— এক চেহারা যমজ ভাই। দাদার মাথায় টুপি আছে, ভায়ের মাথায় নাই। আসলে ধাঁধা প্রশ্ন-উত্তরের এক লৌকিক যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে ধন্দ, ধন্দ থেকে ধাঁধা এরকমও হতে পারে। ধাঁধার ব্যবহার অনেক প্রাচীন। প্রত্যেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহার লক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতির স্তর থেকে ধাঁধা পরে প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঋগ্বেদে ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ও তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করবার রীতি প্রচলিত ছিল। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা অনেকেরই জানা আছে। সোমদেবের 'কথা-সরিৎসাগরে' এমন ধাঁধা বা প্রশ্নোত্তর আছে। বাইবেলের মধ্যেও সামসন্‌কে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক নাটকে স্ফিংস (Sphinx) রাজ্যের মানুষকে এক দুরূহ ধাঁধা জিজ্ঞেস করে না পারলে তাদের বিনাশ। এই অবস্থায় রাজা অয়াদিপাউস সেই প্রহেলিকার উত্তর দিয়ে স্ফিংস-এর কবল থেকে রাজ্যবাসীকে উদ্ধার করেন।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যও ধাঁধা বা হেঁয়ালিতে পূর্ণ ছিল। চর্যাপদের তত্ত্ব ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা তো ধাঁধারই রূপান্তর। এছাড়া মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' কিংবা ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলে' বেশ কিছু ধাঁধার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। সাহিত্যে ব্যবহৃত এই ধাঁধাগুলিকে সাহিত্যিক ধাঁধা বা Literary riddle বলা হয়। আসলে লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে এই সাহিত্যিক ধাঁধার তেমন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল উপস্থাপন রীতিতে। সাহিত্যে ব্যবহৃত ধাঁধাগুলি লৌকিক মন বা লোকমানস থেকে উদ্ভূত বটে, তবে সেগুলো সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, শিষ্ট কবি তাঁর রচনার উপাদানগুলো লোকসমাজ থেকে গ্রহণ করে শিষ্ট সাহিত্যে একটু পালিশ করে ব্যবহার করেছেন মাত্র। লৌকিক ও সাহিত্যিক-উভয় ধাঁধাই একই সমাজ-মাটি থেকে উদ্ভূত। আমাদের আলোচনার লক্ষ্য সাহিত্যিক নয়, লৌকিক ধাঁধা।

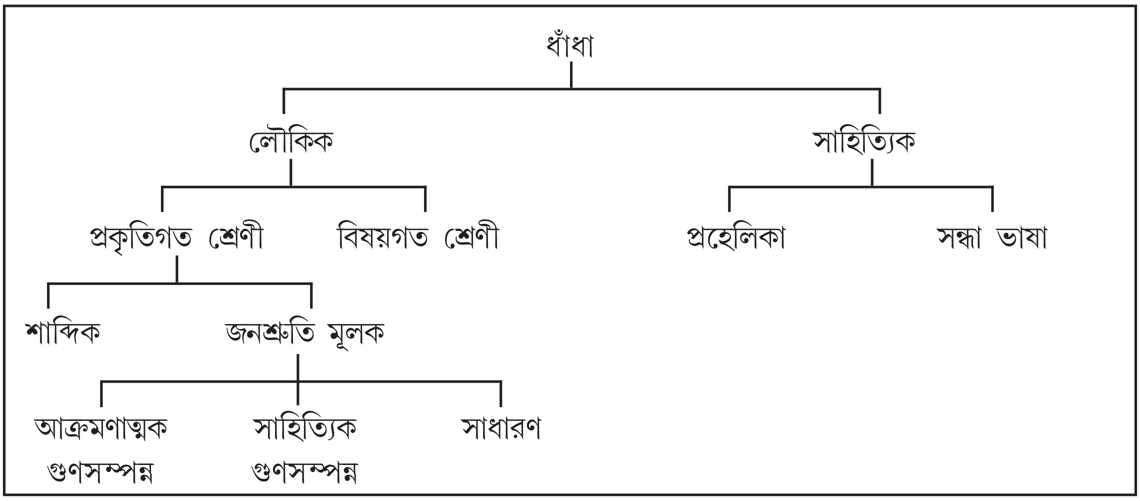

৯৮.৫.১ ধাঁধার প্রকৃতি ও পরিচয়

খুব সহজভাবে বলতে গেলে ধাঁধা আসলে একরকম লৌকিক ছড়া, যার মধ্যে সর্বদা একটা প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা কিংবা রহস্য লুকিয়ে থাকে। ছড়াতে কল্পনা বা আমাদের মনের চলচিত্ততা যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি সামাজিক দিকগুলোও ছড়াতে উপেক্ষিত থাকে না। প্রবাদ তুলে ধরে নিরপেক্ষ ভাবে কিংবা একটু সমালোচকের দৃষ্টিতে সমাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে। ধাঁধা তুলে ধরে পরিচিত কোন বিষয়কে, কিন্তু সব সময় একটা রহস্য কিংবা রূপকের আবরণে। এদিক থেকে ছড়া কিংবা প্রবাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা ধাঁধাতে থাকে না সবসময়। যদিও ধাঁধার ছড়াটি অন্তমিল ও ছন্দোবদ্ধ হয়, তবুও তারমধ্যে কোথাও না কোথাও থেকে যায় কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা। এর কারণ, প্রবাদ যে বিষয়টি সরাসরি বলতে সক্ষম, ধাঁধা সেখানে বলে ঘুরিয়ে, একটু রহস্যের আড়াল দিয়ে। পরিচিত সহজ জিনিষ যখন অস্পষ্টতার মোড়ক পরে আমাদের সামনে আসে, তখন স্বাভাবিক একটা কৃত্রিমতাবোধ জাগে। যেমন ধরুন—বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোমার টোপর মাথায় দিয়ে।

কিংবা, এক নৌকা সুপারি

গুনতে পারো ব্যাপারী।

অথবা, একটু খানি মামা

গা বোঝাই জামা। — সবই আমাদের পরিচিত জগতের দেখা জিনিষ, অথচ কেমন অজানা-রহস্যময় ধন্ধ তৈরি করে হাজির হয় আমাদের সামনে। যেমন, প্রথম ধাঁধাটির উত্তর আনারস, দ্বিতীয়টির আকাশভরা তারা, তৃতীয়টির পেঁয়াজ। পরিচিত বিষয় লোককবির অলংকারের আবরণে সেজে যখন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে জিজ্ঞাসার বিষয় হয় তখন তা লোকসাহিত্যের একটি Art Form-এ পরিণত হয়। তাই ছড়া কিংবা প্রবাদ যতটা সহজ, স্বাভাবিক কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত, ধাঁধা ততটা নয়। এদিক থেকে ধাঁধার আবেদন গ্রাম্য মানুষ বা লোকসমাজের হৃদয়ের কাছে নয়, তার আবেদন বুদ্ধি এবং জ্ঞানের কাছে। প্রতিটি ধাঁধাই একটি জ্ঞানের বিষয়কে কৌতুকের ছদ্মবেশে চাতুর্যপূর্ণ ভাষার সহায়তায় কিংবা রূপকের আবরণে প্রকাশ করে। ধাঁধার আবেদন আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধির কাছে হলে কি হবে, তার মধ্যে সবসময় একটা কাব্য গুণও থাকে।

৯৮.৫.২ ধাঁধার আঙ্গিক গঠন

আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা ধাঁধা বাঁধা-ধরা বিশেষ কোনো রূপের বাঁধনে আবদ্ধ নয়। তা গদ্য, অমিত্রাক্ষর কিংবা মিত্রাক্ষর পদ্য, যে কোনও রূপেই রচিত হতে পারে। বাংলা লৌকিক ধাঁধাগুলোর সঙ্গে বাংলা ছড়ার বহিরঙ্গগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যদিও তবু, দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বাংলা ধাঁধা ছড়ার মতো দীর্ঘ নয়। ধাঁধা সাধারণত প্রশ্নোত্তরমূলক, যদিও বেশিরভাগ ধাঁধাতে প্রশ্নের অংশটুকু দীর্ঘ, উত্তর সংক্ষিপ্ত। সংলাপধর্মী প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধাও পরিলক্ষিত হয়। আসলে ধাঁধাতে যেন জীবনের দ্বান্দ্বিক দিকের প্রকাশ ঘটে। যার জন্যে ধাঁধা কখনই একমুখী নয়। লোকসাহিত্যের সকল উপকরণেই প্রায় দুটো পক্ষ থাকে, একজন গায়ক / কথক / আবৃত্তিকার এবং অন্যজন শ্রোতা। লোককথা, লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ, লোকনাট্য, গীতিকা ইত্যাদিতে শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ মানুষটি নীরব থাকলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু ধাঁধার ক্ষেত্রে শ্রোতাকে নীরব থাকলে চলে না। তাকে প্রতিপক্ষের ভূমিকা অবলম্বন করে জবাবদিহি করতে হয়। সে যেন পরীক্ষার্থী আর ধাঁধার কথক যেন পরীক্ষক।

আর ধাঁধাটি যেন প্রশ্ন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য, নাহলে ধাঁধার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অভিশাপ তার গায়ে পড়ে। যেমন—

কাঁচা বেলায় কাঁচ কুড় কুড় পাকলে সিঁদুর,
যে না বলতে পারবে, তার বাপ বুড়ো ইঁদুর।।

ধাঁধাটির উত্তর মাটির হাঁড়ি / কলসী। উত্তরটি শ্রোতার তরফ থেকে আসবে এটাই কাম্য। এভাবে ধাঁধার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের দিকটি থেকে যায়। যাই হোক, প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে নিগূঢ় একটি অর্থ প্রকাশ করা কিংবা প্রচ্ছন্ন একটি ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা কিংবা রসোজ্জ্বল একটি চিত্র পরিবেশন করার প্রবৃত্তি ধাঁধার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই ধাঁধা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন অর্থের দিকে ধাবিত না হয়ে, ধাঁধার মধ্যে যে রঙিন চিত্রের খণ্ডাংশ লুকিয়ে আছে, তা রসাস্বাদন করতে এগিয়ে আসে। তারপর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হয়। যেমন—

একটু খানি গাছে,

রাঙা বৌটি নাচে। —উত্তর লঙ্কা। উত্তরটি খোঁজার আগে একটুখানি গাছে রাঙা বৌয়ের নৃত্যপর দৃশ্যে আমাদের মন মজে যায়, তারপর উত্তরের সন্ধানে আমরা অগ্রসর হই। প্রশ্নের উত্তরদানের আগে এই রসের দিকটি ধাঁধা থেকে বাড়তি পাওনা। আসলে, অতি তুচ্ছ এবং আটপৌরে বিষয় কিংবা বস্তুকে এভাবে রসসিক্ত করে না বললে, তা কখনই ভালো লাগার বিষয় হয়ে ওঠে না। আবার ধাঁধার মধ্যে প্রশ্নোত্তরমূলক ব্যাপার থাকলেও সকল ধাঁধা কিন্তু প্রশ্নবাচক নয়। প্রশ্ন প্রকৃতি লুকিয়ে থেকে যায় বেশির ভাগ ধাঁধাতে।

৯৮.৫.৩ ধাঁধার বিষয়বস্তু

বাংলা লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই বিষয় নির্দিষ্টতার দিকটি প্রবাদ ও ধাঁধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রবাদের আলোচনায় আপনারা দেখেছেন তার বিষয় বাঙালি জীবনের সকল দিককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সেখানে মানুষ থেকে শুরু করে, মানুষের স্বভাব, আচার আচরণ, তার জাতি, বৃত্তি, আকার, সম্পর্ক ইত্যাদি যেমন প্রবাদের বিষয়বস্তু হয়েছে; তেমনি তাদের জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু, রোগ-শোক, সঙ্গতি-অসঙ্গতি প্রভৃতিও প্রবাদের বিষয়বস্তু হয়েছে। অর্থাৎ বাঙালির সমাজ জীবনের ব্যক্তিক, পারিবারিক সকল দিকই তার পরিধির মধ্যে পড়েছে। ঠিক প্রবাদের মতো বাংলা ধাঁধার বিষয়বস্তুও বাঙালি সমাজ জীবনের ব্যাপক পরিধির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। বাঙালির সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন কর্মে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম উপকরণ বা বস্তু থেকে শুরু করে তাদের পালিত আচার, ক্রিয়াকর্ম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উদ্ভিদ, ফল, ফুল, পশু-পাখির প্রকৃতি, নিসর্গ সকল বিষয়ই কোন না কোনভাবে ধাঁধার বিষয় হয়ে ধরা পড়েছে। আসলে সামাজিক, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে দৃষ্ট, সৃষ্ট, উদ্ভূত সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়বস্তু কোনকিছুই লোককবির দৃষ্টি এড়ায় নি। যা তারা চোখের সামনে পেয়েছে কিংবা দেখেছে সবকিছুকেই কৌতুকের রসে রহস্যের আবরণে উপস্থাপিত করেছে। সেখানে মাটির ফসল ক্ষুদ্র মাসকলাই থেকে আকাশের তারা কেউ-ই বাদ যায় নি। নারীর ঘোমটা দেওয়ার মতো আচার থেকে গরুর দুধ দোয়া, লাঙল চষার মতো ক্রিয়াকর্ম কোনোটাই ধাঁধার জগতে অপাংক্তেয় নয়। দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত পরিচিত বস্তু, তা জড় এবং জীবন্ত দুই-ই হতে পারে, যা আমাদের নিত্য সঙ্গী ভাবে-অভাবে, রোগে-শোকে, প্রেমে-বিরহে, সুখে-অ-সুখে-সবই ধাঁধার বিষয়ের আওতায় পড়ে। যেমন —

নারী-পুরুষ, পশুপক্ষী, অন্যান্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গৃহসজ্জার বিভিন্ন উপাদান, প্রকৃতির বিবিধ সামগ্রী, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত চরিত্র, খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়, আচার-সংস্কার, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি। ধাঁধার বিষয়বস্তু পরিচিত জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায় কিংবা কানে শোনা যায় তার বাইরে ধাঁধার গতায়াত প্রায় নেই। ধাঁধাতে তুচ্ছ বিষয় লোক কবির কাল্পনিক রস ও ভাবের সহায়তা পেয়ে অসামান্য রূপ পেলেও ছড়া কিংবা লোককথার মতো ধাঁধা কিন্তু কল্পলোকের বিষয় নিয়ে তৈরি হয় না। তবে বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাকে বিষয় করে অনেক ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায়। পৌরাণিকতায়, কবিগান কিংবা তরজাগানে এবং শিবসন্ন্যাসীর গাজনে এজাতীয় ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধাঁধার ব্যবহার এ দেশের একটি প্রাচীন প্রথা, মন্ত্রের অলৌকিক গুণবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ না করে ধাঁধার মাধ্যমে প্রকাশ করা হোত। তবে লৌকিক ধাঁধাগুলো মূলত আচার ও ধর্মনিরপেক্ষ।

৯৮.৫.৪ প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধা

বিষয় অনুসারে বাংলা ধাঁধাগুলোকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা — প্রকৃতি-বিষয়ক ধাঁধা ও গার্হস্থ্যজীবন-বিষয়ক ধাঁধা। এছাড়া তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, আয়ুধ, পারিবারিক, মাস, বার, তিথি বিষয়ক, দেবতা, ধর্ম, পুরাণ কথা বিষয়ক, আচার অনুষ্ঠান বিষয়ক ও জীবজন্তু বিষয়ক ধাঁধার বিভাজন দেখা যায়। প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলোর মধ্যে দিয়ে যেমন কল্পনা ও রসের প্রাচুর্য অনুভব করা যায়, তেমনি গার্হস্থ্য জীবন-বিষয়ক ধাঁধাগুলোর ভিতর বাস্তবজীবনের খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতা মূর্ত হয়ে ওঠে। ‘‘প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধাগুলি রচনায় যে সকল গাছপালা বাঙালির গৃহাঙ্গিনায় নিত্য ফুল ফল প্রসব করিতেছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে — কোনও অপরিচিত কিংবা দুর্লভ বিশল্যকরণী ইহাদের উপজীব্য হয় নাই।’’ (বাংলার লোকসাহিত্য - ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য) যেমন —

হাঁড়ার উপর হাঁড়া,
তাতে নীলকমলের দাঁড়া,
তাতে কালমেঘের জল,
তাতে বিনা দুধের দই,
এমন গোয়ালা কই। — নারিকেল গাছ

পাতাটি ঢোলা ফলটি কুঁজো
তাতে হয় দেবতা পুজো — কলা গাছ

খড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস,
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস। — পান।

নারিকেল গাছ, কলাগাছ কিংবা পান বাঙালি জীবনে, বাগানে ও সংস্কৃতিতে এ তিন গাছ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা ধাঁধায় পরিচিত এই গাছগুলো ভাব ও রসের মোড়কে নতুন করে যেন আমাদের কাছে উপস্থিত হল। এর পাশাপাশি তুচ্ছ কুঁচ কিংবা থোড় অথবা সংসার জীবনে ব্যবহৃত মাসকলাইও জায়গা করে নেয় ধাঁধার রহস্যময়তায়।

যেমন — উঠ্‌তে সূর্য নমস্কার
পড়তে মাটি নমস্কার। — থোড়
কাল বউয়ের কপালে চিক্‌,
জামাই এলে করে হিত। — মাসকলাই

অথবা, রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা,
এক কথায় যে বলতে পারে
সে মজুমদারের বেটা। — কুঁচ।

— এই রকম অসংখ্য উদ্ভিজ্জ, শস্য, ফল ধাঁধার বিষয়। প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধার আরো কয়েকটা নমুনা —

'রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই,
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই
মালা ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই। — চন্দ্র, আকাশ, তারা

কিংবা, সুবিছানা পড়িয়া রইছে কেউ শোয় না।
সুফুল ফুটিয়া রইছে কেউ তোলে না। — সাগর ও তারা

অথবা, আকাশ গুর গুর পাথর ঘটা।
সাতাশ ডালে দুটি পাতা ।। — চন্দ্র ও সূর্য

পরিচিত জগৎ কি অপূর্ব ভাব ও রসের মিশ্রণে উপভোগ্য কবিত্বগুণে ধাঁধার মধ্যে রূপ নিয়েছে।

৯৮.৫.৫ গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক ধাঁধা

অপরদিকে গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক ধাঁধায় অতিতুচ্ছ সাংসারিক সামগ্রীও কি অপরূপ রূপ পেয়ে যায় —

মামলা দিলা পুখুরী ভাগিনায় দিলা পাড়।
টিয়াপাখীরে পানি খাইতে দেখায় সংসার।। — আয়না

এক গুজা
গুজায় ধরে মরা,
মরায় ধরে জিতা। — বঁড়শী।

ঘুমত উঠি তাতে হাত। — দরজার খিল।

একগাছ খেড়ে।
সকল ঘর বেড়ে।। — দীপ

পাশাপাশি বৃহৎ সামগ্রীও এসে যায় — হাতি নয়, ঘোড়া নয় মোটা মোটা পা।
তরু নয় লতা নয় ফুলে ভরা গা।। — পালঙ্ক

এতো গেল ব্যবহৃত সামগ্রী, পাশাপাশি তুচ্ছ বিষয় ও ধাঁধার বিষয় হয়। যেমন —

চাই নাকো তবু খাই।
খেয়ে প্রাণে মারা যাই।। — মার খাওয়া।

সবাকার ধরে শিরে নাহি ধরে কেশে।
হস্ত নাই পদ নাই ধরে কিসে - কে সে? — মাথা ধরা।

আহার্য নয় কিন্তু খায় সর্বজন।
অনিচ্ছাতে বাধ্য হয় করিতে ভক্ষণ।।
বৃদ্ধাতে খাইলে তাহা করে হায় হায়।
যুবকে খাইলে তাহা মরে যে লজ্জায়।।
বালকে খাইলে তাহা করে যে রোদন।
এ হেন আশ্চর্য বস্তু ধরাতে কেমন।। — আছাড় খাওয়া।

কালকাসুন্দে কালো পাতা কালো হরিণ চরে,
দশজনে তাড়া করে দুই জনে মারে। — মাথার উকুন বাছা

অলি অলি পাখিগুলি গলি গলি যায়।
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুব্‌লে খায়।। — ধোঁয়া

— এইভাবে ঘরোয়া বা আটপৌরে জীবনের নানান বিষয়, নানান দিক ধাঁধার মধ্যে রহস্যের আবরণ পরে আমাদের সামনে হাজির হয়।

৯৮.৫.৬ ধাঁধার অন্যান্য ব্যবহার

এছাড়াও কতকগুলো ধাঁধা এক একটি ছোট গল্পের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করা হয়। কিছু কিছু ধাঁধায় থাকে জটিল গণিতের সমস্যা, এগুলোকে গাণিতিক ধাঁধা বলা যায়। কিছু কিছু ধাঁধা আছে, যা এখনো আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামে এখনো নববিবাহিত জামাতা বিয়ের পর যেদিন প্রথম শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করে, সেদিন শ্বশুর তাকে বিভিন্ন ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেন। যদিও এ সকল ধাঁধার উত্তর প্রথাসিদ্ধ ও গতানুগতিক, তবুও সে ধাঁধার উত্তর না দিয়ে জামাতা শ্বশুরগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে আসন গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক এরকম গতানুগতিক ও প্রথাসিদ্ধ কিছু ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলার কিছু লোক সমাজের বিয়ের সময়। সেখানে পাত্রপক্ষকে পাত্রীপক্ষের বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে তারপর পাত্রীর গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করতে হয়।

৯৮.৫.৭ ধাঁধা পরিবেশনের সময়

আলোচনার শুরুতে কাজলা দিদির প্রসঙ্গে আপনারা দেখেছেন যে, রাতে আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, ঠিক তখন শিশুটির তার শোলোক বলা কাজলাদিদির কথা মনে পড়তো। এর কারণ বুঝতে নিশ্চয় আপনাদের

অসুবিধা নেই যে, ধাঁধা পরিবেশিত হতো সাধারণত রাত্রে। প্রবাদ কাজের মধ্যে মুক্তি পেলেও, ধাঁধা লোক কথার মতো রাত্রির অবসরকে অবলম্বন করে। কিছু আচারমূলক ধাঁধা ব্যতিরেকে সাধারণ ধাঁধা সারাদিনের কর্মের অবসরে রাত্রের আসরে একসঙ্গে বসে গ্রামের মানুষ যখন গল্প করে, তখন সেই পরিবেশে ধাঁধা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

৯৮.৫.৮ সারাংশ

ধাঁধা বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ। ধাঁধা শব্দটি এসেছে ধন্দ থেকে। খুব প্রাচীনকাল থেকেই ধাঁধার ব্যবহার হয়ে আসছে। খুব সহজভাবে বলতে গেলে ধাঁধা এক ধরনের ছড়া, যার মধ্যে রহস্য লুকিয়ে আছে। ধাঁধা গদ্য, পদ্য যে কোনো রূপেই রচিত হতে পারে।

বাঙালির সমাজজীবনের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র উপকরণ থেকে শুরু করে তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম, ফল, ফুল, পশুপাখি সবকিছুই ধাঁধার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

বিষয় অনুসারে বাংলা ধাঁধাকে প্রকৃতি বিষয়ক এবং গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। ধাঁধা সাধারণত পরিবেশিত হয় রাতে। রাতের বেলা সারাদিনের কাজের পরে মানুষ যখন গল্প করতে বসে, তখনই ধাঁধা পরিবেশিত হয়।

অনুশীলনী

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) দিন ঃ**

(ক) ধাঁধা কোন্ শ্রেণীর লোকসংস্কৃতি —	অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক	☐
	বাককেন্দ্রিক	☐
	সংস্কার-বিশ্বাস কেন্দ্রিক	☐
(খ) ধাঁধা সাধারণত বলা হয় —	দিনে	☐
	দুপুরে	☐
	রাতে	☐
(গ) ধাঁধার মূল লক্ষ্য —	রহস্যের আবরণ	☐
	ভার বিস্তার	☐
	ব্যাখ্যা দান	☐

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) ধাঁধার প্রকৃতি কি রকম?

(খ) ধাঁধা পরিবেশনের সময় সাধারণত কখন?

(গ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ধাঁধার ব্যবহার কি করে হয়?

(ঘ) সাহিত্যে কিভাবে ধাঁধার ব্যবহার ঘটেছে?

৩। **নিম্নের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন**

(ক) ধাঁধার আঙ্গিক গঠন কেমন হয় আলোচনা করুন।

(খ) ধাঁধার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করে দেখান।

(গ) প্রকৃতি ধাঁধার মধ্যে কিভাবে ধরা পড়ে আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করুন।

(ঘ) ধাঁধাতে গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় দিন।

৯৮.৬ লোকসংগীত

বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ শাখা হলো লোকসংগীত। লোকগীতি এককথায় লোকের গীতি। যা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত তা লোকগীতি বা লোকসংগীত (Folk-song)।

ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতি — সবই লোকসমাজের মানস ক্রিয়ার মৌখিক প্রকাশ। তার মধ্যে ছড়া মূলত কল্পনা প্রধান, প্রবাদ সমাজ-অভিজ্ঞতা-নির্ভর, পরিচিতকে রহস্যের আবরণে ঢেকে ধাঁধার আবির্ভাব আর লোকগীতি মূলত ভাব ও সুর নির্ভর। এই চার উপকরণই মুখ্যত লোকমানসের ভাবনা-চিন্তার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। ভাব-আবেগ ও সুরের গভীরতায় অবশ্য লোকসংগীত-ই প্রথম। ছড়ার আবেদন আমাদের মনের কল্পনার কাছে, প্রবাদের আবেদন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কাছে, ধাঁধার আবেদন বুদ্ধির কাছে, আর সংগীতের আবেদন আমাদের হৃদয় ও আবেগের কাছে। লোক-সমাজের হৃদয়ের আবেগ বা ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে লোকসংগীতের মধ্যে। যাকে আমরা বলি লোকসংগীত, তার মধ্যে কথা থাকে, কথার সঙ্গে থাকে সুর আর সুরের সঙ্গে অনুভূতি। লোকসংগীতে সমাজ-অনুভূতির অন্তরালে ব্যক্তি অনুভূতির ছোঁয়া কখনো কখনো অনুভূত হয়ে থাকে।

বাংলা লোকসংগীতের রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য তার ভাণ্ডারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এদিক থেকে প্রকৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলার পল্লী প্রকৃতির সহজ সরল রূপই বাংলার সংস্কৃতির জন্মদাতা। এখানকার বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি, কল্লোলিত নদ-নদীর শান্ত ও বিক্ষুব্ধ রূপ, মুক্ত স্বচ্ছন্দ মেঘমালা, ধূ-ধূ উদাসী প্রান্তর, বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা হাওড়, চর পড়ে যাওয়া নদীবক্ষে কাশবন, বছরের ছটি ঋতু এবং তাদের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ সৌন্দর্য এ দেশের নরনারীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি করেছে; ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত দিক থেকে এদেশের মানুষের মধ্যে তাই স্বভাব-কোমলতা ও গীতিভাব-প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এর সঙ্গে মিশেছে দিনযাপনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যুর ও মিলন-বিচ্ছেদের বিচিত্র স্বাদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্ব-ই তাই বাঙালি ভরিয়ে তুলেছে গানের ডালি দিয়ে।

৯৮.৬.১ বাংলা লোকগীতের প্রকৃতি

লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের মতো লোকসঙ্গীতও ঐতিহ্যবাহী। এর নির্দিষ্ট কোন লেখক বা গীতিকার যেমন থাকে না, তেমনি এর সুর ও কথা লোকমুখে পরম্পরাগতভাবে বাহিত বা গীত হয়, এবং তার ফলে কথা ও সুরে যে বিকৃতি ঘটে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এক অর্থে লোক-গীতি কাউকে শিক্ষা করতে হয় না, এবং তা শিক্ষাদানের কোন বিধিবদ্ধ প্রণালীও নেই। লোকগীতি কিভাবে রচনা করতে হয়, কি ভাবে স্মরণ

রাখতে হয় কিংবা কিভাবে এর সুর ও তাল শিক্ষা করতে হয়, তার কোনও বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই। কেবলমাত্র কানে শুনে সহজাত প্রবর্তনের দ্বারাই এই সকল বিষয় আয়ত্ত করা হয়ে থাকে। তবে লোকগীতির এই সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল লোকসমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য। শিষ্ট সংগীতের মতো লোকসংগীতও এখন নাগরিক মানুষের শিক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শহরের মানুষ এখন লোকসংগীত শেখেন, শেখান; গান করেন, লেখেন এবং সুরও দেন। কিন্তু সেগুলো কতটা পরিমাণে লোকসংগীত সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

লোকগীতি আকারে সাধারণত ক্ষুদ্রই হয়ে থাকে। ইউরোপীয় লোক গীতি সাধারণত চারটি পদে সম্পূর্ণ হয়, সে তুলনায় বাংলা লোক-গীতি সামান্য দীর্ঘ। তবে এই দৈর্ঘ্য যতটা না বিষয়জনিত, তার অধিক পুনরুক্তিজনিত। মূলগীতির বহির্ভূত ধুয়া (refrain)-ই এই পুনরুক্তির হেতু। লোকগীতিতে সাধারণত কোন কাহিনী থাকে না, থাকলেও তা নিতান্ত অসংলগ্ন ও শিথিলভাবে থাকে। কাহিনী নয়, ভাবই লোকগীতির প্রকৃত রসোপলব্ধি সম্ভব হতে পারে না। প্রত্যেক লোকগীতিরই একটি নির্দিষ্ট সুর থাকে, এই সুরের কোন প্রকার ব্যত্যয় হলে কোন লোকগীতিই প্রাণ পায় না। লোকগীতিতে সুরের প্রাবল্য গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে আত্মিক যোগ গড়ে তোলে। কোন গান কথা প্রধান, কোন গান সুর প্রধান, আবার কোন কোন লোক-গীতি কাহিনী প্রধান। কোথাও আবার কথা ও সুর ছাড়িয়ে দৈহিক কোন ক্রিয়া বিশেষত নৃত্য প্রধান। লোকগীতি যেখানে কথা কিংবা নৃত্য প্রধান তা সাধারণত সমবেত বা গোষ্ঠী সংগীত, আর যেখানে সুর বা আবেগ প্রধান লোকগীতি সেখানে মূলত একক সংগীত। তবে যাই হোক না কেন, গীত হওয়ার মধ্যেই গীতির যথার্থ প্রকাশ।

৯৮.৬.২ বাংলা লোকসংগীতের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ। তাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন — ব্যবহারিক সঙ্গীত, কর্মসঙ্গীত, পার্বণসঙ্গীত, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, আঞ্চলিক সঙ্গীত, প্রেমসঙ্গীত ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ভাবনির্ভর ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতও পাওয়া যায় বাউল, মুর্শিদা, মারফতি, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি নামে। বিষয়ভিত্তিক এই শ্রেণী বিভাগের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক দিকটিও বাংলা লোকসংগীতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

৯৮.৬.২.১ ব্যবহারিক সঙ্গীত

বাংলা লোক-গীতের অন্যতম প্রধান ধারা পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত (Functional Song)। সাধারণত পরিবার জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে গীত হয়, তাই-ই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। এ শ্রেণীর গানকে মেয়েলী সঙ্গীতও বলা হয়, কারণ এ ধরনের গান প্রধানত নারী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে মনে রাখা দরকার সকল মেয়েলী সঙ্গীতই ব্যবহারিক সঙ্গীত নয়। কারণ, পরিবারের নারীরা এমন কিছু গান গায় যেগুলো পরিবারের পুরুষের বহির্মুখীন কোন কর্মভিত্তিক, যেমন কৃষিকাজ কিংবা পশুশিকারের সহায়ক কোন গান, কিন্তু এগুলো ব্যবহারিক সঙ্গীত নয়। সাধারণত গর্ভাধান-বিবাহ, পঞ্চামৃত, সপ্তামৃত, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, বিবাহের বিবিধ স্ত্রী আচার ইত্যাদি উপলক্ষ্যে যে সকল নির্দিষ্ট মেয়েলী গীত গাওয়া হয়, তাই পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই গানগুলো গীত হয়, উদ্দেশ্য ছাড়া কখনই গাওয়া হয় না। পরিবারের মধ্যে উপরোক্ত আচারগুলো যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখনই এই সকল গান গীত হয় অন্য কোন বিনোদনের জন্য এ গান গীত হয় না। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে বাস করতে

গেলে তাকে অবশ্যই সমাজের কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। পারিবারিক জীবনে পালিত সামাজিক এই নিয়ম প্রায় সবাই মেনে চলে। এই নিয়মগুলো প্রাণ পেয়ে ওঠে ব্যবহারিক সংগীতে। সমাজে জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কার অবলম্বন করে এই ব্যবহারিক সঙ্গীতের আবর্তন। (এই শ্রেণীর গান এপার বাংলার তুলনায় ওপার বাংলায় অধিক প্রচলিত।) এই পর্যায়ের গানের মধ্যে প্রধান প্রধান গান হল— গর্ভসঙ্গীত, বিয়ের গান, কন্যা-বিদায়ের গান, শবযাত্রার গান ইত্যাদি। সাধারণত পরিবারের কোন নারীর গর্ভধারণের পরিণত অবস্থায় পালিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় গান গাওয়া হয়। তবে এ শ্রেণীর গানে নায়ক দশরথ এবং নায়িকা রাম-জননী কৌশল্যা। আবার হিন্দু-সমাজে প্রচলিত বিয়ের গানে রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহ বর্ণিত হয়। কিন্তু মুসলমান রমনীদের বিয়ের গান সে তুলনায় অধিকতর বাস্তব ও জীবনরসানুভূতিতে সরস। রাম সীতা সেখানে অবলম্বন নয়। আবার বিয়ের গানের উৎকৃষ্ট, মধুরতম এবং বেদনাবিধুর গান হল কন্যা-বিদায়ের গান। বিয়ের পর কন্যার বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর গৃহে যাত্রার গান হল কন্যা-বিদায়ের গান। এ গান দুভাগে বিভক্ত। কিছু গান কন্যা নিজে গেয়ে থাকে; আর কিছু গান পরিবারের অন্য মহিলারা গায়। বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়াও এই সকল গানে একটি গভীর মানবিক আবেদন আছে। এই মূল ভাবটুকু বাস্তব গার্হস্থ্য জীবনাশ্রিত করুণ এবং এক সর্বজনীন বেদনার সুরে প্রায়শই উৎকৃষ্ট কাব্যমূল্য লাভ করে থাকে। করুণ রসাত্মক ব্যবহারিক সঙ্গীতের আর একটি উদাহরণ হল শবযাত্রার সময় গীত লোকসংগীত। সাধারণত পুরুষ গায়কের কণ্ঠে গীত এ গানে জীবনের নশ্বরতা ও অনিশ্চয়তার দিকটি তুলে ধরা হয়।

৯৮.৬.২.২ কর্মসঙ্গীত

কর্মের সময় শারীরিক শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্য যে গান গীত হয় তাই কর্মসঙ্গীত বলে পরিচিত। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন কাঠুরিয়া যখন কুঠার দিয়ে কাঠ কাটে কিংবা গৃহস্থ নারী যখন ক্ষারে কাচা কাপড় কাচে, তখন তাদের মুখ থেকে এক ধরনের শিস্ ধ্বনি নির্গত হয়। এ ধ্বনি অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নির্গত হয় এবং এর ফলে শ্রম অনেকটা লঘু হয়। ঠিক এইভাবে শ্রম লাঘবের ব্যাপারটি সংঘটিত হয় এই কর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এজাতীয় গান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য ক্ষেত্রে সে গান গাওয়া সম্ভব নয়। এজাতীয় গানের উদাহরণ ধানভানার গান, ধান কাটার গান, তাঁতীদের গান, ছাদ পেটানোর গান, সারিগান ইত্যাদি। ধান এখন হাস্কিং মেশিনে ভানা হয়, তাঁতে কাপড় বোনা হলেও এখন মেশিনের ব্যবহার ব্যাপক। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত গ্রামবাংলার মেয়েরা সারারাত জেগে ঢেঁকিতে ধান ভানত, তখন সেই রাতে নিজেদের জাগিয়ে রাখতে এবং শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করতে ওই ধানভানা মহিলারা দীর্ঘ আখ্যানমূলক গান গাইত, এই গানগুলো ধানভানার গীত বলে প্রচলিত। অনুরূপভাবে তাঁতে বোনার সময় তাঁতীদের দ্বারা এক রকম গান গাওয়া হতো। সাধারণত দীর্ঘ একটানা কাজের একঘেয়েমি দূর করার জন্য এ জাতীয় গান খুবই ফলপ্রসূ হতো। তাঁত বোনার মতো ধানের চারা রোয়ার সময় কর্মরত মেয়ে শ্রমিকেরা একযোগে গান করে থাকে, আবার ধানকাটার সময় তারা সমবেত কণ্ঠে অনুরূপ গান গায়। এখন ইটের বাড়ির ছাদ তৈরি ঢালাই ফেলে যন্ত্রদানবের কয়েক ঘণ্টার চিৎকারে বেশ কিছু শ্রমিকের চট্জলদি কর্ম তৎপরতায় অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশাল ছাদ তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আগেকার দিনে বাড়ির ছাদ বলতে পেটাই ছাদ বোঝাত। কড়ি-বরগা পেতে তার উপর টালি বসিয়ে চুন-সুরকি দিয়ে জল ছড়িয়ে ছোট ছোট মুগুর দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে ছাদ তৈরি হতো। এই ছাদ পেটানোর কাজটি খুবই একঘেয়েমি

এবং বিরক্তিকর। সাধারণত বিহার অঞ্চল থেকে নারী-শ্রমিক আসতো এই কাজ করতে। তারা কাজের সময় ছাদ পেটানোর তালে তালে গান করতো, এই গান ছাদ পেটানোর গান বলে পরিচিত। কর্মসঙ্গীতের আরো একটি উদাহরণ হল নৌকা বাওয়ার গান বা বাইচের গান বা সারি গান। নৌকা বাওয়ার অপরটি গান হিসেবে আপনারা ভাটিয়ালী গানের পরিচয় পাবেন। কিন্তু সেটি কর্মসঙ্গীত নয়, কারণ তখন নৌকা বাওয়াতে কোন শ্রম থাকে না। নৌকা ভাটির টানে আপনি চলে। সারিগান একতালে বহু মাঝির হাল বাওয়ার তালে তালে গাওয়া সমবেত সঙ্গীত। এই গানে হাল টানার শ্রম লাঘব হয়। এই জাতীয় গানের আর একটি উদাহরণ, গভীর নলকূপ বসানোর কাজে আসা শ্রমিকদের মুখে অস্পষ্ট ভাষায় চলমান জীবনের ছবি সম্বলিত গান। কাজ অতীব শ্রমসাপেক্ষ। সেই শ্রম দূর করতে এই শ্রমিকেরা অশ্লীল শব্দ প্রয়োগেও ক্ষান্ত নয়। আসলে গভীর নলকূপের নল বসানো কাজে, কিংবা শালের খুঁটি পোঁতার কাজে সেই অর্থে নির্দিষ্ট কোন গান নেই।

৯৮.৬.২.৩ পার্বণী সংগীত বা আনুষ্ঠানিক সংগীত

বছরের নির্দিষ্ট দিনে সামাজিক উৎসব ও ধর্মীয় পার্বণাদি উপলক্ষ্যে যে লোকসঙ্গীত গীত হয়, তাকেই সাধারণভাবে পার্বণসঙ্গীত বা আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলা হয়। এ জাতীয় সঙ্গীত প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে যে অনুষ্ঠান হয়, তাকে কেন্দ্র করেই গীত হয়। পূর্বে থেকে অনুষ্ঠানটির দিন নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ গান আবার কেবলমাত্র নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষ এমনকি বালক-বালিকারাও এ গানে অংশগ্রহণ করে থাকে। মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠানের গীতগুলো যেমন বাড়ির বড়ো মেয়েরা গেয়ে থাকে, তেমন গাজন প্রমুখ অনুষ্ঠানের গানগুলো গায় পুরুষে। আবার কুমারী মেয়েরা যেমন মাঘমণ্ডল প্রমুখ কোন কোন কুমারীব্রতের গান নিজেরাই গেয়ে থাকে; তেমন কৃষক বালকেরা ঘেঁটু, কুমীর পূজা প্রভৃতি নানা লৌকিক দেবদেবীর পূজার মাগন সংগ্রহ করে নানারকম গান গেয়ে।

এ জাতীয় গান শিব, মনসা, কালী, দুর্গা, কার্তিক প্রভৃতি পূজা উপলক্ষ্যে যেমন হয়, তেমনি লৌকিক দেব-দেবীর উপলক্ষ্যেও গীত হয়, আবার বিভিন্ন প্রকার ব্রতেও এজাতীয় গান গীত হয়। এজাতীয় গানে দুটো ধারা থাকে। যেমন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক বাঁধাধরা বা গতানুগতিক কিছু গান, পাশাপাশি তাৎক্ষণিক রচিত কিছু গান। এই তাৎক্ষণিক গানগুলো রচিত হয় এক বছরের জন্য, পরের বছর আর এই গানগুলো থাকে না। এ জাতীয় গানের বিষয়বস্তু মূলত বাস্তব ও সামাজিক কোন ঘটনা বা সমস্যা বিষয়ক।

৯৮.৬.৩ বাংলা লোক সঙ্গীতের আঞ্চলিক ভাগ

সমগ্র বাংলা লোকসঙ্গীতকে অঞ্চল ভিত্তিতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। সে আলোচনায় আপনারা দেখবেন আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত যেমন আছে, তেমন আবার প্রেমসঙ্গীত এবং কর্মসঙ্গীতও সেখানে বিদ্যমান। আঞ্চলিক সঙ্গীতে প্রকৃতির প্রভাব ব্যাপকরূপে বিদ্যমান। প্রকৃতির উদাসীনতা, চঞ্চলতা, বিষণ্ণতা, রুক্ষতা আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের উপর রেখে গেছে তার ছাপ।

ভাওয়াইয়া ঃ উত্তরবঙ্গের বিশেষত জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিখ্যাত লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া মূলত প্রেমসঙ্গীত, তবে এখানে প্রেমের মিলনমধুর দিকটি নয়, বিরহের দিকটি প্রধান। সেদিক থেকে ভাওয়াইয়া বিরহেরই গান। তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ চর পড়া বুকে মহিষ চরাতে আসে মইষাল

বন্ধুরা, তাদের সঙ্গে দুদিনের এক মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এখানকার কুমারী ও পথিকবধূদের। কিন্তু মইষাল বন্ধুরা যাযাবর, নদীর বুকের ঘাস ফুরিয়ে গেলে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যায়। ফলে উক্ত নারীদের সঙ্গে গড়ে ওঠা দু'দিনের ওই মনের বাঁধন অচিরেই কেটে যায়। মইষাল বন্ধুরা সহজে ভুলে যায় প্রেমের সেই সম্পর্ক, কিন্তু নারীরা পারে না। তাদের অন্তরের ব্যর্থ প্রেম বা বিরহ করুণরসের সাহায্যে প্রকাশ পায় ভাওয়াইয়া গানে। নায়কেরা হয় প্রতারণা করে, নাহলে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। সেই বিরহ যন্ত্রণা সরলা গ্রাম্য নারীর বিলাপে ভাওয়াইয়া গানে মুক্তি পায়। একটি বিশেষ সুরের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করে এখানে, ভাওয়াইয়া গানে ব্যবহৃত যন্ত্র 'দোতারা'। মূলত চারটি তার সম্বলিত তারযন্ত্র এটি, কিন্তু দুটি তার ব্যবহৃত হয় বলে এটি দোতারা বলেই পরিচিত।

চট্‌কা ঃ ভাওয়াইয়া গানের এক বিকৃত বা অবক্ষয়িত রূপ 'চট্‌কা'। এটি লঘুসুরের গান, ছন্দপ্রধান এবং জীবনের লঘু দিকটিকেই অবলম্বন করে এর বিষয় গড়ে ওঠে। যার ফলে চট্‌কা ভাওয়াইয়ার মতো এক বিষয় কেন্দ্রিক নয়, বহু বিষয় তার অবলম্বন। চট্‌কাও ভাওয়াইয়ার মতো কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত।

জাগ গান ঃ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আর এক ধরনের বর্ণনামূলক গানকে বলে জাগ-গান। মুসলিম পীর-ফকিরদের অলৌকিক কীর্তি কথা কিংবা নাথ সম্প্রদায়ের অলৌকিকত্ব বা গোপীচন্দ্রের আখ্যান ওই গানের বিষয়বস্তু। গানগুলো সারারাত ধরে কোন একজন নির্দিষ্ট গায়কের পরিচালনায় গাওয়া হয়। সারারাত ধরে জেগে গাওয়া ও শোনা হয় বলে এ ধরনের গানকে বলা হয় জাগ-গান। সাধারণত দিনাজপুর জেলাতে এ গান প্রচলিত।

গম্ভীরা ঃ মালদহ জেলার বিখ্যাত লোক গান 'গম্ভীরা'। গানটি ধর্ম কেন্দ্রিক হলেও এটি সামাজিকতা যুক্ত। গানগুলি শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তবে এই শিবের প্রকৃতি নিতান্ত মানবিক। গানগুলোর বিশেষ কাব্যমূল্য নেই, তবে তার মধ্যে কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা আছে। গানগুলো অনেকাংশে সংলাপধর্মী। গম্ভীরা গান মূলত হিন্দুদের হলেও মুসলমান অধ্যুষিত মালদহে এ গানে মুসলিম প্রভাব পড়াতে শিব পরিণত হয়েছে নানা-তে। শিব বা নানাকে লক্ষ্য করে সম্বাৎসরিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয় এ গানে। গানগুলো সাধারণত লঘুসুরে গীত হয় এবং তাদের বিষয় বর্ণনাত্মক। আর গানের বিষয়ও প্রতিবছর পাল্টায়।

আলকাপ, রংপাঁচালী, বোলান, জারি ঃ মুসলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী মুর্শিদাবাদ জেলায় গম্ভীরা গানেরই আর একটি রূপ লক্ষিত হয়, তা আলকাপ নামে পরিচিত। আলকাপেরই অবক্ষয়িত রূপ হল রংপাঁচালী। এ সব গানের বিষয় বাস্তব সমাজ। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, অসঙ্গতি, অন্যায়, পাপ, দুর্নীতি, লোভ প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে এ জাতীয় গান রচিত। গানগুলির মধ্যে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম জনপ্রিয় গান বোলান। 'বুলা' থেকে 'বোলান'। 'বুলা' অর্থাৎ ভ্রমণ করা। সাধারণত গ্রাম বা পাড়া ঘুরে ঘুরে এ জাতীয় গান গাওয়া হয়, তাই এ গান বোলান নামে পরিচিত। এ গানের বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে নেওয়া হয়, গানগুলো মূলত বিবৃতিমূলক। পৌরাণিক বিষয়বস্তু আশ্রিত অনুরূপ আরেকটি গানের নাম ছেঁচর। মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিমসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একধরনের লোকসঙ্গীতের নাম জারি। পুরুষ গায়কের নৃত্যযুক্ত এ গানের বিষয়বস্তু কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধ, হাসান-হোসেনের কাহিনী। তাই স্বাভাবিকভাবে করুণ ও বীররসে এ গানের ভাববস্তু গড়ে ওঠে।

ভাদু ঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তবর্তী অঞ্চল—বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম সেখানে বর্ষাকালে বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালিত হয়। এই রকম একটি উৎসব হল ভাদু। ভাদু এসেছে ভাদ্র থেকে। এটি একটি মেয়েলী ব্রত। সারা ভাদ্র মাসে ব্রতটি পালিত হয়। ভাদু এক নারী। তার সম্পর্কে নানাগল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা সারা ভাদ্রমাস জুড়ে এই ভাদুর ব্রত পালন করে এবং ভাদ্রমাসের প্রতিরাত্রে ভাদু গান গেয়ে থাকে। ভাদু গানের একটা রূপে যেমন 'ভাদু' সংক্রান্ত নানা Myth তুলে ধরা হয়, তেমনি অন্যরূপে সামাজিক বাস্তব জগৎ, তার নিত্যনতুন সমস্যা, বিশেষ ঘটনা ইত্যাদিও ফুটে ওঠে। জীবনের সুগভীর অনুভূতির কথাও এ গানে প্রকাশিত হয়ে যায়।

টুসু ঃ পুরুলিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষিকাজ সমাপ্ত হবার পর পৌষমাসে মেয়েরা একটি উৎসব পালন করে। এ উৎসব হল কৃষিদেবী 'টুসু'র পূজানুষ্ঠান। টুসুর পূজা উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয়, তা টুসু গান বলে পরিচিত। এ উৎসব উপলক্ষে গীত গানগুলোতে দেবীর মাহাত্ম্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন দিক অধিক গুরুত্ব পায়। গার্হস্থ্যজীবন যেখানে টুসু গানের বিষয়, সেখানে মানব জীবনের সূক্ষ্ম করুণ অনুভূতি মূর্ত হয়ে গানগুলিতে বিশেষ ভাব গম্ভীর করে তোলে।

ঝুমুর ঃ পশ্চিমবাংলার পশ্চিমসীমান্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীরা প্রতিবেশী আদিবাসী সমাজ থেকে এক ধরনের গান তাদের নিজেদের জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। সে গান ঝুমুর নামে পরিচিত। ঝুমুর গান সর্বজনীনভাবাপন্ন প্রেমসঙ্গীত। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব প্রাধান্য ঝুমুর গানের নায়ক-নায়িকারূপে রাধা-কৃষ্ণকে অনেক সময় মেনে নিয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়ও ঝুমুরগানের প্রেরণা হয়েছে। তবে কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক বিষয় নয়। নিতান্ত মানবিক গভীর প্রেমের অনুভূতি নিয়েও ঝুমুর গান রচিত হয়েছে।

পটুয়া ঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম, অঞ্চলে পটশিল্পকে কেন্দ্র করে এক রকমের গান প্রচলিত আছে, তাকে পটুয়া সঙ্গীত বলে। পটুয়া একটি সম্প্রদায়, তাদের আঁকা দীর্ঘ পট হয় কাহিনীভিত্তিক। কাহিনী রামায়ণ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্যকেন্দ্রিক, কখনো বা আধুনিক জীবনের কোন সমস্যা— পণ প্রথা, নিরক্ষরতা ইত্যাদিও পটের বিষয়বস্তু হয়। পট দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া সাপ খেলানো সুরে গেয়ে যায় পটের কাহিনী।

ঘাটু ঃ বাংলার এক ধরনের পেশাদারী বালকের নৃত্য সম্বলিত গীত প্রচলিত আছে। তার নাম ঘাটু গান। ঘাট বলতে নদীর ঘাট বা ঘাটের গান বোঝায়। এই গানের বিষয়বস্তু—রাধা তার প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ হিসেবে নদীর ঘাটে যায় জল আনতে। আর এই সুযোগে কৃষ্ণ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এই গানে আসরে সমবেত সমস্ত জনতাই অংশগ্রহণ করে, আর ঘাটু-বেশি বালক সর্বক্ষণ নৃত্য করতে থাকে।

গাজন ঃ দঃ ২৪ পরগনা, উঃ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী জেলায় চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের পূজা উপলক্ষে যে গান প্রচলিত আছে তাকে গাজন গান বলে। মূলত শিবকে কেন্দ্র করে এ গান রচিত। বর্তমানে সিনেমার জনপ্রিয় গানের নকল বা প্যারাডি করে সামাজিক নানাদিক তুলে ধরা এ গানের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাটিয়ালি ঃ বাংলা লোকসঙ্গীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা ভাটিয়ালি মূলত পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত। বাংলার নিচু অংশের অর্থাৎ ভাটির দিকে নদ-নদী, হাওড়-বাওড় অঞ্চলেই এই গানের উদ্ভব ও বিকাশ। বাংলার এই নিচু জলাভূমি অঞ্চল বছরের প্রায় সকল সময় জলমগ্ন থাকে। এই অঞ্চলের নৌকার মাঝিরা সাধারণত এই

গান গায়। এই গানের গায়ক একক এবং নিঃসঙ্গ। সাধারণত ভাটির টানে নৌকা যখন আপনি ভেসে যায়, দাঁড় টানতে হয় না, কেবল হাল ধরে থাকলেই চলে, তখন সেই অবসন্ন বা বিশ্রামের মুহূর্তে মাঝির কণ্ঠে ভেসে ওঠে গান, এই ভাটির টানে ভেসে যাওয়া নৌকার মাঝির গানই ভাটিয়ালি। তবে, বর্তমানে কেবল নৌকার মাঝি নয়, মাঠের কৃষক, গরুর রাখাল, গোরুর গাড়ির চালক, মাছ ধরা জেলের কণ্ঠেও ভাটিয়ালী গান শোনা যায় সাধারণত গায়কের একান্ত অন্তরের আশা-নৈরাশ্য এবং প্রেমভাবনা ভাটিয়ালি গানের সুরের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। অলস মন্থর গতিতে ভেসে চলা নৌকার হাল ধরে যখন মাঝি দেহে এবং মনে একটু অবসরের সুযোগ পায়, কিংবা মোষের পিঠে বাড়ি ফেরে, তখনই তাদের কণ্ঠে ভাটিয়ালির সুর ধ্বনিত হয়। ভাটিয়ালি গানের একটি বিশেষত্ব এই যে, এর একটি পদ সর্বাপেক্ষা চড়াসুরে ধ্বনিত হওয়ার পর আবার আকস্মিকভাবে তা তখনই একেবারে খাদে নেমে আসে, অন্যান্য লোকগীতির ক্ষেত্রে সুর ধীরে ধীরে ওঠানামা করে। ভাটিয়ালীর বিষয়বস্তু একসময় ছিল ব্যক্তি প্রেম-বিরহ, ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, কিন্তু এখন তা দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক প্রেম ইত্যাদিতে উন্নীত হয়েছে।

ব্যক্তিগান ঃ বাংলা লোকসংগীতের বিস্তৃত ভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনারা পেলেন। এছাড়াও বাউল, কর্তাভজা ইত্যাদি গানকেও লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ধরা হয়। লোকসংগীতে সাধারণত রচয়িতা থাকেন না। স্রষ্টার অস্তিত্ব লোকসমাজ স্বীকার করে না। তবুও বাউলের গান (যাতে ব্যক্তিনামাঙ্কিত গান আছে), বিজয় সরকারের গান, হাসান রাজার গান, মহিজ ভাণ্ডারীর গান নামে প্রচলিত ব্যক্তি নামাঙ্কিত গানগুলো প্রায় লোকগীতির মতোই গাওয়া হয়। এ গানগুলোর মধ্যে কিছুটা লোক ধর্ম থাকলেও, বর্তমানে নগরজীবনে ব্যক্তি নামাঙ্কিত গ্রাম ও গ্রাম্যতা বিষয়ক কিছু গান লোকসংগীত বলে গীত হচ্ছে, এগুলোকে কতটা লোকসংগীত বলা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে।

৯৮.৬.৪ লোকসংগীতে বাদ্যযন্ত্র

বাংলা লোকসংগীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কিছুটা গৌণ। প্রকৃতির নানামুখী রূপ পল্লীর লোকশিল্পী কণ্ঠকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। তবু তাল ঠিক রাখতে, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য যোগ করতে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় এবং সেই বাদ্য যন্ত্রগুলো এক একটা গানে এক এক রকমের। বাংলা লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহ সাধারণত এই রকম —

তারের যন্ত্র — একতারা, দোতারা, সংগ্রহ, গোপীযন্ত্র, সারিদা

শুষির যন্ত্র — মুরলী, আড়বাঁশি, টিপরা বাঁশি, শিঙা।

আনদ্ধ যন্ত্র — ঢাক, ঢোল, কাড়া, ঢোলক, খোল, মাদল, খঞ্জনী বা খঞ্জরী, আনন্দ লহরী বা খমক।

ঘন যন্ত্র — করতাল (নানা প্রকারের), ঘটতাল, মন্দিরা, কাঁসি, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি।

৯৮.৬.৫ সারাংশ

বাংলা লোকসাহিত্যের জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ শাখা হল লোকসংগীত। লোক সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোকসংগীতও ঐতিহ্যবাহী এবং আকারে ক্ষুদ্র। ভাব-ই লোকগীতির প্রাণ।

লোকসংগীতকে ব্যবহারিক সংগীত, কর্মসংগীত, পার্বণসংগীত, আনুষ্ঠানিক সংগীত, আঞ্চলিক সংগীত প্রেমসংগীত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া লোকসংগীতকে অঞ্চলভিত্তিতে ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, গম্ভীরা, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, পটুয়া, ঘাটু, গাজন, ভাটিয়ালি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

লোকসংগীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার গৌণ। তাহলেও তারের যন্ত্র, শুষির যন্ত্র, আনদ্ধ যন্ত্র, ঘনযন্ত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার যন্ত্র লোকসংগীতে ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

(ক) বাংলা লোকসংগীতের শ্রেণীবিভাগ করুন।

(খ) বাংলা লোকসংগীতে অবয়ব কেমন?

(গ) কর্মসঙ্গীত কাকে বলে?

(ঘ) অনুষ্ঠানিক লোক সঙ্গীতের উদাহরণ দিন।

(ঙ) পার্বণী সংগীত কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে?

২। নিম্নের বিষয়গুলোর পরিচয় দিন—

(ক) ভাওয়াইয়া গান

(খ) জাগ গান

(গ) ভাদু

(ঘ) ভাটিয়ালি

(ঙ) ঘাটু

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) দিন ঃ

(ক) ঘাটু গান সাধারণত	মাঠ কেন্দ্রিক	☐
	হাট কেন্দ্রিক	☐
	ঘাট কেন্দ্রিক	☐
(খ) জাগ গান পরিবেশিত হয়	রাতে	☐
	দিনে	☐
	মধ্যাহ্নে	☐

(গ) সারি গান গীত হয় — চাষীর মধ্যে ☐ / মাঝির মধ্যে ☐ / শ্রমিকের মধ্যে ☐

৪। নিম্নের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন—

(ক) বাংলা লোকসংগীতের প্রকৃতির পরিচয় দিন।

(খ) ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত কাকে বলে, উদাহরণসহ লিখুন।

(গ) উদাহরণসহ বাংলা কর্মসঙ্গীতের পরিচয় দিন।

(ঘ) পার্বণী বা আনুষ্ঠানিক সংগীত কাকে বলে, বাংলায় প্রচলিত কিছু আনুষ্ঠানিক সংগীতের পরিচয় দিন।

(ঙ) বাংলা আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত হিসেবে ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, ভাটিয়ালির পরিচয় দিন।

(চ) উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বাংলা লোকসঙ্গীতের বিবরণ দিন।

(ছ) পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের পরিচয় দিন।

(জ) গম্ভীরা কোন জেলার গান, তার বিষয়বস্তু আলোচনা করে দেখান।

(ঝ) লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্রের পরিচয় দিন।

৯৮.৭ গীতিকা ঃ লোকসংগীত ও গীতিকা

গীতিকার ইংরেজী নাম Ballad। গীতিকা হল লোকসঙ্গীতের একটি রূপ বা প্রকার। গীতিকা হল সেই জাতীয় লোকসঙ্গীত, যার একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী থাকে। অর্থাৎ এককথায় কাহিনীধর্মী লোকসঙ্গীত হল গীতিকা। লোকসঙ্গীত সাধারণত হয়ে থাকে স্বল্প অবয়বের, গীতিকা সেখানে দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট। তাতে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। সাধারণ লোকসঙ্গীতে কথা থাকে কিন্তু সেখানে সুরের প্রাধান্য অন্যদিকে গীতিকায় সুর একটা থাকে বটে, কিন্তু সুর সেখানে গৌণ, কাহিনীই মুখ্য। লোকসঙ্গীতের স্বল্প অবয়বে গায়কের ব্যক্তিমনের ভাবোচ্ছাস সুরের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। এদিক থেকে লোকসংগীতের অনেকটা গীতিকবিতার সঙ্গে সাদৃশ্য। অন্যদিকে গীতিকায় কাহিনী মুখ্য এবং সেখানে বর্ণনা অনেকটা বিবৃতিধর্মী।

৯৮.৭.১ গীতিকার নানারূপ ও বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগের ইউরোপে এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোক-গীতি (narrative folk-song) প্রচলিত ছিল। লোকগীতির এই বিশেষ রূপটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— ডেনমার্কের ভাষায় এর নাম ছিল Vise, স্পেনীয় ভাষায় romance, রুশীয় ভাষায় byline, ইউক্রেনীয় ভাষায় dumi, সাইবিরীয় ভাষায় junacka pesme, ইংরেজীতে ballad। লোকগীতির এই বিশেষ রূপটির নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। যেমন —

- এটি আখ্যানমূলক।
- এটি আবৃত্তি করার পরিবর্তে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়ে এর লৌকিক বৈশিষ্ট্য (Folk Character) অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ আখ্যায়িকা বর্ণনা করতে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- গীতিকার কাহিনী হয় মূলত জনশ্রুতিমূলক।
- এর মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়।
- একটি মাত্র ঘটনাই এর লক্ষ্য।
- গীতি-সংলাপ ও ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে দিয়ে এর কাহিনী লক্ষ্যে উপনীত হয়।
- যে আখ্যান বা কাহিনীকে কেন্দ্র করে গীতিকা গড়ে ওঠে সেটি সাধারণত শিথিলবদ্ধ হলে চলে না, দৃঢ়বদ্ধ হতে হয়। আর একারণে কাহিনীকে হতে হয় এক-ঘটনামুখী ও পারিপার্শ্বিকতা বর্জিত। গীতিকার এই স্বভাবটি অনেকটা একাঙ্ক নাটক ও ছোটগল্পের মতো।

৯৮.৭.২ ব্যালাড ও গীতিকা

ইংরাজি ballad ও বাংলা গীতিকার মধ্যে আন্তর ধর্মে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। সে পার্থক্যের মূলে দেশকাল ও জাতীয় মানসের প্রভাবই স্পষ্ট। যেমন —

➢ সাধারণত আখ্যান বা কাহিনী গীতিকা বা ballad-এর মূল ভিত্তি হলেও ইংরাজি ballad মূলত একটি ঘটনা কেন্দ্রিক, তুলনায় বাংলা গীতিকার একটি ঘটনার পাশাপাশি একাধিক ঘটনার বা কাহিনীর সমাবেশ ঘটে। ফলে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বাংলা গীতিকা ইংরাজি ballad-এর তুলনায় একটু দীর্ঘ-ই হয়।

➢ অবয়ব ছোট হওয়ার জন্যে কিংবা একটি মাত্র ঘটনাকে অবলম্বন করে ballad রচিত হওয়ার ফলে, ballad-এর গঠন রীতি হয় বেশ আঁটসাঁট। ballad এর প্লট হয় সুগঠিত, ঘনপিনদ্ধ। অন্যদিকে ঘটনা, অবয়ব ও বর্ণনারীতি একটু দীর্ঘ হওয়ার ফলে গীতিকার প্লট হয় কিছুটা শিথিল বা আলগা।

➢ গীতিকার একটি অন্যতম প্রধান বিষয় প্রেম। বাংলা গীতিকায় প্রেম ত্যাগে, তিতিক্ষায় শাশ্বত এবং উজ্জ্বল, অন্যদিকে ballad এ প্রেম মধুর রূপে উপস্থিত হলেও সেখানে প্রতিহিংসা ও রোমহর্ষক দিকের অভাব নেই। এখানেও সেই দেশ-কালের প্রভাব বিদ্যমান।

➢ বাংলা গীতিকার আকার বড়ো এবং দীর্ঘ, সে তুলনায় ইংরাজি ballad সংক্ষিপ্ত বা ছোট।

➢ বাংলা গীতিকার সংখ্যা স্বল্প এবং বিষয় বৈচিত্র্যহীন। প্রেম মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সে প্রেম মূলত একই রকম। অন্যদিকে ইংরাজি ballad স্বল্প অবয়ব বিশিষ্ট হলেও বিষয়ের রকমারি বৈচিত্র্য পাঠক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে।

➢ ইংরাজি ballad-এ একটি বিশেষ মুহূর্তকে মূর্ত করে তোলার প্রবণতা বিদ্যমান, অন্যদিকে বাংলা গীতিকায় বিশেষ ঘটনার উপর জোর না দিয়ে দীর্ঘ বর্ণনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

➢ ballad-এ চমকের আধিক্য। সেখানে পাঠক এমন একটি ঘটনা অথবা পরিণতির সম্মুখীন হয়, যার জন্য পাঠক পূর্ব থেকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল না। বাংলা গীতিকায় চমক আছে, তবে ballad-এর মতো সব ক্ষেত্রে তেমন আকস্মিক নয়।

➢ ব্যালাড বেশি বস্তুনিষ্ঠ বা objective, কথক, গায়ক বা রচয়িতা সেখানে নিরাসক্ত বা নিস্পৃহ। সে তুলনায় বাংলা গীতিকা অনেক বেশি subjective, সেখানে বন্দনা দিয়ে শুরু করা থেকে, ঈশ্বর নির্ভরতা, জীবনের অনিত্যতা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নিয়ে নানান কথা এসে যায়, ফলে বাংলা গীতিকায় গায়ক বা কথক কিংবা রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিক স্বভাবটির পরিবর্তে ব্যক্তিক অনুভূতি অনেকক্ষেত্রে ধরা পড়ে।

➢ ballad-এ অলৌকিক উপাদানের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। সেখানে অশরীরী আত্মা, পরী, স্বপ্নাদেশ, যাদুকরী সঙ্গীত, নিষেধাজ্ঞা, ডাইনিবিদ্যা, রূপান্তর ইত্যাদি বিষয় ব্যাপক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় বাংলা গীতিকায় অলৌকিকতার সন্ধান খুব সীমিত পরিসরে লক্ষিত। যেখানে ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান (নাথ গীতিকা) সেখানে অলৌকিকতা লক্ষিত।

এ পর্যায়ে সবশেষে বলা যায়—'ইংরেজি ব্যালাডগুলোর প্রকৃতি আর বাংলা গীতিকার প্রকৃতি ঠিক এক নয়। ইংরেজী ব্যালাডে যে সব বৈশিষ্ট্য না হলে ব্যালাড পদবাচ্য হতে পারে না, বাংলা গীতিকার হয়তো তা একেবারেই অনুপস্থিত; আবার বাংলা লোকগীতিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রায় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়, সে সব হয়তো ইংরেজী ব্যালাডে খুঁজতে যাওয়া বৃথা'।

৯৮.৭.৩ গীতিকার প্রতিশব্দ

ইংরাজি ballad ও বাংলায় গীতিকা সমার্থক বলে পরিচিত লাভ করলেও, গীতিকার একাধিক নাম রয়েছে। সুকুমার সেন এ জাতীয় সাহিত্য নিদর্শনকে 'গাথা' বলে অভিহিত করেছেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'গীতি-আখ্যায়িকা' বা গীতি-আখ্যান', ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক বলেছেন, 'পালা' বা 'পালাগান', সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রাচীন পল্লী গাথা', মযহারুল ইসলাম বলেছেন 'লোকগীতিকা' বা 'লোক-গাথা'।

৯৮.৭.৪ গীতিকার ত্রি-ধারা

যে নামেই প্রচলিত হোক না কেন বাংলা গীতিকার তিনটি ধারা। প্রথমত নাথগীতিকা; দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ গীতিকা ও তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকা। নাথ-গীতিকা উত্তরবঙ্গের নাথ-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্বভিত্তিক রচনা, আর মৈমনসিংহ গীতিকা মৈমনসিংহ জেলায় প্রচলিত সংকলন। আর পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত গীতিকাগুলোর দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত।

নাথগীতিকা

নাথ-সম্প্রদায়কেন্দ্রিক-গীতিকার দুটি প্রধান ভাগ আছে — একটি নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনী আর একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনী। প্রথম ভাগটিকে কেন্দ্র করে এপর্যন্ত যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা 'গোরক্ষ-বিজয়', 'মীনচেতন' নামে পরিচিত। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দ চন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দ চন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে পরিচিত। নাথগীতিকাগুলো প্রধানত উত্তরবঙ্গেই প্রচার লাভ করেছিল, সেখানে এটি যুগীযাত্রা নামে পরিচিত। রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের মুখে এই গান শুনে স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন্ তা লিখে নেন এবং 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' এই নাম দিয়ে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তা সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন।

‘গোরক্ষ-বিজয়’ বা ‘মীনচেতন’ নামক গীতিকার মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কাহিনীর নায়ক গোরক্ষনাথ একটি সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর গুরু মীননাথকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সিদ্ধগুরু মীননাথ রমণীর মোহ-পাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত সাধনভজন জলাঞ্জলি দিলে, পুত্রতুল্য শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে এই ইন্দ্রিয়াসক্তির জগৎ থেকে উদ্ধার করে আবার সাধনার ক্ষেত্রে ফেরান। গুরু উদ্ধার করতে গিয়ে গোরক্ষনাথকেও অনেক ইন্দ্রিয়জয়ের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সকল বাধা জয় করে গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথের প্রকৃত জ্ঞানচেতনায় ফিরিয়ে আনেন, তাই এ গীতিকা গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন বলে পরিচিত।

গোরক্ষ-বিজয়ের তুলনায় গোপীচন্দ্রের গান বা মানিকচন্দ্র রাজার গান অনেক বেশি মানবিক আবেদনপূর্ণ। রাজা মানিক ও রানি ময়নামতীর সন্তান গোপীচন্দ্র, রানী ময়নামতী ডাকসিদ্ধা নারী, ছেলে গোপীচন্দ্রকে বিয়ে দেওয়ার পর তিনি বুঝলেন যে, ছেলেকে কিছুদিন সন্ন্যাসব্রত পালন করানো কর্তব্য, না হলে তাকে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি ছেলেকে হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলায় ছেলে প্রতিবাদ করে ওঠে। সংসারে নববিবাহিতা দুই স্ত্রী অদুনা-পদুনা। তাদের ফলে গোপীচন্দ্র কিছুতেই হাড়ির শিষ্য হতে রাজী নয়। ভোগের স্পৃহা তার সন্ন্যাসের পথরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু মায়ের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত গোপীচন্দ্রকে মানতে হল। সন্ন্যাসের পথে পা বাড়িয়েও গোপীচন্দ্র বার বার ফিরে তাকিয়েছে ভোগের প্রাসাদের দিকে। এই শাশ্বত মানবিক ধর্মের গুনেই মানিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গান সহজেই মানব-মন অধিকার করেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয় বস্তু মূলত প্রেম, আর তার অবলম্বন মানুষ। বাংলা সাহিত্যের লিখিত ধারা-মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, অনুবাদ কাব্য প্রভৃতি যখন ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল, দেবতা পূজার ভিড়ে মানুষের কাহিনী নিয়ে আবির্ভূত হল মৈমনসিংহ গীতিকা। লোকসমাজে প্রচলিত এই গীতিকাগুলো বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এলো একটা নতুন ধারা, সে ধারা মানবিক ধারা।

ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জেলাকে পূর্ব-পশ্চিম দু’ভাগে ভাগ করেছে। এর মধ্যে পূর্বভাগ বিশেষত নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই এই মৈমনসিংহ গীতিকাগুলো প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহ জেলায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষি হাজং গোষ্ঠীর মধ্যে এই গীতিকার উদ্ভব ও প্রচলন ছিল। তাই এই অনাম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বেশ কিছু প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায় মৈমনসিংহ গীতিকায়। এই গীতিকায় নারী-চরিত্রে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের প্রভাব স্পষ্ট। সেখানে মায়ের পরিচয়ে যেমন সন্তানের পরিচয়, তেমনি নারীই সংসার ও সমাজের সর্বেসর্বা কর্ত্রী। সে সমাজ জীবনে নারীর স্বাধীন প্রেম ছিল স্বীকৃত। মৈমনসিংহের নারী প্রেমের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার, ধৈর্যে ও বুদ্ধিতে অনন্য সাধারণ। স্বাভাবিকভাবেই নারী চরিত্রের এই রূপ মৈমনসিংহ গীতিকায় ধরা পড়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলো এ জেলার কৃষক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে’র সংগৃহীত এই গীতিকাগুলো দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী নাথ-গীতিকার মতো যেমন কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক নয়, তেমনি আবার একটি মাত্র কাহিনী কেন্দ্রিকও নয়। ১৯২৩ খ্রীঃ প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকায় মোট দশটি গীতিকা—

মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ানী মদিনা স্থান পেয়েছে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা

বাংলা গীতিকার ত্রিধারার তৃতীয় ধারাটি হল পূর্ববঙ্গ গীতিকা। আপনারা পূর্বেই শুনেছেন যে, পূর্ববঙ্গ গীতিকার দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। মৈমনসিংহ গীতিকা ছাড়াও ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনাতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য-পুষ্ট হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো আবার দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে Eastern Begali Ballads of Mymensingh নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার তিনটি খণ্ড মিলিয়ে সংকলিত গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। গীতিকাগুলোর নাম যথাক্রমে—ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চনমালা, শান্তি, নীলা, ভেলুয়া, কমলা রানির গান, মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, মদনকুমার ও মধুমালা, সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, নেজাম ডাকাইতের পালা, দেওয়ান ইশা খাঁ, মসনদ আলি, সুরৎ জামাল ও অধুয়া, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, মাঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতি ঘেদা, আয়না বিবি, কমল সদাগর, শ্যাম রায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনী কীর্তন, সুজা তনয়ার বিলাপ, বারতীর্থের গান, নবুর মালুম, শীলা দেবী, রাজা রঘুর পালা, নুরন্নেহা ও কবরের কথা, মুকুট রায়, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, সন্নমালা, বীর নারায়ণের পালা, রতন ঠাকুরের পালা, পীর বাতাসী, রাজা তিলক বসন্ত, মলয়ার বারমাসী, জিরালনী, পরীবানুর হাঁহলা, সোনারায়ের জন্ম ও সোনাবিবির পালা। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, নাথ গীতিকার মতো মূলত দুটো বিষয় বা কাহিনী অবলম্বন করে মৈমনসিংহ গীতিকা কিংবা পূর্ববঙ্গ গীতিকা রচিত হয়নি। এখানে এক একটি পৃথক কাহিনী। তবে, কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন হলেও বৈচিত্র্য কম। প্রায়ই এক কাহিনীর সঙ্গে আর এক কাহিনীর মধ্যে মিল দেখা যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলি যেমন এককভাবে চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত, তেমনি পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনীগুলো কিন্তু একক মানুষের সংগ্রহ নয়। এক্ষেত্রে সংগ্রহকারী ছিলেন—আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসীমুদ্দিন, নগেন্দ্র চন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, মনসুরউদ্দীন, শিবরতন মিত্র প্রমুখ।

তিন গীতিকার সম্পর্ক

নাথ গীতিকার কাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্ব, অলৌকিক দিক ইতাদি থাকলেও মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয় কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের ঘটনাই প্রধান। মধ্যযুগীয় বাংলা লিখিত সাহিত্যের ধর্মীয় বাতাবরণের পাশাপাশি এই গীতিকাগুলোর লৌকিক কাহিনী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ, এখানে দেবতার কথা নয়, সাধারণ মানুষের পার্থিব জীবনের কথাই লিপিবদ্ধ। প্রেম এর মুখ্য অবলম্বন হলেও, তা কখন কাম-কলুষতায় পর্যবসিত হয় নি। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের মহত্ত্বে মৈমনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্র বিশ্বসাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয় বস্তু কোন সত্যঘটনা অথবা কিংবদন্তী ভিত্তিক।

৯৮.৭.৫ সারাংশ

গীতিকা হল লোকসংগীতের একটি রূপ। কাহিনীধর্মী লোকসংগীতকে গীতিকা বলা হয়। গীতিকা আকারে দীর্ঘ এবং এখানে একটি সুনির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। কাহিনীটি হয় জনশ্রুতিমূলক।

বাংলা গীতিকার তিনটি ধারা—নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা। নাথগীতিকার কাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্ব, অলৌকিক দিক এবং মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। গীতিকাগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনকথা-ই লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রেম-ই গীতিকাগুলির প্রধান অবলম্বন।

অনুশীলনী

নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

(১) লোকসংগীত ও গীতিকার সম্পর্ক নিরুপণ করুন।
(২) গীতিকার নানারূপের পরিচয় দিন।
(৩) গীতিকার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।
(৪) ব্যালাড ও গীতিকার পার্থক্য দেখান।
(৫) ব্যালাড ও গীতিকার সাদৃশ্য আলোচনা করুন।
(৬) নাথগীতিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৭) মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পর্ক আলোচনা করুন।
(৮) মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

(১) গীতিকার কয়েকটি বাংলা প্রতিশব্দ লিখুন।
(২) ব্যালাডের প্লট কেমন হয়?
(৩) ব্যালাডের অবয়ব কেমন হয়?
(৪) বাংলা গীতিকার তিনধারার সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৯৮.৮ লোককথা

গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাচীন মানুষ সারাদিন কাজ-কর্মের শেষে যখন একজায়গায় জড়ো হত রাতে, তখন তারা বয়স্ক কোন ব্যক্তির কাছে গল্প শুনতো নানান অভিজ্ঞতার, কাজ কর্মের ও কল্পনার। গল্প শোনার এই প্রবৃত্তিটি ক্রমশ মার্জিত হয়ে নতুন নতুন বিষয়-বস্তুর সন্ধান ও নতুনতর উপায়ে তাদের পরিবেশন কৌশল আয়ত্ত করে আজকের শিষ্ট সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্পের আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

গল্প বলার এই শিল্পিত, আদর্শায়িত নাগরিকরূপের সমান্তরালে লোক সমাজে এর একটি সাধারণ মান থেকে গেছে, এই সাধারণ মানের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের লোকসমাজে লৌকিক কথাসাহিত্যের একটি ধারা তৈরি হয়ে গেছে। গদ্য ও পদ্য উভয় মাধ্যমে লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়ে থাকে। পদ্যের ভিতর দিয়ে যা প্রকাশ করা হয়, তা গীতিকা নামে পরিচিত; গদ্যের ভিতর দিয়ে যে কাহিনী প্রকাশ করা হয় তা লোক কথা, ইংরেজিতে তাকে সাধারণভাবে Folk Tale বলা হয়।

৯৮.৮.১ লোককথার প্রকৃতি ও পরিবেশ

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোককথাও ঐতিহ্য ও শ্রুতিনির্ভর। এর কোন লিখিত রূপ নেই, লোকসমাজে মুখে মুখে শুনে শুনে এর ধারা অব্যাহত আছে। ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গীতিকার মতো এরও একটা পরিবেশনের পরিবেশ প্রয়োজন, সাধারণত কাজের অবকাশে লোককথা পরিবেশিত হয়ে থাকে, একজন কথক এবং একাধিক শ্রোতা ঘিরে তৈরি সে পরিবেশ। বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের কাছে প্রতিনিয়ত গল্প শোনার বায়না করে থাকে। কিন্তু সে বায়না পূরণ করা কাজের মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, যেহেতু লোক কথাটি লোকসাহিত্যের অন্যতম দীর্ঘ উপকরণ, দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে পদ্যে রচিত গীতিকার মতো দীর্ঘ গদ্য এই লোককথা। তাই কাজের সময়ে কিংবা কাজের ফাঁকে বাচ্চার বায়নাকে পূরণ করতে লোককথা বলা সম্ভব নয়। সেইজন্য দিনের বেলা গল্প শোনার কথা বললে ঠাকুমা-দিদিমারা বায়নাকারী নাতি-নাতনিদের এই বলে বোঝায় যে, দিনের বেলায় গল্প বললে ও গল্প শুনলে চোখ কানা বা অন্ধ হয়ে যায়। আসলে এই ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞার একটিই কারণ যে, দিনের বেলা কাজের মধ্যে গল্প বলতে বসলে কাজে ফাঁকি পড়বে। তাই লোকসমাজ লোককথা পরিবেশনের পরিবেশটিকে নির্ধারণ করেছে রাত্রিকালে কাজের অবসরে। কেবলই যে দিনের কাজকে নষ্ট না করতে লোককথাগুলো রাত্রে পরিবেশিত হয়, তা নয়। দুরন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে, ভয় দেখাতে, মাকে রাত্রের কাজে অবকাশ তৈরি করে দিতে এই গল্পগুলো রাতে কিংবা সন্ধ্যাতেই পরিবেশিত হত। গল্পের বিষয়বস্তুর অবাস্তবতা, অলৌকিকতা ও অসম্ভবতাকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তোলায় সহায়ক হত রাতের অন্ধকার পরিবেশ। দিনের আলোতে যা অসম্ভব বলে মনে হয় রাতের তারা-ভরা অন্ধকারের রহস্যময় পরিবেশে তা অনেকটা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে শিশুর কাছে। এজন্যেও লোককথায় রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করার প্রবণতা।

৯৮.৮.২ লোককথার নানারূপ

বাংলা লোককথার ভাণ্ডারটি বেশ সমৃদ্ধ। কেবলমাত্র লোককথা শব্দটি কিছুটা অপরিচিত, তার পরিবর্তে রূপকথা শব্দটি বিশেষ জনপ্রিয়। রূপকথা কিংবা লোককথা বলতে রাক্ষস-খোক্কস ও রাজা-রানি, রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্পই আমারে কাছে এক ঝলকে ধরা পড়ে। তবে, লোককথা বলতে কেবল রূপকথাকেই বোঝায় না। লোককথার একাধিক রূপ বর্তমান। যেমন— রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, বীরকথা, নীতিকথা, পরীকথা, লোকপুরাণ ইত্যাদি।

রূপকথা ঃ লোককথার সর্ববৃহৎ রূপ হল রূপকথা, এ জাতীয় গল্পে কল্পনার জালবোনা হয়। সাধারণত অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতা এ জাতীয় রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাক্ষস, দানব এবং পরীরাই রূপকথার কাহিনীতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে থাকে। সঙ্গে থাকে রাজা-রানি, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও রাজকন্যা

প্রমুখেরা। এ জাতীয় লোককথার কাহিনীতে তেমন বৈচিত্র্য থাকে না। সেই বাঁধা ধরা এক গৎ — এক ছিল রাজা, তার সাত রানী, রাজার মনে ভারি দুঃখ, ইত্যাদি। এ জাতীয় রচনায় চরিত্রের কোন নামকরণ নেই এবং সমগ্র কাহিনীটিই নির্বিশেষ চরিত্রে পূর্ণ। এই নৈর্ব্যক্তিক ও সার্বজনীনভাব অবলম্বন করে রূপকথা রচিত বলে এজাতীয় রচনা সহজেই দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হতে পারে। লোককথার এই রোমান্সধর্মী, কল্পনাপ্রবণ শাখাটিকে ইংরাজিতে বলে Fairy Tale, বাংলায় বলে রূপকথা।

সাধারণত, লোকসমাজের কল্পনাপ্রবণ মনটি ধরা পড়ে রূপকথার মধ্যে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রেমের পরই রূপকথায় ভাগ্যের স্থান। গ্রাম্য মানুষ স্বভাবতই তাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে থাকে। রূপকথার গল্পে গ্রাম্য লোকসমাজের উক্ত মনোভাবই প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় কাহিনীতে ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় বা পরাজয়, ন্যায়ের বিচার, উদ্যোগী কর্মীর জীবনে সাফল্য চিত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণত এই আশাবাদী সুরটুকুই রূপকথাগুলোকে তার কল্পনা ও অলৌকিকত্বের মোহজাল ছিন্ন করে মানবজীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

রূপকথা জাতীয় লোককথা সাধারণত দীর্ঘ অবয়বের হয়, বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র শাখাকাহিনী সহযোগে জটিল এ জাতীয় কাহিনী। এ জাতীয় গল্পের পরিবেশটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল-সুনির্দিষ্ট কোনও স্থান ও সুস্পষ্ট কোনও চরিত্র অবলম্বন করে এ কাহিনী রচিত হয় না। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা এ গল্প পরিপূর্ণ। এর নায়ক সাধারণত কোনও অপরিচিত দেশের রাজপুত্র, বহুদূরের কোন এক নতুন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করে অসম্ভব কতগুলো বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সবশেষে সে দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ও সেখানকার সিংহাসনের উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে গল্পের পরিসমাপ্তি। সমাপ্তি সাধারণত সমাপ্তিবাচক ছড়ার মধ্যে দিয়ে। বাংলার উপকথা কিংবা ঠাকুরমার ঝুলি প্রভৃতি এই জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত।

উপকথা ঃ 'রূপকথা' শব্দটি লোকসমাজে উচ্চারণজনিত ত্রুটির ফলে 'উপকথা'তে পরিণত হয়েছে এ ধারণা অনেকের। তবে, যতই উচ্চারণ বিকৃতি ঘটুক না কেন, উপকথা লোককথার একটি বিশেষ শাখা। লোককথার অন্যতম একটি বিশেষ চরিত্র পশু-পাখি। এই পশু-পাখিকেন্দ্রিক লোককথাকে ইংরাজিতে বলে Animal Tale। এ জাতীয় গল্পে নরনারী ও পশু-পাখি উভয়েই সমান অংশগ্রহণ করে থাকে। এখানে পশু-পাখি চরিত্রগুলো সব মানুষের মতো আচরণ করে। কিংবা মানবচরিত্রগুলো পশুপক্ষীর ছদ্মবেশে এ কাহিনীতে উপস্থাপিত হয়। এভাবে পশু-পাখি যখন মানুষের তো কথা বলে বা আচরণ করে তখন স্বাভাবিকভাবে হাস্যরসের উপস্থাপনা ঘটে। অথবা কোন পশুর নির্বুদ্ধিতার দ্বারা কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়। এজাতীয় গল্পে ধূর্ত ও নির্বোধ - দুই শ্রেণীরই পশু পাখি থাকে চরিত্রগত এই বৈপরীত্য নির্দেশ করার ফলে এ জাতীয় রচনায় সহজ একটি নাটকীয় গুণ প্রকাশ পায়। এ জাতীয় কাহিনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দূর্বল এবং অসহায়ের প্রতি সমবেদনা। এ ধরনের লোককথাকে বাংলায় বলা হয় উপকথা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নীতিকথা ঃ অনেক সময় পশু-পাখিকেন্দ্রিক লোককথা বা উপকথা বা Animal Tale-এ একটি নীতি বা উপদেশ সংযুক্ত থাকে, ইংরাজিতে এজাতীয় লোককথাকে বলে fable, বাংলায় উপকথার এই শাখাকে নীতিকথা বলা হয়। এজাতীয় রচনায় লোকসমাজ সাধারণত একটি শিক্ষণীয় বিষয় পায়। ইংরাজিতে Esop's Fable, সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' এ জাতীয় রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্রতকথা ঃ কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই ব্রত বলে। ব্রত পালনের উপলক্ষ্যে যে গল্প, তাই ব্রতকথা। সাধারণত নারী-সমাজ সংসারের সুখ-শান্তি কামনায় সারাবছর ধরে এক-একটা প্রার্থনায় এক-একটি দেবীর কাছে তাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার কথা জনায়। নারী-হৃদয়ের ওই কামনা-বাসনা, উক্ত দেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ব্রতকথা। ব্রতকথার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মঙ্গল সাধন। এ জাতীয় রচনার ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য অপরিসীম। যদিও এখানে কল্পনা ও অলৌকিকত্ব সর্বাংশে বিদ্যমান, তবু নারী মনের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ প্রকাশের মধ্যে সমাজ-সত্য কিংবা ঐতিহাসিক সত্য কোন না কোনভাবে প্রকাশিত হয়ে যায় এ জাতীয় লোককথা কেবল শ্রবণযোগ্য নয়, অনুষ্ঠান করে পালনেরও। দেবতার কাছে কামনা-বাসনা জানিয়ে, আলপনা এঁকে পূজার পর ব্রতকথা শোনার নিয়ম। ব্রতকথার সংকলন গ্রন্থ 'মেয়েদের ব্রতকথা'।

বীরকথা ঃ একটি মাত্র কেন্দ্রীয় দুঃসাহসী ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বীরচরিত অবলম্বন করে যে একাধিক কাহিনী রচিত হয়, তাকে ইংরাজিতে বলে Hero Tale, বাংলায় বলে বীরকথা। এ জাতীয় লোককথা রূপকথা ও লৌকিক উপন্যাসের মিশ্র উপাদানে রচিত, এতে পারিপার্শ্বিক ঘটনা অপেক্ষা নায়ক-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করে। বাংলায় এ জাতীয় লোককথার দৃষ্টান্ত তেমন নেই।

আরব্য উপন্যাস

পাশ্চাত্য সমালোচকগণ একশ্রেণীর লোককথাকে novella বলে উল্লেখ করে থাকেন। এর ঘটনাবলী লোককথার ঘটনাবলীর মতো অসম্ভব অবিশ্বাস্য এবং রোমাঞ্চকর হলেও, তাদের ঘটনাস্থল রূপকথার ঘটনাস্থলের মত কল্পরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য নয়, বরং বাস্তব রাজ্য, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুঃসীমাবেষ্টিত কোন দেশের মধ্যেই এই সকল ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে — এজাতীয় রচনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত Arabian Nights। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের কথা-সাহিত্যের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এই novella কথাটির বাংলায় উপন্যাস বা লৌকিক উপন্যাস বলে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এই অর্থেই Arabian Nights, Persian Nights প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের লোক-কথা সংগ্রহ বাংলায় আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস প্রভৃতি নামে পরিচিত।

৯৮.৮.৩ লোককথার অভিপ্রায়

বিশ্বের যাবতীয় লোককথাকে তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কতকগুলো শ্রেণী বা Type-এ ভাগ করা হয়ে থাকে। শুধু Type-এ নয়, বিশ্বের সকল লোককথার মধ্যেকার মৌলিক মিলের ভিত্তিতে Motif এর তালিকাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এই Motif বা অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে বিশ্বের লোককথাগুলোকে যে কতকগুলো অভিপ্রায় সূচীতে ভাগ করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ—

পৌরাণিকতামূলক অভিপ্রায়
জীবজন্তুবিষয়ক অভিপ্রায়
আনুষ্ঠানিক নিষেধ সম্পর্কিত অভিপ্রায়
জাদুসংক্রান্ত অভিপ্রায়

মৃত্যু সম্পর্কিত অভিপ্রায়

বিস্ময়কর বিষয়মূলক অভিপ্রায়

পরীক্ষাসংক্রান্ত অভিপ্রায়-ইত্যাদি। বিশ্বের বিভিন্ন লোককথার মধ্যে কেবল বিষয়গত সাদৃশ্য নেই। লোককথার মধ্যে একটি সার্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ রূপ আছে। সেখানে আপনারা দেখবেন, লোককথার যেমন কোনও জাতি নেই, তেমনই এর কোন ধর্মও নেই। খ্রীষ্টানের লোককথা, ইহুদির লোককথা বলে যেমন কিছু নেই - হিন্দুর লোককথা, মুসলমানের লোককথা বলেও কিছু নেই; জাতি বা nationality দিয়ে এর পরিচয়, ধর্ম দিয়ে নয়; যেমন, বাঙালির লোককথা, জার্মানির লোককথা ইত্যাদি।

৯৮.৮.৪ লোককথার ভবিষ্যৎ

সর্বোপরি, লোককথা যে শ্রেণীর বা যে জাতির হোক না কেন, এর উৎকৃষ্ট কতকগুলো দিক আছে। যেমন— শিশুর কল্পনার জগৎকে সমৃদ্ধ করতে ও তার কল্পনাপ্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করতে রূপকথার জুড়ি নেই। নীতিকথা মানুষকে সমাজ শিক্ষা ও ন্যায় শিক্ষায় শিক্ষিত করে, উপকথা, কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে ও লোকচরিত্র সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে, বীরকথায় অত্যাচারিত মানুষ সাময়িক মানসিক আশ্রয় খুঁজে পায়, ব্রতকথায় কামনার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও সামাজিক সত্য মূল্যবান হয়ে ওঠে। তবে, এ সবকিছুর জন্যে প্রয়োজন লোককথা পরিবেশনের অবকাশ ও লোককথা শোনার মতো মানসিকতা। আজকের মাল্টিমিডিয়ার দৌরাত্ম্যে হারাতে বসেছে অবকাশের ক্ষণ, হারাতে বসেছে শিশুর সমৃদ্ধ কল্পজগৎ ও হারাতে বসেছে লোককথার জগৎ।

৯৮.৮.৫ সারাংশ

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোককথাও ঐতিহ্য ও শ্রুতিনির্ভর। সাধারণত কাজের অবকাশে লোককথা পরিবেশিত হয়। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে পদ্যে রচিত গীতিকার মতো দীর্ঘ হয় লোককথা।

বাংলা লোককথার ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। বাংলায় লোককথার একাধিক রূপ পাওয়া যায়। যেমন—রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, বীরকথা, নীতিকথা, পরীকথা লোকপুরাণ ইত্যাদি।

লোককথার মধ্যে একটি সার্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ রূপ আছে। তবে লোককথা যে শ্রেণীর বা জাতির, তার কতকগুলো উৎকৃষ্ট দিক আছে। যেমন নীতিকথা মানুষকে সমাজশিক্ষা ও ন্যায় শিক্ষায় শিক্ষিত করে, উপকথা কৌতুকের সাথে সাথে সমাজ সম্পর্কে ও লোকচরিত্র সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। বীরকথায় অত্যাচারিত মানুষ মানসিক আশ্রয় খুঁজে পায়, ব্রতকথায় ঐতিহাসিক ও সামাজিক সত্য মূল্যবান হয়ে ওঠে। তবে সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন লোককথা পরিবেশনের অবকাশ ও শোনবার মতো মানসিকতা।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

(১) লোকসংগীত-এর প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) লোককথার অভিপ্রায় (Motif) সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) লোককথার ভবিষ্যৎ আলোচনা করুন।

(৪) লোককথার শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করে দেখান।

(৫) রূপকথা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(১) ব্রতকথা

(২) উপকথা

(৩) নীতিকথা

(৪) বীরকথা

৯৮.৯ লোকনাট্য

লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটককে সাধারণত লোকনাট্য বলা হয়। লোকনাট্য অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক এবং বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন। লোকনাট্য একইসঙ্গে দৃশ্য, শ্রব্য এবং অভিনেয়। ছড়ায় আছে কল্পনা, ধাঁধায় আছে রহস্যময়তা, প্রবাদে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা, লোকসংগীতে প্রকাশ পায় আবেগ-উচ্ছ্বাস আর লোকনাট্যে ধরা পড়ে সমাজজীবনের বাস্তব ছবি। কিন্তু লোকনাট্যের এই বিশেষ রূপটি এখন দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

বর্তমান লোকনাট্য ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, লোকনাট্যের উদ্ভবের পিছনে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিদ্যমান। মূলত ধর্মীয় কোন ভাবনা থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটলেও, তা ধীরে ধীরে বাতাবরণ মুক্তির দিকে এগিয়েছে এবং সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক পূর্ণতার দিকে তার যাত্রা ত্বরান্বিত হয়েছে। গ্রামবাংলায় ব্যাপক পরিমাণে প্রচলিত যাত্রা পালাকে অনেকে লোকনাট্য বলে অভিহিত করতে চান। যাত্রার মধ্যে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু, আধুনিক যাত্রার উপস্থাপনা ও অভিনয় রীতি যেদিকে এগিয়েছে, তার সঙ্গে লোকনাট্যের মঞ্চ, অভিনয় কাহিনীগত ব্যবধান খুব স্পষ্ট।

৯৮.৯.১ লোকনাট্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

লোকনাটক ও লোকনাট্য :

লোকনাটক লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। Folk Drama is a representation of actions in specified human life. সংক্ষেপে বলা লোকসাধারণের জন্য লোকসাধারণ দ্বারা রচিত যে নাটক তাই লোকনাটক।

লোকনাটকের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য :

১) সংহত ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের মধ্য থেকে লোকনাটক জন্মলাভ করে।

২) কাহিনীর মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত সংযোগ থাকে না। একধরনের কাহিনীগত শিথিলতা এর মধ্যে দেখা যায়।

৩) বলিষ্ঠ লোকপ্রিয় আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়।

৪) এই নাটকের বিষয় ভাবনা অনেক সময়ই পরিকল্পনাহীন।

৫) আঞ্চলিক উপভাষা এর প্রাণশক্তি।
৬) তত্ত্ব-বর্জিত এই নাটক অত্যন্ত সাবলীল।
৭) রঙ্গমঞ্চের অকৃত্রিমতা।
৮) অভিনেতা ও দর্শক-শ্রোতার মধ্যে স্থানগত ও রুচিগত ব্যবধান থাকেনা। বর্তমানের পথ-নাটিকার সঙ্গে এর অনেক মিল দেখা যায়।
৯) 'কথান্তর'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই কাহিনী নানা সময়ে নানা রূপ লাভ করে।
১০) সঙ্গীত ও নৃত্য প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
১১) লোক-সাংবাদিকতা লোকনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
১২) লোকনাটক অনেক সময়ই উদ্দেশ্যমূলক রচনা।
১৩) পরিবর্তনশীলতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
১৪) লোকনাটক গতিশীল ও বিবর্তনশীল।
১৫) অধিকাংশ লোকনাটকে পুরুষ চরিত্র সংখ্যায় বেশি থাকে।
১৬) কাহিনী পুরাণ ও লোকসমাজ নির্ভর।
১৭) প্রশ্নমূলক তথা ধাঁধার ব্যবহার লোকনাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।
১৮) লোকনাটকের অনেকটা অংশই অভিনয়কালীন রচনা অর্থাৎ তাৎক্ষণিক রচনা।
১৯) লোকনাট্যের চরিত্রগুলি সাধারণত একমাত্রিক। জটিল চরিত্র লোকনাটকে বিরল।
২০) গদ্য ও পদ্য দুধরনের সংলাপ ব্যবহৃত হয়।

লোকসমাজে, লোকসমাজের জন্য এবং লোকসমাজের দ্বারা অভিনীত নাট্যই লোকনাট্য। লোকনাট্যের সঙ্গে শিষ্ট বা নাগরিক নাটকের ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। লোকনাট্য তার বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে, তার অভিনয় রীতি, মঞ্চ সবদিকেই নিজস্ব স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যে আপন একটা ঘরানা তৈরি করে নিয়েছে। যেমন—

- নাগরিক বা শিষ্ট নাটকের মতো লোকনাট্যের নির্দিষ্ট কোন বাঁধা মঞ্চ থাকে না। লোকনাট্য অভিনীত হয় দর্শক যে ভূমিতে বসে থাকে, সেই ভূমির উপর।

- মাটি বা ভূমির উপর চারদিকে দর্শক বৃত্তাকারে বসে থাকে, আর তার মাঝখানে এ জাতীয় অভিনয়ের আসর বসে। লোকনাট্যের মঞ্চ চারদিক খোলা। চারদিকেই দর্শকাসন, আর সেই অর্থে লোকনাট্যে পৃথক কোন মঞ্চ থাকে না, কারণ তা তো দর্শকাসনের ভূমিতেই অভিনীত হয়।

- লোকনাট্যের অভিনেতাদের আলাদা কোন সাজঘর বা গ্রীনরুম থাকে না, তাদের যা সাজসজ্জায় তা একবারেই ঠিক করে নিয়ে আসরে দর্শকদের সামনে বসে যায় এবং যার যখন অভিনয়ের পালা পড়ে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে তার অংশ অভিনয় করে।

- লোকনাট্যের অভিনেতারা মূলত পুরুষ। যদি নাট্যের খাতিরে স্ত্রী চরিত্রের দরকার হয়, অর্থাৎ নাটকের মধ্যে যদি স্ত্রী চরিত্র থাকে, তাহলে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতাই অভিনয় করে থাকে।

- একজন অভিনেতা অনেক সময় একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে এবং কোন প্রকার সাজ-সজ্জার পরিবর্তন ছাড়াই। লোকনাট্যে লোক অভিনেতার সাজ-সজ্জা খুবই সাধারণ এবং তা মুখ্যত লোকসমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীকে অবলম্বন করে।

- লোকনাট্যের কোন অভিনেতার সাজ-সজ্জার পরিবর্তন ব্যতিরেকে অন্য চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নয়, বরঞ্চ জীবনেরই ছবি ফুটে ওঠে। কারণ, কোন মানুষ সমাজ ও সংসার জীবনে বাস করতে গিয়ে সারাদিনে তাকে নানান ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। বাড়ির মধ্যে সে একরকম আবার বাড়ির বাইরে সে অন্যরকম। আবার বাড়ির এক একটা মানুষের সঙ্গে সে এক এক রকম আচরণ করে, তেমনি সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার আচরণ ও সংলাপের ধরণও পৃথক পৃথক। স্বাভাবিকভাবে সামাজিক একটা মানুষ যদি সারাদিনে এই রকম বহুরূপে প্রকাশিত হতে পারে মুহুর্মুহু, তাহলে লোকনাট্যের কোন অভিনেতা কেন একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে পারবে না।

- লোকনাট্যের কাহিনী মূলত সমাজ থেকে গৃহীত এবং পূর্ব নির্ধারিত লিখিত কোন কাহিনী লোকনাট্যে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কাহিনীর একটা বাহ্যরূপ নির্ধারিত থাকলেও সংলাপের কোন পূর্বরূপ ঠিক থাকে না, তা আসরে দাঁড়িয়ে অভিনেতা তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে নেন।

- লোকনাট্যে সাধারণত লোকবাদ্যের ব্যবহার হয়।

- ধর্মের সঙ্গে লোকনাট্যের সম্পর্ক থাকলেও, লোকনাট্য তার ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে সামাজিক হয়ে ওঠে। যদি লোকনাট্যের উদ্ভবের পিছনে ধর্ম থাকে, তাহলে ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের পর লোকনাট্য সামাজিক হয়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হয় এবং এক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকনাট্যে সালতামামির বর্ণনা থাকে। সেই সালতামামিতে আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানান ঘটনা ও সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। এ পর্যায়টি অনেকটা লোক সাংবাদিকতার মতো।

৯৮.৯.২ লোকনাট্যের মিশ্রধর্মিতা

বাংলা লোকনাট্যের ধারাটি অবিমিশ্র নয়। এর মধ্যে যেমন সামাজিকতার পাশাপাশি ধর্মীয় প্রভাব বিদ্যমান, তেমনি আবার লোকনাট্যের মধ্যে তার আপন স্বভাবের পাশাপাশি গীতিধর্মিতাও লক্ষিত। আবার লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও লোকনাট্যের উপাদান মিশে থাকে, যেমন গীতিকা। এছাড়া সংলাপধর্মী ছড়া, প্রবাদও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। লক্ষণীয় গাজনের মন্ত্র ছড়াও। লোককথার মধ্যেও অনেকসময় নাট্যধর্ম পাওয়া যায়। লোকনাট্যের মধ্যে লোকনৃত্যেরও ব্যবহার হয়। সব মিলিয়ে লোকনাট্য এক মিশ্র শিল্প।

৯৮.৯.৩ লোকনাট্য গণসংযোগ ও আধুনিক নাটক

লোকনাট্য শুধু মিশ্র শিল্পকলাই নয়, গণসংযোগের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। লোকনাট্য উদ্ভবের পিছনে পথের ভূমিকা বিদ্যমান। কোন দেবতার পূজার শেষে দেবতার মূর্তি নিয়ে যে শোভাযাত্রা হয় কিংবা গ্রাম ঘোরা হয়, সেই গ্রাম ঘোরার সময় জনগণের পারস্পরিক অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা, নৃত্য ইত্যাদির সংমিশ্রণ থেকে লোকনাট্যের উদ্ভব। উদ্ভবের সময় থেকেই লোকনাট্যের সঙ্গে জনগণের যোগ থেকে গেছে এবং এই যোগ আসর পেতে লোকনাট্যের অভিনয়ের সময়ও বজায় থাকে। সেখানে দেখা যায় যে, লোকনাট্যের অভিনেতা ও দর্শকদের ভিতর কোন ব্যবধান নেই। দর্শকাসন ও অভিনয়ের আসর একই ভূমির উপর অবস্থিত। আবার অভিনেতারা আলাদা কোন নেপথ্য গৃহে বা সাজঘরে অবস্থান করে দর্শকের সঙ্গে একটা দূরত্ব রচনা করে না,

তারা আসরেই দর্শকদের পাশে / সামনে বসে থাকে। অভিনয়ের সময় দর্শকাসন বা দর্শকদের মধ্যে থেকে তারা উঠে আসে। অভিনয়ের প্রয়োজনে অভিনেতা যেমন দর্শকদের মধ্যে চলে যায় বিনাদ্বিধায়, তেমনি দর্শকরাও অনেক সময় অভিনয়ে যোগ দিয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী মূল অভিনেতাদের সঙ্গে সংলাপেও রত হয় দর্শক-শ্রোতা। এভাবে গণসংযোগের ফলে লোকনাট্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং লোকসমাজের এই বিশেষ শিল্পরূপটি কখনও কৃত্রিম কোন কলাচর্চা বলে মনে হয় না। আধুনিক শিষ্ট নাট্য আন্দোলনের বিশেষ ধারা 'থার্ড থিয়েটার' বা পথনাটকের বর্তমান রূপ এই লোকনাট্যের কাছেই ঋণী।

৯৮.৯.৪ লোকনাট্যের পরিচয়

বাংলা লোকনাট্যের ভাণ্ডারটি বৈচিত্র্যে ভরা। বাংলার নানা প্রান্ত জুড়ে নানারকম লোকনাট্যের দেখা মেলে। যেমন—

খন বা খনের গান ঃ উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলাতে এই শ্রেণীর লোকনাট্য অভিনীত হয়। 'খন' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্ষণ' থেকে এসেছে; এ জাতীয় লোকনাট্য বা গান তাৎক্ষণিক রচিত বলে, এর নাম খন বা খনের গান। সাধারণত নিরক্ষর গ্রাম্য পালা রচয়িতারা সারা বছর ধরে গ্রামের সামাজিক এবং পারিবারিক নানা ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখে এবং যদি সে বছর কোন প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে গ্রামে কোনো কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায়, যেমন কুলত্যাগ, অসবর্ণ বিয়ে, গোপন প্রণয় ইত্যাদি, তাহলে তারা সেই প্রসঙ্গগুলো ব্যবহার করে মুখে মুখে নাটক রচনা করে তার অভিনয় করে। সমস্ত ঘটনাটির ধারাবহিকতা বজায় রেখে গান রচনা করে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুর আরোপ করে ওই আসরে গাওয়াও হয়। প্রণয় সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপার গ্রামের মানুষের কাছে খুব রসালো বিষয়, এ বিষয় নিয়ে তৈরি লোকনাট্য জনগণের জমাট আনন্দের খোরাক যোগায়। এ জাতীয় লোকনাট্যে আগে কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত মানুষের নাম সরাসরি উচ্চারিত হত। কিন্তু এখন আইনি বাধায় জড়িত ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হয় না। খনে বা খনের গানে প্রতিবছর নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গান ও সংলাপ বাঁধা হয়। এক বছরের পুরাতন বিষয় পরবর্তী বছরের গানে থাকে না। এভাবে প্রতিবছর নতুন নতুন ঘটনাকে কেন্দ্র করে খনের গান ও সংলাপ রচিত। এ জাতীয় নাটকের বিষয়বস্তু সর্বদাই প্রেম, সে প্রেম আধ্যাত্মিক প্রেম নয়, বরং পার্থিব প্রেম। এবং তার উপর বছর বছর নিত্যনতুন কেলেঙ্কারি নিয়ে যখন গান ও সংলাপ রচিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয়।

পালাটিয়া ঃ উত্তরবঙ্গের আর এক শ্রেণীর গ্রামীণ লোকনাট্যের নাম পালাটিয়া। পালা শব্দের অর্থ লোকনাট্যের কাহিনী। এ শ্রেণীর লোকনাট্যের বিষয় বা কাহিনী খনের মতো তাৎক্ষণিক রচিত নয়, বরঞ্চ একটা গতানুগতিক। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় এ জাতীয় লোকনাট্যের প্রচলন। নাচ, গান ও ছড়া সংলাপের সমন্বয়ে 'পালাটিয়া' তৈরি। মূলত রূপকথার কাহিনী, কিংবদন্তীমূলক ও সামাজিক কাহিনী নিয়ে এ জাতীয় লোকনাট্য নির্মিত। আঞ্চলিক সংলাপ এবং পল্লীগীতির সুরে এ পালার গান বাঁধা হয়। প্রধান গায়কের সঙ্গে দোহার ও বাদকগণ এ নাট্যে সহযোগিতা করে। এ শ্রেণীর লোকনাট্যে 'মহান' এবং 'দেউলিয়া' চরিত্র উপস্থাপিত হয়। নাচ, গান ও সংলাপযোগে পূর্ণ পালাই পালাটিয়াতে অভিনীত হয়। তাতে সাধারণত ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, অন্যায়ের শাস্তি প্রভৃতি দেখানো হয়। তবে পালাটিয়া যদি নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয়, তাকে 'মান পালাটিয়া' বলে, আর প্রেমমূলক কাহিনী নিয়ে রচিত হলে তাকে 'খাস পালাটিয়া' বলে।

লেটো ঃ বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় প্রচলিত এক বিশেষ লোকনাট্যকে বলে লেটো। লেটো মূলত নৃত্য, গীত ও হাস্যরসাত্মক সংলাপ ভিত্তিক লোকনাট্য। এখানে গ্রামজীবনের ছোট খাটো ঘটনা আঞ্চলিক সংলাপের

মাধ্যমে নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়। লেটোর গান আগে থেকে বাঁধা থাকে, কিন্তু নাট্যাংশের সংলাপ উপস্থিত বুদ্ধিমত বিভিন্ন চরিত্র প্রয়োগ করে থাকে। গ্রামর নিরক্ষর নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে লেটো প্রচলিত বলে দর্শক-রুচি অনুযায়ী এর নৃত্য-গীতে যথেষ্ট অশ্লীলতা বিদ্যমান। সাধারণত মেলা বা বাজারের মত জনসমাবেশ পূর্ণ স্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে লেটো পরিবেশিত হয়। লেটোর অভিনেতব্য অংশে অলিখিত লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে লেটো অনেক মার্জিত হয়েছে।

রঙ পাঁচালী ঃ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার কোন কোন অংশে অভিনীত এক ধরনের লোকনাট্য রঙপাঁচালী। এ শ্রেণীর লোকনাট্যে সাধারণত জীবনের লঘু দিকটিকে তুলে ধরা হয়। তা আগাগোড়া হাস্যরসাত্মক। হাস্যরস দিয়ে যেমন এর সূচনা, তেমনি হাস্যরসেই এর সমাপ্তি। আর তার অন্তরালে বাস্তব জীবনভিত্তিক সুসংবদ্ধ একটি কাহিনী। রঙ পাঁচালীর নায়ক-নায়িকারা কোন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নয়। তাদের জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এখানে উপস্থাপিত হয় না। এই লোকনাট্যের যে প্রকৃত নায়ক, তাকে বলে ‘বাতেয়া’। ‘বাতেয়া’ শব্দের অর্থ - যে বর্ণনা করে বা বলে। বাতেয়া অনেকসময় নিজেই মুখে মুখে রঙ পাঁচালী রচনা করে এবং মুখে মুখে সংলাপ রচনা করে। রঙ পাঁচালী অভিনয়ের কোন বিশেষ নিয়ম নেই। কাহিনী অনেক সময় বাস্তব জীবনের থেকে নেওয়া হলেও, কখনো কখনো তা কাল্পনিকও হয়। কোন প্রাচীন চরিত্র যেমন রাম, সীতা, কৃষ্ণ, রাধা-এর মধ্যে থাকে না। কল্পিত চরিত্র থাকলেও তা কখনও বাস্তবকে অতিক্রম করে না। কতকগুলো মোটামুটি গ্রাম্যচরিত্র এ জাতীয় লোকনাট্যে দেখা যায়, যেমন, কাজী (মুসলমান বিচারক), কারুয়া (ঘটক), জোতদার (ভূস্বামী), মোড়ল (গ্রামের প্রধান)। এদের কাজকর্মকে ব্যঙ্গ করা, কিংবা সৎমার নিষ্ঠুরতার মতো করুণ রসাত্মক কাহিনী নিয়েও রঙ পাঁচালীর কাহিনী গড়ে ওঠে।

গম্ভীরা ঃ মালদহ জেলার বিখ্যাত লোকনাট্য গম্ভীরা। গম্ভীরা মূলত শিব-মাহাত্ম্যমূলক গান। এ গানের সঙ্গে নৃত্যেরও সম্পর্ক আছে। সাধারণত লৌকিক সূর্যোৎসব বা শিবের গাজন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শিবের গাজন বা সূর্যোৎসবকে এই অঞ্চলে গম্ভীরা বলে। চৈত্রমাসে শুরু হয়ে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত গম্ভীরা উৎসব চলে। অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের গ্রাম্যজীবনে সারা বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি পর্যালোচনা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মাবলীর সমালোচনা ও অন্যায়কর্মের জন্য অনুতাপ করার রীতিও অনুষ্ঠানে প্রচলিত। এর সঙ্গে আবার অভিযোগের দিকটিও থাকে। সাধারণত গ্রামবাসী তাদের সারা বছরের শোক-তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, মনুষ্য খাদ্য, পশু খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার ও দুর্মূল্যতার সমস্যা, সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, আইন সভার সদস্য কিংবা রাজা-জমিদারের কাছে নয়, দেবতা শিবের কাছে অভিযোগ স্বরূপ জানায়। তিনি তাদের ত্রাণকর্তা। তিনি যদি উদ্ধার করেন, তাহলে তাদের এ দুরবস্থা ঘুচবে, তাই শিবের কাছে নাচ, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের সম্বাৎসরিক অভিযোগ জানানো। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে যতক্ষণ এই অভিযোগ জানানো হয়, ততক্ষণ একজন শিবঠাকুর সেজে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোন মন্তব্য করেন না। একজন মূল গায়েন তার দোহারদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শিবঠাকুরের কাছে নৃত্য, গীতবাদ্য এবং সংলাপ সহযোগে নানা অভিযোগ পেশ করতে থাকে এবং শিবঠাকুরকে এই বিষয়ে তাঁর চরম ঔদাসীন্যের জন্য দায়ী করতে থাকে। বর্তমান মুসলিম প্রধান মালদা জেলার বহু স্থানে শিবের জায়গা দখল করেছে মুসলমান সমাজের ‘নানা’ চরিত্রটি। তাঁর কাছে সকল অভিযোগ জানানো হয়। গম্ভীরায় এই অভিযোগ জানানোর দিকটির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সরকারি অনেক মানুষের কাজের নিরপেক্ষ সমালোচনা উঠে আসে। তাই গম্ভীরার সামাজিক রাজনৈতিক গুরুত্বটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

আলকাপ ঃ আলকাপের অপর নাম আলকাটা কাপ। আলকাপ শব্দটি সম্ভবত আরবি শব্দভাণ্ডার থেকে জাগত। এর অর্থ সামাজিক রঙ্গ ব্যঙ্গ। ‘আল’ বলতে তীক্ষ্ণ বা ধারালো বোঝায়, ‘কাপ’ বলতে বোঝায় কপটতা বা রঙ্গব্যঙ্গ। অর্থাৎ যে রঙ্গরসিকতার মধ্যে দিয়ে কোন কিছুকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্ধ করা হয় বা ‘আল’ কাটা হয় যে কাপের মধ্যে দিয়ে, তাকে আলকাপ বলে। মুর্শিদাবাদ, মালদা ও বীরভূম জেলাতে আলকাপের প্রচলন আছে। বীরভূম জেলাতে আলকাপ জাতীয় লোকনাট্য ‘ছ্যাঁচড়া’ নামে প্রচলিত।

আলকাপকে গ্রাম্যজীবনচিত্র ভিত্তিক নাটকীয় নক্‌শা বলা যেতে পারে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নক্‌শাচিত্র নৃত্য এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু আলকাপের প্রতিপাদ্য হলেও, প্রত্যক্ষ জীবনের ঘটনাই এর প্রধান অবলম্বন। আলকাপে পূর্ণাঙ্গ জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা করা হয় না, কেবলমাত্র জীবনের যে অংশে নরনারীর চরিত্রে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায় সেই অংশকেই আলকাপের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখানো হয়। আলকাপের মধ্যে মোটামুটি একই ধরনের কিছু চরিত্র, যেমন গ্রামের স্বার্থপর মোড়ল, অত্যাচারী জমিদার, কৃপণ গ্রাম্য মহাজন, কলহপ্রিয়া সতীন ইত্যাদির চরিত্র ঘুরে ফিরে আসে। তবে, আলকাপের বিষয়বস্তু ও চরিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সাম্প্রতিককালে স্ত্রীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা, পণপ্রথা ইত্যাদি আলকাপের রঙ্গব্যঙ্গের বিষয়ও হচ্ছে। আলকাপের মধ্যে আদি ও ব্যঙ্গ রঙ্গরসের অবতারণা থাকেই। রঙ্গরস সৃষ্টির জন্য আলকাপে সঙ্-এর উপস্থাপনা করা হয়। ‘সঙ্-মাস্টার’ এই সঙ্ পরিচালনা করেন। সঙ্-মাস্টারকে ‘কোপ্যা’ বলা হয়। আলকাপের সঙ্ নাট্যলক্ষণযুক্ত, বাকি অংশে শুধু নাচগানের মধ্যে দিয়ে কাহিনী পরিবেশিত হয়। আলকাপ নানাপ্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশমূলক পালাগান।

যাত্রা ঃ লোকনাট্যের একটি ধারা যাত্রা। যাত্রায়, বিশেষভাবে প্রাচীন যাত্রায়, লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। যাত্রার দর্শক পরিবৃত সমতল আসর, যাত্রার অধিকারী, অভিনেত্রী ও তাদের অভিনয় পদ্ধতি, লোকধর্মী বিষয়, গীতিভূমিকা ও যন্ত্রানুষঙ্গ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে যাত্রার গোত্রসম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। যাত্রার প্রকারভেদও এই সূত্রে আলোচ্য।

আধুনিক যাত্রা যতোই অনুকরণ করে এগিয়ে চলেছে নাটক ও চলচিত্রের দিকে ততোই স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে তার।

ধর্মীয় লোকনাট্য

সামাজিক লোকনাট্যের পাশাপাশি বাংলায় বেশিকিছু লোকনাট্য প্রচলিত আছে, যার বিষয়বস্তু মূলত পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয়। আপনারা গম্ভীরা গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ধর্মকে কেন্দ্র করে গম্ভীরার উদ্ভব ঘটলেও সেখানে প্রধানত সামাজিক সমস্যাই ব্যক্ত হয়ে থাকে। ঠিক এমনই একটি লোকনাট্য দক্ষিণবঙ্গের গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে এ লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটলেও এই লোকনাট্যের মধ্যে সামাজিক জীবনই মুখ্য হয়ে ধরা পড়ে গান ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে। এর লক্ষ্য সবসময় সামাজিক জীবনের কোন অসঙ্গতি, উচ্ছৃংখলতা, অনাচার ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করা। সাম্প্রতিক সময়ে গাজনের কাহিনী তৈরি হয় নারী স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদির নামে নারীর উদ্দাম জীবনযাপনকে ব্যঙ্গ করে, অবৈধ প্রেম, দেশীয়, আন্তর্জাতিক কোন সমস্যার কথা তুলে ধরে। দুই চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলাতে গাজনের প্রচলন ব্যাপক।

গাজনে তবু ধর্মকে অতিক্রম করে সমাজ বাস্তবতার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়, কিন্তু কুশানে, বিষহরা পালায়, টনসা যাত্রায়, জাগের গানে লোকনাট্যে পৌরাণিক কাহিনীই মুখ্য। কোচবিহার জেলার কুশান যাত্রায় রামায়ণের লব-কুশের কাহিনী ছড়া ও গানের মাধ্যমে নাট্যরূপ পায়। বিষহরা পালায় নাট্যরূপ পায় মনসার কাহিনী। টনসাযাত্রার বিষয়বস্তু রামায়ণের চলিত কাহিনী। সাত-আট দিন ধরে এ যাত্রা চলে, এক একদিন রামায়ণ থেকে এক একটি পালা তাৎক্ষণিক সংলাপে পরিবেশিত হয়। তবে, যাত্রার তুলনায় 'প্যালা' আদায় করা ও ফুলের মালা নিলাম করে পয়সা লাভ করা এ যাত্রার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর মদন চতুর্দশীতে কামের দেবতা মদনের জাগরণ উৎসব উপলক্ষে রংপুর, জলপাইগুড়ি, কামরূপ অঞ্চলে পালিত হয় জাগের গান।

৯৮.৯.৫ লোকনাট্যের ভবিষ্যৎ

লোকনাট্য তার লোকায়ত স্বভাব নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হয়ে থাকে। তবে সময়ের পরিবর্তনের নানান শিল্প মাধ্যমের প্রভাব বর্তমানে বাংলার লোকনাট্যের মধ্যে শিষ্ট নাট্য, চলচ্চিত্র ও রেডিও, টি. ভি. ইতাদির প্রভাব পড়ে লোকনাট্যকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে তাকে কৃত্রিম করে তুলছে। এসময় যে লোকনাট্য দিনের আলোতে কিংবা হ্যাজাকের আলোতে সাধারণ ভূমিতে সাধারণ বেশভূষায় খালিগুলাতে অভিনীত হোত এবং যেখানে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়চরিত্রেই পুরুষ অভিনেতা অভিনয় করতো, সেখানে আজ বৈদ্যুতিক রঙিন আলোর ঝলমলানিতে, মাইক্রোফোনের উচ্চচিৎকারে, বাঁধামঞ্চে, টিকিট কাটা দর্শকের সামনে, নারী চরিত্রের জন্য নারী অভিনেত্রী নিয়ে ফিল্মের চটুলগানের কথায়, সুরে ও নৃত্যে সাধারণ মানুষের সামনে এক কৃত্রিম সংস্কৃতি উপহার দিচ্ছে। ফলে, লোকনাট্য তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে আজ কৃত্রিম শিল্পে পরিণত হওয়ার মুখে, তার উপর ভিডিও সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে লোকসংস্কৃতির আসরে লোক জোটানো দুরূহ হয়ে পড়েছে দিন দিন।

৯৮.৯.৬ সারাংশ

লোকজীবনের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটককে লোকনাট্য বলা হয়, লোকন াট্য একইসঙ্গে দৃশ্য, শ্রাব্য এবং অভিনেয়। লোকনাট্যে ধরা পড়ে সমাজজীবনের বাস্তব ছবি। লোকনাট্য ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, এর পেছনে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিদ্যমান।

লোকনাট্যের কোনো বাঁধা মঞ্চ থাকে না, সাধারণত দর্শক যে ভূমির ওপর বসে, সেখানেই নাটক অভিনীত হয়। লোকনাট্যের অভিনেতারা মূলত পুরুষ। এর কাহিনী সমাজ থেকে গৃহীত এবং পূর্বনির্ধারিত। লোকনাট্যে সাধারণত লোকব্যঙ্গের ব্যবহার করা হয়।

লোকনাট্য গণসংযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলা লোকনাট্যের ভাণ্ডার বৈচিত্র্যে ভরা। এখানে নানারকম লোকনাট্যের দেখা পাওয়া যায়। যেমন — খনের গান, পালটিয়া, লেটো, রঙ পাঁচালী, গম্ভীরা, আলকাপ ইত্যাদি। যাত্রাও লোকনাট্যের একটি ধারা, সামাজিক লোকনাট্যের পাশাপাশি ধর্মীয় এবং পৌরাণিক লোকনাট্যও পাওয়া যায়। যেমন—গাজন, বিষহরা পালা, টনসা যাত্রা ইত্যাদি।

বর্তমানে লোকনাট্যের ওপর শিষ্ট নাট্য, রেডিও, টিভির প্রভাব পড়ে তাকে কৃত্রিম করে তুলছে এবং ভিডিও সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে লোকনাট্যের আসরে লোক জোটানো দুরূহ হয়ে পড়ছে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন -

১। লোকনাট্য কেমন শিল্প মাধ্যম?

২। লেটো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। আলকাপ কথার অর্থ কি?

৪। গম্ভীরা কোন জেলায় প্রচলিত লোকনাট্য?

৫। রঙ পাঁচালীতে কি জাতীয় চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়?

নিম্নের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন-

১। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন।

২। লোকনাট্যের মাধ্যমে কিভাবে গণসংযোগ ঘটে?

৩। ধর্মীয় লোকনাট্যের পরিচয় দিয়ে, বাংলার কিছু ধর্মীয় লোকনাট্যের বর্ণনা দিন।

৪। লোকনাট্য কাকে বলে? এ প্রসঙ্গে গম্ভীরার পরিচয় দিন।

৫। উত্তরবঙ্গে কয়েকটি লোকনাট্যের পরিচয় দিন।

৬। রাঢ়বঙ্গের কয়েকটি লোকনাট্যের পরিচয় দিন।

৯৮.১০ মন্ত্র

শব্দ ব্রহ্ম। যাকে আমরা লোকসাহিত্য বলি, তা আসলে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। বাক্ মানে কথা, কথা ধরা পড়ে শব্দে, লোকসাহিত্য যেহেতু বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, তাই লোকসাহিত্যে শব্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই সূত্র ধরে শব্দকেন্দ্রিক মন্ত্রকেও আমরা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্যতম উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি। তবে, মন্ত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হলেও, তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

৯৮.১০.১ ঋক্‌বেদ ও মন্ত্র

বিশ্বসাহিত্যে বিধৃত প্রাচীনতম শব্দসমূহের মধ্যে 'মন্ত্র' শব্দটি অন্যতম। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন হল বেদ। বেদের গোড়ার অংশের নাম ঋক্‌বেদ সংহিতা। ঋক্ বেদের এক একটি শ্লোককে বলে ঋক্। 'মন্ত্র' শব্দটি এই ঋকের নামান্তর। আদিতে বৈদিক সাহিত্যে ছিল দুটি মাত্র ভাগ— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ঋক্‌গুলি যেখানে সংকলিত হয়েছে সেই সংহিতা ভাগের নাম মন্ত্র, আর বাকি অংশটা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অংশের মুখ্য বিষয় মন্ত্রের প্রয়োগ ও অন্যান্য ভাবনা এবং উপনিষদ।

'মন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তি — মননার্থক 'মন্ত্র' ধাতু থেকে। বিশ্বজ্ঞানকে বলে মনন, আর সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিকে বলে ত্রাণ! এই দুটি নিয়ে সংসিদ্ধ হবার জন্য বলা হয় 'মন্ত্র'। বেদান্ত মতে সাধনার ক্রম তিনটি— শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অর্থ করলে দাঁড়ায় এই রকম— বিষয়টি জানা, তার বিচার এবং শেখে ধ্যানে তাকে পাওয়া বা হওয়া Realisation, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, —'মন্ত্র শব্দের অর্থ যাহা মনন করা হইয়াছে, যাহা ধ্যানের দ্বারা লব্ধ।' শ্রীমদ্ অনির্বাণজী মনে করেন যে, মনন ব্যাপারটি বুদ্ধি ও বোধি এই দুটি ধারার সমন্বিত প্রবাহ। বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ, আর বোধি তথা স্বয়ংপ্রভ প্রত্যয় দ্বারা বিশ্বাস।

৯৮.১০.২ মন্ত্রের উদ্ভব

আদিম মানুষের মধ্যে বিশেষ জাদু বিশ্বাস থেকে মন্ত্রের উদ্ভব। জীবন-যাপনের পথে নানান 'প্রতিকূলতা জয় করার হাতিয়ার হিসেবে তারা এই শব্দব্রহ্মকে বেছে নিয়েছে। সকলকালের সকল স্থানের মানুষের একটি শাশ্বত কামনা-ভালোভাবে বেঁচে থাকা, সুন্দর জীবন যাপন করা। কিন্তু তাদের কামনা বা চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশীর আনুকূল্যের একটা যোগাযোগ থাকা চাই, অথচ সে আনুকূল্যের অভাব প্রায়শই চোখে পড়ে, ফলে সে প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যেতে এমন কিছু অস্ত্রের ও জ্ঞানের দরকার-যা তাদের কামনার শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। অথচ বিজ্ঞানের তেমন উন্নতি তখন ঘটেনি। তাই এই মনন জাত মন্ত্র-ই তাদের হাতিয়ার ও ত্রাণকর্তা রূপে উপস্থিত। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি সুতীব্র জিজীবিষার সুর অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। ফলে যে বিষয় বা শক্তিসমূহ তার কামনার পরিপূর্তি বা প্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক সেগুলিকে সে সর্বশক্তি দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে চায়, আর বিরোধী ও প্রতিকূল বিষয় বা বাধাগুলোকে সে নির্মমভাবে নাশ করতে চায়। এবং এ কাজে মানুষ মন্ত্রকেই হাতিয়ার করেছে। মন্ত্রের উদ্ভবের অন্তরে এই অভীপ্সাও কার্যকরী। এই জাগতিক অর্থাৎ মূলত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপদ ও উৎপীড়নাদি থেকে পরিত্রাণের জন্য মন্ত্র এবং ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রশোধিত ভেষজ বা ধাতু-মণি রত্নাদির ব্যবহার হয় - এর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে যেমন আছে, লোকসমাজেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বৈদিক সাহিত্যে মন্ত্রের উদ্ভবের কথা থাকলেও, সে মন্ত্রের পাশাপাশি মন্ত্রের একটা লোকায়ত রূপও বিদ্যমান।

৯৮.১০.৩ মন্ত্রের ব্যবহার

মোটকথা, সকলেই ভালভাবে বাঁচতে চায়, চায় দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বতোমুখী অনুকূলতা। মানুষ শুধু কাম্যকে পেতে চায় না, কাম্যকে পাওয়ার পথে যা কিছু বাধা, তাকে সে অতিক্রম করতে চায়। অর্থাৎ তার কামনা চরিতার্থতার পথে যা কিছু প্রতিবন্ধক, তাকে সে সরাতে চায় যে কোন ভাবে। এসব কাজে সে ব্যবহার করে মন্ত্র এবং এই মন্ত্রের ব্যবহার পৌরাণিক বৈদিক শাস্ত্রেও যেমন লক্ষিত হয়েছে, তেমনি তার একটা ব্যবহারিক রূপ সাধারণ লোকসমাজেও প্রচলিত। বাংলা লোকভাষায়ও মন্ত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত।

৯৮.১০.৪ মন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা ও লোকভাষার মন্ত্রগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) আনুষ্ঠানিক, (২) আভ্যুদয়িক, (৩) অভিচারিক। নিত্য ও নৈমিত্তিক যেসব পূজা-অর্চনা করা হয় এবং সেখানে যে মন্ত্র উচ্চারিত

হয়, সে মন্ত্রগুলোকে আনুষ্ঠানিক মন্ত্র বলে। যেমন, গৃহদেবতার আরাধনা বা আরতি বা কোন দেব-পূজায় যে মন্ত্রের ব্যবহার হয়, সে মন্ত্রগুলোকে আনুষ্ঠানিক মন্ত্র বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রকে বলে আভ্যুদয়িক বা অভ্যুদয় সাধনের মন্ত্র। অথর্ববেদে বর্ণিত আয়ুষ্য (আয়ুবৃদ্ধির জন্য), ভৈষজ্য (বা আরোগ্যলাভের জন্য), শান্তির (ভৌতিক উপদ্রব প্রভৃতি প্রশমনের জন্য), পৌষ্টিক (বা শ্রী বৃদ্ধিসাধনের জন্য), সংমানস্য (বা মৈত্রীলাভের জন্য) প্রভৃতি মন্ত্রগুলোকে এ পর্যায়ে ধরা চলে। এ জাতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য হল সবকিছুকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করা। আর, তৃতীয় শ্রেণীতে যে আভিচারিক মন্ত্র পড়ে, তার লক্ষ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর আভ্যুদয়িক মন্ত্রের ব্যবহারে যেখানে প্রতিকূলতা তৈরি হয়, সে প্রতিকূলতা দূর করা। অর্থাৎ শত্রু বা বিরোধী শক্তিকে নাশ করার মন্ত্র হলো এই আভিচারিক মন্ত্র।

যাকে আমরা আনুষ্ঠানিক মন্ত্র বলে জেনেছি তার বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক মন্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও তার মূল কাঠামোটি অনেকটা একরকম। লক্ষ্মীপূজার মন্ত্র দঃ ২৪ পরগণায় যেমন, কলকাতায় তেমন, এমনকি উত্তরবঙ্গেও সেই একই। কারণ, এ জাতীয় মন্ত্র লোকায়ত নয়, যার ফলে শিষ্ট সাহিত্যের মতো এর একটা নির্দিষ্ট লিখিত রূপ পাওয়া যায়, সে রূপে খুব বেশি বিকৃতি ঘটানো যায় না। দেব-দেবীকে তুষ্ট করাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য।

অন্যদিকে আভ্যুদয়িক মন্ত্রের সংখ্যাই সর্বাধিক। এ মন্ত্রের লক্ষ্য আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক-এই ত্রিবিধ উৎপাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে সুস্থ, সমৃদ্ধ, সুন্দর জীবনযাপন করা। সাপ, বাঘ, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, ভূত, প্রেত প্রভৃতি প্রভাব থেকে রেহাই, দৈহিক নানারকম অসুখ থেকে বাঁচার উপায় কিভাবে সম্ভব-এই সমস্ত ব্যাপার হল আভ্যুদয়িক মন্ত্রের বিষয়। এই ধরনের মন্ত্রে আপ্তসার (দেহবন্ধন), গৃহবন্ধন, পথবন্ধন, জলপড়া তেলপড়া, ধূলাপড়া, সিন্দুর পড়া, বিষ নামানো, সাপের ঝাড়ন, ভূত-প্রেতের উৎপাত নাশ করার মন্ত্র আছে; আছে রোগ-প্রতিরোধ ও রোগনিরাময়ের মন্ত্রও, জ্বর, পেটের অসুখ থেকে উদরী, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের মন্ত্রও আছে এ পর্যায়ে।

সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পথে, কামনা পূর্তির লক্ষ্যে যদি কোনরূপ বাধা বা প্রতিকূলতা আসে, কিংবা কেউ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সে তখন কামনাকারীর শত্রু। আকাঙ্ক্ষিত জীবনের প্রয়োজনে তখন শত্রুকে ধ্বংস বা নিপাতসাধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই রকম অভীষ্টবিরোধী মানুষকে পীড়ন এমনকি নিধন করার মন্ত্র অথর্ববেদেও আছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে এ প্রকার মন্ত্রকে বলে অভিচার। মারণ, মোহন, উচাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও বশীকরণ-অভিচারের এই ছয় শাখা-যার পারিভাষিক নাম ষটকর্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়রিপুর দ্বারা চালিত মানুষ তার সুখ বা কামনাপূর্তির পথে অন্তরায় হিসেবে যাকে পায় তাকে সরিয়ে বা মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। প্রকাশ্যে অস্ত্রাঘাতে না মেরে মন্ত্রপ্রয়োগে এই হত্যা প্রক্রিয়ার নাম মারণ। স্থিরবুদ্ধি মানুষের চিত্তকে মন্ত্র যোগে মোহগ্রস্ত করা চলে। তার প্রসার বা প্রতিপত্তিকে থামিয়ে দেওয়া যায়, বা আটকে দেওয়া যায়, এর নাম স্তম্ভন। যে আমার শত্রু বা আমার কামনার ঈর্ষাভাজন তার মানসিক সুখ শান্তিকে বিচলিত বা নষ্ট করার নাম উচাটন। দুটো মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের বা স্বামী-স্ত্রীর কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেকার প্রগাঢ় ভালোবাসাকে যে মন্ত্র বলে ভেঙে দেওয়া যায়, তার নাম বিদ্বেষণ। কাম্য অথচ অবাধ্য ও অনায়ত্ত নারী বা পুরুষকে বশে আনার নাম বশীকরণ।

মন্ত্রের দেব-দেবী

বাংলা মন্ত্রগুলোর বিশেষত আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক মন্ত্রগুলির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হচ্ছে— আজ্ঞা, দোহাই ও দিব্যি বা শপথ। যেমন, কার আজ্ঞা? কাঙুরের কালিকা, মাচণ্ডীর আজ্ঞা। এই আজ্ঞাকারী দেবতার তালিকায় আছে, এক পর্যায়ে— চণ্ডী, কালী, গৌরী-পার্বতী, বিষহরি, মনসা, জগৎগৌরী, মহাদেব, ব্রহ্মা, কামাক্ষা, হাড়িঝি, সদাশিব, ধর্মপ্রমুখ, অন্য পর্যায়ে রাম, রাম-লক্ষ্মণ, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, ভীমা-অর্জুন, মহাদেব, কংস, নরপতি, মহীপাল প্রমুখ। আর এক পর্যায়ে-আল্লা, খোদা, মহমদ প্রমুখ, নরসিং, বদ্দিনাথ, গরুড়ও আছে। দোহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে রাম-সীতা, হনুমান, গৌরী-পার্বতী, মা ফুল্লরা, মনসা, জগন্নাথ, আল্লা, খোদা প্রমুখ, আর দিব্যি কাটার ক্ষেত্রেও কার্তিক, গণেশের মাথা খাওয়ার পাশাপাশি ব্রহ্মা, যীশু, আল্লা, মহাদেব প্রমুখের নামও এসে যায়।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক মন্ত্রকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— শুভকারক বা মঙ্গলজনক, অশুভকারক বা ডাইনিবিদ্যা, প্রতিরোধক বা আত্মরক্ষামূলক এবং নিরাময়মূলক। সাধারণত আভ্যুদয়িক মন্ত্র বলে আপনারা যে মন্ত্রের পরিচয় পেয়েছেন, তার মধ্যে একটা ইতিবাচক বা শুভকারী বা মঙ্গলজনক দিক থাকে। যেমন, কৃষি ও সকলরকম উর্বরতাবৃদ্ধিমূলক মন্ত্র। অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি আনার মন্ত্র, প্রেমসংঘটন মূলক মন্ত্র, ঝড় বন্ধ ইত্যাদি মন্ত্র। যেমন, তুফান বা ঝড় বন্ধের একটি মন্ত্র ঃ

‘পা মনে গনানে কালী
তুফান ভাংগায় ডালি
দহাই মা বদর আলী
গাঙ্গের তুফান হয়ে যারে পানি
দোহাই মা কালী (৩বার)।

অন্যদিকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, আভিচারিক মন্ত্রের মধ্যে একটা ধ্বংসাত্মক দিক বিদ্যমান। এক অর্থে এই আভিচারিক মন্ত্রগুলোই অশুভকারক বা নেতিবাচক। আসলে একজনের শুভ বা হিতের জন্য আর একজনের অহিত বা অশুভ কিংবা ধ্বংস। তাই এর মধ্যে একপক্ষে যেমন নেতিবাচকতা থাকে, ঠিক অপরপক্ষে থাকে মঙ্গলজনকতা বা ইতিবাচক দিক। আমার হিত কামনার পক্ষে যে প্রতিবন্ধক, তার অহিত বা অশুভ কিংবা ধ্বংস সাধন করে আমার হিত সাধনের চেষ্টা। এ জাতীয় মন্ত্র ডাইনিবিদ্যা রূপেও প্রচলিত। এ জাতীয় একটি মন্ত্রের উদাহরণ, শক্তিশেল বাণ মন্ত্র—

ফুল তুলে মারি ফুলকুমারী
লক্ষ্মণের মারি বুকে।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল বাণ পড়ে গেল
অমুকের বুকে।
মার মার মার ফুল মার অমুকের ঘাড়ে
কার আজ্ঞে শ্মশানবাসী শিবের দোহাই
দোহাই মা কালীর আজ্ঞে। জয় মা।

প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক যে মন্ত্র, তার মধ্যে কিছুটা আভ্যুদায়িক মন্ত্রের ধর্ম বর্তমান। কারণ, এ জাতীয় মন্ত্রে কাউকে ক্ষতি না করে নিজের একটা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, তাগাবন্ধন মন্ত্র—

তাগা তাগা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর
তিন দেবতা লাগ তাগা মুই তাগ ধর।
শতকে ভারবিষ পান কর।
. . . .
তাগা বান্ধিলাম লোহার শিকল
হাড় না ফোটে মাস না টোটে
হেট ছেড়ে বিষ উপরে না- ওঠে
হেট ছেড়ে বিষ উপরে যাস
তোর অষ্ট দেবতার মাথা খাস।
কার আজ্ঞে-ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে।

নিরাময়মূলক মন্ত্রও আভ্যুদায়িক শ্রেণীতে পড়ে। সাধারণত কোন রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে এ জাতীয় মন্ত্র। যেমন, জলসারমন্ত্র, দীর্ঘদিন ধরে কোন ঘা বা ক্ষত না সারলে নিম-নিসিন্দির পাতা সিদ্ধ জল ক্ষতস্থানে ধারা ফেলে ধুয়ে দিতে দিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে —

শোড়া গাছের দুম দুমনী বিষের নাম পুত্ত
গাঁটি গাঁটুলী করিয়ে বেটা আসতে না দেয় ধেয়ে
গাঁট ভাঙ্গি গাঁট ভাঙ্গি ভাঙ্গি লোহার শিকল
চৌষট্টি গাঁটুলী ভেঙে বিষ তুই ঘা মুখেতে নিকল।
কোল বেটা গাড়ল ওঝা ভার করে রেখেছে
বাম-পার লাথি তুলে মারি তার গুরুশিরে।
আয় বিষ তুই শতকে গাঁটুলী ছিঁড়ে
নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে
নেই বিষ মা মনসা হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।

৯৮.১০.৫ মন্ত্রে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

'মন্ত্র' দেহ বাঙময় অর্থাৎ শব্দ দিয়ে গড়া। সেদিক থেকে মন্ত্র বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। 'মন্ত্র' কেবল বাক্‌কেন্দ্রিক নয়। এরসঙ্গে আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস-সংস্কার কেন্দ্রিকতা জড়িত। অর্থাৎ মন্ত্রের পিছনে

আছে বিশ্বাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট। মনে মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে, বা আদিম মানবগোষ্ঠী থেকে মানুষ যে ট্যাবু, টোটেম, ম্যাজিক ম্যানা, সর্বপ্রাণবাদ ইত্যাদি নানা সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আছে, তার উপর আস্থা না থাকলে মন্ত্রের কোন মূল্য থাকে না। শব্দ-ব্রহ্মা, কেবলমাত্র কতকগুলো প্রায় অসংলগ্ন, পারম্পর্যহীন শব্দের উচ্চারণে অনেক অসাধ্য সাধন হয়ে যেতে পারে না, যদি তার প্রতি অন্ধ কিংবা গভীর বিশ্বাস না থাকে। এদিক থেকে মন্ত্র বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে সংমিশ্রিত একটি রূপ। তেমনি মন্ত্রের একটি প্রয়োগের দিক থাকে। এদিকে মন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর। মন্ত্র শুধু উচ্চারণ করলে হয় না, তাতে সাফল্য পেতে গেলে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠানগুলো ঠিকঠিক পালন করতে হয়।

৯৮.১০.৬ মন্ত্রের সাহিত্যিক দিক

সবশেষে, মন্ত্র যদিও বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি এবং বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি লোকসাহিত্যের নামান্তর, সেই সূত্রে মন্ত্রকে লোকসাহিত্য হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে, লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যায় মন্ত্রের মধ্যে তেমন কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। মন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো দিক হল এর লোকসমাজ ঘনিষ্ঠতার। সামাজিক মানুষের কিছু মানসিক বিশ্বাস-সংস্কারকে, কামনা-বাসনাকে চরিতার্থতা দেওয়ার জন্য মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটানো হয়। এর সাহিত্যিক দিকের তেমন পরিচয় ঘটে না-কিছু মাত্র ছন্দ ও আলংকারিক দিক ব্যতীত। যেমন, একপদী, ত্রিপদী, পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিশিষ্ট মন্ত্র যেমন দেখা যায়, তেমনি গদ্যভাষায়ও মন্ত্র লক্ষিত হয়। লক্ষিত হয় হেঁয়ালী বা ধাঁধা জাতীয় মন্ত্রেরও। যেমন,

একপদী - ‘চিন্তকান্ত দন্ত কাঁচা আরে তু গিরা ছায়া।’

ত্রিপদী - মনসা মায়ের পতি মন্ত্র ঝাঁকে হরিমতি
ঘন ঘন দিয়া হুহুংকার।
হাত বুলাতে বিষমল রক্তের সঞ্চার হল
যত বিষ হয়ে গেল ছারখার।।

পয়ার - আদম গুরু প্যাকম্বর কা শিষ।
খোদার আজ্ঞায় নাই বিষ।।

হেঁয়ালী জাতীয় - উত্তরেতে মেঘ করেছে মেঘ চাইতে পানি হল।
যা যা ঘা চাইতে অমুকের অঙ্গের বিষ মল। ইত্যাদি।

৯৮.১০.৭ সারাংশ

বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম শব্দসমূহের মধ্যে ‘মন্ত্র’ শব্দটি অন্যতম। ঋক্‌বেদের এক-একটি শ্লোককে ঋক্ বলা হয়। ‘মন্ত্র’ শব্দটি এই ঋকের নামান্তর।

আদিম মানুষের মধ্যে জাদুবিশ্বাস থেকে মন্ত্রের উদ্ভব, বাংলা ও লোকভাষার মন্ত্রগুলোকে আনুষ্ঠানিক, আভ্যুদায়িক ও আভিচারিক এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই মন্ত্রগুলির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল দিব্যি, আজ্ঞা, দোহাই। উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে লৌকিক মন্ত্রকে মঙ্গলজনক, ডাইনিবিদ্যা, আত্মরক্ষামূলক এবং নিরাময়মূলক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

তবে লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের মতো মন্ত্রে কোনো সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যায় না।

অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন —

(ক) 'মন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন।

(খ) আনুষ্ঠানিক মন্ত্র কাকে বলে?

(গ) আভ্যুদায়িক মন্ত্র কাকে বলে?

(ঘ) আভিচারিক মন্ত্র কাকে বলে?

(ঙ) মন্ত্রের দেব-দেবী সাধারণত কারা?

২। নিম্নের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন —

(ক) মন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) উদ্দেশ্যের দিক থেকে মন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করে তার পরিচয় দিন।

(গ) আনুষ্ঠানিক মন্ত্রের পরিচয় দিন।

(ঘ) আভ্যুদয়িক মন্ত্রের পরিচয় দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য দেখান।

(ঙ) আভিচারিক মন্ত্রের পরিচয় দিন।

(চ) মন্ত্রের মধ্যেকার বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ছ) মন্ত্রের সাহিত্যিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলার লোকসাহিত্য (১-৬) — আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলার লোকসংস্কৃতি — আশুতোষ ভট্টাচার্য

৩। লোকসাহিত্য — আশরাফ সিদ্দিকী

৪। লোকসাহিত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর — আশুতোষ ভট্টাচার্য

৬। বাংলা প্রবাদ — সুশীল কুমার দে

৭। শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত — নির্মলেন্দু ভৌমিক ও গুরুসদয় দত্ত
৮। বাংলার ছড়ার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক
৯। বাংলা ধাঁধার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক
১০। বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয় — শীলা বসাক
১১। ময়মনসিংহ গীতিকা — দীনেশ চন্দ্র সেন
১২। পূর্ববঙ্গ গীতিকা — দীনেশ চন্দ্র সেন
১৩। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা — গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
১৪। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ‘মন্ত্র’ সংখ্যা — সম্পাদক-সনৎকুমার মিত্র

একক ৯৯ ❒ বাংলার ব্রত — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন ঃ

৯৯.১ উদ্দেশ্য

৯৯.২ প্রস্তাবনা

৯৯.৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত

৯৯.৪ ব্রত কী

৯৯.৫ ব্রতের শ্রেণীবিন্যাস ও তার পরিচয়

৯৯.৬ বাংলা ব্রতের বৈশিষ্ট্য

৯৯.৭ বিভিন্ন বাংলা ব্রতের পরিচয়

৯৯.৮ ব্রতে বিধৃত সমাজ-ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের পরিচয়

৯৯.৯ ব্রতে ও ব্রতের ছড়ায় নাট্য লক্ষণ

৯৯.১০ ব্রতের আলপনা

৯৯.১১ সারাংশ

৯৯.১২ অনুশীলনী

৯৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৯৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি ঠাকুরবাড়ির আর এক কৃতি সন্তান, বিখ্যাত চিত্রকর ও শিশু-সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গসংস্কৃতি প্রীতির এক অনালোচিত অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন। জানতে পারবেন লোকায়ত বাংলার এক বিস্মৃত-প্রায় অধ্যায়-ব্রত, আলপনা-সম্পর্কে সম্যক পরিচয়। ব্রত ও সেই সংশ্লিষ্ট আলপনা-বাঙালি নারীর এক আপনজগৎ। সেই জগৎ সম্পর্কিত একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে এই এককটি পাঠ করে। মোটকথা, বর্তমান এককটির উদ্দেশ্য—

- আপনাকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান করা।
- বঙ্গ সমাজের নারীকেন্দ্রিক লোকায়ত ধারার অন্তর্গত ব্রত সম্পর্কে আপনাকে পরিচিত করা।
- ব্রতের উদ্ভব ও তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আপনার সম্যক ধারণা তৈরি করে দেওয়া।
- শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত ব্রতের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় দান করা।
- বাংলার বিভিন্ন লোকায়ত ব্রতের পরিচয় দান করা।
- ব্রতের সমাজ-ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে আপনাকে ওয়াকিবহাল করা।

- ব্রত সংশ্লিষ্ট আলপনা সম্পর্কে পরিচিত করা।
- ব্রতের বর্তমান সমস্যা ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান করা।

৯৯.২ প্রস্তাবনা

ব্রতকথা বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য, কিন্তু শুধু ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ। বাংলা ব্রত বাঙালি নারীর এক নিজস্ব জগৎ। নারীর সাংসারিক ও ব্যক্তিক সুখ কামনা এই ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেবতার কাছে জানানো হয়। বাঙালি নারী তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার কামনা-বাসনা আলপনা এঁকে, ব্রত পালন করে সংশ্লিষ্ট দেবার কাছে জানায়। তার ব্যক্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ধরা পড়ে যায় সমাজ-ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব-নৃতত্ত্বের নানান দিক। আলোচ্য এককে এ সকল দিককে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

ব্রতের এই পর্যালোচনা অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হবে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। আর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ। দেশ যখন ব্রিটিশের অধীন, তখন দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটাতে তাদের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রকাশ প্রবর্তিত হয়ে গেছিল। তখন সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুসদয় দত্ত, সুশীল কুমার দে—প্রমুখের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। 'বাংলার ব্রত' এই রকম দেশীয় ঐতিহ্য ও লোকায়ত সংস্কৃতি সংরক্ষণের চেষ্টার অন্যতম ফসল।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যরচনায় শব্দ দিয়ে আঁকতেন ছবি। তাঁর শিল্পীসত্তার আড়ালে ছিল এক শিশুহৃদয়, শিশু-মন, যার উপর নির্ভর করে তিনি বেশ কিছু শিশু সাহিত্য রচনা করেছিলেন। এসব কিছুর সাথে সাথে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পর্যালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ প্রীতি তো ছিলই। এ সবকিছুরই মেলবন্ধন ঘটে গেছে 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে। স্বদেশানুরাগের বশে 'বাংলার ব্রত' লিখিত হলেও দক্ষ সমাজতাত্ত্বিকের মতো তিনি ব্রতের উদ্ভব, তার শ্রেণীবিভাগ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা, স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতিও যেমন তিনি আরোপ করেছেন, তেমনি পরিস্থিতি অনুযায়ী সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি। ব্রত হল নারী মনস্তত্ত্বের প্রকাশের আনুষ্ঠানিক দিক, আর আলপনা তার চিত্ররূপ। আলোচ্য গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের আলপনার কথাও চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে ও দক্ষতায় আলোচনা করেছেন। বর্তমান এককটি বাংলার ব্রতের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথের এই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সম্যক ধারণা গড়ে দেবে।

৯৯.৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত

বাংলার যে কটি পরিবারকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ বিশ্বসভায়ও গর্ব করতে পারে, তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অন্যতম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কেবল রবীন্দ্রগর্বেই ভারতবর্ষ গর্বিত নয়। এ পরিবারের একাধিক সদস্য বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অন্যতম।

সাধারণের কাছে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে পরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম হয় ৭ই আগস্ট, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যু ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় চিত্রশিল্পীরূপে। ভারতীয় ঘরানার এক অনন্য চিত্রশিল্পী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর বিখ্যাত 'ভারতমাতা'র চিত্র একসময় পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতার মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠেছিল, ভারতমাতার ছবি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে। 'ভারতমাতা' ছাড়া তাঁর আঁকা বহু চিত্র, সাজাহানের অন্তিম শয্যা প্রভৃতি চিত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন। অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রকরই ছিলেন না, বহুচিত্রকরের স্রষ্টা ছিলেন তিনি। কেবল চিত্র রচনা করে, চিত্রকর তৈরি করে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা থেমে থাকে নি, এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতশিল্প'-এ তাঁর শিল্প সম্পর্কিত মতামত ও অভিমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কেবল রং তুলির শিল্পী ছিলেন না অবনীন্দ্রনাথ; ফেলে দেওয়া নানা জিনিয়ের টুকরো, গাছের শিকড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কাটুম-কুটুম অবনীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। শিল্পের উপর অসাধারণ গ্রন্থ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'।

চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথের আর একটি সত্তা ছিল সাহিত্যিকের। তবে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিকসত্তা মুখ্যত শিশুমুখী। তাঁর বিখ্যাত রচনা রাজকাহিনী, ক্ষীরের পুতুল, নালক, বুড়ো আংলা। এক্ষেত্রেও অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী, তবে এখানে রং তুলি নয়, কথার অপূর্ব জাদু ও বর্ণনার সুনিপুণ দক্ষতায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে তাঁর রচনা। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ছিল অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ। শুধু সাহিত্য নয়, স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ছিল তাঁর গভীর অনুরক্তি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেমই তাঁকে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ও অনুরাগী করে তোলে। এর ফলে স্বদেশীয় লোক সংস্কৃতির ভাণ্ডারটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আর সে সম্পর্কে তাঁর যথার্থ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের মধ্যে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কলাবিভাগের অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বিশ্বভারতীর আচার্য হয়েছিলেন অবনীঠাকুর। তারপর ১৯৫১-র ৫ই ডিসেম্বর অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

৯৯.৪ ।। ব্রত কী ।।

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ এই বাংলাদেশ। এমন মাস খুবই কমই আছে এই বাংলায়, যার কোন না কোনমাসে কোন ব্রতের অনুষ্ঠান হয় না। মূলত নারীর কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত। অর্থাৎ কোন কিছুর কামনা প্রার্থনায় নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তা-ই হল ব্রত। অবনীন্দ্রনাথের মতে, 'কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।' 'বৃ' ধাতু থেকে ব্রত শব্দের উৎপত্তি। ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। যে ব্রত পালন করে সে ব্রতী। সাধারণত কোনকিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে (ক্ষেত্র বিশেষ আলপনা দিয়ে) কোন বিশেষ আচার পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে ব্রত বলা হয়। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ব্রত বলতে কি বোঝায়, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে সরাসরি ব্রতের শ্রেণী-বিভাগ দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করেছেন।

৯৯.৫ ।। ব্রতের শ্রেণী বিভাগ ও তার পরিচয়।।

আমাদের দেশে চলিত ব্রতের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের শুরু। লেখক প্রথমে প্রচলিত ব্রতের প্রধান দুটি ভাগের কথা উল্লেখ করেছেন—শাস্ত্রীয় ব্রত এবং যোষিদপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত। আর মেয়েলি ব্রত বলে প্রচলিত ব্রতকে তিনি আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—কুমারী ব্রত এবং নারীব্রত। মূলত পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের অবিবাহিতা কুমারী মেয়েরা যে ব্রতগুলো পালন করে, তাকে তিনি কুমারী ব্রত বলে উল্লেখ করেছেন, আর তদূর্ধ্বে বড়ো বয়সের মেয়েরা বিয়ের পর যে ব্রতগুলো পালন করে, তাদের তিনি নারী ব্রত বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের ব্রতের শ্রেণীবিন্যাসকরণ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলার ব্রতের কথা বলতে গিয়ে তিনি মেয়েলিব্রতের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করবেন বা সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাবেন। কিন্তু লোকায়ত এই ব্রত-পরিচয়ের পাশাপাশি লেখক সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রীয় ব্রতকে একেবারে এড়িয়ে যাবেন না। লেখক এড়িয়ে যান নি। বরঞ্চ দুই শ্রেণীর ব্রতের মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনার মধ্যে দিয়ে দুই শ্রেণীর ব্রতেরই সম্যক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

লেখক অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের শ্রেণীবিভাগ তাঁর নিজের মতো করেই করেছেন।

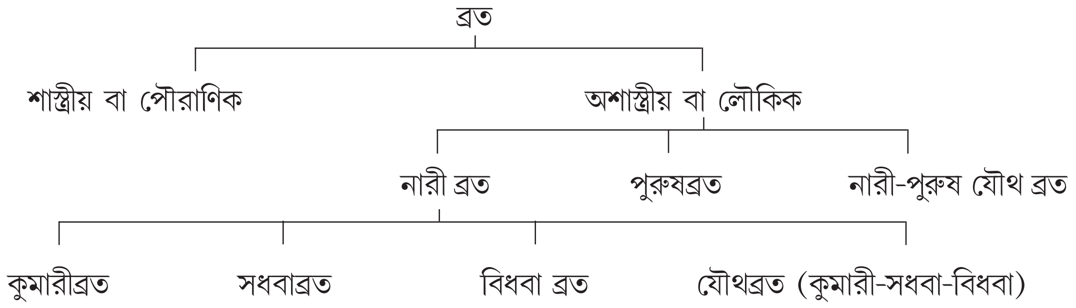

— ব্রতের শ্রেণীবিভাগের এই বিস্তারের দিকে না গিয়ে লেখক মূলত শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি কিংবা নারী ব্রতেরও কুমারী ব্রতের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে ব্রত উৎপত্তির কারণ, তার বিষয়বস্তু, তার মধ্যেকার সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তার আলপনা নিয়েই আলোচনা করেছেন। এবং একটি বিষয় লক্ষণীয় লেখক তাঁর গ্রন্থে আলোচনাকে আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট কোন অধ্যায় ভাগ করে করেননি। একটানা আলোচনা করেছেন। মনে হয় যেন এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কথাগুলো তিনি বলে গেছেন। অতিরিক্ত অধ্যায় বিন্যাসে লেখার বিষয়কে পাঠকের মনের উপর বোঝা করে দিতে চাননি তিনি। মুখ্য বিষয়টাকে একটানা বলে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

শুরুতেই লেখক শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী ব্রত ও কুমারী ব্রতের গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন উদাহরণসহ। এ পর্বে প্রথমেই এসেছে শাস্ত্রীয় ব্রত। শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রতের উপাদান বা গঠন সামান্যকাণ্ড ও ব্রতকথা এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল। এ জাতীয় ব্রত মূলত একটা গতানুগতিক পদ্ধতি নির্ভর। এবং সকল শাস্ত্রীয় ব্রতে সেই পদ্ধতি পালনীয় বিশেষ করে তার সামান্যকাণ্ড অংশটুকু। সামান্যকাণ্ড হলো কতকগুলো পালনীয় আচার-যেমন —আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যর্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি

মাতৃকান্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপন। এরপর ভুজ্জি-উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করে ব্রতকথা শ্রবণ। এই হলো শাস্ত্রীয় ব্রতের ব্যাপার। কেবল নিয়মের বাহার।

অন্যদিকে নারীব্রত কিছুটা শাস্ত্রীয় ব্রত ও কিছুটা মেয়েলি ব্রতের মেলবন্ধন। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় ব্রতের যুগলমূর্তি হল নারী ব্রত। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে ও লৌকিক ব্রতের সরলতা প্রায় নষ্ট হয়ে পূজারি ব্রাহ্মণ ও সামান্যকাণ্ডের জটিল আনুষ্ঠানিকতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

একমাত্র কুমারী ব্রত-ই শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাঁধন এড়িয়ে অনেকখানি আপন অকৃত্রিমতায় অক্ষত রেখেছে নিজেকে। ব্রতের গঠন অনেকটা এই রকম— আহরণ, আচরণ, কামনা জ্ঞাপন, ব্রত কথা শ্রবণ। আহরণ হলো— ব্রতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ হলো— কামনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি; কামনাজ্ঞাপন পর্যায়ে কামনার কথা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা এবং সব শেষে ব্রত কথা থাকলে তা শোনা, না হলে ফুল ধরে শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ করা। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা তন্ত্রমন্ত্রের কোন ভূমিকাই এখানে নেই।

তিন প্রকার ব্রতের পারস্পরিক গঠন আলোচনায় একটা বিষয় লেখকের মতে স্পষ্ট যে, 'এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোকসাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়।' যজুঃ এবং সামবেদের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রতগুলোতে থাকলেও বৈদিকক্রিয়ার সঙ্গে এগুলোর কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের মতো প্রভেদ। সে তুলনায় 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ স্পষ্ট। এবং এ সূত্রে মেয়েলি ব্রতের সঙ্গে বেদের সূক্তের একটা মিল লক্ষিত। কারণ, বেদের সূক্তগুলোতে সমগ্র আর্যজাতির চিন্তা, তার উদ্যম-সৎসাহ ফুটে উঠতে দেখা যায়। এভাবে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক দেখানোর চেষ্টা করেছেন 'এ দুয়েরই মধ্যে লোকের আশা-আশঙ্কা, চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী, সূর্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলি ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে।'

শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রত ঃ

শাস্ত্রীয় ব্রত ভারতে আর্যদের অনুষ্ঠান, পুরাণ ভেঙে এই ব্রতের উদ্ভব, আচার-নিয়মের নিষ্ঠা ও ব্রতের মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে মেয়েলি ব্রত ভারতের নিবাসীদের অনুষ্ঠান, বৈদিক সূক্তের সঙ্গে মেয়েলি ব্রতের মিল লক্ষিত হলেও, মেয়েলি ব্রতের উদ্ভব বৈদিকসূক্ত নয়, এর মধ্যে একটা জাতির প্রাণের কথা, একটা স্বপ্ন যেন মূর্তরূপ পেতে চায়। বেদ, পুরাণের চেয়েও পুরানো এই সব লৌকিক ব্রত অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় ব্রত পুরুষতান্ত্রিক আর্য সভ্যতার অবদান, আর মেয়েলিব্রত মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সমাজের সৃষ্টি-আর্য-পূর্ব সমাজে এর উদ্ভব। বৈদিক সূক্তের সঙ্গে মেয়েলি ব্রতের চাওয়া-পাওয়া কামনায় মিল থাকলেও বৈদিক অনুষ্ঠান মূলত পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের। বৈদিক ঋষিরা যেখানে চাচ্ছেন — ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; আর বাঙালি মেয়েরা চাইছে— 'রণে রণে ত্রয়ো হব, পনে জনে সূয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' শাস্ত্রীয় ব্রত কিংবা বৈদিক সূক্তগুলো বহির্মুখী, আর মেয়েলি ব্রতগুলো আমাদের অন্তঃ

পুরচারী নারীদের মতো, অন্তর্মুখী। লেখক অবনীন্দ্রনাথ আলোচনাসূত্রে এ দুই বিষয়কে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'দুজনেই পৃথিবীর কিন্তু বেদ মূক্তনগুলি ছাড়াও স্বাধীন, ধানের সবুজের ওপর নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান; আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি-কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।'

অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার দিক থেকেও মেয়েলি ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। শাস্ত্রীয় ব্রতের প্রায় সবগুলিতে, যে কামনা করেই ব্রত হোক-না, কামনা চরিতার্থ করবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, ... পুত্রপৌত্র কামনা, তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র, যে ক্রিয়া, অন্য কিছু কামনা করেও সেইসব ক্রিয়া; ... সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্দুকের একই চাবি!' শাস্ত্রীয় ব্রত এদিক থেকে একমুখী, গতানুগতিক কিংবা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি মাত্র। অন্যদিকে মেয়েলিব্রত এই রকমারি রূপের প্রধান কারণ, এগুলো লোকসমাজের সম্পদ। লোকসমাজে কোনকিছুর নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। লোকগীতি প্রচলিত সুরে যে কেউ গাইতে পারেন এবং সেখানে ব্যক্তিভেদে সুরের বৈষম্য আসতেই পারে। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতে সুরের কোন রকমফের চলে না। কারণ তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রতের মধ্যেকার সম্পর্কটা অনেকটা সে রকম। লেখক মনে করেন, 'ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, ... ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি।' এই উৎপত্তির পিছনে অর্থাৎ মেয়েলি বা খাঁটি ব্রতের উৎপত্তির পিছনে গণমানসের একটা ভূমিকা থেকে গেছে, লোকসংস্কৃতির যেকোন সৃষ্টিতেই তাই থাকে। ফলে, মেয়েলি ব্রতের নিয়ম-কানুন বা আচার-অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতি কামনাভেদে পৃথক। শুধু কামনা ভেদেই পৃথক নয়, একই ব্রতের নিয়ম-কানুন অঞ্চল ভেদে আবার ভিন্ন হতে পারে, তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কারণ, লোকসাহিত্যের অঞ্চল পার্থক্যে পাঠান্তর থাকতেই পারে। ব্রতের ক্ষেত্রেও সে নিয়ম প্রযোজ্য। আর ব্রত, বিশেষত মেয়েলিব্রত একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার অনুষ্ঠান নয়। ব্রতের মূলে কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যদিও আবশ্যক, তবু ব্রতে একক মানুষের কামনা ধরা পড়ে না। ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠছে।' তবে এক্ষেত্রে লেখক একের সঙ্গে কেন যে দশজনে মিলছে, কিংবা একের অনুকরণ কেন যে দশজন করছে, সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে ব্রত ও উপাসনার পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে ব্রতের পিছনে দশজনের ভূমিকার দিকটি স্পষ্ট করে দিলেন — 'একজনকে নিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতা উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া-কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর-একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত-কামনার সফলতাই তার শেষ শাস্ত্রীয় ব্রত আনুষ্ঠানিক, মন্ত্র ও পূজারি নির্ভর, অন্য দিকে মেয়েলিব্রত কামনা-বাসনাপূর্ণ, মন্ত্রহীন, তার সঙ্গ প্রকৃতির একাত্মতা। মেয়েলি ব্রতে প্রকৃতি-নির্ভরতা অনেক সময় তাকে ব্রত ভাবতে সন্দেহ জাগায়। 'প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্যরকম সৌন্দর্যে রসে শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বলব কি ষড়ঋতুর এক-একটি উৎসব বলা ঠিক করা শক্ত।

ব্রতের উদ্ভব

কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্যসম্পাদনই ব্রত। অর্থাৎ ব্রতের মধ্যে সর্বদাই কামনা-বাসনা পূরণের একটা প্রচেষ্টা থাকে। মানুষ আজীবন তার নানা কামনার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এই কামনা-বাসনা চরিতার্থতা সাধনের মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন ব্রতের উদ্ভবের ইতিহাস। অবনীন্দ্রনাথ সমাজতাত্ত্বিক এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবরোহী পদ্ধতিতে অর্থাৎ সামান্য থেকে বিশেষে পৌঁছানোর সূত্র ধরে ব্রতের উদ্ভবের মধ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন। কামনা-বাসনা চরিতার্থতার বৃহত্তর দিকের সমান্তরালে লোকায়ত যে রূপ, তার মধ্যে দিয়েই মেয়েলি ব্রতের উদ্ভব। 'নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা-অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্যকামনায়-এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কী আর্য কী অন্য ব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।'

ব্রতের উদ্ভবের পিছনে আমাদের ভুল ধারণার নিরসন করে লেখক বলছেন, ''আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বেকার পুরুষদের— তখনকার, যখন শাস্ত্র হয়নি। হিন্দু ধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান, যেগুলির নাম ব্রত। সমাজবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নয়। কিছুটা এক ঢালাই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের উৎপত্তির কথাই মেনেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকেও অস্বীকার করেননি। ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিদেশী শক্তি এসে বাস করেছে, আক্রমণ করেছে, জয় করেছে, লুণ্ঠন করেছে, কেউ চলে গেছে, কেউ মিশে গেছে এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে। এমনিভাবে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত আর্যরা এদেশে এসে যাদের দেখা পেলেন, তাদের তাঁরা ডাকলেন 'অন্য ব্রত' নামে। এই আর্যরা এদেশে আসার আগে 'এদেশে দলে দলে এই সব 'অন্য ব্রত'— ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়ভরসা হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল।' এই আর্য ও অনার্য বা অন্যব্রতদের মধ্যে ঘটল ভাব-ভাবনা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান। 'পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাস; ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেই সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন-পুরষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি।' এই নিজেদের ঘরের মধ্যে থাকার অর্থ নিজস্বতায় স্থির থাকা। উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের গঙ্গামৃত্তিকা, তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায় অন্যব্রতদের এই-সব ব্রত— একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে। এইভাবে আর্য-পূর্ব 'অন্যব্রত'দের পালিত পূজা বা ব্রত পার্বণ থেকেই মেয়েলি ব্রতের উদ্ভব।

৯৯.৬ বাংলা ব্রতের বৈশিষ্ট্য

ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। সাধারণত কোন কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচার পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়।

- ব্রত একক ক্রিয়া অনুষ্ঠান নয়, একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ব্রতের অনুষ্ঠান।
- ব্রতের মধ্যে সর্বদা একটা কামনা প্রকাশিত হয়। কামনা বাসনার বাস্তব রূপায়ণের জন্যই ব্রতের আয়োজন।
- বাংলা ব্রত বা বাংলার মেয়েলি ব্রতের কতকগুলো পর্যায় থাকে, আহরণ, আচরণ, কামনাজ্ঞাপন, ব্রতকথা শ্রবণ ইত্যাদি।
- আহরণ অর্থে, ব্রতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা। অর্থাৎ উপকরণ সংগ্রহ। ব্রতের উপকরণকে উপাচারও বলে। সাধারণত ব্রতের উপকরণ বা উপাচারের মধ্যে পড়ে— ঘট, আম্রপল্লব, ফুল, দুর্বা, ধান, প্রদীপ, তুলসী, বেলপাতা, সিদ্ধি, হরিতকি, তিল, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, সশীষ ডাব, পঞ্চশস্য, পান, সুপারি, চাল, চালের গুঁড়ো, ধানের শীষ বা ছড়া, কুলো, সিঁদুর, পিটুলি, পাকাকলা, ধুতি বা শাড়ী, গামছা, ধুপ-ধূনা, ঘটি, সরা, থালা, মধুপর্কের বাটি, তামার টাট, গঙ্গাজল, আসন, পিঁড়ি, পুষ্পমালা, চাঁদমালা, ফলফুলের নৈবেদ্য, যজ্ঞকাঠি, পাঠকাঠি, চন্দনকাঠ, বালি, দক্ষিণা ইত্যাদি। এর মধ্যে ধানের শীষ, পিটুলি, সরা, পিঁড়ি, ঘট, প্রদীপ, আম্রপল্লব ইত্যাদি হল ব্রতের শিল্পকলার বা মঙ্গল কামনার উপকরণ। বাংলার ব্রতের উপকরণগুলি এদেশীয় আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সংস্কৃতির এক চলমান চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে। ব্রতের শুরুতে এইসব উপকরণ উপচার সংগ্রহকে আহরণ বলে।
- আহরণের পরের পর্ব আচরণ, আচরণ হল ব্রতের পালিত নিয়মবিধি। যে ব্রত পালন করে সেই হল ব্রতী। ব্রতী বা ব্রতিনীকে আহরণ কর্মের পাশাপাশি ব্রতের আচরণের প্রস্তুতি নিতে হয়। ব্রতী বা ব্রতিনী স্নান করে শুচিবস্ত্রে উপবাসী থেকে ব্রত পালন করে। ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে নারীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সুপ্ত-কামনা-বাসনা বা কল্পনা এবং একাগ্রতার প্রকাশ ঘটে। মূল কথা হল এই যে, প্রাতঃস্নান, উপবাসী থাকা, ব্রতাচার পালন, আলপনা দেওয়া, পুকুর কাটা, ছড়া বলা, ব্রত কথা বলা বা শোনা ইত্যাদি হল ব্রতের আচরণীয় নিয়ম। আচরণ পর্বের মধ্যে দিয়ে ব্রতীর নিয়ম-নিষ্ঠা বা সংযমের প্রকাশ ঘটে।
- আচরণপর্বের অন্যতম প্রধান আচার আলপনা দেওয়া। আলপনায় ব্রতীর কামনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। আলপনার অলংকরণের এক একটা চিত্রে যেমন আর্থ-সামাজিক দিকটি স্পষ্ট হয়, তেমনি এক একটা চিত্রে ব্রতীর কামনার নানা রূপ ধরা পড়ে।
- শুধু আলপনা নয়, আচরণ পর্বে পুকুর কাটা ও ফুল ধরা প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠানও সংঘটিত হয়। কামনাজ্ঞাপন ব্রতের মূল অংশ বলা যায়। আলপনাগুলো কামনার প্রতিচ্ছবি। সেই প্রতিচ্ছবিগুলোতে এক একটা ফুল ধরে এক একরকম কামনা জানানো হয়। কামনাগুলোর বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে ছড়ার মধ্যে। কাম্য আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি স্বরূপ আঁকা ছবিগুলোতে এক এক করে ফুল দিয়ে সুপ্ত কামনার বাহ্য প্রকাশ ঘটানো হয় ছড়ার মধ্যে দিয়ে। এক একটা আলপনাতে ফুল দেওয়ার পর আলপনার অন্য ছবিতে ফুল দিয়ে কামনাজ্ঞাপক ছড়া উচ্চারণ করা হয়। ফুল দেওয়া ব্যাপারটি অনেকটা বাজারের ফর্দে টিক দেওয়ার মতো। অর্থাৎ কোন আলপনাতে কামনা জানানো হয়ে গেছে তার চিহ্ন থেকে যায় ওই ফুলের মধ্যে।

- ব্রতের শেষ পর্ব হলো ব্রতকথা শোন। গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। ব্রতকথার মধ্যে এই গল্প শোনার আগ্রহ প্রকাশ পেলেও, ব্রতকথা শোনা ও বলার মধ্যে দিয়ে ব্রতের প্রচার, ব্রতীর মঙ্গল বা সকলের মঙ্গলের দিকটি ধরা থাকে। এ পর্বটি অনেকটা কাজকর্ম (ব্রত পালন) শেষে সবাই বসে একসঙ্গে গল্প করার মতো। সম-আকাঙ্খী মানুষগুলো পরস্পর মিলিত হওয়ার পর্ব এটি। এরপরই উপবাস ভেঙে পারনা করার পর্ব। ব্রতকথা শোনার পর্বটির সঙ্গে কামনার যোগাযোগ কিংবা অনুষ্ঠানের যোগাযোগ ততটা নেই। কেননা, কোনো ব্রতে কথা আছে কোনো ব্রতে নেই। 'এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে গল্পগুজব করা-গ্রামের পাঁচজনে মিলে।' ব্রতের এই কথা ও ছড়া অংশটি বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ, আলপনা অংশটি অঙ্কনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ, আর আচরণ অংশটি আচার-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অংশ আর সমগ্র ব্রতের মধ্যে থাকে যে গভীর বিশ্বাস, তা বিশ্বাস-সংস্কারের অংশ।

- ব্রত যদিও কামনা-বাসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া তবু ব্রতের মধ্যে কবিতা, চিত্র, উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডনশিল্প ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়। ব্রতের ছড়াগুলো সব এক রকম নয়; কোথাও সে গুলো সাধারণ ছড়া, কোথাও বা সেগুলো সংলাপধর্মী। নাটকের মতো পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্কভেদে সাজানো।

- ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, গীতকলা, উপন্যাস, উপাখ্যান সবই বর্তমান।

- ব্রতের মধ্যে কেবল পুরাকালের ছবি নয়, বাংলা ব্রতে বাঙালির সমাজ জীবনের বহুমুখী চিত্র ধরা পড়ে। ব্রতের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব এদিক থেকে ব্রতের ছড়ার মধ্যে ব্যক্তি মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সমাজ-মানসিকতা।

- 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পুজো নয়; এর মধ্য ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদি মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষ ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।' লেখক অবনীন্দ্রনাথের মতে, এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে।

- খাঁটি ব্রতের লক্ষণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন, 'খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই'।

- এছাড়া 'ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার।

৯৯.৭ ।। বাংলা ব্রতের পরিচয়।।

বাংলা ব্রত মূলত নারীব্রত বা মেয়েলি ব্রত। বাঙালি নারীরা (কখন কখন পুরুষও ব্রতী হয়) সারা বছর ধরে পালন করে থাকেন বিভিন্ন পাল-পার্বণ, ব্রত, আচার-অনুষ্ঠান। 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ মুখ্যত বাংলার মেয়েলি ব্রতের কথাই এনেছেন। যাইহোক, ব্রতের মধ্যে নারীমনের কামনার প্রকাশ ঘটে। মেয়েরা চায় ঘর সংসার, স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন বা পরিপূর্ণ সংসার। এক কথায় সামাজিক জীবন। মেয়েলি ব্রতের মধ্যে বাঙালি নারীর সামাজিক এই আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার প্রকাশ ঘটে। নারী চায় তার কামনা বাসনার চরিতার্থতা ঘটাতে, ফলে সারা বছর ধরে সে পালন করে নানা ব্রত। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি ব্রত হল 'ভাদুলি'।

।। ভাদুলি ব্রত ।।

ভাদুলি ব্রত পালিত হয় ভাদ্র মাসে। বৃষ্টি বা বর্ষার পরে আত্মীয়-স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জলপথে, স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় বাঙালি নারী এই ব্রত পালন করে থাকে। ভাদুলির মূর্তি, জোড়াছত্র মাথায় এঁকে, জোড়া নৌকা এঁকে, এরপর আলপনার মধ্যে নদী, সমুদ্র, কাঁটা-বন, হিংস্রজন্তু, নৌকো ইত্যাদি এঁকে ব্রত পালন করা হয়। ব্রতী এক একটি আলপনার চিত্রে এক একটি কামনার বস্তুতে ফুল ধরে ব্রতের ছড়া বলতে থাকে। যেমন—

নদী নদী কোথা যাও?
বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।
নদী নদী কোথা যাও?
সোয়ামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।

—এইভাবে ব্রতী আলপনার ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে ফুল ধরে এক এক রকম ছড়া বলে ব্রত সাঙ্গ করে। জল যাত্রী স্বামী, শ্বশুর, পিতা বা ভাই বা কোন নিকট আত্মীয় প্রবাসে থাকার ফলে নারী মনে যে যন্ত্রণা বা কামনা-বাসনা তা এই ব্রতের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রতটির সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি হল, বাঙালি যে ঘরকুনো জাতি ছিল না, তার কিছুটা প্রমাণ এরমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

।। বসুধারা ব্রত ।।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত পালিত হয় বৃষ্টির কামনায়। আলপনা হিসেবে এই ব্রতে আঁকা হয় ৮টি তারা তারপর জলভর্তি একটি মাটির ঘটকে ফুটো করে বৃষ্টি অনুকরণে তুলসী কিংবা বট বা পাকুড় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে জল পড়তে থাকে। এরপর নারীরা ছড়া বলতে থাকে ঃ

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুজী,
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

ব্রতটির সঙ্গে আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে পালিত বৃষ্টি কামনায় পালিত ব্রতটির সাদৃশ্যের কথা 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লেখক অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। উভয় দেশীয় সমউদ্দেশ্যমূলক ব্রতটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও উভয়ের মধ্যে কিন্তু একই রকম জাদু বিশ্বাস ক্রিয়াশীল।

।। আদর সিংহাসন ব্রত ।।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস ধরে এই ব্রত সধবা নারীরা পালন করে। এই ব্রত পালন করতে হয় চার বছর। প্রথম বছর উক্ত সময়ের প্রত্যেকদিন সকালে একজন এয়ো ও একজন ব্রাহ্মণকে নানারকম দ্রব্য ও দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করানো হয়। দ্বিতীয় বছরে যত্ন করা এয়ো ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা দাঁড়ায় দু'জন করে, তৃতীয় বছরে তিনজন করে, চতুর্থ বছরে তা চারজন করে এয়ো ও ব্রাহ্মণকে যত্ন ও আদর করা হয়। ব্রতী উক্ত এয়ো নারী। নারীদেরকে গন্ধ তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে, সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে, পা ধুইয়ে দিয়ে, পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়ে, লাল পাড় শাড়ি পরিয়ে সিঁদুর, আলতা, আয়না কিছু পয়সা দিয়ে তাকে ভোজন করায়। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণদেরকেও ধুতি, চাদর, ছাতি, খড়ম দান করে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে যত্ন সহকারে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দেয়। সুখ-সৌভাগ্যলাভের সঙ্গে সকলের আদর লাভ করা এই ব্রতে ব্রতীর লক্ষ্য বা কামনা।

এই ব্রতের সাদৃশ্যসূচক মধুসংক্রান্তি, মিষ্ট সংক্রান্তি ইত্যাদি ব্রতও পালিত হয় — সেখানে উদ্দেশ্য, নিজের কথা মিষ্ট হবে এ বং শাশুড়ি-ননদের বাক্যযন্ত্রণা সইতে হবে না।

ব্রতের পরিচয় প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, আমাদের আলোচ্য 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে লেখক অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের মাসভিত্তিক বা জেলাভিত্তিক পরিচয় দেওয়ার জন্য এ গ্রন্থ লেখেননি। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রত বিশেষত বাংলার মেয়েলিব্রতকে কেন্দ্র করে সমাজ-মানসের পরিচয় দেওয়া, আর্য-অনার্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করা, সমাজ-সমালোচনা করা, ব্রতের মধ্যে ধৃত চিত্র, সঙ্গীত, নাট্য লক্ষণের পরিচয় দেওয়া। তাই তিনি একটা একটা করে বাংলায় প্রচলিত ব্রতগুলোর ধারাবাহিক পরিচয় দিয়ে যাননি। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ কিছু বাংলা ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন। তাই এই আলোচনায় সকল বাংলা ব্রতের পরিচয় তুলে ধরাও আমাদের লক্ষ্য নয়। এ পর্যায়ে আপনারা বাছাই করা কিছু ব্রতেরই পরিচয় পাবেন।

।। লক্ষ্মীব্রত ।।

বাংলার অন্যতম ব্যাপক ও বৃহৎ ব্রত হল এই লক্ষ্মী ব্রত। আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হৈমান্তিক শস্য ঘরে আসবে, তখনকার ব্রত এটি। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী পূজা, সারাদিন উপবাসী থেকে নারীরা আলপনায় নানান লতা-পাতা, পথ এঁকে ঘর সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মী পূজার আলপনার প্রধান অঙ্গ হল লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানের ছড়া। লক্ষ্মী হলেন ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী। বাঙালি নারীরা ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের কামনায় এই ব্রত পালন করে।

বড়ো ঘরে, যেখানে ধানচাল, জিনিসপত্র রাখা হয়, সেই ঘরের মাঝের খুঁটির—মধুম খামের গোড়ায় নানা আলপনা-দেওয়া চৌকি পাতা হয়। আলপনায় নানা অলঙ্কার, এবং চৌকিতে, লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না লিখে কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিংবা পদ্মের উপরে পা এমনি নানারকম চিত্র দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী

নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটি লতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড়-ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁদুরের কৌটা এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ রচনার পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীসরার ঊর্ধ্বে আধখানা নারিকেল মালই—মেয়েরা এই মালইকে কুবেরের মাথা বা মাথার খুলি বলে। লক্ষ্মীপূজা বাংলার আপামর সকল শ্রেণীর মধ্যে পালিত হয়। লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীব্রত মেয়েদের ব্রত হলেও, ব্রতটি পুরো মেয়েলিব্রত নয়। এখানে ব্রাহ্মণ ডেকে মন্ত্র-তন্ত্রের দিকটিকেও বাদ দেওয়া হয় না। তবে যাই হোক না কেন, কোজাগর ব্রতটির মধ্যে অনেকখানি অনার্য অংশ রয়েছে। 'শুয়োরের দাঁত-যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনার পাতিল; কুবেরের মাথা-যেটা সর্ব উপরে রয়েছে দেখি; কিংবা সরার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ের মতো ডাব-হলুদ-সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া-এক লক্ষ্মীর বাহন, আর এক লক্ষ্মীর শস্যমূর্তি— এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্যব্রতদের।

এদেশে লক্ষ্মীপূজার আর একটা অনুষ্ঠান রয়েছে, যেটা নজর করে দেখলে শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি যে অনার্য এবং প্রাচীন লৌকিক একটি ব্রতের স্থান পরে অধিকার করেছে, তা বেশ বোঝা যায়। গৃহস্থের বড়ো ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী পূজার পূর্বে, ঘরের বাইরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় 'অলক্ষ্মী বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপান্বিতা। পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মী-বিদায় নিজেরা করে না; পুজারিকে দিয়ে এ কাজ সারা হয়। এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা।

বাংলায় ও দেশভেদে নানা অঞ্চলে লক্ষ্মীব্রত পালনের একটু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ বাংলায় প্রচলিত তিনটি বড়ো লক্ষ্মীব্রতের কথা বলেছেন — প্রথম ফাল্গুন মাসে বীজ বপনের পূর্বে। চাষিরাই বেশি করে এ ব্রত করে রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে। একে বলা যেতে পারে ছরিতা-দেবী-সবুজবর্ণ। এই পূজা করে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মী ব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পূর্ণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী, হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অঘ্রানে, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। এছাড়াও ভাদ্রে, কার্তিকে ও চৈত্রে মেয়েরা আর কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত পালন করে। লক্ষ্মীব্রতের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক অবনীন্দ্রনাথ পেরু ও মেক্সিকোর কয়েকটি ব্রত ও দেবতার নামের কথা এনেছেন। এভাবে দেশভেদে লক্ষ্মীপূজার একটি তুলনামূলক দিকের পরিচয় দিয়ে লেখক, মানুষের কামনা-বাসনার সাদৃশ্যকে সূচিত করেছেন।

।। তোষলা ব্রত ।।

ব্রতটি তুষ-তুষলি ব্রত বলেও পরিচিত। সারা পৌষ মাস ধরে ব্রতটি পালন করে কুমারী মেয়েরা। এই ব্রতের দেবী শস্যের ও মঙ্গল পূরণের। এ ব্রতে গোবরের সঙ্গে আলো চালের তুষ মিশিয়ে ১৪৪ টা নাড়ু তৈরি করতে হয়। নাড়ুর মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং ৫ গাছি করে দূর্বা গুঁজে নাড়ু হাতে নিয়ে সরষের ফুল দিয়ে কুমারীরা এই ছড়া বলে ব্রত পালন করে—

তুষ-তুষলি কাঁধে ছাতি।

বাপ-মার ধন যাচাযাচি।।

স্বামীর ধন, নিজপতি।

বাপের ধন কান্নাহাটি।

পুত্রের ধন পরিপাটি।।

অঞ্চলভেদে নাড়ুর সংখ্যা যেমন কম-বেশি হয়, তেমনি ছড়া বলার সময় কেবল সরষের ফুল নয়, শিম, মুলো ইত্যাদি ফুল হাতে নিয়েও ছড়া বলে।

তুষ-তুষাল ব্রতের পরিচয় দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রতের প্রসঙ্গটি তুলে বাংলা ব্রতের সঙ্গে বিদেশী ব্রতের তুলনামূলক বিচারের মধ্যে দিয়ে বাংলা ব্রতের বিশ্বব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি এ ব্রতের ছড়াও আচার পালনের মধ্যে বাংলার পল্লীগ্রামের যে অপূর্ব চিত্রের প্রসঙ্গ তুলেছেন তা আমাদের 'ছেলেভুলানো ছড়া'তে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়— 'আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, বহুযুগ আগেকার বাংলা দেশের একখানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি শীতের হাওয়া বইছে-গ্রামের উপরে বড়ো গাছের আগায় এখনও কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে, শিশিরে সকালটি একটু ভিজে-ভিজে, বেড়ার ধারে ধারে আর চালে চালে শিমপাতা সবুজ, খেতে খেতে মুলোর ফুল, সরষের ফুল-দুধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে। নতুন সরায় বেগুন-পাতা চাপা দিয়ে, সার মাটি নিয়ে মেয়েরা দলে দলে তোষলা ব্রত করতে খেতের দিকে চলল এবং সেখানে মুলোর ফুল, শিমের ফুল, সরষের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল।'

।। অশ্বত্থপাতা ব্রত ।।

এ ব্রত পালন করা হয় বৈশাখ মাসে। স্থানভেদে ব্রতটির আর একটি নাম অশ্বত্থনারায়ণ। চারবছরে ব্রতসমাপন হয়। অর্থ, ধন, জন, পুত্র, পরিজন সবাই যেন অশ্বত্থ বৃক্ষের মতো চিরঞ্জীব বা দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে এই কামনায় বাংলার ব্রতীরা ব্রতটি পালন করে। ব্রতটি এক অর্থে মূলত বৃক্ষ-বন্দনা। ব্রতটির সঙ্কল্প কামনায় আছে অবৈধব্য, সুসন্তান, সুখ-ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, স্বস্তি-শান্তি ইত্যাদি কামনা। ব্রত ও ব্রতটির ছড়ার সঙ্গে প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করার মত—

'অশ্বথ পাতা কুঞ্জলতা চমকাসুন্দরী!

গঙ্গাস্নান করতে গেলেন শ্যামপণ্ডিতের ঝি;

সাত বউ যায় সাত দোলায়, সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়,

কর্তা যান গজহস্তীতে, গিন্নি যান রত্নসিংহাসনে,

ঠাকুর ঠাকরুন দোলনে যান।'

'বসন্তের বাতাস লেগে গত শীতের শুকনো পাতা গাছের তলায় ঝরে পড়েছে; নদীর ধারে অশ্বথ, কুঞ্জলতা, চাঁপাসুন্দরী আর শ্যাম পণ্ডিতের ঝি—কেউ পাকা পাতার তামাটে লাল, কেউ কাঁচা পাতার সতেজ সোনালী সবুজ, কেউ কচি পাতার কোমল শ্যাম, কেউ শুকনো পাতার তপ্ত সোনা, কেউ বা ঝরা পাতার পাণ্ডুর রঙে সেজেছে। অশ্বথ-পাতা, কুঞ্জলতা, চমকাসুন্দরী, আর এই তিন বনসুন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন

শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।' ব্রতের সঙ্গে প্রকৃতির এই মেলবন্ধনে লেখক অবাক হয়ে যান, ব্রতের উদ্দেশ্যও নামকরণ নিয়ে— 'প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ বাতাসের সঙ্গে এইসব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্যরকম সৌন্দর্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালির সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বলা কি ষড়্ঋতুর এক-একটি উৎসব বলব ঠিক করা শক্ত।'

।। সেঁজুতি ব্রত ।।

অঘ্রান মাসের প্রথম থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় পিটুলি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকতে হয়। এরপর প্রদীপ ফেলে এই ব্রত পালন করতে হয়। সেঁজুতি খুব বড়ো ব্রত। এখানে আলপনার আধিক্য, ছড়ার আধিক্য। আলপনার মধ্যে শিবের মূর্তি থেকে শুরু করে শিব মন্দির, নাটমন্দির, দোলা বা পালকি, ঢেঁকি, বঁটি, বেগুনপাতা, পান, খাট, গোয়াল ঘর, আকাশ-চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি অনেক ছবি আঁকতে হয়। আলপনার চিত্রগুলো এক একটি প্রতীক; এই প্রতীককে অবলম্বন করে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের এক অকপট অভিব্যক্তি ব্রতের ছড়ার ছন্দে ছন্দে ফুটে ওঠে। সেঁজুতি ব্রতে ছড়া ও আলপনার মধ্যে যে কামনা-বাসনা প্রকাশিত হয়; তাতে বাংলার সমাজ-চিত্র ও নারী মনস্তত্ত্বের নিখুঁত রূপটি ধরা পড়ে। যেমন, সতীন সমস্যা কেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব—

কুল গাছ; কুলগাছ, কেঁকুড়ি।
সতিন বেটি মেকুড়ি।
ময়না, ময়না ময়না।
সতিন যেন হয় না।
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।

বঁটি, বঁটি, বঁটি!
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আলতা পরি। ইত্যাদি।

।। মাঘ মণ্ডল ব্রত ।।

মূলত সূর্যের উপাসনা কেন্দ্রিক কুমারী ব্রত এটি। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তি পর্যন্ত পাঁচ বছর ধরে এই ব্রত পালিত হয়। কুমারী মেয়েরা ভালো বা মনোমত স্বামী পাওয়ার কামনায়, বাবা-ভাই-আত্মীয় পরিজনের মঙ্গলকামনায় ও জীবনের সবক্ষেত্রে মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করে। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের উপর গুরুত্ব না দিয়ে ব্রতের ছড়ার উপর জোর দিয়ে এই ব্রতের ছড়াকে তিনটি অঙ্কে ভাগ করে তার মধ্যেকার নাট্যধর্মিতার উপর জোর দিয়েছেন। প্রথম অংশ, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয় বা শীতের পরাজয় ও সূর্যের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় অংশে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে, শেষ অংশে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়।

ভাদুলি ও মাঘ মণ্ডল ব্রতের মধ্যে দিয়ে একটা জীবনবৃত্তকে দেখিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ—'ভাদুলি ব্রতটি আমরা দেখলেম — বর্ষা দেশ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় হচ্ছে আর শরৎ আসছে, এরই একটা উৎসব, মাঘ মণ্ডল ব্রতে — শীতের কুয়াশা কেটে সূর্যের আলোতে ঝলমল বসন্তদিনগুলি আসছে, তারই উৎসব।'

।। ভাঁজো ব্রত ।।

ব্রতটি শস্পাতার ব্রত বলেও পরিচিত। ভাদ্রমাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়, পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলো নৈবেদ্য নিয়ে, বাজি শস্য সরষে এবং ইঁদুর মাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে নিকোনো উঠসনে বেদির উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন-দেওয়া আলপনা, কোথাও মাটির ইন্দ্র-মূর্তিও থাকে। সারারাত ধরে পাড়ার সকল মেয়ে আপন-আপন শস্ পাতার সরাগুলো সাজিয়ে দিয়ে বেদির চারদিক ঘিরে নাচ-গান শুরু করে, মুখে মুখে ছড়া কাটে।

৯৯.৮ ব্রতে বিধৃত সমাজ-ইতিহাস-নৃতত্ত্ব

বেশকিছু ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে বাঙালি নারীর মন, বাংলার প্রকৃতি, বাংলা ব্রতে সমাজ-ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব কেমন ভাবে ধরা পড়েছে সে পরিচয়ও তুলে ধরেছেন তিনি। ব্রতের ধর্ম ও দেবতার গুণগান নয়, তার মধ্যে সাধারণ মানুষ, তাদের কামনা-বাসনা নিয়ে কিভাবে উপস্থিত ছিল এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি কিভাবে ব্রতের মধ্যে ধরা পড়েছিল তার পরিচয় দান লেখক অবনীন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর শিল্পী মন। আলোচনায় কখনও ঐতিহাসিক, কখনও সমাজতাত্ত্বিক কখনও নৃতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।

ব্রত যদিও কামনা-বাসনারই আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। তবু সে ব্রত একক নয়, ব্যাপক সমাজজীবনের মানসিকতাই সেখানে ধরা পড়ে। আর এই সূত্রে ব্রত হয়ে ওঠে সমাজজীবনের চিত্র। সেঁজুতি ব্রতে এই সমাজজীবনের ছবিটি স্পষ্ট রূপ পায় বাঙালি নারীর ঐকান্তিক কামনায় —

'ময়না, ময়না, ময়না!
সতিন যেন হয় না।
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতিনের মাথা।
পাখি, পাখি, পাখি!
সতিন মাগি মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি।

বঁটি, বঁটি, বঁটি।
সতিনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি,
সতিন কেটে আলতা পরি।'

বাঙালি সমাজে একসময় সতীন নিয়ে ঘর করা প্রায় অনিবার্য ছিল। কৌলিন্য প্রথার ফলে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরুষের পক্ষে তা উপভোগ্য হলেও কোন নারী চায় না স্বামীর উপর আর কারো অধিকার থাক। কিন্তু নারীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমাজের নিয়ম মেলে না, সতীনের সংসার যেহেতু নারীর কাছে দুর্বিষহ— তাই ব্রতের মধ্যে বাঙালি নারী তার ঐকান্তিক প্রার্থনাটা জানায় যে, সতীন যেন হয় না। আর সতীন যদি হয়ই, তাহলে তার মরণ দেখতে ওই নারীর কামনার অন্ত নেই। এ ব্রতটিতে নারী মনস্তত্ত্বের এই প্রকাশের আড়ালে থেকে গেছে সমাজেরই ছবি।

ব্রত নারীর কামনার বহিঃপ্রকাশ, ব্রতের ছড়ায় নারী কামনার সেই উচ্চারণ। নারী যখন বলে—

কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গোরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।

কিংবা, বাঁশের কোঁড়া! শালের কোঁড়া!
কোঁড়ার মাথায় চালি ঘি,
আমি যেন হই রাজার ঝি।

অথবা, ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী;
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর-
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর।

অথবা, আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না।

তখন এর মধ্যে সমসময়ের সমাজ-জীবনের চাওয়া-পাওয়ার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে সমাজে বহু সন্তানের চল ছিল, মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখে থাকার রেওয়াজ ছিল, 'সাত-ভেয়ের বোন হয়ে, সাবিত্রী সমান হয়ে' বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল।

।। ব্রতে ইতিহাস ।।

বাঙালি জাতি বড়ই ঘরকুনো এ অপবাদ দীর্ঘদিনের। কিন্তু সে অপবাদ দূর হয়ে যায় বাংলা ব্রতে নারীর আকাঙ্ক্ষায়। ভাদুলি ব্রতে নারী যখন নদী আঁকা আলপনাতে ফুল ধরে বলে—

নদী নদী কোথা যাও?

বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।

নদী-নদী কোথা যাও?

সোয়ামী-শ্বশুরের বার্তা দাও।

—তখন এই ছড়ায় বাঙালির বাণিজ্য যাত্রার ছবিই ফুটে ওঠে। বাঙালি জাতির ইতিহাস যেন এতে বিধৃত।

ঠিক তেমনি, বাঙালির যুদ্ধ যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় 'রণে এয়ো' ব্রতে। রণে এয়ো ব্রতে ব্রতী যখন সিঁদুরের কৌটো ধরে বলে— 'রণে রণে এয়ো হবো।' তখন বাঙালি যে যুদ্ধ ভীরু ছিল না, তার ইতিহাস ফুটে ওঠে এখানে।

।। ব্রতে নৃতত্ত্ব ।।

লক্ষ্মীব্রতের বিস্তারিত রূপ আলোচনাকালে লেখক অবনীন্দ্রনাথ উপচার হিসাবে যে, শুয়োরের দাঁত, নারিকেল মালা এবং হলুদ মাখানো ডাব, পেঁচার ছবি, ধান ছড়ার ছবির কথা বলেছেন, তার মধ্য দিয়ে সমাজ-নৃবিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মতে, 'এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্যব্রতদের।' এভাবে ব্রত উপাচার ও আলপনায় ব্যাপক অংশ এসেছে অনার্য বা অন্য ব্রতদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। আসলে মেয়েলি ব্রত তো তাদের কাছ থেকে পাওয়া।

'আদর সিংহাসন' ব্রতে দেখা যায় মনুষ্যমূর্তি পূজা। এর মধ্যে এক ম্যাজিক বা যাদু ভাবনা ক্রিয়াশীল। অধিকাংশ ব্রতের মধ্যেই কোন না কোনভাবে এই যাদু ভাবনা ধরা পড়ে। এই ব্রতে ব্রতী 'যে-আদরটি কামনা করছে সেটি একটি জীবন্ত প্রতিমার মধ্যে ধরে দেখবার আয়োজন করছে। সত্যি এক স্বামী সোহাগিনীকে সামনে বসিয়ে বসনভূষণে সাজিয়ে যেমন আদর সে নিজে কামনা করছে তেমনি আদর তার মূর্তিবাদী কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে এতেই তার আদর পাওয়ার কামনা চরিতার্থ হবে নিশ্চয়। এইখানে ব্রত আর পুজোতে তফাত।'

এমনি অনুকরণমূলক যাদুর প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় - ভাঁজো ব্রতে, বসুধারা ব্রতেও।

৯৯.৯ ।। ব্রতে ও ব্রতের ছড়ায় নাট্যলক্ষণ ।।

অনুকরণমূলক যে যাদুর কথা বলা হল, তা আসলে এক রকমের অভিনয়। আদর সিংহাসন ব্রতে ব্রতী যেমন আদর তার নিজের জীবনে কামনা করে, তেমন আদরের অভিনব ক্রিয়া সংগঠন করে। তেমনি 'ভাঁজো ব্রতে' প্রচুর শস্য কামনায় নারী পাঁচরকম শষ্য ভিজিয়ে রাখার অভিনয় করে, বসুধারা ব্রতেও বৃষ্টি কামনায় বৃষ্টি ধারার অনুকরণ করা হয়। এ সবই একরকম অভিনয় কলা। কেবল ব্রতের আচারে অনুকরণপ্রক্রিয়ার মধ্যে নাট্যলক্ষণ ধরা পড়ে তাই নয়। ব্রতের ছড়াতেও নাট্য লক্ষণ দেখিয়েছেন লেখক। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে নৃত্যে; এক কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।'

'বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিংবা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মন্ডনরূপে, থাকেই থাকে কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে।' 'ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো-ছোটো যাত্রার পালার মতো গাঁথা হয়েছে, সেখানে নাট্য নৃত্য ও গীত-কলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি'। এ প্রসঙ্গে তিনি 'মাঘমণ্ডল' ব্রতের উল্লেখ করে সেখানে ব্যবহৃত ছড়াকে তিনটি অঙ্কে ভাগ হওয়ার কথা বলেছেন। সেখানে ব্রতের ছড়াগুলি এক একটা চরিত্র ধরে নাটকের সংলাপের মতো ব্যক্ত হয়েছে। আছে গান, আছে নাচও, নাচের কথা ভাঁজো ব্রতে উল্লেখিত হয়েছে। সংলাপের মতো ছড়ার ব্যবহার ফুলাই ব্রতেও লক্ষিত হয়। সেখানে বহুরূপী বাঘের অনুকৃতিও অভিনয়ের দিককে স্পষ্ট করে। ভাদুলি ব্রতের মধ্যেও নাট্যলক্ষণ বিদ্যমান। তাঁর মতে, ব্রতের আলপনা যেন নাটকের দৃশ্যপট। আছে সংলাপধর্মী ছড়া, ব্রতের এক একটা পর্ব যেন নাটকের এক একটা দৃশ্য বা অঙ্ক।

৯৯.১০ ।। ব্রতের আলপনা ।।

ব্রতে আলপনা হল মানসিক কামনা-বাসনার প্রতীক। 'ব্রতের ছড়াগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার যে যোগ, ব্রতের আলপনাগুলির সঙ্গেও ঠিক সেই যোগটিই দেখা যায়।' 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের শেষ পর্বে লেখক আলপনার প্রসঙ্গে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সঙ্গে দিয়েছেন অসংখ্য আলপনার ছবি।

ব্রতের আলপনাগুলোকে তিনি দুটো ভাগে ভাগ করেছেন—একরকমের আলপনা—সেগুলো কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্তি— কতটা ইজিপ্টের চিত্রাক্ষরের মতো। এই সব আলপনায় মানুষ নানা অলংকারের কামনা করে পিটুলির গহনা এঁকেছে। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় ঘরবাড়ি, চন্দ্রসূর্য, সুপুরিগাছ, রান্নাঘর, গোয়াল ঘর—এগুলো ঠিক শিল্পকার্য নয়, মন যা চায় তারই মোটামুটি মানচিত্র। কাজ চালানোই এর লক্ষ্য। কিন্তু আর এক রকমের ছবি বা আলপনা যেমন, কলালতা, খুন্তিলতা, শঙ্খলতা, চালতালতা প্রভৃতি—এগুলো ঠিক মনের মানচিত্র নয়। মণ্ডন শিল্প-প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক শিল্প সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, মানুষ কেবল তার প্রয়োজনটির মধ্যে নিজের মনকে বন্দী রাখে না। তার চাওয়া-পাওয়া, কামনার প্রতিবিম্ব এঁকেই যে ক্ষান্ত নয়। তাতে তার মন তৃপ্তি মানছে না, যতক্ষণ না শিল্পসৌন্দর্যে সেগুলি সে ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা-পরিতৃপ্তির পক্ষে আলপনা সুন্দর হল কি না হল তাতে বড়ো আসে যায় না।

আলপনার ছবিগুলোর শ্রেণীবিভাগ করে তিনি দেখিয়েছেন— প্রথম, পদ্মগুলি। দ্বিতীয়, নানা লতামণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়, গাছ, ফুলপাতা ইত্যাদি। চতুর্থ, নদনদী ও পল্লীজীবনের দৃশ্য। পঞ্চম, পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সপ্তম, আভরণ ও নানাপ্রকার আসবাব। অষ্টম, পিঁড়িচিত্ত। আলপনার চিত্র সমতল ভিত্তিক চিত্র। যা আঁকতে চাওয়া হয় তার পরিষ্কার চেহারা দেওয়া। ব্রতের আলপনা ব্রতীর কামনার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠল, তারপর সেটা আলপনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তারপর আলপনা, তারপর ছড়া, শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস— এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেল।

এভাবে বাংলার ব্রতের কথা আলোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ব্রতের উদ্ভব, শাস্ত্রীয় ব্রতের সঙ্গে মেয়েলি ব্রতের পার্থক্য, ব্রতের পরিচয়ের সঙ্গে সমাজ, শিল্প, ইতিহাস, নৃতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে সবশেষে আলপনার কথা বলে শিল্প সৃষ্টির পটভূমি আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে দেশী-বিদেশী ব্রতের পরিচয় দিয়েছেন। দেশীয় সংস্কৃতির ধারায় দেশীয় ব্রতের অবস্থান পর্যালোচনা করেছেন বাংলার আসল প্রাণটি ও মনটি ধরার চেষ্টা করেছেন 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে।

৯৯.১১ ।। সারাংশ ।।

শুধু সাহিত্য নয়, স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বদেশপ্রেম। তাই স্বদেসীয় লোক-সংস্কৃতির ভাণ্ডারটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এ সম্পর্কে তাঁর যথার্থ মনোভাব 'বাঙলার ব্রত' গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

মূলত নারীর কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত। যে ব্রত পালন করে সে ব্রতী।

আমাদের দেশে চলিত ব্রতের শ্রেণীবিভাগ দিয়ে ''বাঙলার ব্রত'' গ্রন্থের শুরু। প্রচলিত ব্রতের প্রধান দুটি ভাগ শাস্ত্রীয় ব্রত এবং মেয়েলি ব্রত। মেয়েলি ব্রত, কুমারী ব্রত এবং ব্রত এই দুভাগে বিভক্ত। গ্রন্থের শুরুতেই বিভিন্ন প্রকার ব্রতের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে আছে বিভিন্ন প্রকার ব্রতের মধ্যে পার্থক্য।

কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ব্রতের উদ্ভব। ব্রত কথার সাধারণ অর্থ নিয়ম। ব্রত একক ক্রিয়া অনুষ্ঠান নয়। ব্রতের মধ্যে সর্বদা একটা কামনা প্রকাশিত হয়। বাংলা ব্রতের কতকগুলি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়, ব্রতের শেষ পর্ব হল ব্রতকথা শোনা। ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা, নাট্যকলা, নৃত্যকলা, গীতকলা ইত্যাদি বর্তমান। এর পাশাপাশি বাঙালির সমাজজীবনের ছবিও আছে।

বাংলা ব্রত মূলত মেয়লি ব্রত। সারা বছর ধরে বাঙালি মেয়েরা যা যা ব্রত পালন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাদুলি ব্রত, বসুধারা ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রত, লক্ষ্মীব্রত, তোষলা ব্রত, অশ্বত্থ পাতা ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, ভাঁজো ব্রত ইত্যাদি।

এভাবে প্রথমে ব্রতের উদ্ভব, পার্থক্য, ব্রতের পরিচয়ের সঙ্গে সমাজ, শিল্প, ইতিহাস, নৃতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে সবশেষে আলপনার কথা বলা হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে দেশী-বিদেশী ব্রতের পরিচয় দেওয়া আছে। এভাবে ''বাংলার ব্রত'' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ বাংলার আসল প্রাণ ও মন ধরার চেষ্টা করেছেন।

৯৯.১২ ।। অনুশীলনী ।।

১। **নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) ‘ব্রত’ শব্দের উদ্ভব কীভাবে ঘটেছে?

(খ) ব্রতের মধ্যে মানুষের কোন ভাবটি প্রকাশ পায়?

(গ) বাংলা ব্রতকে অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করেছেন, কী কী?

(ঘ) মেয়েলি ব্রত বলতে কি বোঝেন, লিখুন।

(ঙ) ব্রতের আলপনার মধ্যে দিয়ে কি প্রকাশিত হয়?

(চ) ভাদুলি ব্রতের লক্ষ্য কি?

(ছ) মাঘমণ্ডল ব্রতের মধ্যে দিয়ে ব্রতীর কোন কামনার প্রকাশ ঘটে?

(জ) আদর সিংহাসন ব্রত ব্রতীর কোন কামনাকে প্রকাশ করে।

(ঝ) বসুধারা ব্রত কোন মাসে পালিত হয়?

(ঞ) তোষলা ব্রত অন্য কি নামে পরিচিত?

২। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ**

(ক) বাংলা ব্রতের উদ্ভব সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের অভিমত জ্ঞাপন করুন।

(খ) ব্রতের শ্রেণীবিভাগ করে, সংক্ষেপে তা আলোচনা করুন।

(গ) শাস্ত্রীয় ব্রত ও মেয়েলি ব্রতের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো নির্দেশ করুন।

(ঘ) বাংলা ব্রতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের অভিমত পোষণ করুন।

(ঙ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অবলম্বন করে বাংলার লক্ষ্মীব্রতের পরিচয় দিন।

(চ) অশ্বত্থপাতা ব্রতের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ কীভাবে নিরূপণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ আলোচনা করে দেখান।

(ছ) সেঁজুতি ব্রতের পরিচয় দিন।

৩। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন ঃ**

(ক) বাংলা ব্রতের মধ্যে কিভাবে সামাজিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায় আলোচনা করে দেখান।

(খ) বাঙালির ইতিহাস কোন কোন ব্রতের কামনা প্রকাশক ছড়ায় কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা করে দেখান।

(গ) ব্রতের মধ্যে কিভাবে যাদু-বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে তা আলোচনা করুন।

(ঘ) ব্রতের মধ্যে সমাজ-নৃবিজ্ঞানের প্রকাশ কিভাবে লক্ষিত হয় আলোচনা করে দেখান।

(ঙ) ব্রত ও ব্রতের ছড়ায় কিভাবে নাট্যলক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে আলোচনা করুন।

(চ) ব্রতের আলপনার লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বাংলার ব্রত।

২। ড. শীলা বসাক — বাংলার ব্রত পার্বণ।

৩। অন্নপূর্ণা দেবী — মেয়েদের ব্রতকথা।

৪। বিনয় ঘোষ — বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব।

৫। সেলিম আলদীন — মধ্যযুগের বাংলা নাট্য।

৬। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী — বাংলার স্ত্রী আচার।

Notes

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

একক ১০০ ❒ মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রহ—সম্পাদনা-প্রকাশ

গঠন ঃ

১০০.১ উদ্দেশ্য
১০০.২ প্রস্তাবনা
১০০.৩ মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রহ - সম্পাদনা - প্রকাশ
১০০.৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা নিয়ে বিতর্ক
১০০.৫ ব্যালাড ঃ স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য
১০০.৬ পাশ্চাত্য ব্যালাড ও বাংলা গীতিকা
১০০.৭ সারাংশ
১০০.৮ মৈমনসিংহ-গীতিকার উদ্ভব ও প্রচলন ক্ষেত্র
১০০.৯ হাজং সম্প্রদায় ও মৈমনসিংহ-গীতিকা
১০০.১০ মৈমনসিংহ-গীতিকা পরিচিতি
১০০.১১ 'মহুয়া' গীতিকা
১০০.১২ প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ
১০০.১৩ বৈষ্ণবীয় প্রভাব
১০০.১৪ গীতিকা বা ব্যালাড হিসেবে 'মহুয়া' পালা
১০০.১৫ সারাংশ
১০০.১৬ অনুশীলনী
১০০.১৭ উত্তর-সংকেত
১০০.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

১০০.১ উদ্দেশ্য

বাংলার লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা হলো গীতিকা। বাংলা গীতিকার তিনটি ধারা - নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। মূলত মৈমনসিংহ অঞ্চলের কৃষকদের মুখে মুখে প্রচলিত দীর্ঘ কাহিনিমূলক লোকগীতি-ই মৈমনসিংহ গীতিকা বলে পরিচিত। আমাদের এই এককটির উদ্দেশ্য হবে —

- মৈমনসিংহ গীতিকা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা।
- গীতিকার স্বরূপ প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া।
- গীতিকা ও ব্যালাডের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত করা।

এই এককটি পাঠ করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সঙ্কলনের বিভিন্ন গীতিকার কাহিনির সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটবে। গীতিকার নাট্যলক্ষণ, চরিত্র সমূহের উত্থান - পতন, প্রেম - বিরহ, ত্যাগ - তিতিক্ষার পরিচয় পাবেন। বিশ্বসাহিত্যে এগুলির গুরুত্ব সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

১০০.২ প্রস্তাবনা

বাংলা গীতিকার ত্রিধারা—নাথগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকা। নাথগীতিকার উদ্ভবস্থল উত্তরবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার উদ্ভবস্থল পূর্ববঙ্গ। একালে যা বাংলাদেশে নামে পরিচিত। আপাতত মৈমনসিংহ গীতিকাই আমাদের আলোচ্য।

গীতিকা একপ্রকার লোকসঙ্গীত-ই। মৈমনসিংহ জেলার চাষীদের মুখে গীত দীর্ঘকাহিনি মূলক লোকগীতিই মৈমনসিংহ গীতিকা নামে প্রচলিত। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের এই ধারাটিকে অবলুপ্তির থেকে রক্ষা করেছিলেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন। শুধু বাঙালি কিংবা ভারতবাসী নয়, বিশ্ববাসীও এর ফলে মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত গীতিকার রস আস্বাদন করলো। এ আলোচনায় আপনারা জানতে পারবেন, মৈমনসিংহ - গীতিকার স্বরূপ-প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, বিশ্বসাহিত্যের মানদণ্ডে এগুলির মূল্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

বাংলার নিরক্ষর কৃষক সমাজ, তাদের হৃদয়ে সঞ্চিত সাহিত্যের রস অলিখিত উপায়ে মৌখিকভাবে রূপ পেয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকায়। এক হিসাবে আঞ্চলিক গীতিকা বা সাহিত্য মৈমনসিংহ গীতিকা। কিন্তু তার বিষয় বস্তুর সজীবতায় ও অভিনবত্বে, অঙ্কিত চরিত্রের স্বভাবে তা বাংলা, তথা ভারতীয় সাহিত্যে শুধু ব্যতিক্রম নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অনন্যতায় অনবদ্য। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা পল্লীসাহিত্যের উদাহরণ হয়েও জয় করেছে বিশ্ববাসীর হৃদয়। সাধারণ চাষীর কণ্ঠের গান হয়েও বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের পাশে আপন জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তী অংশে মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে।

১০০.৩ মৈমনসিংহ-গীতিকার সংগ্রহ - সম্পাদনা — প্রকাশ

মৈমনসিংহ গীতিকার নামের মধ্যেই আছে এ গীতিকার উদ্ভব স্থলের ইঙ্গিত অর্থাৎ মৈমনসিংহ জেলার গীতিকাই মৈমনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত। এগুলি সংগ্রহ করেছেন চন্দ্রকুমার দে, সম্পাদনা করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন, প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চন্দ্রকুমার দে জন্মেছিলেন মৈমনসিংহ জেলার আইথর গ্রামে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার তেমন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। চন্দ্রকুমারের অল্প বয়েসে তাঁর বাবার মৃত্যু হলে সংসারের সকল দায়িত্ব এসে পড়ে চন্দ্রকুমারের ওপর। এ কারণে লেখাপড়াও তেমন হয় নি। মাসিক ৫ টাকা বেতনে কালীপুর জমিদারিতে গোমস্তার চাকরি নেন চন্দ্রকুমার। এই সূত্রে চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কৃষক সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। মৈমনসিংহ গীতিকা এই কৃষকদের মুখে মুখে প্রচলিত দীর্ঘ আখ্যানগীতি। কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আখ্যানগীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন চন্দ্রকুমার দে। এই 'সৌরভ' পত্রিকার সূত্রেই কেদারনাথ মজুমদারের মাধ্যমে আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেনের দৃষ্টি পড়ে চন্দ্রকুমার দে'র ওপর। ভাগ্য ফিরে যায় চন্দ্রকুমার দে'র। যিনি মাসিক ২ টাকা বেতনে সেরেস্তায় কাজ করতেন, তিনি ৭০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হয়ে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আখ্যানগীতি সংগ্রাহকের পদে। দীনেশ চন্দ্র সেনের উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়। তিনি 'সৌরভ' পত্রিকার মাধ্যমে মৈমনসিংহ-গীতিকার ঐশ্বর্যপূর্ণ অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে কেদারনাথ মজুমদারের মাধ্যমে চন্দ্রকুমার দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে এগুলি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। এ ব্যাপারে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুমোদনের সহায়তায় চন্দ্রকুমারকে ৭০ টাকা মাস মাহিনায় সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

চন্দ্রকুমার সংগ্রহ কর্মে নিবিড় ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তৎকালীন মৈমনসিংহ জেলার নানান প্রান্ত থেকে গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন। যাই হোক, মৈমনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলি দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। বাংলা গীতিকাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর জন্যে স্যার আশুতোষের অর্থানুকূল্যে দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় গীতিকাগুলি ইংরেজিতে অনুদিত হয়ে 'Eastern Bengal Ballads of Mymensingh (Vol-1, Part I, 1923) নামে প্রকাশিত হয়।

১০০.৪ মৈমনসিংহ-গীতিকা নিয়ে বিতর্ক

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' মৈমনসিংহ জেলার চাষীদের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনিধর্মী লোকসংগীত, নাকি চন্দ্রকুমার দে'র স্বকপোল কল্পিত কাহিনি-এ নিয়ে একটা বিতর্ক বা সমালোচনা অনেকের মুখে শোনা যায়। তাঁদের মতে, চন্দ্রকুমার দে ছিলেন অনেকটা স্বভাব কবি, এবং এই গীতিকা সংকলনের গীতিকাগুলো তিনি ওই অঞ্চল থেকে সংগ্রহ না করে নিজের কল্পনা দিয়ে এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। অভিযোগ সঠিক নয়। এ হতে পারে যে, চন্দ্রকুমার দে যে সমস্ত গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর সেই সংগ্রহ করা এক একটা গীতিকার কাহিনির মধ্যে ঘটনাগত পারম্পর্য হয়তো সর্বত্র ঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। সম্পাদনাকালে দীনেশচন্দ্র সেন সেই ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষা করে অনেক পরিমার্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি করে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু, তাই বলে গীতিকাগুলো চন্দ্রকুমার দে'র কবিত্ব-কল্পনা থেকে এসেছে একথা মানা যায় না। একটা উদাহরণ দিলে এ বিতর্কের অবসান ঘটে। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মৈমনসিংহ জেলার চাষীদের মুখে প্রচলিত একটি গীতিকা সংগ্রহ করে তার নাম দেন 'বাদ্যানীর গান'। গীতিকাটির বিষয়বস্তু এবং চন্দ্রকুমার দে' সংগৃহীত 'মহুয়া' গীতিকার বিষয় পুরোপুরি এক। পার্থক্য কেবলমাত্র দু'টো নামে - মহুয়া ও হুমর্‍্যা বাইদ্যা-য়। পূর্ণচন্দ্রের বাদ্যানীর গানে মহুয়ার নাম আছে মেওয়াসুন্দরী বলে, আর হুমর্‍্যা'র নাম আছে উন্দুরা বাইদ্যা নামে। নামের এই পার্থক্যের কারণ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনা কর্ম। আসলে মহুয়া ফুল বা ওই গাছ মৈমনসিংহ জেলায় প্রায় বিরল। তাই মহুয়া নয়, মেওয়া নামটিই আসল। 'মেওয়া' কথার অর্থ দুধের ক্ষীরজাত মিষ্টান্ন। হুমর্‍্যার বউ হুমর্‍্যার চুরি করে আনা ছয় মাসের শিশু কন্যাটির নাম রাখে 'মেওয়াসুন্দরী'। সেই নায়িকা। তবে গীতিকার নাম 'বাদ্যানীর গান'। একই বিষয় কিন্তু গীতিকা ও গীতিকার নায়িকার নামের পার্থক্য এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত গীতিকার নামটি হলো 'মহুয়া'। পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বাদ্যানীর গানে'র 'মেওয়া' দীনেশ বাবুর হাতে 'মহুয়া', আর উন্দর্‍্যা 'মহুয়া' গীতিকায় 'হুমর্‍্যা'য় পরিবর্তিত হলেও উভয় গীতিকার বিষয়বস্তু এক, উভয় গীতিকার বিষয়বস্তুর এই সাদৃশ্যই প্রমাণ করে মৈমনসিংহ জেলার চাষীদের মুখ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে তা চন্দ্রকুমার দে'র নিজের রচনা কি করে হয়! এ বিতর্কের শেষ করা যাক চন্দ্রকুমার দে সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেনের একটি উক্তি দিয়ে — "কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবানই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই।...এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহুলোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি— নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পারা যায়। এই জন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালা সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।"

১০০.৫ ব্যালাড ঃ স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

দীনেশচন্দ্র গীতিকাগুলিকে Ballad নামে অভিহিত করেছেন। ব্যালাড কাকে বলে। 'A ballad is a song that tells a story, or to take other point of view – a story told in song'' বাংলায় বলা যায়, গীতিকা এক ধরনের সঙ্গীত যার মাধ্যমে একটি গল্প বর্ণিত হয়। বা গানের মাধ্যমে বর্ণিত গল্প-ই হলো গীতিকা। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় গীতিকা হল এক ধরনের লোকগীতি, যার অবয়ব এমনি সাধারণ লোকগীতির তুলনায় দীর্ঘ, যার মধ্যে একটি কাহিনি বা গল্প উপস্থাপিত হয় এবং বিশেষভাবে কাহিনির সংকটময় মুহূর্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ঘটনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ক্রিয়াকে উদ্‌ঘাটিত করা হয় অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে। ভাষা পরিবর্তন করে বললে দাঁড়ায়— ''A ballad is a folk song that tells a story which stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias.'' — আসলে গীতিকা বা ballad হলো লোকগীতির একটি রূপ। বিশ্বের সকল দেশেরই লোকসমাজের মধ্যে লোকগীতির এই কাহিনীধর্মী রূপটি অল্পবিস্তর আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে। বাংলায় যা গীতিকা, ইংরেজিতে তাই ballad, রুশ ভাষায় bylina, ইউক্রেনিয় ভাষায় dumi, স্প্যানিশে romance, আবার যুগোস্লাভ-এর পরিচিতি pesme নামে। যদিও কাহিনিধর্মী লোকগীতি হিসেবে বিভিন্ন দেশে গীতিকার বিভিন্ন নাম, তবুও গীতিকার ওই বিভিন্ন রূপের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ছোটখাটো পার্থক্য কিন্তু আছেই। যার জন্যে গীতিকা ballad-এর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের পাশাপাশি পার্থক্যও বিদ্যমান।

১০০.৬ পাশ্চাত্য ব্যালাড ও বাংলা গীতিকা

ইংরেজি ballad শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গীতিকা হলেও এবং গীতিকা ও ballad উভয়েই কাহিনিধর্মী লোকগীতি হওয়া সত্ত্বেও দেশ-ভেদে এই দুই বিষয়ের মধ্য বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষত অবয়ব বা আকারগত দিক থেকে দেখলে ইংরেজি ballad-এর তুলনায় বাংলা গীতিকা অনেক দীর্ঘ। ইংরেজি আবার সংখ্যাগতদিক থেকে বাংলা গীতিকার তুলনায় অধিক বা বেশি। শুধু সংখ্যায় অধিক নয়, ইংরেজি ballad-এর বিষয় বাংলা গীতিকার তুলনায় অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। সূত্রাকার এই দুই বিষয়ের মধ্যেকার পার্থক্য ধরার চেষ্টা করলে এ রকম দাঁড়ায় —

- আকার বা দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ইংরেজি ballad-এর তুলনায় বাংলা গীতিকা অনেক বড়ো।
- বাংলা গীতিকার এই দীর্ঘ অবয়বের কারণ বাঙালিজাতির অধিক বর্ণনাপ্রিয়তা।
- দীর্ঘতা ও বর্ণনার আধিক্যে বাংলা গীতিকার গঠন সাধারণত শিথিল হয়ে থাকে। বাংলা গীতিকা হয় বর্ণনাপ্রধান। তুলনায় ইংরেজি ballad-এর সংক্ষিপ্ত অঙ্গ-সংগঠন এর গঠনকে করেছে ঘনপিনদ্ধ। শিথিলতার অবকাশ এখানে খুব কম।
- বাংলা গীতিকা যেখানে বর্ণনাপ্রধান, ইংরেজি ballad সেখানে কাহিনি প্রধান।
- বাংলা গীতিকার সংখ্যা স্বল্প, তুলনায় ইংরাজি ballad-এর সংখ্যা ব্যাপক। এর ফলে বিষয় বৈচিত্র্যে ballad যতটা সমৃদ্ধ, গীতিকা ঠিক তত নয়।

- গীতিকার মুখ্য বিষয় প্রেম, ballad-এরও তাই। কিন্তু গীতিকায় প্রেমের প্রকাশ সাধারণত একধরনের। পুরুষ-ই প্রথম প্রেম নিবেদন করে, কিন্তু শেষমেশ নারীর আত্মত্যাগ-ই সে প্রেমের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে থাকে। তুলনায় ballad-এ প্রেম থাকলেও, তা আদৌ শান্ত রসের নয়, সেখানে রোমহর্ষক অনেক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।
- গীতিকা বর্ণনা প্রধান হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে তার গতি সুনির্দিষ্ট নয়, তুলনায় ballad অনেক বেশি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী।
- পাশ্চাত্য ballad অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ বা objective। সেখানে যিনি বর্ণনা দেন, তাঁর কোন রকম ব্যক্তিগত মতামত কোনভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত থাকেন। অন্যদিকে আমাদের গীতিকাগুলো কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে subjective বা ব্যক্তিনিষ্ঠ। এর বন্দনা অংশ থেকে শুরু করে নানান অংশে নানা বিষয়ে যথার্থ সুখ-দুঃখের স্বরূপ, ঈশ্বর নির্ভরতা, জীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি নিয়ে বর্ণনাকারীর নানা মন্তব্য সংযোজিত হয়ে যায়। ফলে এর মধ্যে মহাকাব্যিক নিরপেক্ষতা বা নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে না। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগা ইত্যাদি অনুভূতিগুলো জড়িয়ে যায়।
- ইংরেজি ballad বা পাশ্চাত্য গীতিকায় ব্যাপক কথান্তর লক্ষিত হয়, তুলনায় আমাদের গীতিকাগুলোতে কথান্তর কম। এর ফলে তুলনামূলক পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন পাঠ খুঁজে পাওয়ার দিক থেকে প্রাচ্য গীতিকাগুলোতে আছে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা।
- পাশ্চাত্যগীতিকাগুলো অলৌকিক উপাদানে ভরপুর। অশরীরী আত্মা, পরী, স্বপ্নাদেশ, যাদু, যাদুকরী সঙ্গীত, ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা, ডাইনিবিদ্যা, রূপান্তর ইত্যাদি নানা অলৌকিক উপাদান পাশ্চাত্য গীতিকায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সে তুলনায় বাংলা গীতিকায় এ জাতীয় উপাদানের সন্ধান সীমিত পরিসরেই লক্ষিত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে দেবমহিমা বা অলৌকিকতার সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, তার পাশে মৈমনসিংহ-গীতিকার বিষয়বস্তু মানবিকতা প্রধান।
- পার্থক্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যগীতিকা এবং বাংলাগীতিকার বিষয়বস্তুতে সাদৃশ্যও আছে। যেমন, ইতিহাস, ধর্ম, কিংবদন্তী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয় গীতিকা গড়ে উঠেছে অধিক সংখ্যায়। উভয় গীতিকার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েছে প্রেম। তবু বলা যায়, 'ইংরেজি ব্যালাডগুলোর প্রকৃতি আর বাংলা গীতিকার প্রকৃতি ঠিক এক নয়। ইংরেজি ব্যালাডে যে সব বৈশিষ্ট্য না হলে ব্যালাড পদবাচ্য হতে পারে না, বাংলা গীতিকায় হয়তো তা একেবারেই অনুপস্থিত, আবার বাংলা লোকগীতিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রায় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়, সে সব হয়তো ইংরেজি ব্যালাডে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।'

১০০.৭ সারাংশ

গীতিকা হলো ইংরেজি ballad শব্দের প্রতিশব্দ। এর বিশেষত্ব হলো :

(১) গীতিকা এক প্রকার লোকগীতি।

(২) এতে থাকে একটি কাহিনি।

(৩) এ কাহিনি হতে পারে প্রেম, ইতিহাস, কিংবদন্তী ইত্যাদি বিষয়ক।

(৪) এ কাহিনি বর্ণিত হয় একমুখীভাবে, অর্থাৎ সব সময় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায় কাহিনি, লক্ষ্যমুখিনতা গীতিকা একাঙ্ক নাটক ও ছোটগল্পের মতো।

(৫) নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী হতে গিয়ে গীতিকাকে অবশ্যই হতে হয় পারিপার্শ্বিকতা বর্জিত। অর্থাৎ কাহিনি হয় সব সময় একমুখী। এই পারিপার্শ্বিক ঘটনা বর্জনের বৈশিষ্ট্যও ছোটগল্পের 'নদীর চোখে তীরের গল্প' স্বভাবের।

(৬) গীতিকা সাধারণত হয় বস্তুনিষ্ঠ, লেখক বা গায়ক বা বর্ণনাকারীকে হতে হয় নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্ত। যা ঘটেছে তা বর্ণনা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। ব্যক্তিগত কোন অনুভূতির প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়। এদিক থেকে গীতিকা অনেকটা মহাকাব্যের স্বভাবযুক্ত।

(৭) গীতিকা হয় গেয় এবং যেহেতু গেয়, তাই এর একটা সুর ও ছন্দেরও দরকার হয়।

(৮) গীতিকার কাহিনিতে সাধারণত জীবনের সাধারণ ঘটনা থাকে না। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর জোর দেওয়া হয় গীতিকায়।

(৯) পারিপার্শ্বিক ঘটনা বর্জন করে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর ওপর জোর দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী হওয়ার ফলে গীতিকার কাহিনি হয় দ্রুত এবং একমুখী।

(১০) গীতিকা গীত হলেও এর উপস্থাপনায় থাকবে নাটকীয়তা। ঘটনা, বর্ণনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গীতিকার পরিবেশনা। নাটকীয়তা কেবল উপস্থাপন রীতিতে নয়, বিষয়বস্তু ও কাহিনির মধ্যেও থাকবে নাটকীয় উপাদান।

(১১) লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান, বিশেষত লোকসাহিত্যের মতো গীতিকাও ঐতিহ্য নির্ভর মৌখিকভাবে বাহিত।

(১২) সচরাচর জনপ্রিয় কাহিনিই গীতিকার বিষয়বস্তু।

গীতিকার এই স্বভাব প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় গীতিকার মধ্যে লক্ষিত হলেও বাংলা গীতিকার সঙ্গে ইংরেজি ballad-এর পার্থক্য অনস্বীকার্য।

১০০.৮ মৈমনসিংহ গীতিকার উদ্ভব ও প্রচলনক্ষেত্র

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নামের মধ্যেই উল্লেখ আছে এর উদ্ভব ও প্রচলন ক্ষেত্রের। মৈমনসিংহ জেলাই এর প্রচলনক্ষেত্র। চন্দ্রকুমার দে এ জেলার কৃষক বা চাষীদের মধ্যে থেকে এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন। এ অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই 'হাজং' সম্প্রদায়ের বাস। 'হাজং' একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান, এ অঞ্চলে প্রচলিত গীতিকাগুলিতে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান। হাজং সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরা অসূর্যম্পশ্যা নয়।

১০০.৯ হাজং সম্প্রদায় ও মৈমনসিংহ-গীতিকা

হাজং আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের উদ্ভব বা উৎস ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী থেকে। ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য-এরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবনে অভ্যস্ত। এদের সমাজে পুরুষ থাকলেও বৈদিক বা আর্য সভ্যতার মতো পুরুষ সংসার ও সমাজের সর্বময় কর্তা নয়। নারী-ই সেখানে সর্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষেরা সংসারে কাজ সামলাতো, নারীরা ব্যস্ত থাকতো বাইরের কাজে, ফলে, স্বাভাবিকভাবে নারীর একটা স্বাধীনতা ছিল। নারীর এই স্বাধীনতা কোনভাবেই উচ্ছৃংখলতায় পরিণত হ'ত না। কারণ, তারা পরাধীনতা থেকে স্বাধীন

হয়নি। স্বাধীনতা তাদের সমাজে সহজাত। শুরু নারী স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। নারী বা মায়ের পরিচয়-ই হতো সন্তানের পরিচয়। নারীরা স্বাধীনভাবে তাদের পাত্র নির্বাচন করতে পারতো। ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর এই সামাজিক পরিকাঠামো আজও উত্তর-পূর্ব ভারতের অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই ইন্দো-মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর যে একাধিক শাখা উপশাখা ছিল, তাদের মধ্যে গারো, খাসি, বোরো, কোচ ইত্যাদি শাখার মধ্যে হাজং-এরাও অন্যতম।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গীতিকাগুলোর মধ্যে নারী চরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কী নামকরণে, কী বিষয়বস্তুতে সব ক্ষেত্রে নারী চরিত্রের এই আধিক্য হাজং সমাজে নারীচরিত্রের কর্তৃত্ব প্রাধান্যকেই বোধ করি ইঙ্গিত করে। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গীতিকাগুলোর নামকরণের দিকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ গীতিকার নামকরণে নারী চরিত্র-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যেমন — মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, রূপবতী, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা ইত্যাদি। গীতিকাগুলোর নামকরণই প্রমাণ করে যে গীতিকাগুলোতে নারী তথা নায়িকা চরিত্রের নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রাধান্য ঘটেছে। গীতিকাগুলো পরলেই দেখা যাবে যে, নারী চরিত্রের এই প্রাধান্য কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, কাহিনি নিয়ন্ত্রণে বা ঘটনা নিয়ন্ত্রণে, সর্বোপরি সক্রিয়তার দিক থেকেও পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীচরিত্রগুলো অনেক সক্রিয়।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় নারী পুরুষের তুলনায় কেবল অধিক সক্রিয়ই শুধু নয়; তুলনায় পুরুষ অনেক নিষ্ক্রিয়। 'মহুয়া' গীতিকাটির উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেখানে দেখা যায় যে, মহুয়ার ভালোবাসায় দুর্বল হয়ে নদ্যারচাঁদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মহুয়াকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তীকালে একের পর এক চরম বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায় নি - মহুয়াই সকল বিপদের মোকাবিলা করেছে। পুরুষের এই নিষ্ক্রিয়তা বা দুর্বলতা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের মূল সুরটি নিহিত থেকে গেছে হাজং গোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। শুধু তাই নয়, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় নারীদের স্বাধীন জীবনচর্যায়, স্বাধীনভাবে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রকটিত হয়েছে মাতৃতান্ত্রিক স্বভাব, মহুয়ার মধ্যে এ স্বভাব যতটা প্রবল চন্দ্রবতীর মধ্যে অবশ্য ততটা নয়; কারণ 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার প্রেক্ষাপট অনার্য হাজং গোষ্ঠী নয়, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ এর পটভূমি। সে সমাজ পুরুষশাসিত, তাই চন্দ্রাবতী নিজের স্বামী নির্বাচনে পিতার মুখাপেক্ষী।

১০০.১০ 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পরিচিতি

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন। এবার জানতে পারবেন গীতিকাগুলোর পরিচয়। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে মৈমনসিংহ জেলা থেকে সংগৃহীত যে গীতিকা-সংকলনটি প্রকাশিত হয়, তাতে স্থান পেয়েছিল মোট ১০টি গীতিকা। গীতিকাগুলো যথাক্রমে—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা এবং দেওয়ানা মদিনা। উল্লেখ্য যে ১০টি গীতিকাই চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত। আমাদের আলোচনা এই ১০টি গীতিকাকে অবলম্বন করেই।

কাহিনি-পরিচয় ঃ আমাদের আলোচ্য গীতিকাগুলো সবই চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত। মৈমনসিংহ জেলার কৃষকদের মুখ থেকে গীতিকাগুলো তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরাজি ballad বা পাশ্চাত্য গীতিকার তুলনায় বাংলা গীতিকাগুলো অনেক দীর্ঘ। দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে একটা সুরে ছন্দোবদ্ধভাবে পরপর ২টি চরণের চরণান্তিক মিল বিশিষ্ট পংক্তি নিয়েই গীতিকাগুলো রচিত। সেই মিল বিশিষ্ট পংক্তি তুলে দেওয়ার পরিবর্তে আপনাদের সামনে গীতিকাগুলোর সংক্ষিপ্ত কাহিনির পরিচয় এবার দেওয়া যাবে।

১০০.১১ মহুয়া গীতিকা

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র গীতিকাগুলোর মধ্যে একডাকে বিখ্যাত গীতিকাটি হলো মহুয়া। এ পর্যায়ের সব গীতিকাই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়, তবে 'মহুয়া'র পরিচিতি বোধহয় আরো ব্যাপক। এক অর্থে 'গীতিকা' যদি লোকসাহিত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার কোন রচয়িতা থাকার কথা নয়। কিন্তু 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালা বা গীতিকাগুলো চন্দ্রকুমার দে লোকমুখ থেকে সংগ্রহ করলেও, এর এক-এক জন পালাকার বা রচয়িতার সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। নির্দিষ্ট স্রষ্টা থাকার ফলে এই গীতিকাগুলো আদৌ লোকসাহিত্য কিনা, সে আলোচনা পরের বিষয়। এখন আমরা দেখি যে, 'মহুয়া' গীতিকাটি দ্বিজ কানাই কর্তৃক প্রণীত। 'মহুয়া' গীতিকাটিকে সমালোচকবৃন্দ একটি আদর্শ গীতিকার মর্যাদা দিয়েছেন। সমস্ত দিক থেকে 'মহুয়া' গীতিকাটিতে গীতিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত ঠিকঠাক অনুসৃত হয়েছে।

মহুয়া'র কাহিনি ঃ সর্বমোট ২৪টি পরিচ্ছেদে 'মহুয়া' গীতিকাটি বিভক্ত। কাহিনির শুরু হুমর্যা নামক বেদের কথা দিয়ে, হুমর্যা শুধু বেদে নয়, ডাকাত দলের সর্দার। গারো পাহাড়ের উত্তরে হিমানী পর্বতের কাছে হুমর্যার দলবল সহ বাস। এই হুমর্যাই একদিন রাত্রে এক ব্রাহ্মণের ছয় মাসের এক শিশু কন্যাকে চুরি করে। তারপর সেই শিশুকন্যাকে হুমর্যা এবং তার স্ত্রী পালন করতে থাকে পিঞ্জরাতে বন্দী পাখির মতো। হুমর্যা ও তার স্ত্রীর কোন সন্তান ছিল না। কন্যার রূপ দেখে হুমর্যার স্ত্রী তার নাম রাখল মহুয়া সুন্দরী। ছয় মাসের শিশু মহুয়া দেখতে দেখতে ষোল বছরের যুবতীতে পরিণত হলো। মহুয়ার পরিণতি দেখানো এ গীতিকার লক্ষ্য, ফলে, ষোল বছরের ঘটনাক্রম গীতিকায় গতি আনতে ও পারিপার্শ্বিকতা বর্জন করতে মাত্র একটি পংক্তির মধ্যে শেষ করা হ'ল—'এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।' যুবতী মহুয়ার রূপের কোন তুলনা নেই। তার রূপে মুনিরও মতিভ্রম হয়। এ হেন মহুয়া কেবল রূপসীই নয়, বেদের দলের খেলা-কসরতে সে সম্পদ স্বরূপ। খেলা দেখানোর দক্ষতা মহুয়ার থাকলেও, মহুয়ার রূপ তার জীবনের ট্র্যাজেডির মূল কারণ।

এরপর একদিন হুমর্যা তার ভাই মাইনক্যার পরামর্শে শুভদিন দেখে বেরিয়ে পড়ল খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে। অনেক নদী, গ্রাম, প্রান্তর পার হয়ে তারা একদিন এসে পৌঁছলো বামনকান্দা গ্রামে। সে গ্রামের অভিজাত ব্রাহ্মণ নদ্যারচাঁদ ঠাকুর। জমিদার তনয় সে। তার বাড়িতে বেদের দল খেলা দেখালো। খেলা দেখাতে গিয়েই মহুয়া ও নদ্যারচাঁদ — একজন বেদের মেয়ে, অন্যজন ব্রাহ্মণতনয় — পরস্পরকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলল। যদিও গোপন সে ভালোবাসা আরো পরে আত্মপ্রকাশ করলো।

কয়েকদিন পর সন্ধ্যার সময় খেলা দেখিয়ে ফেরার সময় পথে নদ্যারচাঁদের সঙ্গে মহুয়ার দেখা হলে, নদ্যারচাঁদ তার মনের ভিতরের আবেগকে ধরে রাখতে পারেনা। সে মহুয়াকে কিছু কথা বলবে বলে পরদিন সন্ধ্যার সময় নদীতে একা একা জল নিতে আসতে বলে। পরদিন মহুয়া এক আসে, নদ্যারচাঁদ নানাভাবে মহুয়ার কাছে তার ভালোবাসার কথা জানাতে থাকে, কিন্তু মহুয়া — বুদ্ধিমতী মহুয়া এত সহজে পুরুষের প্রেমের বাঁধনে ধরা দিতে চায় না, বুদ্ধি করে সে নদ্যারচাঁদের ভালোবাসার পরীক্ষা নিতে থাকে এবং মুখে এমন ভান করে যেন, নদ্যারচাঁদের ওই ভালোবাসা সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মহুয়ার মনের এই বাঁধ অচিরেই ভেঙে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায়, মহুয়া নদ্যারচাঁদের জন্য প্রায় পাগল হতে চলেছে। রাতে তার ঘুম নেই, দিনে শান্তি নেই, কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে নদ্যারচাঁদের বাড়ির দিকে। সই পালঙ্ক মহুয়ার মনের কথা জেনে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। গোপনে গোপনে মহুয়া-নদ্যারচাঁদের সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে। হুমর্যা বাইদ্যা সব জেনে ফেলে, এবার চরম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় মহুয়া-নদ্যারচাঁদের মধ্যে। বেদের দল নদ্যারচাঁদের কাছ থেকে বসবাসের ও চাষের জমি পেলে যে মহুয়া মানসিক যন্ত্রণায় চলে যেতে চেয়েছিল, সেই মহুয়া যখন এবার থাকতে চাইলো, হুমর্যা এবার মেয়েকে নিয়ে, দলবল নিয়ে চলে যেতে চাইল। তার এই প্রস্তাবে ভাই

মাইনক্যা আপত্তি করলেও, মান-সম্মানের দোহাই দিয়ে হুমর‍্যা সবাইকে নিয়ে চলে গেল একদিন রাতের অন্ধকারে। 'মহুয়া' গীতিকার মূল লক্ষ্য মহুয়া-নদ্যারচাঁদের প্রেম। নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে তাদের পরিণতি কী সেটাই যদি গীতিকাটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হয় ; তাহলে হুমর‍্যা বাইদ্যার এই বাধাদান প্রচেষ্টাই প্রতিবন্ধকতার সূচনা করলো।

কিন্তু মহুয়া ও নদ্যারচাঁদের প্রেমের পথে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা যেমন এসেছে, তেমনি সে বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টাও থেকে গেছে অবিরত। পাহাড়ী ঝর্ণা যেমন, যতই উপলখণ্ডের প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে নামে, ততই বাড়ে তার সৌন্দর্য। তেমনি মহুয়া-নদ্যারচাঁদের ভালোবাসার প্রবাহ যতই বাধা অতিক্রম করেছে, ততই পরস্পরের প্রতি বেড়েছে প্রেমের তীব্রতা ও আন্তরিকতা। তাই বিদায়ের আগে মহুয়া নদ্যারচাঁদকে বলে যায় তাদের পরবর্তী ঠিকানা। সে বাড়িতে নদ্যারচাঁদকে তাদের অতিথি হতে বলে মহুয়া এবং বেদের দল রাতে চলে গেছে এ কথা শোনার মুহূর্তে বিশ্বাস করতে পারে না নদ্যারচাঁদ, হাত থেকে তার মুখের গ্রাস পড়ে যায়, তারপর একদিন রাত্রে মাকে না জানিয়ে নদ্যারচাঁদ মহুয়ার উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ কয়েকমাস পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে একদিন নদ্যারচাঁদ সন্ধান পায় মহুয়া ও বেদের দলের, নদ্যারচাঁদকে দেখে অনিদ্রা, অনাহারে মৃত প্রায় বিরহিনী মহুয়া মুহূর্তের মধ্যে শয্যা ছেড়ে স্নান করে এসে রান্না করতে বসে। মহুয়ার হাতের রান্না খেয়ে জাত দেয় নদ্যারচাঁদ। মহুয়ার সন্ধান পেয়ে সুখী ও ক্লান্ত নদ্যারচাঁদ মহুয়ার হাতের রান্না খাওয়ার পর যখন রাতের আঁধারে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে তখন দলের অন্য কেউ না চিনতে পারলেও হুমর‍্যা বাইদ্যা নদ্যারচাঁদকে চিনতে পেরে ঘুমন্ত মহুয়াকে ঘুম থেকে তুলে তাকে পাঠায় বিষ মাখানো ছুরি দিয়ে নদ্যারচাঁদকে হত্যা করতে। এবারও কঠিন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে জয় হয় প্রেমের। বিষ মাখানো ছুরি নিয়ে মহুয়া ঘুমন্ত নদ্যারচাঁদের কাছে গিয়ে পিতৃ-আদেশ পালন করতে গিয়ে যখন ছুরি নদ্যারচাঁদের বুকে বসাতে যায়, তখন নদ্যারচাঁদের ভালোবাসার কথা মনে করে পর মুহূর্তে সে ছুরি আবার তুলে নেয়। এদিকে নদ্যারচাঁদের ঘুম ভেঙে যায় এবং তারপর দুজনে বেদের দলের একটি ঘোড়ায় চড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। হুমর‍্যার আক্রোশ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলেও সামনে আর এক বিপদ দেখা দেয়। এবার তাদের সামনে পড়ে পাহাড়ী খরস্রোতা এক নদী। ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে এবার নদীর ওপারে কি ভাবে যাবে যখন ভাবছে দুজনে, তখন দেখল এক বণিকের নৌকো আসতে। তাদের অনুরোধে বণিক মহুয়া-নদ্যারচাঁদকে নৌকোতে তুলে নিল বটে, কিন্তু বিপদ এখানেও। মহুয়ার রূপে মোহগ্রস্ত বণিক তার দলবল দিয়ে প্রথমে নদ্যারচাঁদকে নদীর জলে ফেলে দিল। তা দেখে মহুয়াও যখন নদীতে ঝাঁপ দিতে গেল, তখন বণিকের দলবল তাকে বাধা দিল। মহুয়া বুঝল দেহের বলে তাদের কাছে পারা সম্ভব নয়, এবার সে ধৈর্য ধরে বুদ্ধি বলের উপর নির্ভর করলো এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে। নদ্যারচাঁদকে নদীর জলে ফেলে দেওয়ার পর বণিক মহুয়াকে বিয়ের ও সুখী করার দীর্ঘ প্রস্তাব যখন দিল, তখন মহুয়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পান সেজে বণিক ও তার দলের লোকজনকে খেতে দিল। পান সেজে খাওয়ানোর মধ্যে সম্মতির লক্ষণ আছে ভেবে বণিক খুশী মনে সে পান খেতে থাকলো, কিন্তু পানের মধ্যে যে মহুয়া মাথার চুলের মধ্যে রেখে দেওয়া পাহাড়ী তক্ষকের বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, বণিক তা জানতে পারেনি। অচিরেই বণিক অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল নৌকোর ওপর। অন্যেরাও অচৈতন্য হয়ে পড়লো। সবাই যখন অচৈতন্য, তখনই মহুয়া কুঠার দিয়ে নৌকার তলদেশে ছিদ্র করে, নৌকার কাছি কেটে দিয়ে বণিক ও তার দলের লোকজনের মৃত্যু নিশ্চিত করে জলে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠল, এবার সন্ধান নদ্যারচাঁদের। নদ্যারচাঁদ বেঁচে আছে, না মারা গেছে এই অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান অবস্থায় মহুয়া যখন আত্মহত্যায় উদ্যত, তখন হঠাৎ এক ভগ্ন মন্দির প্রাঙ্গণে একটা ক্ষীণ ধ্বনি শুনে মহুয়া গিয়ে নদ্যারচাঁদকে দেখতে পেল। কঙ্কালসার মৃতবৎ নদ্যারচাঁদকে কীভাবে বাঁচাবে এই বিজন বিভুঁইয়ে। হঠাৎ উপস্থিত হয় এক সন্ন্যাসী। তারই সাহায্যে মহুয়া নদ্যারচাঁদকে যখন সুস্থ করার পথে তখন সন্ন্যাসী মহুয়ার রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে পেতে চাইলো। একদিকে অসুস্থ স্বামী, অন্য দিকে সন্ন্যাসীর কুপ্রস্তাব, এই দুইয়ের মাঝে মহুয়া আবার জটিল সমস্যায় পড়লো।

সন্ন্যাসীকে অপেক্ষা করতে বলে মহুয়া রাত্রের অন্ধকারে অসুস্থ নদ্যারচাঁদকে কাঁধে করে সে স্থান ত্যাগ করলো। এভাবে সন্ন্যাসীর আওতা থেকে বেরিয়ে এক বনের মধ্যে মহুয়াও ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়া নদ্যারচাঁদ এবার কিছুটা থিতু হয়ে সংসার জীবনযাপন করতে লাগলো। কিন্তু সুখ মহুয়ার ভাগ্যে নেই। তাই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মহুয়া শুনতে পায় বাঁশির আওয়াজ। সে বুঝতে পারে এ পালং সইয়ের বাঁশি। বিপদের আভাস। পরদিন ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে হুমর্‍্যা শিকারী কুকুর ও তার দলবল সহ তাদের ঘিরে ফেলেছে। এবার আর হুমর্‍্যা ভুল করলো না। নিজের উপস্থিতিতে বিষ মাখানো ছুরি মহুয়ার হাতে দিল নদ্যারচাঁদকে হত্যা করতে। কিন্তু বারবার অগ্নি পরীক্ষায় দগ্ধ হতে হতে সীতা যেমন সহ্য করতে না পেরে মা বসুন্ধরার কোলে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তেমনি এবার অনেক প্রতিবন্ধকতা জয় করে আসা মহুয়া ছুরিটি নদ্যারচাঁদের বুকে না বসিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা করলো। সঙ্গে সঙ্গে হুমর্‍্যার আদেশে নদ্যারচাঁদকে হত্যা করা হলো। অনুতপ্ত হুমর্‍্যা স্বীকার করলো যে, দুজন দুজনার জন্য পাগল ছিল। দুজনকে এক সঙ্গে সমাধিস্থ করে বেদের দল চলে গেল। কিন্তু গেল না পালং সই। সে মহুয়া-নদ্যারচাঁদের কবরে প্রতিদিন ফুল দিয়ে সেখানে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য থেকে গেল। এই হলো মহুয়া পালার বিষয়বস্তু।

১০০.১২ প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

মহুয়া গীতিকায় মুখ্যসম্পদ মহুয়া চরিত্রটি। প্রেমের জন্যে ত্যাগে, তিতিক্ষায়, ধৈর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, বীর্যে, শক্তিতে এমন নারীচরিত্র ভারতীয় সাহিত্যে তো বটে, বিশ্বসাহিত্যেও পাওয়া ভার। অথচ নিজ ভাগ্য বা নিয়তির কাছে কীভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো মহুয়াকে। ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার পরিচয় হলো বেদের মেয়ে বলে, বেদের দলে লালিত-পালিত হতে হলো, তার খেলা দেখানোর দক্ষতা ও কিছুটা রূপ বিক্রি করেই বেদের দলের যত প্রতিপত্তি। মহুয়ার রূপই তার কাল। তার ট্র্যাজিক পরিণতির মূল কারণ বোধহয় তার রূপ। চর্যাগীতির আপন মাংসে হরিণা বৈরীর মতো মহুয়ার রূপ-ই নিয়তির মতো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তার রূপে নদ্যারচাঁদ মুগ্ধ হয়েছে, মনে মনে ভালোওবেসেছে। মহুয়াও নদ্যারচাঁদকে ভালোবেসেছে, কিন্তু প্রথমে সহজে তার মনের দুর্বলতাকে সে প্রকাশ করে নিজেকে ছোট করেনি। যখন সে বুঝেছে নদ্যারচাঁদের ভালোবাসা পুরুষের ভ্রমরস্বভাব নয়, তখনই সে নিজেকে সমর্পণ করেছে নদ্যারচাঁদের কাছে। নদ্যারচাঁদ ও মহুয়ার পারস্পরিক অনুরাগ যখনই গভীর হয়েছে তখনই হুমর্‍্যা বাইদ্যার ভয়ঙ্কর আক্রোশ তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে স্থানগত ব্যবধান। কিন্তু মহুয়া-নদ্যারচাঁদের পারস্পরিক টান, বিশ্বাস ও ভালোবাসা তাদের মধ্যেকার স্থানগত বিরহ দূর করে দিলেও একের পর এক প্রতিবন্ধকতা এসেছে এবং তার মূলেই সেই মহুয়ার রূপ। হুমর্‍্যা বাইদ্যার থেকে মুক্ত হয়ে মহুয়া-নদ্যারচাঁদ যখন নদী পার হওয়ার জন্য বণিকের নৌকোয় উঠল, সেখানকার বিপদের কারণ কিন্তু মহুয়ার রূপ। তার রূপেই মোহগ্রস্ত বণিক প্রতিদ্বন্দ্বী নদ্যারচাঁদকে নদীর জলে ফেলে মহুয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শূন্য করতে চেয়েছে। বুদ্ধিমতী, ধৈর্য্যশীলা মহুয়া এ যাত্রায় বহুকষ্টে নদ্যারচাঁদকে ফিরে পেলেও আবার বিপদ ঘনিয়ে আসে সন্ন্যাসীর তরফ থেকে। গীতিকার শুরুতে মহুয়ার রূপ সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছিল যে, তার রূপে মুনিরও মতিভ্রম হয়। ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে গেল নদ্যারচাঁদকে সুস্থ করতে আসা সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে। বনের মধ্যে, অসুস্থ স্বামী নদ্যারচাঁদকে নিয়ে এই অসহায় মহুয়াকে সন্ন্যাসী পেতে চাইলে এক্ষেত্রেও মহুয়া বুদ্ধি ও ধৈর্যে তাকে আশ্বাস দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে অসুস্থ স্বামীকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অজানার সন্ধানে। সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেও মহুয়ার রূপই তার ক্ষতির কারণ হয়ে ছিল।

মহুয়ার অসীম ধৈর্য, ত্যাগ, ভালোবাসা ও তিতিক্ষার বাঁধ ভেঙে পড়ল হুমর্‍্যা বাইদ্যার পুনরায় বনদম্পতি মহুয়া-নদ্যারচাঁদকে ঘিরে ফেলার পর। বণিক ও সন্ন্যাসীর কবল থেকে নিজের নারীত্ব ও নদ্যারচাঁদের প্রাণ বাঁচিয়ে মহুয়া যখন অসুস্থ নদ্যারচাঁদকে নিয়ে বনের মধ্যে ধীরে ধীরে তাকে সুস্থ করে সুখের মুখ দেখছিল, ঠিক তখনই ঘনিয়ে এলো বিপদ। এবার আর নতুন কোন শত্রু নয়, পুরাতন হুমর্‍্যা বাইদ্যা। 'মহুয়া' গীতিকার মূল প্রতিপাদ্য মহুয়া-নদ্যারচাঁদের ভালোবাসা ও তার পরিণতি। তাদের ভালোবাসার স্রোত বারে বারেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে হুমর্‍্যা বাইদ্যার স্বার্থ ও মহুয়ার রূপ পিপাসু এক একজন স্বার্থপর মানুষের কাছে। বার বার এই প্রতিকূলতায় গীতিকার নায়ক তথা পুরুষ চরিত্র নদ্যারচাঁদের ভূমিকা থেকে গেছে অনেকটাই নিষ্ক্রিয়।

পালঙ্ক ঃ পালঙ্ক মহুয়ার সই। নারী চরিত্রের মধ্যে মহুয়ার পাশাপাশি পালঙ্ক সই আলোচিত। তবে গীতিকার মধ্যে মহুয়ার তুলনায় পালঙ্ক বেশি পরিমাণে অনালোচিত। পালঙ্ক চরিত্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনার বীজ ছিল, কিন্তু তা গীতিকার একমুখীন গতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পালঙ্ককে পাওয়া যায় মহুয়ার প্রেমের সাক্ষীস্বরূপে। মহুয়ার সঙ্গে নদ্যারচাঁদের যখন ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন পালঙ্কই একমাতদ্র সাক্ষী। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পালঙ্ক এই সময় মহুয়াকে নদ্যারচাঁদ থেকে নিরস্ত করতে চাইলেও মহুয়ার প্রেমের প্রতি (বিশেষত নদ্যারচাঁদের প্রতি) একাগ্রতা দেখে পালঙ্ক এবার তাকে একান্ত একাত্ম সখীর মতো সাহায্য করতে থাকে। কিন্তু এরপর মহুয়ার সক্রিয়তা এত প্রবল হয়ে ওঠে বা গীতিকা নদ্যারচাঁদ মহুয়া মুখী হয়ে পড়ে যে পালঙ্ক আর তেমন ভাবে গীতিকায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় না। পালঙ্ককে আবার পাওয়া যায় গীতিকার শেষাংশে, যেখানে সুখী বনবাসী মহুয়া-নদ্যারচাঁদকে হুমর্‍্যা তার দলবল দিয়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টায় থাকে সেখানে অগ্রিম বিপদের বাঁশি বাজিয়ে এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্যে পালঙ্কের আবির্ভাব। কিন্তু তার বিপদের সঙ্কেত কোনভাবে উদ্ধার করতে পারে না মহুয়াদের। শিকারী কুকুরসহ হুমর্‍্যার দলবল ঘিরে ফেলে তাদের। মহুয়ার হাতে বিষমাখানো ছুরি তুলে দিয়ে হুমর্‍্যা যখন নদ্যারচাঁদকে মারতে বলে, তখন অসহায় মহুয়া একবার তাকায় নদ্যারচাঁদের মুখে, একবার পালঙ্ক সইয়ের দিকে, যদি তারা কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে মহুয়া বিষ মাখানো ছুরি নিজের বুকে বসালে, হুমর্‍্যার নির্দেশে নদ্যারচাঁদকেও তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হল। এরপর হুমর্‍্যার দল চলে গেলে মৃত মহুয়া ও নদ্যারচাঁদের কবরের পাশে থেকে গেল একা পালঙ্ক। সমগ্র গীতিকায় যে পালঙ্ক অনালোকিত ছিল সে যেন এবার নিজেকে মেলে ধরল। পালঙ্ক প্রিয়সখী ও তার প্রিয়জনের এই সকল পরিণতিতে এতটাই শোকবিহ্বল যে, একটা স্বপ্নের ঘোরে যেন সে আচ্ছন্ন। পালঙ্ক মৃত মহুয়ার উদ্দেশে বলতে থাকে, সই মহুয়া তুমি ঘুম থেকে ওঠ, আর ভয়ের কিছু নেই হুমর্‍্যার দল চলে গেছে, চলো আমরা দুজনে ফুল তুলে এনে ওই নাগর কালাকে সাজাই। যদিও তীব্র এক শোকাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে পালঙ্কের এসকল কথাবার্তা বা প্রলাপ। তবু এর মধ্যে পালঙ্কের অন্তরে গোপন থাকা কোন এক সুপ্ত বাসনা বোধহয় ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে যেমন মৈমনসিংহ গীতিকায় বৈষ্ণব প্রভাব। পালঙ্ক যখন মৃতা মহুয়ার উদ্দেশে বলে যে, আমরা দুজনে ফুল তুলে মালা গেঁথে ওই নাগরকালাকে সাজাবো, তখন এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে যায়। নাগরকালা বলতে সাধারণত কৃষ্ণকে বোঝায়, নদ্যারচাঁদকে যখন নাগরকালা রূপে অভিহিত করা হয়, তখন তার মধ্যে কৃষ্ণ রূপই আরোপিত হয়। আর মহুয়া হয়ে যায় রাধা, পালঙ্ক হয়ে যায় ললিতা-বিশাখা সখীদের কেউ। রাধা ছাড়া এই সখীদের মধ্যেও যেমন কৃষ্ণ অনুরক্তি ছিল, এক্ষেত্রে পালঙ্কের মধ্যেও মনের কোন গোপন কোণে নিশ্চয় নদ্যারচাঁদের প্রতি অনুরাগ ছিল। না হলে সে একথা বলতে পারতো না। তা যদি না হয়, পালঙ্ক যদি মহুয়াকে গভীর ভালোবাসতো মনে করা যায় এবং তার টানে সে থেকে গেল মনে হয়, তাহলেও মনে হতে পারে যাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও পালঙ্ক বাঁচাতে পারলো না তার সমাধির কাছে পড়ে থেকে পালঙ্ক কী পাবে! যদি নদ্যারচাঁদের প্রতি পালঙ্কের কোন টান না থাকে। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠতে পারে মৃত নদ্যারচাঁদের কাছ থেকেই বা পালঙ্কের কী পাওয়ার আছে। হয়তো কিছু নেই, ওখানেই পালঙ্ক সই-এর মহত্ত্ব।

নদ্যারচাঁদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সে অনুরাগকে কোনভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে পালঙ্ক মহুয়ার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে চায়নি। কারণ, মহুয়াকেও সে ভালোবাসতো এবং সে ভালোবাসা এত গভীর যে, জীবিত অবস্থায় নদ্যারচাঁদের ভালোবাসা দাবি করে মহুয়ার প্রেমে সে বাধা হতে চায়নি, চায়নি মহুয়ার মনে কষ্ট দিতে। তাই পালঙ্ক তার সকল ভালোবাসাকে প্রকাশ করেছে জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার যখন আর কিছু নেই তখনই। এদিক থেকে মহুয়াকেও বোধ হয় ত্যাগের মহিমায় ছাড়িয়ে গেছে পালঙ্ক। মহুয়া নদ্যারচাঁদকে ভলোবেসেছে, অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করতে হয়েছে, পেয়েছে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা, শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতেও হয়েছে, কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে নদ্যারচাঁদের ভালোবাসা সে পেয়েছে, সাময়িক হলেও নদ্যারচাঁদকেও সে পেয়েছে। এদিক থেকে মহুয়া কিছুটা সফল। অন্যদিকে পালঙ্ক কি পেল। মহুয়া-নদ্যারচাঁদকে সে বাঁচাতে তো পারলো না, পেল না নদ্যারচাঁদকে। নদ্যারচাঁদকে পাওয়াতো দূরের কথা, তাকে যে সে ভালোবাসে একথা একবার তার জীবিত অবস্থায় সে জানাতে পারলো না। এইখানে পালঙ্ক চরিত্রের ট্র্যাজেডি। এক নিরাসক্ত প্রতিদানহীন ভালোবাসার তাগিদে বেঁচে থাকলো পালঙ্ক। প্রেমের জন্য মহুয়া প্রাণ দিল। প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে জর্জরিতা মহুয়া যখন আর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছিল না, তখনই সে হুমর্‍্যা বাইদ্যার বিষ মাখানো ছুরি বসিয়ে দিল নিজের বুকে। মহুয়া মারা গেল, কিন্তু মরেই তার সকল জ্বালা ফুরালো, নদ্যারচাঁদ মারা গেল, কিন্তু তার নিজের কোন অন্তরের যন্ত্রণা তেমন করে প্রকাশিত হয়ইনি। অন্যদিকে বেঁচে থাকলো পালঙ্ক সই। সে তো কিছু পেলই না, বরঞ্চ যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকার অবকাশ পেল। পালঙ্ক ইচ্ছা করলেই হুমর্‍্যার দলবলের সঙ্গে চলে যেতেই পারতো, কিন্তু সে চলে না গিয়ে মৃত দুই মানুষের কবর আঁকড়ে পড়ে থাকলো। তার এই নীরব তিতিক্ষা ও উদ্দেশ্যহীন অপেক্ষা তাকে কোন কোন ক্ষেত্রে মহুয়ার তুলনায় মহৎ করে তোলে।।

১০০.১৩ বৈষ্ণবীয় প্রভাব

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'গুলোর কাল বা সময় নির্ধারণ বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ এই গীতিকাগুলোর কোন রচনা সালের উল্লেখ নেই। যদিও এগুলো কোন না কোন একজন রচয়িতার নামে প্রচলিত, তবু এগুলোর কাল নির্ণয় খুব সহজ নয়। এদিক থেকে মহুয়া গীতিকার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু উপাদান লক্ষিত হয়, যার ওপর ভিত্তি করে গীতিকাটির কাল নির্ণয়ে কিছুটা সুরাহা হয়। বিশেষ করে এই গীতিকার নায়ক চরিত্রটি। নায়কের নাম নদ্যারচাঁদ। নদ্যারচাঁদ বা নদেরচাঁদ বলতে সাধারণত চৈতন্যদেবকে বোঝায়। চৈতন্যদেবের এই নদ্যারচাঁদ নামের ভিত্তিতে বা তার প্রভাব পরবর্তীকালে নদেরচাঁদ নামটির প্রচলন ঘটে। এদিক থেকে মহুয়া গীতিকার নায়কের নামটিও চৈতন্য প্রভাবিত মনে করা যেতে পারে এবং তার ভিত্তিতে 'মহুয়া' গীতিকাটি যে চৈতন্য পরবর্তীকালের সৃষ্টি তা অনুমান করা যেতেই পারে। শুধু তাই নয়, মহুয়ার প্রেমে আকৃষ্ট নদ্যারচাঁদ মহুয়াদের উলুইয়াকান্দা গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার খবর শুনে যখন গৃহত্যাগ করে রাত্রের আঁধারে-তার সেই গৃহত্যাগের দৃশ্য নিমাই তথা চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। এদিক থেকেও 'মহুয়া' গীতিকা যে চৈতন্য পরবর্তী তা অনেকটা ধরা পড়ে। 'মহুয়া' গীতিকায় এই চৈতন্য সাদৃশ্য গীতিকাটির সময় সীমা নির্ধারণে কেবল সাহায্য করে না, গীতিকাটির উপর বৈষ্ণবীয় প্রভাবের দিকটি তুলে ধরে। বৈষ্ণবীয় প্রভাবের চূড়ান্ত দিকটি লুকিয়ে আছে গীতিকার অন্তিম অংশে-মহুয়া-নদ্যারচাঁদ-পালঙ্ক সই এর সম্পর্কের মধ্যে। নদ্যারচাঁদ নাগরকালা অর্থাৎ কৃষ্ণ, মহুয়া রাধিকা আর পালঙ্ক সখীভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-রাধা তথা নদ্যারচাঁদ ও নদ্যারচাঁদ মহুয়ার সেবা করার লক্ষ্যে থেকে গেল নির্জন বনে। তবে ঠিক বৈষ্ণবীয় আবরণ দিয়ে পালঙ্কের ত্যাগকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

১০০.১৪ গীতিকা বা ব্যালাড হিসেবে মহুয়া পালা

ব্যালাড বা গীতিকা হলো এক ধরণের লোকসঙ্গীত যার একটা নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। সাধারণত ব্যালাড ও গীতিকার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো একই ধরনের। তবে আভ্যন্তরীণ কিছু পার্থক্য থাকেই। পার্থক্য যাই থাক না কেন গীতিকা কিংবা ব্যালাড যে এক ধরণের কাহিনিকেন্দ্রিক লোকসঙ্গীত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে দিক থেকে 'মহুয়া' পালাটিও কাহিনিধর্মী লোকসঙ্গীত। কাহিনির পরিচয় আগেই আপনারা পেয়েছেন। গীতিকা যেখানে লোকসঙ্গীত, সেখানে তা গেয়। আসর পেতে দর্শক শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে একটানা একঘেয়ে সুরে গেয়ে যান কোন গায়ক। 'মহুয়া' গীতিকায় বন্দনা অংশেই দেখা যায় আসর পেতে গান গাওয়ার কথা। এবং সমগ্র গীতিকাটিই এক নির্দিষ্ট ছন্দেই গীত হয়।

ব্যালাড বা গীতিকা ঘটনাকেন্দ্রিক এবং সে ঘটনা মূলত একমুখী ও পারিপার্শ্বিকতা বর্জিত। অনেকটা ছোটগল্প কিংবা একাঙ্ক নাটকের মতো। এদিক থেকে ইংরেজি ব্যালাড যতটা দ্রুত ও একমুখী বাংলা গীতিকা ততটা একমুখী নয়। সাধারণত একটু বর্ণনা বাহুল্যের কারণে বাংলা গীতিকার ঘটনার একমুখীনতা থাকা সত্ত্বেও তা কিছুটা শিথিল। 'মহুয়া' গীতিকায় মহুয়া-নদ্যারচাঁদের প্রেম হলো প্রধান ঘটনা, এর পরিণতিই এ গীতিকার লক্ষ্য। মহুয়া-নদ্যারচাঁদের প্রেম একের পর এক প্রতিবন্ধকতায় আঘাত বা বাধাপ্রাপ্ত হলেও মহুয়ার প্রচেষ্টায় সে বাধা অতিক্রান্ত করে তারা এগিয়ে চলেছে। এবং একটা করে বাধা যখন অতিক্রান্ত হয়েছে, সে ঘটনার রেশ আর পরবর্তী ঘটনার ওপরে তেমন প্রভাব ফেলেনি। হুমর্‍্যার দেওয়া ছুরির সমস্যা যখন মহুয়া অতিক্রম করতে পারলো, তখন সে এগিয়ে গেল সবকিছু ভুলে নদ্যারচাঁদকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার সন্ধানে, পথে বণিকের নৌকোয় ঘটে গেল স্বপ্নের মৃত্যু। সে বিপর্যয় পার করে মহুয়া আবার চলল নদ্যারচাঁদের খোঁজে, মৃতপ্রায় অবস্থায় পেল। অনিশ্চয়তার মধ্যে সন্ন্যাসীর সাহায্যে স্বামীকে যখন সুস্থভাবে ফিরে পেতে চলল, তখনই সন্ন্যাসীর প্রস্তাব আবার এনে দিল চরম বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। সে বিপদ যখন কাটানো গেল, যখন সুখের মুখ দেখল মহুয়া-নদ্যারচাঁদ, তখনই পালঙ্কের বাঁশি। হুমর্‍্যার দল ঘিরে ধরল, প্রতিকূলতার তরঙ্গ একের পর এক অতিক্রম করার পর এবার মহুয়া হুমর্‍্যার দেওয়া বিষ মাখানো ছুরি নিজের বুকে বসিয়ে নিয়ে সকল সমস্যা ও প্রতিকূল তরঙ্গের অবসান ঘটালো। পর মুহূর্তেই হুমর্‍্যার আদেশে নদ্যারচাঁদকেও হত্যা করা হল। এভাবে মহুয়া ও নদ্যারচাঁদের প্রেমের একমুখী গতির অবসান ঘটল কাহিনির মধ্যে। কতকগুলো প্রতিকূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হল তাদের প্রেমের পরিণতিকে। কাহিনির এই একমুখীনতা 'মহুয়া' পালার ব্যালাড ও গীতিকার বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে।

'মহুয়া' গীতিকার কাহিনি ইংরেজি ব্যালাডের মতো সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু সংক্ষিপ্ত না হলেও কাহিনির গঠনের কোন শৈথিল্য নেই। একের পর এক বাধা যখন এসে পড়ছে মহুয়া-নদ্যারচাঁদের জীবনে, সেই বাধা কী করে অতিক্রম করবে-এই টেনশন কাহিনির গতিকে মোটামুটি সচল রেখেছে। করে তুলেছে একমুখী।

ইংরেজি ব্যালাডের রোমহর্ষকতা বা প্রতিশোধস্পৃহা 'মহুয়া' গীতিকায় তেমনভাবে ধরা না পড়লেও, হুমর্‍্যার আচরণ ও লক্ষ্যপূরণের লোভ এবং মহুয়ার জীবনে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার অনিশ্চিত টেনশন গীতিকাকে আরো বেশি কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে। এছাড়া সমগ্র গীতিকাটি মূলত একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ও সুরে গেয়। গীতিকাটির গায়ক কিংবা রচয়িতা মূলত বস্তুনিষ্ঠ থেকে গেছেন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কিংবা আবেগের স্থান সেখানে হয়নি। এসবের ভিত্তিতে বলা যায় 'মহুয়া' পালাটি যুগপৎ গীতিকা ও ব্যালাড উভয় প্রকরণের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে। 'মহুয়া' পালাটি গীতিকা যেমন, আবার ব্যালাড এর ধর্মও তার মধ্যে বিদ্যমান।।

১০০.১৫ সারাংশ

মৈমনসিংহ-গীতিকার উদ্ভব ও প্রচলনক্ষেত্র হলো অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিংহ-জেলা। এ অঞ্চলের মাটি জলের সঙ্গে গীতিকাগুলির রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। অধিকাংশ গীতিকায় উল্লিখিত স্থানগুলির বাস্তবে অস্তিত্ব রয়েছে অথবা ছিল। পাত্রপাত্রীরাও নিতান্ত কাল্পনিক নয়, তাদের অধিকাংশের বাস্তবভিত্তি স্বীকৃত। 'কাজলরেখা' অবশ্য রূপকথা। এ অঞ্চলের নদ-নদী, পাহাড়, অরণ্য, পশু-পাখি, মানুষ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির উল্লেখ গীতিকাগুলিতে লভ্য।

অঞ্চলটি হাজং অধ্যুষিত। হাজং একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। হাজং সম্প্রদায় মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা এ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। নারীর সর্বময় কর্ত্রীত্ব এ সমাজে দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব গীতিকাগুলিতে বিদ্যমান।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত 'মহুয়া' গীতিকাটি অতুলনীয়। কাহিনির চমৎকারিত্বে, কবিত্ব-সৌন্দর্যে, নাট্যলক্ষণে গীতিকাটি বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছে। মহুয়া চরিত্রটি তো অবিস্মরণীয়। সমগ্র সর্বযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিত্রটি দ্বিতীয় রহিত।

নায়কের নদ্যারচাঁদ নামকরণে, জলের ঘাটে নায়ক-নায়িকার প্রণয়-মিলনে, বাঁশির অনুষঙ্গে এবং নদ্যারচাঁদকে পালঙ্ক সইয়ের 'নাগরকালা' রূপে অভিহিতকরণে বৈষ্ণব প্রভাব বিদ্যমান।

পাশ্চাত্য ব্যালাডের আদর্শে 'মহুয়া' গীতিকাটির আয়তন অবশ্যই সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এর কোনও অংশই অপ্রয়োজনীয় বা ক্লান্তিকর নয়। গীতিকা হিসেবে যে উপভোগ্য তাতেও সন্দেহ নেই। একে ভারতীয় ব্যালাড হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে, সার্থক ট্র্যাজেডি সৃষ্টির কোন উদাহরণ নেই। এর মুখ্য কারণ, ঐ সময় পরিসরে রচিত সাহিত্যের ধর্মনির্ভর বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বাংলা সাহিত্যে অভিনব এবং ব্যতিক্রমী। সার্থক ট্র্যাজিক রস সৃষ্টির মাধ্যমে এই গীতিকাগুলি যে স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তার অন্যতম কারণ, এর জীবন-মুখিতা।

১০০.১৬ অনুশীলনী - ১

১। **সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন —**

(ক) গীতিকা বলতে বোঝায় —

- ☐ লোকনাট্য
- ☐ আখ্যানগীতি
- ☐ লোকক্রীড়া

(খ) বাংলা গীতিকা হলো —

- ☐ বর্ণনাপ্রধান
- ☐ ক্রিয়াপ্রধান
- ☐ উপদেশাত্মক

২। **নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) গীতিকা কাকে বলে?

(খ) সাধারণত গীতিকার বিষয়বস্তু কি হয়?

(গ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গীতিকার কি কি প্রতিশব্দ প্রচলিত?

(ঘ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কোন অঞ্চলে প্রচলিত?

(ঙ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহে কার কার ভূমিকা আছে?

(চ) গীতিকা কোন্ বৈশিষ্ট্যে ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকের সমধর্মী?

৩। **নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ**

(ক) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহের ইতিহাস বিবৃত করুন।

(খ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র গীতিকাগুলি কি চন্দ্রকুমার দে-র রচনা? এ প্রশ্ন ওঠার কারণ কি?

(গ) বাংলা গীতিকা ও পাশ্চাত্য ব্যালাডের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(ঘ) গীতিকার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করুন।

(ঙ) গীতিকার কথক কিংবা গায়ককে কোন্ কোন্ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়? — আলোচনা করুন।

(চ) কোন্ কোন্ দিক থেকে গীতিকায় নাট্যলক্ষণ দেখা যায়, আলোচনা করুন।

১০০.১৭ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী - ১

১। (ক) আখ্যানগীতি

(খ) বর্ণনাপ্রধান

২। আলোচনার পূববর্তী অংশসমূহ (১০০.৩, ১০০.৫, ১০০.৬, ১০০.৭ ও ১০০.৮) দেখুন।

৩। আলোচনার পূববর্তী অংশসমূহ (১০০.৩, ১০০.৪, ১০০.৬, ১০০.৭) দেখুন।

১০০.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। দীনেশচন্দ্র সেন ঃ মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯২৩)

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড (১৯৬২)

৩। Dusan Zbavitel : Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and problem of their authenticity (1963)

৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত — মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯৯১)

৫। ক্ষেত্রগুপ্ত ঃ প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন (১৯৯৬)

একক ১০১ ❐ মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য পালা

গঠন ঃ

১০১.১ উদ্দেশ্য
১০১.২ প্রস্তাবনা
১০১.৩ মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যান্য পালা
১০১.৪ মলুয়া
১০১.৫ চন্দ্রাবতী
১০১.৬ কমলা
১০১.৭ দেওয়ান ভাবনা
১০১.৮ দস্যু কেনারামের পালা
১০১.৯ রূপবতী
১০১.১০ কঙ্ক ও লীলা
১০১.১১ কাজলরেখা
১০১.১২ দেওয়ান মদিনা
১০১.১৩ মৈমনসিংহ গীতিকায় নাট্যলক্ষণ
১০১.১৪ মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী
১০১.১৫ মৈমনসিংহ গীতিকায় পুরুষ
১০১.১৬ বাংলা সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা
১০১.১৭ সারাংশ
১০১.১৮ অনুশীলনী
১০১.১৯ উত্তর সংকেত
১০১.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১০১.১ উদ্দেশ্য

মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্যান্য গীতিকাগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। এগুলির মধ্যে 'কাজলরেখা' অবশ্য রূপকথা। 'দস্যু কেনারামের পালা' নরঘাতক এক দস্যুর হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনি। অন্য সাতন গীতিকা প্রেমমুখ্য। প্রেমের বহুবিচিত্র রূপায়ণ এগুলিতে লভ্য। 'মহুয়া' গীতিকাটি নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। অন্যগুলি নিয়ে এই পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা থেকে গীতিকাগুলি সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

১০১.২ প্রস্তাবনা

'মলুয়া' গীতিকাটিতে মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেমের উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতি চিত্রিত। কাহিনিটি বিয়োগান্তক। 'চন্দ্রাবতী' গীতিকার নায়িকা চন্দ্রাবতী সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা, অদ্ভুত রামায়ণ রচয়িত্রী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মহিলা কবি। তাঁর জীবনের বেদনা

বিধুর কাহিনি গীতিকাটির আশ্রয়। 'কমলা' গীতিকার নায়িকা কমলা অভিজাত মানিক চাকলাদের কন্যা, ভাগ্য-বিড়ম্বিতা। অসাধারণ তাঁর মানসিক স্থৈর্য। সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে সে জয়ী হয়। রাজপুত্র প্রদীপকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। গীতিকা শুভান্তক। 'দেওয়ান ভাবনা'-র নায়িকা সুনাই দেওয়ান ভাবনার অত্যাচারের শিকার হয়, স্বামী-শ্বশুরের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন করে, ক্ষুণ্ণ হতে দেয়না তার নারীত্বের মর্যাদা। তার ত্যাগের মহিমায় গীতিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'দস্যু কেনারামের পালা'-য় মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের চরিত্র মাধুর্যে নিষ্ঠুর নরঘাতক দস্যু কেনারামের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। 'রূপবতী' গীতিকাটি প্রকৃতিতে রূপকথা জাতীয়। 'কঙ্ক ও লীলা' বিয়োগান্তক। সমাজপতিদের মূঢ়তা ও অবিবেচনায় লীলার অকালমৃত্যু ঘটেছে। 'দেওয়ান মদিনা'-য় মদিনার ত্যাগ ও প্রেমের যে মহিমা কীর্তিত হয়েছে তা অবিস্মরণীয়।

অধিকাংশ গীতিকাই নাট্যলক্ষণ যুক্ত। তার বৈচিত্র্যও কম নয়। গীতিকাগুলিতে যে সমস্ত নারী ও পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছে সেগুলি নিয়েও আলোচনার অবকাশ আছে।

একহিসাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র আবির্ভাব স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কোনও না কোনও দিক থেকে গীতিকাগুলির সম্পর্ক রয়েছে। এসবই পরবর্তী আলোচনায় পরিস্ফুট হবে।

১০১.৩ মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্যান্য পালা

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্যান্য পালা বলতে বোঝায় — মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ান মদিনা। প্রতিটি পালাই আকর্ষণীয়।।

১০১.৪ মলুয়া

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রধান রস মধুর। প্রেমই অলৌকিক কাব্যশাখার প্রাণ। কোন ঐশ্বরিক বা অলৌকিক প্রেম নয়, সম্পূর্ণ মানবিক রাগ-অনুরাগে রঞ্জিত মৈমনসিংহ-গীতিকার পালাগুলো। 'মলুয়া' গীতিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ পালা মলুয়া ও চাঁদবিনোদের ভালোবাসাকেন্দ্রিক। এখানেও প্রেম অভিমানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত এবং আত্মহননের পথেই মুক্তির রাস্তা খুঁজে নেয়।

কাহিনিটি এই রকম - কুড়া পাখি শিকারী চাঁদ বিনোদ পাখি শিকারে ক্লান্ত হয়ে জলের ঘাটে গাছের ছায়াতে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে দেখে জল আনতে যাওয়া মলুয়া। ঘুমন্ত চাঁদ-বিনোদকে দেখে মলুয়ার ভালো লেগে যায়, সন্ধ্যার আগে ক্লান্ত ঘুমন্ত বিদেশিকে কি করে ঘুম ভাঙাবে মলুয়া! ভিনদেশিকে জাগাতে তাই মলুয়া জলের কলসীতে জলভরার আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজে বিনোদের ঘুম ভাঙলে মলুয়া তাকে তাদের বাড়ির পথ বলে দিয়ে, তাদের বাড়িতে অতিথি হওয়ার নিমন্ত্রণ করলে বিনোদ তাদের বাড়িতে সে রাত্রের অতিথি হয়। ইতোমধ্যে মলুয়াকে দেখে চাঁদবিনোদ বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার দারিদ্র্য হয় বাধা। অবশেষে চাঁদ বিনোদ পরিশ্রম করে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে মলুয়াকে বিয়ে করে। কিন্তু এবারও বিধি বিরোধিতা শুরু করে। মলুয়া-চাঁদবিনোদের দাম্পত্যে ভেসে আসতে থাকে প্রতিকূলতার আঘাত। গ্রামের মুসলমান কাজী মলুয়ার রূপে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু নানাভাবে মলুয়াকে প্রলুব্ধ করে পেতে চেয়েও যখন ব্যর্থ হয়, তখন

সে অ্য রাস্তা ধরে। বিয়ের সময় চাঁদ বিনোদ দেওয়ানকে নজরানা দেয়নি এই অজুহাতে দেওয়ানের কান ভারী করে, চাঁদবিনোদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে পূর্বের দারিদ্র্য দশা চাঁদবিনোদকে আবার গ্রাস করে। অর্থের সন্ধানে সে বিদেশে যাত্রা করে। শাশুড়িকে নিয়ে মলুয়ার অনাহারে ও হাজার প্রলোভনের বাধা অতিক্রম করে বহুকষ্টে দিন কাটতে থাকে। অথচ মলুয়া একবারের জন্যও সচ্ছল পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না। তার দাদা ও ভায়েরা বারবার তাকে বলা সত্ত্বেও। এহেন অবস্থায় অর্থ উপার্জন করে চাঁদবিনোদ বেশ কিছুদিন পর বাড়িতে ফিরলে স্বার্থপূরণে ব্যর্থ কাজী এবার দেওয়ানের কাছে চাঁদ-বিনোদের নামে অভিযোগ আনে বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী রাখার এবং তাকে ঠিকমতো দেওয়ানের কাছে সমর্পণ না করার। দেওয়ানের বিচারে চাঁদ বিনোদের প্রাণ দণ্ডাদেশ হলে মলুয়া তার ভায়েদের সাহায্যে বিনোদকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু রক্ষা পায় না মলুয়া, এবার দেওয়ান তাকে ধরে নিয়ে যায়। নিজের বিপদ জেনে মলুয়া বুদ্ধি করে দেওয়ানকে দিয়ে কাজীকে শাস্তি দেওয়ায়। তারপর দেওয়ান তাকে চাইলে মলুয়া ব্রতের ছলনা করে নিজেকে এক বছর রক্ষা করে, বছর পার হওয়ার মুখে মলুয়া দেওয়ানকে নিয়ে নৌকো ভ্রমণে গিয়ে তার পোষা কুড়া পাখির সাহায্যে ভায়েদের কাছে খবর পাঠিয়ে দেওয়ানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু কাঙি(ত সুখ ভাগ্যহীনা মলুয়ার কপালে মেলে না। মুসলমানের ঘরে বৎসরকাল অতিবাহিত করার দুর্নামে আত্মীয়-স্বজনদের চাপে চাঁদবিনোদ মলুয়াকে পরিত্যাগ করে। আপনজনেদের প্ররোচনায় চাঁদবিনোদ আবার বিয়ে করে। এর মধ্যে সর্প দংশনে চাঁদবিনোদের মৃত্যু হলে মলুয়ার প্রয়াসে সে আবার প্রাণ ফিরে পায়। মলুয়া স্ত্রী হিসেবে নয়, দাসীর মতো চাঁদবিনোদের ঘরে থাকতে চাইলে মামার আপত্তিতে চাঁদ যখন মলুয়াকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, তখন অভিমানিনী মলুয়া নৌকো চড়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে নৌকো জলে ডুবিয়ে মৃত্যুকেই বেছে নেয়। এখানে গীতিকার সমাপ্তি।।

১০১.৫ চন্দ্রাবতী

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কাহিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাস্তব। বিশেষ করে গীতিকাগুলো কোন বাস্তব ঘটনা কিংবা কিংবদন্তীর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি। মৈমনসিংহ-গীতিকার অন্যান্য পালার তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব এবং সত্য ঘটনাভিত্তিক এমনই একটি পালা হলো 'চন্দ্রাবতী'।

'চন্দ্রাবতী' পালাটির প্রণেতা নয়ানচাঁদ ঘোষ। পালাটি শুধু সত্যতার নিরিখে নয়, সংক্ষিপ্ততায় ও নাট্যগুণে অন্যান্য পালার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

'চন্দ্রাবতী' গীতিকার সূচনা নাটকীয়ভাবে। ছেলেবেলায় পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের পরিচয় ঘটে। চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। ক্রমে উভয়ে বড়ো হয়। জয়ানন্দ একদিন চন্দ্রাবতীকে চিঠি লিখে জানায়, আর সে ফুল তুলতে আসবে না, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাই বিধায় নেওয়ার আগে সে যে চন্দ্রাবতীকে ভালোবাসে সে কথা জানিয়ে যায়। জানতে চায় চন্দ্রাবতী ভালোবাসে কি না! কিন্তু চন্দ্রাবতী কি করে জানাবে, বাড়িতে বাবা আছেন, বাবাই তার অভিভাবক। তাই নিজের মনে ইচ্ছা থাকলেও চন্দ্রাবতী মুখ ফুটে বলতে পারে না। মনে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়ে জয়ানন্দ চলে যায়, গোপন ভালোবাসার রং মনের মধ্যে ধারণ করে হাজার স্মৃতির সরণী বেয়ে চন্দ্রাবতীর দিন কাটে। ইতোমধ্যে ঘটক আসে বংশীবদনের বাড়িতে। ঘটক যে পাত্রের সন্ধান দেয় এবং কুষ্ঠি বিচার করে যে পাত্রকে মনোনীত করা হয়, সে পাত্র আর কেউ নয় স্বয়ং জয়ানন্দ। শ্রোতা থেকে শুরু করে পাঠককুলও বোধহয় খুশী হয় — জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর বিয়ের খবর শুনে। কিন্তু মানুষের ভাবনা ও বিধাতার কাজের মধ্যে মিল তো সব সময় ঘটে না। তাই তীরে এসে তরী ডোবে, হাতিরও পা

টলে এবং মুনিরও মতিভ্রম হয়। বিয়ের দিন সমস্ত আয়োজন যখন ঠিকঠাক হঠাৎ খবর আসে জয়ানন্দ অন্যত্র বিয়ে করেছে। এবং সে বিয়ে করেছে এক মুসলিম কন্যাকে। জয়ানন্দের বিয়ের খবরে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে যায় বংশীদাসের সংসারে। সবচেয়ে ভেঙে পড়ে স্বয়ং চন্দ্রাবতী, তার কাছে হঠাৎ শোনা এই খবর জয়ানন্দের সঙ্গে সকল স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। জয়ানন্দের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর সম্পর্কের কথা তারা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। স্মৃতির পাহাড় চন্দ্রাবতীর মনে, অথচ ভালোবাসার ফুল ফুটিয়ে, ভালোবেসে জয়ানন্দ কীভাবে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলো, তা চন্দ্রাবতী ভাবতেই পারছে না। সমস্ত কিছুই তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মনে স্মৃতির পাহাড়, বাইরের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত চন্দ্রাবতীকে পাথরপ্রতিমা করে তোলে। যে জয়ানন্দ এত ভালোবাসতে পারে, সেই জয়ানন্দ যে এতটা আঘাত দিতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি চন্দ্রাবতী। তাই অন্যদের তুলনায় এই দুর্ঘটনায় চন্দ্রাবতীর আঘাত ব্যাপক। অনাহারে অনিদ্রায় তার দিন কাটতে থাকে। পিতা বংশীদাস চন্দ্রাবতীকে অন্য ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে, চন্দ্রাবতী জানায় আজীবন সে অবিবাহিতা থাকবে। বিয়ে আর সে কোনদিনই করবে না। কন্যার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সিদ্ধান্তে পিতা জানান যে, শিবপূজা করে ও রামায়ণ লিখে কন্যা তার বাকী জীবনটা তাহলে অতিবাহিত করুক। পিতার কথা অনুযায়ী চন্দ্রাবতী শিবপূজা করে ও অবসর সময় রামায়ণ লিখে সময় কাটাতে থাকে। অন্যদিকে, বিশ্বাঘাতক জয়ানন্দ রূপমোহে মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করার পর, তার মধ্যে অনুশোচনা দেখা দেয়। যে মোহে সে মুসলিম কন্যাকে বিয়ে করে, সে মোহের রঙ অচিরেই ফিকে হয়ে আসে। সুখ-স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই মোহভঙ্গ হওয়া জয়ানন্দ বুঝতে পারে ফুলের মালা ভেবে সে কালসাপ গলায় পরেছে, তুলসী ভেবে সে শেওড়াকে গ্রহণ করেছে। অমৃত মনে করে গরল পান করেছে। এই মুহূর্তে তার জীবন বিষময়। অনুতপ্ত জয়ানন্দ নিজের সকল ভুল বুঝতে পেরে চন্দ্রাবতীকে পত্র লেখে। তাকে কেবল একবারের মতো চোখের দেখা দেখে নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করতে চায়। নিজের সকল ভুল স্বীকার করে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে কেবল একবার চোখের দেখা দেখতে চায়, তাকে বিয়ে করা তো দূরের কথা একবার ছুঁয়ে অপবিত্র জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে কলঙ্কের ভাগী করতে চায় না। কিন্তু চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের এই পত্রের কথা তার পিতাকে বলল, পিতা বারণ করে দেন জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। একদিন চন্দ্রাবতী যখন মন্দিরের দরজা বন্ধ করে শিবের পূজায় নিরত, তখন পাগল জয়ানন্দ আসে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধ মন্দিরের দরজায় আঘাত করে একাধিকবার চন্দ্রাবতীর নাম ধরে ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অভিমানী জয়ানন্দ মন্দিরের গায়ে তার আসার কথা লিখে চলে যায়। পূজার শেষে চন্দ্রাবতী মন্দিরের দরজা খুলে বাইরে এসে মন্দিরের দরজার ওপরে লেখা পড়ে বুঝতে পারে জয়ানন্দ এসেছিল, তার ছোঁয়ায় মন্দির অপবিত্র হয়ে গেছে, এবং সেই মন্দিরে থাকার জন্য সেও অপবিত্র হয়ে গেছে। অতএব জলের কলসী নিয়ে সে চলে নদীর জলে স্নান করতে। নদীর কাছে পৌঁছে চন্দ্রাবতী দেখে নদীতে জোয়ার এসেছে, জোয়ারের জলের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মতো জয়ানন্দের দেহ ভাসছে। নদীর জলে জয়ানন্দের দেহ, আর পারের ওপর উন্মাদিনী চন্দ্রাবতী চোখের জলে ভাসে। জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ বোঝার ক্ষমতা কারুর নেই। জীবনের এই অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েই গীতিকাটির সমাপ্তি।

১০১.৬ কমলা

মৈমনসিংহ-গীতিকায় 'কমলা' পালাটির বিশেষত্ব হলো তা মিলনান্তক। বিচ্ছেদের অন্ধকার অতিক্রম করে মিলনের আনন্দে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে এ গীতিকায়। কাহিনির শুরু হুলিয়া গ্রামের মানিক চাকলাদারের

সমৃদ্ধির পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে, যদিও মানিক চাকলাদার নয়, তার মেয়ে কমলাই এ গীতিকার মুখ্য চরিত্র। গীতিকাটির মধ্যে মানিক চাকলাদার ও তার মেয়ে কমলা ছাড়া আছে কমলার ভাই সুধন, তাদের বাড়ির কারকুল নিদান, চিকন গয়লানী, মইষাল, প্রদীপ কুমার ইত্যাদি চরিত্র।

মানিক চাকলাদারের মেয়ে কমলা, যেমন সুন্দরী, তেমনি অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু তার জীবনে হঠাৎ একটা কুচক্র নেমে আসে। বাড়ির কারকুল নিদান কমলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। চিকন গয়লানী নামক কুটনির সাহায্যে সে কমলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। চিকন গয়লানির তেল পড়ার গুণে অনেক ঘরের বউ অনায়াসে স্বামীকে ত্যাগ করে, তার তৈরি পেঁচার মাংসের মন্ত্রপূত বাড়িতে অনেক নারী কুলত্যাগিনী হলে কী হবে, চিকন কমলার কাছে নিদানের প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে প্রহৃত হয়। ব্যর্থ কারকুল এবার শুরু করে চক্রান্ত। মিথ্যা অভিযোগ এনে জমিদারের কাছে নালিশ করে কারকুল। তার অভিযোগের ভিত্তিতে অন্যায়ভাবে বন্দী হতে দেখে কমলা মাকে নিয়ে আশ্রয় নেয় মামার বাড়িতে। কারকুলের ষড়যন্ত্র সেখানেও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে কমলাকে। কারকুল কমলার চরিত্রের ওপর মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগ চাপিয়ে তার মামার কাছে নালিশ করে এবং ভয় দেখায় যে কলঙ্কিনী কমলাকে যারা জায়গা দেবে তাদের গর্দান নেওয়া হবে। ফলে মামার বাড়ির আশ্রয়টুকুও হারাতে হয় কমলাকে। আশ্রয়হারা কমলা একবারের জন্যও মাতুলানীর কাছে অনুরোধ করে না থাকার জন্য। আত্মমর্যাদাবোধে কমলা এবার পথে বেরিয়ে পড়ে। পথে বেরিয়ে পড়া কমলার শান্ত মধুর মুরতি দেখে এক বৃদ্ধ মইষাল তাকে লক্ষ্মীজ্ঞানে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। মইষালের বাড়ি আশ্রয় পেয়ে কমলা বাড়ির মেয়ের মতো নানান কাজ করে। সন্ধ্যায় আলো জ্বালে, গোয়ালে ধোঁয়া দেয়, রান্না করে, বৃদ্ধ মইষালের জন্য খড়ের বিছানা পাতে। এভাবে চলছে যখন, তখন একদিন এক তৃষ্ণার্ত শিকারী মইষালের বাড়িতে এসে জল চায়। শিকারীর নাম প্রদীপকুমার। কমলাকে দেখে মুগ্ধ হয় প্রদীপকুমার। বৃদ্ধ মইষালকে বুঝিয়ে মুগ্ধ প্রদীপকুমার কমলাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। প্রদীপকুমার এক রাজপুত্র। রাজপুত্র প্রদীপকুমারের শত অনুরোধেও কমলা তার পরিচয় দেয় না। সে বলে যে, সময় হলে সে একদিন পরিচয় দেবে। এর মধ্যে একদিন প্রদীপকুমারের বাবা রক্ষাকালীপূজার আয়োজন করলে, সেখানে নরবলির ব্যবস্থা হয়। প্রদীপকুমারের মুখে পিতা-পুত্রকে বলি দেওয়া হবে শুনে কমলার মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এই দুজন মানুষ আর কেউ নয়, তার বাবা ও ভাই। প্রদীপকুমারের কাছে কমলা বায়না করে বলি দেখতে যাওয়ার। সবার সামনে কমলা তার আত্মপরিচয় দানের কথা বলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সে কারকুল, চিকন, মাতুল, মাতুলানী, মইষাল সবাইকে সেখানে হাজির করাতে বলে। সবাইকে হাজির করানোর পর কমলা এক এক করে তার জীবনের সকল ঘটনা তুলে ধরে। কমলার বলা বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীদের মতামত বিচার করার পর দেখা যায় কমলার বক্তব্যই সঠিক। তখন কমলার বাবা-ভাইয়ের পরিবর্তে সে রাত্রে কারকুলকেই শাস্তি স্বরূপ কালীর কাছে বলি দেওয়া হয়। যথাসময়ে সাড়ম্বরে কমলার সঙ্গে রাজকুমার প্রদীপের বিয়ে হয়। এই হল 'কমলা' গীতিকার কাহিনি।

১০১.৭ দেওয়ান ভাবনা

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলোর মুখ্য প্রতিপাদ্য প্রেম। কাহিনির মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও প্রেমের বিচিত্রগতি পালাগুলোর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। তবে, বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য লক্ষিত হয় নারীর আত্মত্যাগে। প্রেমের জন্য নারী যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও যন্ত্রণার কোন সীমাতে পৌঁছতে পারে তা এই গীতিকাগুলোর নারী চরিত্রদের না দেখলে বোঝা যায় না। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের চরম প্রকাশও গীতিকার নায়িকার মধ্যেও দেখা যায়।

দশ বছরের সুনাই পিতৃহীন হয়ে অসহায় অবস্থায় মায়ের সঙ্গে দীঘলহাটিতে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। নিঃসন্তান মামা সুনাইদের পেয়ে খুশী হয়। সুনাইয়ের মামার যজমানি পেশা। নানান জনের সঙ্গে তার পরিচয়। সুনাইয়ের বয়স যখন বারো বছর তখন তার বিয়ের জন্য ঘটকের আনাগোনা শুরু হয়। সুনাই পরমা সুন্দরী। তার মায়ের ইচ্ছা উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে সুনাইয়ের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু পাত্রের সন্ধান যা আসে কাউকেই মায়ের পছন্দ হয় না। এ সময় একদিন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে মাধবের সঙ্গে সুনাইয়ের পরিচয় হয় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়।

এদিকে ঘটে যায় আর এক ঘটনা। বাঘরার মাধ্যমে সুনাইয়ের রূপের কথা শুনে তার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে দেওয়ান ভাবনা। দেওয়ান ভাবনার এ প্রস্তাব বাঘরার মাধ্যমে পৌঁছে যায় সুনাইয়ের মামার কাছে। জমির লোভে মামা রাজি হয়ে গেলে সুনাই মাধবের কাছে সব জানায় এবং বলে মাধব যেন তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে এর মধ্যে একদিন জল আনতে নদীর ঘাটে গেলে সুনাইকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ভাবনার লোকজন। অপহরণ করার পথে মাধবের সঙ্গে দেখা হলে মাধব ভাবনার দলকে পর্যুদস্ত করে সুনাইকে উদ্ধার করে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ ভাবনা এবার প্রতিশোধস্পৃহায় মাধবের বাবাকে বন্দী করে আনলে মাধব যায় বাবাকে মুক্ত করতে। বাবাকে মুক্ত করতে গিয়ে মাধব বন্দী হয়। মাধবের বাবা মুক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরলেন। কিন্তু পুত্রের বন্দী দশায় তাঁর দুঃখের অন্ত নেই। পুত্র শোকে কাতর পিতা এবার নিজস্বার্থের কথা ভেবে পুত্রবধূ সুনাইকে পাঠান ভাবনার কাছে। শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে, স্বামীর মুক্তির কথা ভেবে সুনাই ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে যায়। ভালোবাসার জন্য ত্যাগের কোন্ চরমসীমায় পৌঁছালে এক নারী তার নারীত্বকে পরপুরুষের কাছে সমর্পণ করতে পারে! 'সুনাই গিয়ে আত্মসমর্পণ করলো, অন্যদিকে মুক্তি পেল মাধব। মাধব জানলো না যে তার মুক্তি তারই স্ত্রী সুনাইয়ের বিনিময়ে। মুক্তি পেয়ে মাধব বাড়ি ফিরে আসে সুনাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আনন্দে। অন্যদিকে সুনাই তখন ভাবনার গৃহে বন্দী। ভাবনা যখন মিলনের আকাঙক্ষায় উদ্বেল হয়ে সুনাইয়ের ঘরে প্রবেশ করে, সুনাই তখন নিজের প্রেম, নিজের ভালবাসা ও নারীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখে বিষ পান করে আত্মবিসর্জনে।।

১০১.৮ দস্যু কেনারামের পালা

মৈমনসিংহ গীতিকার প্রায় একঘেঁয়ে বিষয়বস্তুর মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা' এক অভিনব সংযোজন। নরনারীর প্রেম যেখানে মৈমনসিংহ-গীতিকার মুখ্য বিষয়, সেখানে এ পালার উপজীব্য নিষ্ঠুর এক নরঘাক দস্যুর মানসিকতা পরিবর্তনের কাহিনি। নিঃসন্দেহে এ এক ব্যতিক্রমী পালা। মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের প্রাধান্য এক অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য। এ গীতিকায় সেখানে নারী চরিত্র প্রায় বিরল। নারীর প্রেমিকা সত্তা তো নেই-ই। আছে কেবল মাত্র মাতৃরূপ তাও নাথ গীতিকার ময়নামতীর মতো নয়। সাধারণ একটি রূপ। নারী চরিত্র, বলতে কেনারামের মা যশোধরা — খেলারামের স্ত্রী।

খেলারাম এবং যশোধরা স্বামী-স্ত্রী। তাদের মনে দুঃখ, কারণ তাদের কোন সন্তান নেই। সন্তান কামনায় তারা দেবী মনসার কাছে মানসিক করে এবং তাঁর বরে যশোধরার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় কেনারাম। কেনারামের যখন সাত মাস বয়স, তখন কেনারাম মাতৃহারা হয়। মাতৃহীন সন্তানকে মামার বাড়ি নিয়ে যায় খেলারাম। সেখানে অল্প কিছুকাল অবস্থানের পর খেলারাম অসহায় শিশুপুত্র কেনারামকে তার মামার বাড়িতে ফেলে রেখে চলে যায় তীর্থভ্রমণে। মা-বাবার অবর্তমানে শিশু কেনারাম পালিত হতে থাকে মামীর কাছে। কিন্তু কেনারামের এ সুখে বাধ সাধে প্রকৃতি। অনাবৃষ্টির ফলে চাষবাস হয় না, দেখা দেয় আকাল, নিজের প্রাণ বাঁচানো যেখানে দায়, সেখানে অন্যের সন্তান মানুষ করার দায় কে নেবে! তাছাড়া না খেতে দিতে

পেরে ঘরে রাখার তুলনায় যেখানে খেতে পাবে সেখানে পাঠানো ভাল। শুধু তাই নয় সন্তান বিক্রয় করে অন্নের সংস্থান যদি হয় তাহলে তো সোনার সোহাগা। তাই কেনারামের মামী পাঁচকাঠা ধানের বিনিময়ে কেনারামকে বিক্রি করে দেয় এক হালুয়ার কাছে। দুর্ভাগ্যক্রমে হালুয়ার সাত সাতটি পুত্রই দুর্ধর্ষ ডাকাত। এদের সংস্পর্শে কেনারামও হয়ে ওঠে নরঘাতক ডাকাত। জলে-স্থলে ডাকাতি করা ও মানুষ মেরে তার সম্পদ লুণ্ঠন করা কেনারামের কাজ। এই কাজে একদিন কেনারামের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মনসার ভাসান রচয়িতা ও গায়ক দ্বিজবংশীদাসের। নরঘাতী কেনারাম যখন দ্বিজ বংশীদাসের প্রাণ সংহারে উদ্যত, তখন প্রাণভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বংশীদাস কেনারামের সামনে শেষবারের মতো একবার মনসার ভাসান গান গাওয়ার অনুমতি চেয়ে গাইতে থাকলে, তাঁর সুললিত কণ্ঠের সুমধুর গান শুনে কেনারাম অনুতপ্ত হয়। তার কৃত পাপের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে আত্মসমর্পণ করে বংশীদাসের কাছে। বংশীদাস তাকে আশ্বাস ও আশ্রয় দেন। দস্যু কেনারাম দীক্ষিত হয় বংশীদাসের কাছে ডাকাতি করা ছেড়ে এবার তার পেশা হয় মনসামঙ্গল গেয়ে ভিক্ষা করা। ডাকাতি করে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ কেনারাম নদীর জলে বিসর্জন দেয়। এভাবে একজন নরঘাতী ডাকাতের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মানসিক কাহিনি-ই' 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকার বিষয়বস্তু।

কেনারামের কাহিনিতে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির প্রভাব যেন প্রচ্ছন্ন, মনসার বরে কেনারামের জন্মের পিছনে অলৌকিকতার স্পর্শ থাকলেও কেনারামের পালা কিন্তু কোন অলৌকিক কাহিনি নয়। সম্পূর্ণ মানবিক গুণসম্পন্ন মর্ত্য মানুষের সৎপথে ফেরার কাহিনি।।

১০১.৯ রূপবতী

আলোচ্য পালাটি রূপকথা ধর্মী, বর্তমান পালাটি মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালার মতো প্রাক্ বিবাহ পর্বের প্রেমে সমৃদ্ধ নয়। এ পালার দ্বন্দ্বটি অন্যান্য গীতিকার মতো তীব্র নয়। পরিণতির দিক থেকেও এ কাহিনি মিলনান্তক।

কাহিনিটি এই রকম—রামপুরের রাজা রাজচন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে রেখে মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে দেখা করতে দীর্ঘ তিন বছরে ফেরার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। এদিকে কন্যা রূপবতী চোদ্দ বছরে পদার্পণ করেছে। তার বিয়ের জন্য রানী চিন্তিত। কন্যার কথা জানিয়ে রানী মুর্শিদাবাদে রাজা রামচন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠালে চিঠির বিষয় জানতে পেরে স্বয়ং নবাব রূপবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে অবস্থা খুব জটিল হয়ে ওঠে। রাজা রাজচন্দ্র খুব চিন্তায় পড়েন এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন। নবাবের প্রস্তাবে চিন্তিত রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হয়ে জানালেন যে, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি প্রথমেই যার মুখ দেখবেন তার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেবেন। রাজার এই প্রস্তাব শুনে রানী কৌশলে মদন নামে এক ভৃত্যকে পরদিনই ভোরে রাজার শোওয়ার ঘরের দরজায় তামাক নিয়ে উপস্থিত করালেন এবং মদনের হাতেই রানী রূপবতীকে সমর্পণ করালেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচলিত রাজার পক্ষে এ বিয়ে মেনে নেওয়াও সম্ভব হল না। স্বাভাবিক কারণে রূপবতীকে নিয়ে মদন বনে পালিয়ে গেল। সেখানে ভাগ্যক্রমে মদন ও রূপবতী আশ্রয় পেল কাঙ্গালীয়া-জাঙ্গালীয়াদের গৃহের জ্যেষ্ঠ বধূ পুনাইয়ের কাছে। সেখানে থাকতে থাকতে মদন একদিন তার বাবা-মায়ের সন্ধান নেবার জন্য যাত্রা করলে পথে রাজার রক্ষীদের হাতে সে ধরা পড়ল রাজকন্যার অপহরণকারী হিসেবে। মদনের অপরাধের বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল। সেই সময় রাজদরবারে গিয়ে হাজির হলো মদন-রূপবতীর আশ্রয়দাত্রী পুনাই। সে-ই রাজার কাছে জানালো যে মদনের কোন দোষ নেই, স্বয়ং রানীমা তাকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করে রূপবতীকে তার হাতে সমর্পণ করেছেন। পুনাই-এর কথার সত্যতা যাচাই-এরপর নির্দোষ প্রমাণিত মদন মুক্তি

পেল এবং রাজা সমারোহের সঙ্গে কন্যা রূপবতীকে মদনের হাতে সমর্পণ করলেন আনুষ্ঠানিক ভাবে। এইভাবে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটলো মিলনের মধ্যে দিয়ে। রাজা সকালে উঠে যার মুখ দেখবেন তার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, বাড়ির চাকরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে ইত্যাদি প্রসঙ্গ রূপকথাধর্মী। এ গীতিকায়ও মুখ্য বিষয় প্রেম, তবে এর প্রেম মহুয়া, চন্দ্রাবতী, মলুয়া ইত্যাদির মতো নায়িকার জীবন যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তেমনভাবে পরিশুদ্ধ নয়, বিবাহ পরবর্তী এ প্রেম অবশ্য কোনও অংশে দুর্বল নয়।।

১০১.১০ কঙ্ক ও লীলা

ব্যর্থ প্রেমের আর এক করুণ পরিণতির কাহিনি কঙ্ক ও লীলা। কঙ্ক হতভাগ্য আর ব্যর্থ প্রেমে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করে লীলা। কাহিনিতে যদিও লীলার মৃত্যু হয়, কিন্তু চরম ট্র্যাজেডি কঙ্কের। তবে কঙ্ক সে ট্র্যাজেডি উত্তীর্ণ হতে পারে তার স্থিতধী সত্তা দিয়ে।

কাহিনি এই রকম — বিপ্রপুরের ব্রাহ্মণ গুণরাজ খানের পুত্র কঙ্ক। মাত্র ছ'মাস বয়সে কঙ্ক মাতৃহারা হলে পত্নী শোকে গুণরাজ পাগল হয়ে যান, পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ফলে মা ও বাবাকে অকালে হারিয়ে অসহায় কঙ্ক মুরারি ও কৌশল্যা নামক এক চণ্ডাল দম্পতির কাছে লালিত হতে থাকে। কঙ্ক মুরারিকে বাবা এবং কৌশল্যাকে মা বলে ডাকে। কিন্তু এই সুখও কঙ্কের কপালে স্থায়ী হয় না। তার পাঁচ বছর বয়সে মুরারির মৃত্যু হলে শোকে অল্প দিনের মধ্যে কৌশল্যারও মৃত্যু হয়। অভাগা কঙ্কের এ আশ্রয় হারিয়ে গেলে সে এবার আশ্রয় পায় ব্রাহ্মণ গর্গ এবং ব্রাহ্মণী গায়ত্রীর কাছে। ব্রাহ্মণী গায়ত্রী কঙ্ককে সন্তানতুল্য স্নেহ করতেন, কিন্তু সে স্নেহও কঙ্কের কপালে সইল না। গায়ত্রী অকালে মারা গেলেন। তবু কঙ্ক থেকে গেল গর্গের আশ্রয়েই। সেখানে গর্গের কন্যা লীলার সঙ্গে বালক ও লীলা ভাই-বোনের মতো বড় হতে থাকলো। কিন্তু বাল্যের এই সখ্য বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগে পরিণত হলো। গর্গের গৃহে লালিত হওয়া কঙ্ক গর্গকে গুরু মেনে তাঁর কাছে শাস্ত্র চর্চা করে। নানান শাস্ত্র অলঙ্কারে তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। কঙ্ক-লীলার কাহিনি কচ ও দেবযানীর কথা স্মরণ করায়। কঙ্ক নানান গুণে গুনান্বিত। সে শাস্ত্রে পারদর্শী, বারোমাসী ও ফরমাসী গানে তার জুড়ি মেলা ভার, বাঁশি বাজানোতেও কঙ্ক ওস্তাদ। রূপেও সে অসাধারণ সুন্দর। এহেন কঙ্ক গুরুগৃহে শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি গর্গের গরু নিয়ে মাঠে চরাতে যেত। পথ চেয়ে বসে থাকতো লীলা। কঙ্ক না ফেরা পর্যন্ত, তাকে খেতে না দিয়ে লীলা কোনভাবে খেত না। গোচারণ থেকে কঙ্ক ফিরলে লীলা তাকে পাখার বাতাসে ক্লান্তি দূর করায়। কঙ্ক যতক্ষণ বাইরে থাকে লীলা বিরহে কাঁদে। এমত অবস্থায় গোচারণে গিয়ে একদিন কঙ্কের সঙ্গে দেখা হয় এক পীরের। কঙ্কের কণ্ঠস্বর, তার রূপ, তার কবিত্ব শক্তি ও ভক্তিভাবে মুগ্ধ পীর। পীরের কাছে দীক্ষা নিল কঙ্ক। তাঁর কাছে কালাম শিক্ষা হল কঙ্কের। গুরুর প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় গুরুর আদেশে সত্যপীরের পাঁচালি রচনা করলো সে। কঙ্ক চরিত্রের এই ঔদার্যমণ্ডিত দিক-ই তার জীবনের ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান কারণ। কঙ্কের এই ইসলামীপ্রীতি গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুদের কোপের কারণ হলো। তারা কঙ্ককে সমাজচ্যুত করলে কঙ্কের প্রতি স্নেহশীল গর্গ তাকে সমাজে ফিরিয়ে আনতে চাইলে রক্ষণশীল হিন্দুরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা প্রচার করলো কঙ্ক শুধু চণ্ডাল পুত্র নয়, সে মুসলমান পীরের কাছে দীক্ষিত। এহেন ছেলেকে গর্গের কন্যা লীলা প্রেম নিবেদন করেছে। এ অপপ্রচার যখন গর্গের কানে পৌঁছাল, গর্গ সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে নিজের ধৈর্য ও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। তিনি কঙ্ক ও লীলাকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। সেই উদ্দেশ্যে কঙ্কের খাদ্যে দিলেন বিষ মিশিয়ে। লীলা তা দেখতে পেয়ে কঙ্ককে সেই খাদ্য না খেতে দিয়ে তাকে চলে যেতে বললো।

গৃহত্যাগের পূর্বে কঙ্ক বারবার লীলাকে বলে গেল পিতৃতুল্য গুরু গর্গের যেন কোন অযত্ন লীলা না করে, তাকে যেন যত্নে রাখে, দেবতাদের প্রতি তার ভক্তি যেন অটুট থাকে। কঙ্ক গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর গর্গ

নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন, বুঝতে পারলেন কঙ্কের প্রতি তিনি অবিচার করেছেন। কঙ্কের খোঁজে তিনি শিষ্যদের পাঠালেন। এদিকে কঙ্কের বিরহে লীলা অন্নজল ছেড়ে শয্যাশায়িনী। তার ওপর গর্গের শিষ্যদ্বয় বিচিত্র- মাধব কঙ্ককে খুঁজতে গিয়ে দু'দুবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর লোক মুখে রটে গেল কঙ্ক জলে ডুবে মারা গেছে। যে আশা নিয়ে বেঁচে ছিল লীলা তা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তখন জীবনের প্রতি সকল আকর্ষণ হারিয়ে তিল তিল করে লীলা মৃত্যুকে বেছে নিল। কঙ্ক যখন ফিরে এলো তখন লীলার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লীলার সঙ্গে আর দেখা করার সুযোগ নেই। জীবনের কঠিন ট্র্যাজেডি কঙ্ক ও লীলার সাথে জীবন-মৃত্যুর একটা হাইফেন হয়ে থেকে গেল। কঙ্ক কেবল উদার ছিল না, তার ছিল অসাধারণ সংযম। চিতা জ্বেলে, তাতে লীলাকে শায়িত করে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে শেষ সম্মান জানিয়ে অসহায় গর্গকে নিয়ে কঙ্ক চলে গেল নীলাচলে। এই হল 'কঙ্ক ও লীলা'র কাহিনি।

১০১.১১ কাজল রেখা

'কাজলরেখা' গীতিকাটির কাহিনি বাস্তব ঘেঁষা নয়, রূপকথাধর্মী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শিষ্টধারার পরিপ্রেক্ষিতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিষয়বস্তু অনেক বাস্তব এবং মানবিক। কিন্তু সে তুলনায় 'কাজলরেখা' গীতিকাটি প্রায় পুরোপুরি রূপকথার কাহিনি। রূপকথার একাধিক মোটিফ গীতিকাটিতে কেবল ব্যবহৃত হয়নি, এর আদ্যোপান্ত রূপকথারই মতো। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'এই গাথাটি অতিরিক্ত ঘটনাপ্রধান এবং গাথাকাব্য অপেক্ষা রূপকথার লক্ষণই ইহাতে অধিক।' কেউ কেউ আবার এটি রূপকথা শ্রেণীর রচনা বলে গাথা সাহিত্য থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 'কাজলরেখা' যেহেতু 'মদনকুমার' ও 'মধুমালা'র মতো পুরোপুরি গদ্যে রচিত নয়, তাই 'কাজলরেখা'কে গীতিকা সাহিত্য থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া চলে না। মোটকথা 'কাজলরেখা' মৈমনসিংহ গীতিকা ধারায় এক অভিনব সংযোজন-এর বিষয়বস্তু এবং গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত হওয়ার জন্যে।

'কাজলরেখা' গীতিকার কাহিনি এই রকম — সাধু ধনেশ্বরের কন্যা কাজলরেখা। অপরূপ তার সৌন্দর্য। কিন্তু ভাগ্য তার বিপরীত। একদিন এক সন্ন্যাসীর দেওয়া শুকপাখি ধনেশ্বরকে জানায় যে, মরা স্বামীর সঙ্গে কাজলরেখার বিয়ে হবে। পাখিটি বণিককে পরামর্শ দেয় ধনেশ্বর যেন কাজলরেখাকে তার পুরীতে না রেখে বনে দিয়ে আসে। কন্যার ভবিতব্যে চিন্তান্বিত পিতা বাণিজ্যের নাম করে কন্যাকে নিয়ে গেলেন বনে। বনে কাজলরেখাকে রেখে অঙ্গার আগে তার বাবা তাকে বলে এসেছিলেন যে, তার ভাগ্যে মৃত স্বামীর সঙ্গে বিয়ে আছে সে যেন তা মেনে নেয়। বনে রেখে আসার পর কাজলরেখা বনের মধ্যে একটা মন্দির দেখতে পেয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলে মন্দিরের দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল। মন্দিরে বন্দিনী কাজালরেখা দেখল সর্বাঙ্গে সূঁচবিদ্ধ মৃত একটি কুমার মন্দিরের মধ্যে শায়িত আছে। বাবার কথা স্মরণ করে মৃতদেহকে স্বামী মনে করে মেনে নিলে মন্দিরের দরজা কিছুক্ষণ পরে খুলে গেল। এক সন্ন্যাসী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। যাকে স্বামী মনে করে মেনে নিলো, তার প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র অবলম্বন ভেবে কাজলরেখা সন্ন্যাসীর পায়ে পড়ল। সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে জানালো মৃত ব্যক্তির সঠিক পরিচয় এবং তার বেঁচে ওঠার প্রকৃত রহস্য। মৃত ব্যক্তিটি আসলে একজন রাজপুত্র। সন্ন্যাসী কাজলরেখাকে বলল, সে যেন রাজপুত্রের শরীরের সকল সূঁচ তুলে, চোখের সূঁচ দুটো না তোলে। সন্ন্যাসী কয়েকটা গাছের পাতা দিয়ে গেল এবং বলে গেল শরীরের সকল সূঁচ তোলার পর চোখের সূঁচ দুটি তুলে এই গাছের পাতার রস দিলে মৃত রাজপুত্র বেঁচে উঠবে। সেই সঙ্গে সন্ন্যাসী সাবধান করে দিয়ে গেল যে, কাজলরেখা যেন নিজের থেকে রাজকুমারকে তার পরিচয় না দেয়, তাহলে সে বিধবা হবে। এক ধর্মমতি শুকপাখি রাজপুত্রের কাছে কাজলরেখার পরিচয় দিয়ে দেবে।

অসীম ধৈর্য কাজলরেখার, সন্ন্যাসীর সকল কথা বর্ণে বর্ণে পালন করতে সে টানা সাতদিন ধরে অনাহারে থেকে তার মৃত স্বামীর দেহের সকল সূঁচ তুলে ফেলল। আটদিনের দিন কাজলরেখা রাজপুত্রের চোখের সূঁচ দুটো বাকি রেখে মন্দির থেকে স্নানের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। বন থেকে বেরিয়ে কাজলরেখা দেখল, এক দরিদ্র পিতা অন্নসংস্থানের আশায় তার কন্যাকে বিক্রি করতে এসেছে। সমব্যথী, ভাগ্যহীনা কাজল মেয়েটির দুঃখে ব্যথিতা হয়ে তার হাতের কঙ্কনের বিনিময়ে মেয়েটিকে কিনে নিয়ে তাকে রাজপুত্র সম্পর্কিত সকল কাহিনি আগামী সুখের আনন্দে বলে দিয়ে তাকে মন্দিরে পাঠিয়ে স্নান করতে গেল। আর বলল, দাসীটি যেন পাতার রস করে রাখে, সে স্নান করে গিয়ে রাজপুত্রের চোখে দেবে। অকৃতজ্ঞ দাসী রাজপুত্রের চোখের সূঁচ তুলে পাতার রস দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'ল। ভাগ্যবিড়ম্বিতা কাজলরেখার জীবনের দ্বিতীয় যন্ত্রণা পর্ব শুরু হ'ল। সে স্নান করে এসে তার দাসীর কৃতকর্ম দেখে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল, তার কঙ্কন দিয়ে কেনা দাসী কাজলরেখার পরিচয় দিল রাজপুত্রের সামনে কঙ্কন-দাসী বলে। সন্ন্যাসীর পরামর্শে কাজলরেখা দাসীর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিবাদমুখর হ'য়ে নীরবতা অবলম্বন করলো।

রাজকুমার তার রাজ্যে ফিরে এল। নকলরানী দিব্যি রাজসুখ ভোগ করতে লাগলো আর কাজলরেখা করতে থাকলো দাসীগিরি। এদিকে রাজকুমার আকৃষ্ট হ'ল কাজলরেখার প্রতি। সে জানতে চায় কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর পরামর্শে কাজলরেখা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর মধ্যে রাজপুত্র দেশ ভ্রমণে যাবে। নকল রানি তার পছন্দমাফিক নানান জিনিসের ফরমাস দিল, কাজলরেখা বলল একটি ধর্মমতি শুকপাখি আনার জন্যে। শুকপাখি এলো। এদিকে রাজপুত্র কাজলরেখার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। নকল রানী ও রাজকুমারের বন্ধু কাজলরেখা সম্পর্কে রাজপুত্রকে সন্ধিগ্ধ করে তুললো। দু'জনে মিলে চক্রান্ত করে কাজলরেখার ঘরের দরজায় সিঁদুর লেপে দিয়ে চারটি পায়ের পাতা এঁকে দেয়। রাজপুত্র নকলরানীর প্ররোচনায় কাজলরেখার কাছে সিঁদুরের রহস্য জানতে চাইলে সে শুকপাখিকে সাক্ষী মানল। শুকপাখি রাজপুত্রকে পরামর্শ দিল কাজলরেখাকে বনবাসে পাঠানোর জন্য। রাজকুমারের বন্ধুর ওপর দায়িত্ব পড়ল কাজলরেখাকে বনে পাঠানোর। যাওয়ার আগে কাজলরেখা রাজকুমারের কাছে প্রার্থনা করল মৃত্যুর আগে তাকে যেন একবার দেখতে পায়। কাজলরেখাকে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়ার পথে রাজপুত্রের বন্ধু সরাসরি কাজলরেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে সতীত্ব প্রমাণের জন্য সমুদ্রের মাঝে চড়া প্রার্থনা করলে সত্যি সত্যি চড়া পড়ে সমুদ্রে। সেখানেই কাজলরেখাকে ফেলে রেখে রাজপুত্রের বন্ধু চলে যায়। এদিকে কাজলরেখার ভাই ওই পথে বাণিজ্য করতে গিয়ে কাজলরেখাকে দেখতে পায়। কিন্তু নিজের বোন বলে চিনতে পারে না। জীবনের এমন ট্র্যাজেডি যে, কাজলরেখার ভাই তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাজলরেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে চরম যন্ত্রণার মধ্যে কাজলরেখা শুকপাখিকে তার পরিচয় দিতে বলে। শুকপাখি আনুপূর্বিক সকল কথা জানালে কাজলরেখার ভাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাজলরেখার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। শুকপাখির কথা শোনার পর কাজলরেখার দীর্ঘ বারো বছরের ত্যাগ, তিতিক্ষার অবসান ঘটে। কঙ্কন দাসীর শাস্তি হয়। কাজলরেখা তার স্বামীকে ফিরে পায়।

১০১.১২ দেওয়ানা মদিনা

গীতিকাটির কাহিনি এই রকম— সোনাফর দেওয়ানের দুই ছেলে আলাল এবং দুলাল। আলাল-দুলালের শৈশবে তাদের মা মারা যান। মৃত্যুর আগে সোনাফরের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় স্বামীর কাছে তাঁর মৃত্যুর পর তার স্বামী যাতে বিয়ে না করেন সেই অনুরোধ করে যান। স্ত্রীকে কথা দিয়ে সোনাফর মাতৃহারা দুই সন্তানকে অধিক স্নেহ দিয়ে মানুষ করতে থাকেন। কিন্তু একই সঙ্গে নিজের দেওয়ানী সামলানো এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের দেখভাল

করার কাজে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সোনাফরকে। ফলে সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হন সোনাফর। তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন। নিজের সুখের জন্য নয়, দুই শিশুসন্তানের দেখাশোনার জন্য সোনাফরের দ্বিতীয় বিয়ে। কিন্তু এইখানেই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীকে সোনাফর যতটা না ভালোবাসতেন তার অধিক ভালোবাসতেন তাঁর শিশু সন্তানদের। ফলে আলাল-দুলালের বিমাতা এসে প্রথমে তাঁর সতীন পুত্রদের যে ভাবে স্নেহ করতেন, তা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। প্রথমে যে স্নেহ অকৃত্রিম ছিল, তা ধীরে ধীরে অভিনয়ে এ পরিণত হয়। আলাল-দুলালের বিমাতা বুঝতে পারেন স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার পথে আলাল-দুলালই কাঁটা। অতএব, তাদের সরাতে হবে। বিমাতার ভয়ে সোনাফর আলাল-দুলালকে সব সময় নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করতেন। এবার তাদের সৎমা ছলনার সাহায্য নিতে শুরু করলেন। আলাল-দুলালকে অধিক স্নেহ দেখাতে শুরু করলেন। সোনাফর তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর ছলনার ফাঁদে পা দিলেন। এদিকে আলাল-দুলালের বিমাতা জল্লাদকে 'বিশপুড়া জমিবাড়ি' দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের হত্যা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করল। তারপর একদিন নৌকাবাইচ দেখতে যাওয়ার নাম করে সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীতে আলাল-দুলালকে জল্লাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল বর্ষার ভরা নদীতে। জল্লাদ একটু দয়া পরবশ হয়ে শিশু দুটিকে হত্যা না করে কাজলকান্দার হীরাধর ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে আলাল পালিয়ে দেওয়ান সেকেন্দরের আশ্রয়ে আসে। আলাল তার কর্মপটুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা দিয়ে সেকেন্দরের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। সেকেন্দরের লক্ষ্য হয় তাঁর দুই কন্যার এক কন্যার সঙ্গে আলালের বিয়ে দেবেন। বুদ্ধিমান আলাল পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে সেকেন্দারের কাছে পাঁচশ শ্রমিক ও দু'শ সৈন্য চেয়ে নিয়ে বান্যাচঙ্গে নতুন বাড়ি নির্মাণ করল এবং পিতৃঅধিকার দখল করলো।

অন্যদিকে দুলাল কাজলকান্দার হীরাধন ব্যাপারীর বাড়িতে থাকে। সেখানে সে হীরাধন ব্যাপারীর মেয়ে মদিনাকে বিয়ে করে। মদিনাকে বিয়ে করার জন্য দুলাল শ্বশুরের কাছে থেকে পেয়েছিল যৎসামান্য জমি। সেই জমিতে চাষবাস করে দুলাল ও মদিনার সংসার কোন ভাবে চলে যেত। সংসারে অর্থের ও সচ্ছলতার অভাব পূরণ হয়ে যেত ভালোবাসা ও প্রেমে। দুলাল ও মদিনার পরস্পরের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। সেই অনুরাগের ফসল সুরুজ কামাল - তাদের একমাত্র সন্তান। দুলাল চাষের কাজে গেলে মদিনা পথ চেয়ে বসে থাকে - দুলাল ধান নিয়ে এলে মদিনা কুলো দিয়ে ধান ঝাড়ে। দুলালের দক্ষতায় পৌষমাসে ধানে ক্ষেত ভরে গেলে মদিনা পাহারা দেয়। দুলাল কখন মাঠ থেকে ফিরবে সেই আশায় মদিনা ভাত রেঁধে বসে থাকে, কখনও বা তামাক সেজে অপেক্ষা করে। চাষের কাজে দুলালকে সাহায্য করে, দুলালের প্রিয় খাবার বানায়। এভাবে সুখে-দুঃখে দারিদ্রের মধ্যে দিন চলে তাদের। কিন্তু হঠাৎ করে ঘুরে যায় জীবনের মোড়, মিলনের মাঝখানে বিশ্বাসঘাতকতার মেঘ ঘনালো। আলাল পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করার পর ভাইয়ের কথা স্মরণ করলো এবং দরিদ্রের বেশ ধরে নানান স্থান সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত কাজলকান্দায় ধনুয়া নদীর তীরে বিবাহিত সংসারী দুলালকে খুঁজে পেল। আলাল দুলালকে পরামর্শ দিয়ে নিজের কাছে নিয়ে এলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে দুলাল দাদার কাছে গেলে দাদা তাকে মদিনাকে তালাকনামা দিয়ে, সেকেন্দারের কন্যাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিল। ভালোবাসার স্ত্রী মদিনা, ভালোবাসার সন্তান সুরুজকে ভুলে দুলাল দাদার কথায় মজতে বসলো। ওদিকে বিরহিনী মদিনা সন্তান সুরুজকে নিয়ে দুলালের আশা-পথ চেয়ে বসে রইল। দিনের পর দিন যায়, দুলাল আর বান্যাচঙ্গ থেকে কাজলকান্দায় ফিরে আসে না। একদিন থাকতে না পেরে ভাই ও ছেলেকে মদিনা পাঠিয়ে দিল বান্যাচঙ্গ। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস, দুলাল এমনই মোহগ্রস্ত তার নতুন পরিবেশে, যে সে কোনভাবে তার শ্যালক ও সন্তানকে চিনতে পারলো না। মামাকে নিয়ে সুরুজ মায়ের কাছে ফিরে গেল। মদিনা দুলালের আচরণের

কথা শুনে ব্যাথা পেলেও আশা ছাড়লো না। সে স্বামীর পথ চেয়ে বসে রইলো - অনাহার, অনিদ্রা, চিন্তা - এসবের মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগলো মদিনার। একসময় সে পাগল হয়ে দুলালের আশায় থাকতে থাকতে মারা গেল। এদিকে দুলালেরও ভুল ভাঙলো। ছেলে ও শ্যালককে তাড়িয়ে দেওয়ার পরই দুলালের মোহভঙ্গ হলো। সে কাজলকান্দার পথে পাড়ি দিল দাদার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার পেছনে রেখে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দুলালের কাজলকান্দায় পৌঁছানোর আগেই মদিনা মারা গেল। অনুতপ্ত দুলাল আর বান্যাচঙ্গে দ্বিতীয়া স্ত্রীর কাছে না ফিরে ফকির হয়ে বাকী জীবনটা মদিনার কবরের পাশে বসে আমৃত্যু কাটিয়ে দিল।।

১০১.১৩ মৈমনসিংহ-গীতিকায় নাট্যলক্ষণ

গীতিকা নাটক নয়, কাহিনি ধর্মী লোকসংগীত। কিন্তু গান হলে কী হবে গীতিকার মধ্যে নানানভাবে আপনারা নাটকের বেশকিছু লক্ষণ দেখতে পাবেন। কারণ গীতিকা নাট্যলক্ষণযুক্ত রচনা।

আপনারা সাধারণত যাকে নাটক বলে বোঝেন, তার আর এক নাম দৃশ্যকাব্য। এই নাটকের মূলত কতকগুলো উপকরণ থাকে। যেমন— কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, দ্বন্দ্ব, মঞ্চ, দর্শক, গান ইত্যাদি। সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে নাটকের প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, অন্যান্য রচনা মুখ্যত পাঠ্য, কিন্তু নাটক মূলত অভিনয়যোগ্য। নির্দিষ্ট মঞ্চে দর্শকের সামনে নাটককে অভিনীত হতে হয়, নইলে তা প্রাণবন্ত হয় না। আরো একটা দিক — সংলাপ নাটকের প্রাণ। নাট্যকারের যাবতীয় প্রকাশ মাধ্যম হল সংলাপ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় রচয়িতা এমনভাবে সংলাপের বাঁধনে বন্দী নন।

মৈমনসিংহ-গীতিকার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, আদৌ নাটক না হওয়া সত্ত্বেও, নাটকের অন্যতম উপাদান কাহিনি ধর্মিতা গীতিকার অন্যতম প্রধান অংশ। গীতিকার সহজতম সংজ্ঞাতেই আছে যে, গীতিকা হলো কাহিনিধর্মী লোকসংগীত। প্রত্যেকটি গীতিকা একটা নির্দিষ্ট কাহিনিকে ভিত্তি করে যে নির্মিত হয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ মৈমনসিংহ-গীতিকার কাহিনিগুলো আগেই আপনাদের বলা হয়েছে। সেখানে আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটি গীতিকা স্ব-স্ব কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কাহিনিভিত্তিক লোকগীতি হওয়ার ফলে মৈমনসিংহ-গীতিকা নাটকের প্রাথমিক লক্ষণটিকে যে যথাযথ মেনেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, এ বিষয়ে একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো যে, আমরা কোনভাবেই জোর করে মৈমনসিংহ-গীতিকাকে নাটক প্রমাণ করতে চাইব না। মৈমনসিংহ-গীতিকা গীতিকাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজসূত্রে তার মধ্যে নাটকের গুণ বা ধর্ম এসে গেছে।

নাটকের একটা লক্ষণ, তা দর্শকদের সামনে অভিনীত হবে এবং নির্দিষ্ট একটা রঙ্গমঞ্চে। মৈমনসিংহ-গীতিকা অভিনীত হয় না, গীত হয়। তবে এ গীতিকার গীত হওয়া অন্যান্য সাধারণ লোকগীতির মতো নয়। গীতিকা মূলত আসর পেতেই গীত হয়। তার প্রমাণ প্রথম গীতিকা 'মহুয়া' পালার বন্দনা অংশ দেখলেই বোঝা যায়। গীতিকার এই আসর পেতে গীত হওয়া, নাটকের আসর বেঁধে অভিনীত হওয়ার মতোই অনেকটা। তবে নাটকের ক্ষেত্রে কাহিনি বা বিষয়টি স্বতন্ত্র চরিত্র এবং তাদের সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, গীতিকায় সেটি সম্ভব হয় না। এখানে একজন গায়ক তাঁর একটানা একটা সুরে সমস্ত কাহিনিটা বর্ণনাভিত্তিকভাবে উপস্থাপিত করেন। কাহিনির মধ্যে পৃথক পৃথক চরিত্র থাকে। কিন্তু চরিত্রগুলো কেবলমাত্র নিজস্ব নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয় না। গীতিকায় চরিত্রগুলোর মুখে উদ্ধৃতি থাকে। কিন্তু সে উদ্ধৃতিগুলো নাটকীয় সংলাপের মতো নয়। নাটকে দেখা যায় প্রত্যেকটি সংলাপের বামধারে পৃথক পৃথক চরিত্রের নাম থাকে। ফলে কোন সংলাপটি কোন্ চরিত্রের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকায় নাটকীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এবং গীতিকা মূলত বর্ণনাধর্মী হওয়ার ফলে এর মধ্যে পৃথক সংলাপের অবকাশ নেই। তবু, গীতিকা একেবারেই

পরোক্ষ উক্তিতে বর্ণনার বিষয় নয়। চরিত্রগুলো গায়ক কিংবা রচয়িতার বর্ণনার ভিতর থেকে উপস্থাপিত হলেও, কখনও কখনও নিজে নিজে কথা বলে ওঠে। বর্ণিত চরিত্রের এই কথা বলে ওঠা মৈমনসিংহ-গীতিকার সব পালাতে বর্তমান। তবে উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রাবতী গীতিকার শুরুর অংশটুকু অনেক বেশি চমকপ্রদ —

'চাইরকোনা পুষ্কনির পাড়ে চম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তোল কে তুমি নাগর।।'
'তোমার বাড়ি আমার বাড়ি ওই না নদীর পার।
কি কারণে তোল কন্যা মালতীর হার।।'

— নাটকের সংলাপের মতো বামদিকে চরিত্র দিয়ে উদ্ধৃতি দুটো উপস্থাপিত নয়। তবু উদ্ধৃতি দুটো পড়লেই বোঝা যায় কেমন ধরনের মানুষের উক্তি উদ্ধৃতি দুটো। প্রথম দুই পংক্তির শেষ 'নাগর' শব্দটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, উদ্ধৃতিটি কোনো নারী চরিত্রের। কারণ, পুরুষ চরিত্রের কোন পুরুষের প্রতি সম্বোধন এমন হতে পারে না। প্রথম দুই পংক্তিতে শুধু পুরুষের প্রতি নারীর সংলাপই ধরা পড়ে না, পুরুষের স্বভাবটিও আভাসিত হয়ে ওঠে। পুরুষটি ফুল তোলে, কিন্তু শুধু ফুল তোলে না, ডাল ভেঙে ফুল তোলে। অর্থাৎ যে ফুলটি তোলে, সেটাকে তো তোলেই, সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুলের কাছাকাছি অনেক ফুলের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির অসংখ্য কুঁড়িকেও সে ধ্বংস করে। মোটকথা, পুরুষটির ইচ্ছাকৃত অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়া কিংবা ধ্বংসাত্মক স্বভাবটি এখানে ধরা পড়ে। উদ্ধৃত চারটি পংক্তি দুটি সংলাপ। নাটকের মতো বামদিকে চরিত্র উল্লেখের সুযোগ গীতিকায় নেই, তবু সংলাপ দুটির বিষয় থেকে বক্তার লিঙ্গ, বয়স, স্বভাব বুঝতে সচেতন পাঠকের অসুবিধা হয় না, — এখানেও ধরা পড়ে গীতিকার নাট্যলক্ষণ। সংলাপের এই স্বভাব মৈমনসিংহ-গীতিকার সব পালাতেই আছে।

নাটকের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব জীবনেরই প্রকাশ। অথবা জীবনের দ্বন্দ্বমুখর দিকের সাহিত্যিক প্রকাশ নাটকেই। দ্বন্দ্ব যেমন বাহ্যিক হতে পারে, তেমনি হতে পারে আভ্যন্তরীণ। দ্বন্দ্ব যেমন ঘটনাগত হতে পারে, তেমনি হতে পারে আত্মগত। মৈমনসিংহ-গীতিকায় এই উভয় প্রকার দ্বন্দ্ব-ই গীতিকার পালাগুলোর কাহিনি ও চরিত্রগত দিককে অতিমাত্রায় উপাদেয় করে তুলেছে। কাহিনিগত দ্বন্দ্বের নমুনা স্বরূপ মহুয়া গীতিকার কাহিনিকে উত্থাপন করা যেতে পারে। মহুয়া ও নদ্যারচাঁদের প্রেম এবং সে প্রেমের পরিণতি দেখানোই যদি এ গীতিকার লক্ষ্য হয়, তাহলে দেখা যায় যে, তাদের প্রেমের গ্রাফিক রেখাটি একবার উঁচু, একবার নিচু — এইভাবে এগিয়ে গেছে। পাহাড় থেকে ঝরনা যেমন নানান প্রকার উপলখণ্ড ভেঙে নাচতে নাচতে, কখনও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায় এবং তাতে তার সৌন্দর্য বাড়ে; তেমনি অনুকূল এবং প্রতিকূল ঘটনার পাথরখণ্ড ভাঙতে ভাঙতে মহুয়া-নদ্যারচাঁদের প্রেমের ঝরনাধারা এগিয়ে চলেছে। মহুয়ার সঙ্গে নদ্যারচাঁদের গোপন ভালোবাসার খবর যখন জানলো হুমর‍্যা তখনই সে দু'জনার মধ্যে তৈরি করলো স্থানগত এক বিস্তর ব্যবধান। নদ্যারচাঁদের অঞ্চল থেকে মহুয়াকে নিয়ে হুমর‍্যা চলে গেল বহুদূরে নিজেদের দেশে। মিলনের সুর আকস্মিক বিচ্ছেদে দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠল। কাহিনির মধ্যে প্রতিকূলতার এই দ্বন্দ্ব বার বার মহুয়া-নদ্যারচাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার গতিকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলেছে। এই প্রতিকূলতা এসেছে হুমর‍্যার জেদ ও প্রতিহিংসা থেকে, বণিকের ও সন্ন্যাসীর কামুকতা ও মোহগ্রস্ততা থেকে, আর সব কিছুর চরম পরিণতি ঘটেছে হুমর‍্যাও তার দলবলের মহুয়া ও নদ্যারচাঁদকে ঘিরে হত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে। এক একটা প্রতিকূল ঘটনা মহুয়া-নদ্যারচাঁদের মধ্যে কখনও মানসিক, কখনও স্থানিক দূরত্ব বাড়িয়েছে, আবার তারা কাছে এসেছে। কিন্তু কাছে এসেও শেষ রক্ষা হয় না হুমর‍্যার দলবল যখন তাদের ঘিরে ধরে। ঘটনাগত দ্বন্দ্ব এসেছ প্রতিকূলতা থেকে। কিন্তু আত্মসংকট তথা আত্মদ্বন্দ্ব এর বিষয়কে আরো নাটকীয় করে তুলেছে দু'বার এবং দু'বারই মহুয়া সে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে

প্রায় কাহিনির শুরুতে এবং শেষে যখন নদ্যারচাঁদকে মারার জন্য হুমর্‍্যা দু'বারই বিষ মাখানো ছুরি তুলে দিয়েছে মহুয়ার হাতে। প্রথমবারের আত্মসংকট উত্তীর্ণ হতে পারলেও, দ্বিতীয়বার মহুয়া আর পারে না। বারবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে সীতা যেমন বসুন্ধরার কাছে পাতাল প্রবেশের প্রার্থনা জানায়, মহুয়াও তেমনি না পেরে নদ্যারচাঁদকে মারার পরিবর্তে নিজের বুকে বসিয়ে দেয় বিষ মাখানো ছুরি। এই ঘটনার আকস্মিকতার প্রতিক্রিয়ায় নদ্যারচাঁদকেও সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় নাটকীয় কিছু ঘটনা। বাহ্যিক ঘটনার এই নাটকীয়তা 'চন্দ্রাবতী' গীতিকাতেও লক্ষণীয়। সেখানে চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের ফুল তুলতে গিয়ে প্রেম, এবং প্রেমের পরিণতি যখন কাকতালীয় ভাবে পরিণয়ের পথে এগিয়েছে ততদূর পর্যন্ত কাহিনির গতি সহজ সরলরেখায়। কিন্তু বিয়ের সকল আয়োজন যখন শেষ, বর আসার অপেক্ষায় যখন সবাই, তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আকস্মিকভাবে খবর এলো পাত্র জয়ানন্দ এক মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে। যা সহজ কল্পনায় আসে না, কিংবা যা কোন দিন ভাবা যায় নি কিংবা ভাবা হয়নি তা যদি হঠাৎ ঘটে যায় তাই নাটকীয়। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের প্রেমের খবর এরা দুজন ছাড়া কেউ জানে না। পাঠক কিংবা শ্রোতা এদের সাক্ষী। সবাই (পাঠক / শ্রোতা) যখন জানছে প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তাদের বিয়ে হচ্ছে এবং কাহিনি খুব সহজ ও আটপৌরে হতে চলেছে ঠিক তখনই দেখা দিল গতি পরিবর্তন। কাহিনির এই গতি পরিবর্তনের ধারাটি দেখলে কাহিনির বাহ্যিক বা ঘটনাগত নাটকীয়তা বোঝা যায় — জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রেমের কথা জানিয়ে চলে গেল, চন্দ্রাবতীর সঙ্গে যখন তার বিয়ের সকল আয়োজন সমাপ্ত তার আগে অধৈর্য মোহগ্রস্ত জয়ানন্দ মুসলিম কন্যার পাণিগ্রহণ করলো, চন্দ্রাবতীকে উপেক্ষা করে মুসলিম কন্যাকে বিয়ে করার জন্য অনুতপ্ত জয়ানন্দ, সে নিজের দোষ স্বীকার করে চন্দ্রার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইলো, জয়ানন্দকে চন্দ্রা দেখা না দেওয়ায় সে হলো চরম অভিমানী, সবশেষে নদীর জলে সে আত্মহত্যা করলো। জয়ানন্দের জীবনের এই বাঁক নেওয়া যেমন নাটকীয়তায় ভরা, তেমনি চন্দ্রাবতীর জীবনটাই নাটক। ভালোবাসা, ভালোবাসার বিয়ে, অপেক্ষা, ভালোবাসার জনের কাছ থেকে চরম আঘাত, আজীবন অবিবাহিতা থাকার প্রতিজ্ঞা, অনুতপ্ত প্রেমিকের দেখা করার ইচ্ছায় সম্মত না হওয়া, সেই অভিমানে প্রেমিকের আত্মহনন চন্দ্রাবতীকে উন্মাদিনীবৎ করে তুলেছে এবং কাহিনির শেষও সেখানে। মৈমনসিংহ-গীতিকার সকল কাহিনির মধ্যে এই ঘটনাগত নাটকীয়তা চমৎকার রূপ পেয়েছে। 'দেওয়ান-ভাবনা' পালায় বাবাকে মুক্ত করতে গিয়ে বন্দী হলো মাধবকে উদ্ধার করার জন্য গিয়ে ধরা দিল সোনাই। মাধব জানে না যে তার মুক্তি তার স্ত্রী সোনাই এর রূপ-যৌবনের বিনিময়ে। মুক্তির আনন্দে সে যখন স্বপ্নে বিভোর যে, এবার সোনাই-এর সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সাক্ষাৎ হবে, তখনই বাড়ি ফিরে মুহূর্তের মধ্যে তার স্বপ্ন সব ব্যর্থ হয়ে গেল এই জেনে যে, তার মুক্তি সোনাই-এর ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণের বিনিময়ে। মনের যে সাধ, স্বপ্ন ও আনন্দ নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা বিষবৎ হয়ে গেল — ভাগ্যের এই নাটকীয় বিপর্যয় গীতিকার রক্ত মাংসের মানুষগুলোর জীবনকেও জীবন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাতে পরিণত করেছে। নাটকীয় পরিবর্তন এ কাহিনির অন্তিমেও দৃশ্য হল। উপভোগের আনন্দে, লালসার বীভৎস উত্তেজনায় ভাবনা যখন মিলন মন্দিরে প্রবেশ করলো, তার অনেক আগেই সোনাই বিষপান করে চলে গেছে ভাবনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যদিও মৃত্যু, তবুও সতীত্ব রক্ষার এই পরীক্ষায় সোনাই-এর মৃত্যুও দর্শক-শ্রোতার মনে এক রকম স্বস্তি দেয়। 'দেওয়ান মদিনা' কিংবা 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় নায়কেরা ফিরে আসে একদিন, নায়িকার পথ চেয়ে থাকার অবসান ঘটে, কিন্তু ততদিন আর মিলনের সাধপূরণের সাধ্য থাকে না। মদিনার কবরের পাশেই অনুতপ্ত দুলালের কেটে যায় বাকী জীবন, আর লীলার মৃত্যুর কথা শুনে কঙ্কও বেরিয়ে পড়ে তীর্থ যাত্রায়। কাহিনিগত এই দ্বন্দ্ব মনোজগতেও তোলে আলোড়ন — বিষ মাখানো ছুরি হাতে মহুয়া পিতৃ আদেশ পালন করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে —'একবার দুইবার তিনবার করি / উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের ছুরি'। অনপুতাপে দগ্ধ হয় জয়ানন্দ মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণের পর। বুঝতে পারে তুলসী

ভেবে সে শেওড়াকে গ্রহণ করেছে। ফুলের মালা ভেবে কালসাপ সে গলায় পরেছে। নদীর জলে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জয়ানন্দের ভাসমান দেহ দেখে চন্দ্রাবতীও পড়ে যায় চরম মানসিক সংকটে।

এইভাবে কাহিনিগত দিক থেকে, মানসিক দ্বন্দ্বে ও প্রেমের টানাপোড়েনে মৈমনসিংহ-গীতিকার মধ্যে মধ্যে নাটকীয় উপাদানের বহুলক্ষণ দৃষ্ট। সর্বোপরি, পরিণতির দিক থেকে মৈমনসিংহ-গীতিকার কাহিনিগুলোর অধিকাংশই প্রায় বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজেডিযুক্ত, ব্যতিক্রম 'কমলা' গীতিকাটি।।

১০১.১৪ মৈমনসিংহ-গীতিকায় নারী

মৈমনসিংহ-গীতিকার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ এর নারী চরিত্র। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যে মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রগুলো এক বিশেষ স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত। এই গীতিকার নারী চরিত্রগুলো জীবনের বিশেষ যে স্বভাবকে অবলম্বন করে আবর্তিত সেটি হলো প্রেম। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী থেকে শুরু করে মদিনা, লীলা, সোনাই, কাজলরেখা, কমলা — সবাই বিকশিত হয়েছে প্রেমকে কেন্দ্র করেই।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নারী চরিত্রের প্রাধান্যে। গীতিকার নামকরণ থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু — সর্বত্রই এই নারী চরিত্রের প্রাধান্য বিদ্যমান। পুরুষ-চরিত্র থাকা সত্ত্বেও নারী চরিত্রের এই প্রাধান্যের কারণ আপনারা আগেই জেনেছেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর হাজং শাখার মধ্যে মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রথম উদ্ভব ঘটার ফলে সমাজতাত্ত্বিক এই মাতৃতান্ত্রিক স্বভাবটি গীতিকার নারী চরিত্রের প্রাধান্যের অন্যতম কারণ হয়েছে। সাধারণত আর্য সমাজজীবনে পুরুষ সর্বেসর্বা। পুরুষসংসার এবং সমাজের মাথা। নারী সেখানে গৌরীদানের বলি হয়ে, সহমরণে গিয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে পরাধীন জীবন যাপনে পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। মুসলিম সমাজে নারী পর্দাপ্রথার শিকার হয়ে পুরুষের সন্তান উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র। তথাকথিত হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যেখানে নারী আত্ম স্বাতন্ত্র্যহীন পরাধীন জীবন যাপনের শিকার। সেখানে অনার্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত হাজং নারী সমাজ কিন্তু অনেক উদারপন্থী এবং প্রগতিশীল। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো, মৈমনসিংহ-গীতিকার সকল নারীই কিন্তু হাজং গোষ্ঠীসম্ভূত নয়। আমাদের আলোচ্য গীতিকাগুলোর সামাজিক প্রেক্ষাপটটি অনার্য ও আর্য উভয় সমাজ-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এখানে ব্রাহ্মণ্যশাসিত রক্ষণশীল আর্য সংস্কৃতির প্রকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি অনার্য সম্ভূত উদারপন্থী সমাজের প্রকাশও পরিলক্ষিত। এখানে চন্দ্রাবতীর মতো রক্ষণশীল নারীর পাশাপাশি মহুয়ার মতো স্বাধীনচেতা নারীও বিদ্যমান। তবে, একথা ঠিক মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী — সে আর্য কিংবা অনার্য-যেকোন সমাজের হোক না কেন, তার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। হোক না কেন সে নারী স্বাধীন কিংবা পরাধীন, ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সমাজের নারীও হাজার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে দিয়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে মৈমনসিংহ-গীতিকার পালায়, বাংলা শিষ্ট সাহিত্যে আর্য নারীর এই আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদাহরণ সেকালের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রায় ছিলই না বললে চলে।

মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর আত্মমর্যাদা, কিংবা আত্মস্বাতন্ত্র্য অথবা জীবনে লড়াই করার মানসিকতায় সবচেয়ে বড় রসদ হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়েছে প্রেম। কখনও প্রেমের অনুকূল অবস্থা, কখনও বা প্রতিকূলতা নারীকে ত্যাগে তিতিক্ষায়, সাহসে-শক্তিতে, বীর্যে-ধৈর্যে-আত্মদানে ও সহিষ্ণুতায় মহীয়ান করে তুলেছে। আর এর সঙ্গে মিলেছে নিয়তির চরম প্রতিকূলতা। কেবল মাত্র কমলা ও কাজলরেখা — এই দুই নারী চরিত্র ছাড়া আর সকল নারীই কোন না কোনভাবে প্রেমের জন্যে জীবন যুদ্ধে অনেক লড়াই করে পরাজিত হয়েছে।

তাদের পরিণতি কোন না কোনভাবে বিয়োগান্তক। কখনও সমাজ, কখনও স্বার্থ, কখনও পুরুষের মোহ, কখনও বা পুরুষের কাপুরুষতা মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীচরিত্রের দুঃখজনক পরিণতির কারণ।

ধরা যাক 'মহুয়া' গীতিকার মহুয়া চরিত্রটির কথা। মহুয়া চরিত্রটির গুণে মৈমনসিংহ-গীতিকায় শ্রেষ্ঠ পালা 'মহুয়া'। ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া ছয় মাস বয়সে হুমর্‍্যা কর্তৃত হৃত হয়ে তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে বেদের মেয়ে রূপে বেদের দলে বড়ো হতে থাকে। মহুয়ার রূপ তার বিয়োগান্তক পরিণতির অন্যতম কারণ। কেবল মহুয়া নয় মলুয়া, সোনাই প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একইভাবে রূপ তাদের 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' হিসেবে কাজ করেছে। তবে, মহুয়ার ক্ষেত্রে যন্ত্রণাটা অন্যখানে। সে ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার আসল পরিচয় গোপন থাকলো এবং সে বেদের দলে লালিত হয়ে নিজস্ব স্বাধীনতায় বাঁচতে পারলো না হুমর্‍্যার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে। আসল পরিচয় গোপন থেকে এই যন্ত্রণাজনক জীবনযাপন অন্যকারুর ক্ষেত্রে হয় নি। ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়া সত্ত্বেও মহুয়াকে বেদের মেয়ে বলে পরিচিত হতে হল। বেদের দলের সেরা সুন্দরী, সেরা খেলোয়াড়। তার শারীরিক সৌন্দর্য ও কসরৎ-এ আকৃষ্ট মানুষজন। স্রোতের শ্যাওলার মতো তার জীবন। বেদের দলের সঙ্গে যাযাবর জীবনযাপন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষের বিশেষত পুরুষের চিত্তে তার রূপ আলোড়ন তুলেছে। বহু মানুষের কু-সু প্রস্তাবের সম্মুখীন সে হয়েছে। পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তার কম নয়। তাই সহজে পুরুষের অভিনয়ে সে ভোলে না। তাই নদ্যারচাঁদের সঙ্গে প্রথম যেদিন তার সাক্ষাৎ হলো, সেদিন তার প্রতি মনের কোণে মহুয়ার একটা ভালোলাগা ও তা থেকে ভালোবাসার একটা বীজ রোপিত হয়ে গেলেও একবারের জন্যেও সে নিজের দুর্বলতার কথা নিজেকে তুচ্ছ করে আগে নদ্যারচাঁদকে বলেনি। যেদিন নদ্যারচাঁদ সন্ধ্যার সময় পথে মহুয়াকে দেখতে পেল, সেদিন সে মহুয়াকে পরদিন সন্ধ্যার সময় একা নদীর ঘাটে আসার প্রস্তাব জানালে মহুয়া আসেও জল ভরতে। কিন্তু নদ্যারচাঁদের কথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে জানায় যে, নদ্যারচাঁদের গতদিনের কথা তার মনে নেই এবং সে জন্য মহুয়া আসেও নি। মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীদের বিশেষত্ব এই যে তারা স্বাধীনভাবে স্বামী নির্বাচন করলেও কেউ কিন্তু পুরুষের কাছে আগে প্রেম নিবেদন করেনি। পুরুষেরাই আগে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। সে মহুয়ার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মলুয়া, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও। নদীর ঘাটে সাক্ষাতের প্রথমদিন মহুয়ার প্রতি নদ্যারচাঁদের দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়লেও মহুয়া কিন্তু একবারও তার দুর্বলতাকে বুঝতে দেয়নি। মহুয়াকে দেখেই নদ্যারচাঁদ বুঝেছে যে তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু নদ্যারচাঁদকে (পুরুষকে) দেখে তো বোঝা যায় না বিবাহিত না অবিবাহিত, তাই মহুয়া তার মনের গোপন প্রশ্নটা বেশ বুদ্ধি করে জেনে নেয়। নদ্যারচাঁদ যখন তাকে বিয়ের কথা বলে তখন সে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ প্রতিবাদ মনের গোপন অনুরাগের বিপরীত প্রকাশ। আসল কথা হলো, মহুয়া নারী-নিজেকে সহজ ও সুলভ করে সে নদ্যারচাঁদের কাছে ধরা দিতে চায়নি। পরিবর্তে নদ্যারচাঁদের জন্য পাগল হয়েছে। নদ্যারচাঁদের সঙ্গে এক তিলের অদর্শন তার কাছে মৃত্যুর সামিল হয়েছে। নদ্যারচাঁদের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে যখন হুমর্‍্যা নিজের পূর্ব বাসস্থানে গেছে তখন প্রণয়ীর বিরহে মহুয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু যেদিনই দীর্ঘ বিরহের পর নদ্যারচাঁদকে দেখেছে সেদিনই মুহূর্তের মধ্যে ছয়মাসের শয্যাশায়িনী মহুয়া সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি হুমর্‍্যার চক্রান্তে। বিষ মাখানো ছুরি হাতে দিয়ে হুমর্‍্যা তাকে নদ্যারচাঁদকে হত্যা করতে বলেছে। মনের সঙ্গে কঠিন লড়াই করে এ যাত্রায় মহুয়ার প্রেমের জয় হয়েছে। নদ্যারচাঁদকে জাগিয়ে তাকে নিয়ে মহুয়া পালিয়েছে, কিন্তু চলার পথে পাহাড়ী নদী পার হতে গিয়ে বণিকের লোভের শিকার হয়ে মহুয়া নদ্যারচাঁদকে হারিয়েও ধৈর্য ও বুদ্ধি হারায়নি। কেবলমাত্র নদ্যারচাঁদের প্রতি প্রেমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে বুদ্ধি করে বণিকের প্রেমের প্রস্তাবে কোন বাধা না দিয়ে তাকে এবং তার

দলবলকে মাথার চুলে লুকিয়ে রাখা পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ দিয়ে পান সেজে খাইয়ে হত্যা করে, এবং তাদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে, ভবিষ্যতে কোন রকম প্রতিশোধ নিতে যাতে না পারে তারজন্য অচেতন বণিক এবং তার দলবলকে নৌকো ডুবিয়ে হত্যা করে। নদীর জলে ভেসে যাওয়া নদ্যারচাঁদকে ফিরে পাওয়ার পরীক্ষায় অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে মৃতপ্রায় নদ্যারচাঁদকে সে ফিরে পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিপদ ঘনিয়ে আসে সন্ন্যাসীর তরফ থেকে। সন্ন্যাসীর আদি রিপুর তাড়নার শিকার হওয়ার আগে অসুস্থ স্বামীকে নিজের কাঁধে তুলে পলায়ন করে এবং বিপদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে। কতটা ধৈর্য, সাহস ও শক্তিধারণ করলে তারপর একটি নারীর পক্ষে এই কঠিন লড়াই-এ জয়ী হওয়া সম্ভব মহুয়ার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই ধৈর্য, শক্তি ও সাহস দিয়ে বনদম্পতি রূপে যে সুখের সন্ধান পাওয়া গেল, তা স্থায়ী হতে দিল না হুমর্যার জেদ ও প্রতিহিংসার পথ ধরে আসা নিয়তি। হুমর্যা তার শিকারী কুকুরসহ দলবল নিয়ে মহুয়াদের ঘিরে ফেলে মহুয়ার হাতে আবার বিষ মাখানো ছুরি দিয়ে নদ্যারচাঁদকে হত্যা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। একদিকে পিতার আদেশ, অপরদিকে প্রণয়ীর ভালোবাসা, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে মহুয়া দিশেহারা। শেষ পর্যন্ত পিতার আদেশ পালন করা ও প্রণয়ীকে হত্যাও করা সম্ভব নয় জেনে বিষ-মাখানো ছুরি মহুয়া নিজের বুকে বসিয়ে তার ভালোবাসাকেই অমরত্ব দিয়ে গেল। প্রেমের জন্যে এ ভাবে ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, শক্তি, বুদ্ধি, সাহস এবং শেষ পর্যন্ত জীবনদান মহুয়াকে চিরন্তনত্ব দিয়েছে।

মহুয়ার তুলনায় অনেক অনালোচিত, অনেক কম জায়গা পাওয়া চরিত্র পালঙ্ক সই। কিন্তু কাহিনির শেষে পালঙ্ক সই-এর যে ভূমিকা, তাতে সে প্রেমের ক্ষেত্রে ত্যাগে কোন অংশে কম নয়। নদ্যারচাঁদের প্রতি পালঙ্ক সইয়ের মনের মধ্যে কোন ভালোবাসা না থাকলে পালঙ্ক এইভাবে মৃত দুই মানুষের সমাধিকে কেন্দ্র করে থেকে যেতে পারে না। নদ্যারচাঁদের প্রতি পালঙ্ক সইয়ের ভালোবাসা বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ মনে করিয়ে দেয়। মহুয়া ভালোবেসে নদ্যারচাঁদের একনিষ্ঠ প্রেম পেয়েছে। কিন্তু পালঙ্ক সইয়ের ভালোবাসা সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছে এবং প্রতিদানহীন এক অন্ধকার ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরতে পালঙ্ক বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। মহুয়া নদ্যারচাঁদকে ভালোবেসে ভালোবাসা পেয়েছে, নদ্যারচাঁদ-মহুয়ার পারস্পরিক ভালোবাসায় কোন ঘাটতি নেই। তাদের প্রেমে প্রতিবন্ধকতা সব বাইরের থেকে আসা। তাই ভালোবেসে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে মহুয়ার যে ত্যাগ তার মহত্ত্ব অস্বীকার করার নয় জেনেও বলতে হয় মহুয়া আত্মহত্যা করে শান্তি পেয়েছে। কিন্তু পালঙ্ক যে কোন প্রতিদান না পেয়েও, নদ্যারচাঁদের জীবিত অবস্থায় ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে একবার না বলতে পেরেও তার বাকী জীবনটা এক অন্ধ, অপ্রকাশিত, অস্বীকৃত ভালোবাসার জন্যে দিয়ে দুই মৃত মানুষের কবরকে কেন্দ্র করেই জনমানবশূন্য এক বনে থেকে গেল তার মধ্যে যে ত্যাগ তা কখনও কখনও মহুয়ার প্রেমের ত্যাগস্বীকারকেও বোধকরি ছাপিয়ে যায়।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আবার চন্দ্রাবতীর সমস্যাটা অন্যরকম। চন্দ্রাবতী ব্রাহ্মণ কন্যা। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রেমের স্বাধীনতা নেই, আছে পুরুষের ভ্রমর সুলভ স্বভাব। এহেন অবস্থায় চন্দ্রাবতীর মধ্যে প্রেমের কুসুম ফুটিয়ে জয়ানন্দ চলে গেছে দূরে। জয়ানন্দের সঙ্গে ফুল তুলতে গিয়ে পরিচয় চন্দ্রার। জয়ানন্দকে দেখে তার মনের মুকুলে মধুর সঞ্চার, ফুল তুলে মালা গেঁথে জয়ানন্দকে সে সাজায়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। চন্দ্রাবতীর এই রকম বিকশিত প্রায় মনের মুকুলে প্রেমের সঞ্চার ঘটালো জয়ানন্দ। কিন্তু প্রেম জাগিয়ে সে গেল চলে। তারপর কাহিনি সরল গতিতে প্রেমের পরিণতি যে পরিণয় সে দিকে যাচ্ছিল নির্দ্বন্দ্বে। চন্দ্রাবতীও জয়ানন্দের প্রেমের ছোঁয়ায় তার প্রতি ভালোবাসায় নতুন স্বপ্নে বিভোর। বিয়ের সকল আয়োজন যখন সমাপ্ত, তখনই হঠাৎ

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর এলো জয়ানন্দের মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণের। চন্দ্রাবতীর বাবা থেকে শুরু করে পরিবার-পরিজন সবাই আঘাত পেল। কিন্তু চন্দ্রাবতীর আঘাত তার শতগুণ। কারণ, যে জয়ানন্দকে সে চন্দ্রসূর্য সাক্ষী করে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেই জয়ানন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চন্দ্রাবতীর সঙ্গে জয়ানন্দের পূর্ব পরিচয় ও প্রেমের কথা আর কেউ না জানুক চন্দ্রাবতী জানে। সে জানে যে জয়ানন্দ তাকে প্রথম প্রেমের প্রস্তাবই শুধু দেয়নি, তার প্রস্তাবের মধ্যে ছিল এক সকরুণ প্রার্থনা ও নিঃসঙ্গ মানুষের আর্তি। অসহায় মাতা-পিতাহীন জয়ানন্দের সেই প্রেমের জন্য করুণ আর্তি বিগলিত করেছিল চন্দ্রাবতীকে। সেও মনে মনে গভীর ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিল জয়ানন্দের সঙ্গে। কিন্তু পিতার ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। তবু ঘটক আসায় এবং বিয়ের কথা হওয়ায় মনের মধ্যে সে অনেক আশার স্বপ্নসৌধ রচনা করেছিল। কিন্তু এক মুহূর্তেই যখন সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জয়ানন্দের দুর্ব্যবহারে তখন পাথর প্রতিমা হয়ে গেল চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী বোধ হয় এত দুঃখ পেত না, যদি জয়ানন্দের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় না থাকতো। কিংবা জয়ানন্দ তাকে এভাবে প্রেমের কথা বলার পর এই আঘাত না দিত। পুরুষের দুর্বলচিত্ততা, রূপের মোহে পড়া, ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করা এই প্রসঙ্গগুলো চন্দ্রাবতীকে হয়তো এত কষ্ট দিত না যদি সেই পুরুষটি তার পূর্ব প্রেমিক জয়ানন্দ না হোত। জয়ানন্দের এই আঘাতের প্রত্যুত্তর হিসেবে চন্দ্রাবতী অন্যত্র বিয়ে করতে পারতো। সে প্রস্তাব এবং সে ব্যবস্থা তার পিতা বংশীবদন ভট্টচার্যের তরফ থেকে যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু প্রথম প্রেমের যে আবেশ মনের মধ্যে উপলব্ধি করেছে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের কাছ থেকে তাকে আর কলঙ্কিত হতে দিয়ে দ্বিচারিতার পথ নিতে পারেনি চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দের জাগানো প্রেমের প্রতি নিষ্ঠায় সে ঠিক করলো আজন্ম অনূঢ়াই থেকে যাবে। সেই হিসেবে বাবার কথায় শিবপূজা ও রামায়ণ রচনার মধ্যে দিয়ে সে কাটাচ্ছিল জীবনের বাকী দিনগুলো। কিন্তু অনুতপ্ত জয়ানন্দের পাঠানো চিঠি আবার তার মনের মধ্যে জয়ানন্দকে কেন্দ্র করে শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সেই স্বপ্নমধুর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে তাকে দুর্বল করে দিল। জয়ানন্দের প্রতি তার মধ্যে যে রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা জমাটবাঁধা পাথরের মতো বুকের মধ্যে জমা হয়েছিল, তা ভুলে সে জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করার প্রতি টান অনুভব করলো। কিন্তু পিতার আদেশে মনের স্মৃতিজাগা দুর্বলতাকে দূর করে শিবের মন্দিরে যখন সমাধি শয়নে রত, তখনই পাগল জয়ানন্দ চন্দ্রার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে কোনভাবে যখন তার দেখা পেল না, চন্দ্রা যখন মন্দিরের কপাট খুলল না, তখনই অনুতপ্ত জয়ানন্দ মন্দিরের দরজায় পত্র লিখে চিরতরে বিদায় নিল। মন্দির খুলে চন্দ্রাবতী যখন দেখলো জয়ানন্দ এসে মন্দিরের দরজার গায়ে চিঠি লিখে রেখে মন্দির অপবিত্র করে দিয়েছে, তখনই সে জলের কলসি নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে স্নান করে শুচি হতে গেল। কিন্তু নদীর ঘাটে গিয়ে চন্দ্রাবতী দেখলো নদীর জোয়ারের জলে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জয়ানন্দের দেহ ভাসছে। জয়ানন্দের এই আত্মহত্যা চন্দ্রাবতীর মনে গভীর জিজ্ঞাসার চিহ্ন রেখে তাকে আজীবন অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হওয়ার ইন্ধন জুগিয়ে গেল। সে 'উমেদা কামিনী'র মতো নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল, যেন জীবন সমুদ্রের অথৈ জলের সামনে দিশাহারা নাবিক। যে অভিমান নিয়ে চন্দ্রাবতী সারা জীবন কাটাতে পারতো, সেই অভিমানের বিপরীত রূপ নিয়ে জয়ানন্দ আত্মহত্যা করলো। জয়ানন্দের এই অবিবেচকের মতো, চঞ্চলমতি বালকের মতো আত্মবিসর্জনে চন্দ্রাবতীর কোন হাত নেই সত্য। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, শেষবারের জন্যে চন্দ্রাবতী যদি জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করতো — দুজনার সামনাসামনি সাক্ষাতে হয়তো ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতো, কিন্তু সে সুযোগ যে চন্দ্রাবতী একবারের জন্য জয়ানন্দকে দিল না — তাহলে হয়তো জয়ানন্দ এমনভাবে আত্মহত্যা করতো না। তাই জয়ানন্দের মৃত্যুর পিছনে চন্দ্রাবতীর এই না দেখা করার কারণটি চন্দ্রাবতীকে আজীবন মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে যাবে। অভিমানের বদলে আজ চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের, আত্মহত্যার কাঁটার মালা গলায় নিয়ে বেঁচে থাকবে। অভিমান নিয়ে মরল জয়ানন্দ, বেঁচে থাকলো চন্দ্রাবতী। জীবিত জনের যন্ত্রণাই বেশি, মৃতের নয়। অভিমান নিয়ে মরল মলুয়া, মদিনা ও সোনাই। মলুয়া এবং মদিনার অভিমান নিজ নিজ স্বামীর প্রতি। সোনাই-এর অভিমান শ্বশুর, ভাগ্য ও সমাজের প্রতি। মলুয়া ও সোনাই-এর ক্ষেত্রে পরপুরুষের আসক্তি অন্যতম প্রধান কারণ। মদিনার ক্ষেত্রে পর পুরুষ নয়, স্বামীর

দ্বিতীয়বার বিবাহ করে দাদার অঢেল সম্পত্তিকে ভুলে গিয়ে চাষীর মেয়ের সঙ্গে কাটানো দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পালিত সেই শান্তিময়, প্রেমময় জীবনের দিনগুলো ভুলে যাওয়াই কারণ। সতীন সমস্যা মলুয়ার ক্ষেত্রেও প্রকট হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রেও দুলালের মতো স্বামীর আত্মীয় পরিজনদের কথায় আত্মসত্তা হারানোই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে, মলুয়ার মতো দগ্ধে দগ্ধে মরতে হয়নি মদিনাকে। মদিনার জীবনের দুটো পর্ব। প্রথম পর্বে দুলালের সঙ্গে তার বিয়ে, প্রেম, সন্তান ও সুখের সংসার জীবন। সেখানে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু অশান্তি ছিল না। কষ্ট থাকলেও তারা সুখী ছিল। অন্যদিকে 'মলুয়া'র চাঁদবিনোদ যাকে ভালোবাসতো, যার কাছ থেকে সে অনেক উপকার, প্রেম, ভালোবাসা পেয়েছে তাকে সে আত্মীয়-স্বজনের কথায় নানানভাবে অপমানিত করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, অন্য নারীকে বিয়ে করেছে। জলের ঘাটে ঘুমন্ত অসহায় চাঁদবিনোদকে দেখে সন্ধ্যার আগে জল নিতে আসা মলুয়া তাকে কলসির শব্দে জাগিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। বিনোদ মলুয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, চাঁদবিনোদকে যখন দেওয়ানের লোক ধরে নিয়ে যায়, তখন ভাইদের সাহায্য নিয়ে মলুয়াই বিনোদকে উদ্ধার করেছে, বিনোদের অবর্তমানে মলুয়া শত দারিদ্র্যেও শাশুড়িকে ছেড়ে ধনীভাইদের কাছে আসেনি, তাকে দেওয়ানের লোক ধরে নিয়ে গেলে বুদ্ধি করে নিজের নারীত্ব রক্ষা করেছে এবং নিজেকে উদ্ধার করেছে, চাঁদ বিনোদকে সাপে কাটলে মলুয়াই এসে বাঁচিয়েছে। মলুয়ার এ সমস্ত কাজ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে। কিন্তু এহেন মলুয়াকে চাঁদবিনোদ পরিত্যাগ করেছে মুসলমান দেওয়ানের ঘরে এক বছর কাল অতিবাহিত করার জন্য। কিন্তু দেওয়ানের ঘরে নিজের সতীত্ব যে কি বুদ্ধি সহকারে রক্ষা করেছে তা মলুয়াই একমাত্র জানে। দেওয়ানের প্রলোভন এড়িয়ে নিজেকে মলুয়া যেভাবে রক্ষা ও উদ্ধার করেছে তার মূলে ছিল তার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম। কিন্তু চাঁদবিনোদ আত্মীয়-স্বজনের কথায় মলুয়ার সে প্রেমের মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা তাকে তাড়িয়ে আবার বিয়ে করেছে। সাপে কাটলে মৃতপ্রায় চাঁদবিনোদকে মলুয়া বাঁচিয়েছে কেবলমাত্র স্বামীকে গভীর ভালোবাসে বলে। কিন্তু মলুয়ার সে ভালোবাসার কোন প্রতিদান না দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে মলুয়া পত্নী হিসেবে নয়, দাসী হিসেবে স্বামীর ঘরে থাকতে চেয়েছে, তাতেও যখন আত্মীয়েরা আপত্তি জানালো এবং কাপুরুষের মতো চাঁদবিনোদ তাদের কথায় বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলো না, তখন মলুয়া মাঝনদীতে ভাঙা নৌকো ভাসিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো।

মদিনার ক্ষেত্রে সতীত্বের কোন বাধা আসেনি। নিয়তির কাছে তার অপরাধ সে চাষীর মেয়ে হয়ে এক ধনী দেওয়ানের সন্তানকে বিয়ে করেছিল তার চরম এক অসহায় অবস্থায়। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে দুলাল যখন হারাধন ব্যাপারীর কাছে আশ্রয় পায় তখন সেই আশ্রয়ই তার কাছে স্বর্গ সমান। সেখানেই বড়ো হয়ে দুলাল হারাধনের মেয়ে মদিনাকে বিয়ে করে দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখে-প্রেমে-শান্তিতে বাস করছিল। তাদের সন্তান সুরুজ। চাষবাস করে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিল দুলাল। কিন্তু দাদা আলাল যখন পিতার দেওয়ানি উদ্ধার করে ভাইয়ের খোঁজ করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইলো তখন স্ত্রী ও পুত্রকে অবিলম্বে চলে আসার আশ্বাস দিয়ে দুলাল গেল বটে, কিন্তু সেখানে গিয়ে দাদার পরামর্শে মদিনাকে তালাক দেওয়া ঠিক করে সেকেন্দারের মেয়েকে বিয়ে করলো। স্বামীর ফিরতে বিলম্ব দেখে মদিনা ভাই ও শিশুসন্তান সুরুজকে পাঠালে দুলাল তাদের চিনতে পারলো না। ঘরে ফিরে আসা ভাই ও সন্তানের কাছে স্বামীর আচরণের কথা শুনে মদিনা কষ্ট পেলেও আশা না ছেড়ে দুলালের আশায় পথ চেয়ে বসে রইল। অভিমানে, অনাহারে, অনিদ্রায় মদিনা দুলালের ভুলের অবসান হবে এই আশায় তিল তিল করে নিজেকে শেষ করলো। প্রেমের একনিষ্ঠায় স্বামীর প্রতি অভিমানে এও একরকম আত্মহত্যাই।

সোনাই-এর ক্ষেত্রে অভিমানটা অন্যরকমের। শৈশবে বাবাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সোনাই যখন রূপসী যুবতী হয়ে উঠল, তখন তার প্রতি দেওয়ান ভাবনার লোলুপ দৃষ্টি এবং মামার চক্রান্ত থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল মাধব। মাধবকেই সে ভালোবেসেছিল। তাকেই সে বিয়ে করেছে। কিন্তু সে সুখ স্থায়ী হল

না। কারণ মাধবের বাবাকে দেওয়ান ধরে নিয়ে গেল। মাধব গেল বাবাকে উদ্ধার করতে। মাধবের বিনিময়ে তার বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হলে মাধবের বাবা সোনাইকে এসে বললো মাধবকে উদ্ধার করতে, কারণ, মাধব বা মাধবের বাবার ধরে নিয়ে যাওয়ার একটাই কারণ — সোনাই। বিয়ের আগেই সোনাই-এর রূপে মোহগ্রস্ত ভাবনা তাকে উপভোগ করতে চেয়ে যখন অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল সোনাইকে, তখন সোনাইকে উদ্ধার করেছিল মাধব, শুধু উদ্ধার নয়, মাধব সোনাইকে বিয়েও করেছিল। এই রাগেই মাধবের বাবাকে বন্দী করা হোল, এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ মাধবও ধরা পড়ল। কিন্তু মাধবের স্বার্থপর বাবা পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে তাকে ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে পুত্রবধূর মান-সম্মান ও নারীত্বের দিকে বিন্দুমাত্র ফিরে তাকালেন না। শৈশবে পিতৃহারা সোনাই মামার গলগ্রহ হওয়ার পর শ্বশুরের মধ্যে বাবাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিদান পেয়ে অভিমানিনী সোনাই ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণে আর দ্বিধা করে নি। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুক্তিও তার আকাঙ্ক্ষিত ছিল। শ্বশুরের মুখ চেয়ে, স্বামীর মুক্তির বিনিময়ে সোনাই ভাবনার প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করতে যায়; সোনাই যায় না, যায় তার দেহটি। কিন্তু যে সম্পদ আপন মানুষ মাধবকে দিয়েছে সোনাই, তা কোন ভাবেই অন্যকে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শয়ন মন্দিরে অনেক সাধ ও লালসা নিয়ে ভাবনা যখন গেল তার আগেই সোনাই-এর প্রাণ ছেড়ে গেছে তার দেহ। বিষ খেয়ে সোনাই ভাবনার লালসার শিকার হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেছে। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসায় তার মুক্তির জন্য সোনাই ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু কোনভাবেই নিজের নারীত্ব কিংবা সতীত্ব বিসর্জন দেয়নি।

সোনাই কিংবা মলুয়া অথবা মহুয়ার মতো কোন দুষ্ট বা শয়তানের হাতে না পড়লেও লীলার পরিণতিও বিয়োগান্তক। লীলার এই বিয়োগান্তক পরিণতির মুখ্য কারণ কঙ্কের উদারচেতা ও উদাসী মনোভাব। তার ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের ফলে গর্গ তাকে হত্যা করতে চান, কিন্তু গর্গ যখন শোনেন যে কঙ্কের সঙ্গে লীলার প্রেমের সম্পর্ক তখন তিনি কঙ্ক ও লীলাকে হত্যার পরিকল্পনায় কঙ্কের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিলে লীলা কঙ্কের প্রতি ভালোবাসায় তাকে দূরে পালিয়ে যেতে বলে। কঙ্ক পালায় কিন্তু লীলা প্রতীক্ষা করে কঙ্কের জন্য। কঙ্ক আর আসে না। লোক পাঠিয়েও যখন কঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না, অনুসন্ধানকারী বিচিত্র মাধব যখন কঙ্কের মারা যাওয়ার কথা এসে ঘোষণা করলো তখন কঙ্কের পথ চেয়ে বসে থাকা লীলা অনিদ্রা, অনাহারে একদিন প্রাণ ত্যাগ করলো। লীলার মৃত্যুর পরই কঙ্ক ফিরে এল। অনেকটা মদিনার মতো পরিণতি লীলার।

মহুয়া, মলুয়াদের পরিণতির বৈপরীতে রূপবতী, কমলা ও কাজলরেখার পরিণতি মিলনান্তক। চন্দ্রাবতী, পালঙ্কসই বেঁচে থাকলেও তাদের যন্ত্রণা আজীবন তাদের পীড়া দেবে, কিন্তু অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কমলা ও কাজলরেখারা তাদের স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। কমলা, রূপবতী, কাজলরেখার কাহিনিগুলো কেবলই মিলনান্তক নয়, অনেকটা রূপকথাধর্মীও। রূপকথার অলৌকিকতা থাকলেও নায়িকাদের ত্যাগ স্বীকার কিন্তু কোন অংশে কম নয়, বিশেষত কমলা ও কাজলরেখার। কমলা ও কাজলরেখা উভয়েই ষড়যন্ত্রের শিকার, তবে ষড়যন্ত্রের মেঘ কেটে আলোর পথেই তারা মুক্তি পেয়েছে।

সব মিলিয়ে, মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রগুলো যুগপৎ কোমল কঠোরে-মেঘ ও রৌদ্রে গড়া। প্রেমের স্বাধীনতা তাদের আছে, কিন্তু স্বাধীনতাকে তারা একবারের জন্যেও উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত করেনি। যদিও এই গীতিকার নারী চরিত্রের প্রাধান্যে এবং তাদের সক্রিয় প্রেমের স্বভাবে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ জীবনের প্রভাব আছে। তবু সকল নারী চরিত্রই কিন্তু সেই স্বভাবদ্বারা প্রভাবিত নয়। না হলেও মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রগুলো প্রেমকে কেন্দ্র করে নিজেদের জীবন আদর্শকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। একবারের জন্য তারা কেউ আগে পুরুষকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়নি। এর মধ্যে নারী সুলভ লজ্জা নয়, নিজের আত্মমর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়নি তারা। নিজেকে পুরুষের কাছে তুচ্ছ না করার স্বভাবই এর মধ্যে প্রকাশিত। যদিও

তাদের আচার-আচরণে দুর্বলতাটুকু ধরাই পড়েছিল। নারীর লজ্জা সেই দুর্বলতাতেই ছিল। কিন্তু মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীরা কেউই দুর্বলতা দিয়ে গড়া নয়। প্রেমের কোমলতা তাদের ছিল, ছিল মাধুর্যও, কিন্তু কোমলতা তাদের লতার মতো দুর্বল করেনি। পুরুষকে তারা ভালোবেসেছিল। কিন্তু পুরুষকে অবলম্বন করে তারা লতার মতো বেড়ে ওঠেনি। ভালোবাসা তাদের শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, তারা বীর্যবতী হয়েছে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায়, ধৈর্যে ও বুদ্ধিতে বলবতী হয়েছে, প্রেমের আঘাত, প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকায় তারা ভেঙে পড়েনি, বিদ্রোহ করেনি, কিন্তু জীবনের কঠিন সিদ্ধান্তে তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। চন্দ্রাবতীকে অনূঢ়া থাকার সিদ্ধান্ত থেকে, মলুয়াকে আত্মহননের পথ থেকে, মদিনাকে তিল তিল মৃত্যুবরণের পথ থেকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারেনি। ভালোবেসে প্রেম পেয়ে, না-পেয়ে, বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত পেয়েও তারা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে মৃত্যু, মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রেই লক্ষিত হয়। প্রেম তাদের বুদ্ধিমতী করেছে, বীর্যবতী করেছে; প্রাণ, মন ও জীবনদানের চূড়ান্ত পর্যায় তারা ছুঁয়েছে প্রেমের সরণী বেয়ে। হাজং গোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজজীবনে নারী স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। মৈমনসিংহ-গীতিকার কোন নারীও উচ্ছৃঙ্খল হয়নি। প্রকৃত ভালোবাসার বাঁধন তাদের শান্ত, স্নিগ্ধ ও সৎ করে তুলেছে। প্রেমিক পুরুষের ভালোবাসা যেমন তাদেরকে সকল বাধা জয় করতে শিখিয়েছে, তেমনি অন্য পুরুষের লালসার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেনি। প্রয়োজনে সময়মতো বিষ পানে আত্মহত্যায় নিজের প্রেম ও সতীত্বকে তারা বজায় রেখেছে আত্মিক এক সততার অনুপ্রেরণায়। অন্যদিকে আবার প্রেমিক পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় তারা ইউরোপীয় ব্যালাডের নারী চরিত্রের মতো প্রতিশোধ গ্রহণে উজ্জীবিত হয়নি। ভারতীয় নারীর সততার আদর্শে তারা ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু হয়েছে, শবরীর মতো প্রতীক্ষা করেছে, সীতার মতো অলৌকিকভাবে বসুন্ধরা জননীর কোলে আশ্রয় না নিলেও ভাঙা নৌকায় আরোহিতা হয়ে নদী গর্ভে আত্মবিসর্জন করেছে। কখনও আজীবন অনূঢ়া থাকার প্রতিজ্ঞা করেছে, কখনও বা স্বামীর পথ চেয়ে অনাহারকে অবলম্বন করে মৃত্যুকে আহ্বান করেছে অথচ একবারের জন্যেও প্রতিবাদ করেনি নানান ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে জেনেও। এইভাবে মনের মধ্যে লালিত আদর্শের তাগিদে মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলো পুরুষের চেয়েও বলিষ্ঠ হয়েছে অনেকক্ষেত্রে।।

১০১.১৫ মৈমনসিংহ-গীতিকায় পুরুষ

হাজং গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামোর ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকায় তাদের সমাজ জীবনে পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রের প্রাধান্য তথা সক্রিয়তার কথা আগে আপনারা জেনেছেন। মূলত এই স্বভাবের কারণেই মৈমনসিংহ-গীতিকার পুরুষ চরিত্রগুলো নারীদের তুলনায় একটু দুর্বল বা নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় বলতে ঠিক জড় বোঝানো হচ্ছে না, নারীচরিত্রগুলো যতটা তাদের বহুধা বৈশিষ্ট্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, পুরুষেরা তা পারেনি। তাই বলে তারা জড় পদার্থের মতো বসেও থাকেনি। নিষ্ক্রিয়তার, সবচেয়ে জীবন্ত উদাহরণ ‘মহুয়া’ গীতিকার নদ্যারচাঁদ। যে মায়ের কথায় উঠত-বসত, বেদের দলের খেলা দেখার জন্য যে মায়ের অনুমতি নিয়েছে সেই নদ্যারচাঁদ প্রেমের জন্যে একটু সাহসী ও সক্রিয় হয়ে উঠল। দলবলসহ হুমর‍্যার নদ্যারচাঁদের অঞ্চল ছেড়ে চলে আসার খবর পেয়ে মহুয়ার জন্য নদ্যারচাঁদের গৃহত্যাগ ও প্রায় ছ মাস ধরে মহুয়াকে খুঁজে বের করার জন্য পথে-প্রান্তরে অশেষ কষ্ট করে ঘোরাঘুরি করার সক্রিয়তা ছাড়া নদ্যারচাঁদকে বিন্দুমাত্র সাহসী ও সক্রিয় হতে দেখা যায় না। সে যেন কোনভাবে নিজেকে মহুয়ার কাছে পৌঁছে দিয়েই মুক্ত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত যা কিছু করার মহুয়াই করেছে। হুমর‍্যা থেকে শুরু করে বণিক, সন্ন্যাসী-সবার দিক থেকে যে প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা এসেছে

তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করার সকল দায়িত্ব মহুয়াই পালন করেছে। এমনকি হুমর্‍্যা তার দলবল নিয়ে যখন তাদের ঘিরে ফেলে, মহুয়ার হাতে যখন পুনরায় বিষ মাখানো ছুরি তুলে দিয়ে নদ্যারচাঁদকে হত্যা করতে বলা হয়, তখন অসহায় মহুয়া নদ্যারচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি মারফত কী করবে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেও নদ্যারচাঁদ সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। মহুয়া ছুরি নদ্যারচাঁদের বুকে না বসিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দেয়। নদ্যারচাঁদ তার সকল নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও মৈমনসিংহ-গীতিকার পুরুষ সমাজে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র তার সততার জন্য। নদ্যারচাঁদের বড় এবং একমাত্র বৈশিষ্ট্য হোল তার প্রেমে সততা। সে প্রেমিক, মহুয়াকে সে ভালোবাসে, ভালোবেসে সে তার বাবা-মা ঘর বাড়ি, সহায়-সম্পদ সবকিছুই ত্যাগ করেছে। এমন কী ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও একজন বেদের মেয়েকে ভালোবেসে, তার হাতের রান্না খেয়ে (যদিও প্রকৃতপক্ষে মহুয়া বেদের কন্যা নয় ব্রাহ্মণ ; কিন্তু তা তো নদ্যারচাঁদ জানে না) জাত দিতেও দ্বিধা করেনি। মোটকথা, নদ্যারচাঁদ ভালোবাসায় অন্ধ। জাত কিংবা ধর্ম নয়, ভালোবাসা এসবের উর্ধ্বে। ভালোবাসার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাই নদ্যারচাঁদকে নিষ্ক্রিয় করেছে। মহুয়ার প্রতি নদ্যারচাঁদের ভালোবাসা একরকম একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ।

প্রেম নদ্যারচাঁদকে যেভাবে নিষ্ক্রিয় করে মাধবকে সেভাবে করে তোলে সক্রিয় এবং সাহসী। মৈমনসিংহ গীতিকায় মাধব এমন একটি চরিত্র যে প্রেমের জন্যে একই সঙ্গে সৎ এবং সাহসী। সোনাইকে সে শুধু ভালোবাসে না, সোনাইকে যখন ভাবনার লোকে ধরে নিয়ে যায় তখন সেই-ই পারে তাকে উদ্ধার করতে। প্রেমের জন্যে এমন শক্তি মৈমনসিংহ গীতিকায় আর কোনও পুরুষ চরিত্রে দেখা যায় না। মলুয়াকে যখন দেওয়ানের লোক ধরে নিয়ে যায়, চাঁদবিনোদ তখন অর্থ উপার্জনে দেশের বাইরে। মলুয়া তার নিজের ধৈর্য ও বুদ্ধিতে নিজেকে বাঁচায় এবং উদ্ধার করে, অথচ চাঁদবিনোদ এমনই কাপুরুষ মলুয়াকে প্রশংসা করা তো দূরের কথা, আত্মীয়দের পরামর্শে মলুয়ার সতীত্ব সম্পর্কে সে সন্দেহ করে। তাদের পরামর্শে চাঁদবিনোদ অন্য নারীকে বিয়ে করতেও দ্বিধা করে না। যে মলুয়া তাকে দেওয়ানের হাত থেকে উদ্ধার করে, সর্প দংশনে মৃতপ্রায় চাঁদকে বাঁচায় — সেই মলুয়া যখন স্ত্রী নয়, দাসী হিসেবে চাঁদবিনোদের বাড়িতে থাকতে চায়, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠা করে না চাঁদবিনোদ। অথচ চাঁদবিনোদ ভালোবেসেই মলুয়াকে বিয়ে করেছিল। প্রেমিক পুরুষের এই বিশ্বাসহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতা মৈমনসিংহ-গীতিকায় একাধিক পুরুষ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের ধৈর্যের অভাব ও সাময়িক মোহগ্রস্ততা। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতীর মনে প্রেমের কুসুম ফুটিয়ে সে চলে গেল দূরে। চন্দ্রাবতী যখন তিল তিল করে জয়ানন্দকে ভালোবাসতে শুরু করেছে, তার মনে জয়ানন্দ সম্পর্কে যখন নতুন স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে এবং জয়ানন্দের সঙ্গে তার বিয়ের সকল আয়োজন যখন শেষ, তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো জয়ানন্দের অন্য নারীতে আসক্তি এবং বিয়ের খবর পাওয়া গেল। পুরুষের এই ভ্রমরসুলভ আচরণ শুধু জয়ানন্দ নয়, চাঁদবিনোদ এমন কি দুলালের মধ্যেও লক্ষণীয়। এদের মধ্যে জয়ানন্দ ও দুলাল পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে। সে পথে পাগল জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে শেষবারের জন্যে একবার দেখতে চেয়েও না পেয়ে অভিমান নিয়েই আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। অন্যদিকে দুলালকে শেষবারের মতো একবার দেখার আশা নিয়ে পথ চেয়ে থেকেও না দেখার অভিমান নিয়ে অনাহারে মদিনা যখন মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, ঠিক তারপরেই দুলাল ফিরে আসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে। জয়ানন্দের মতো আত্মহত্যায় সে নিজেকে আত্মশুদ্ধ করতে চায় না বটে, তবে নিজের অন্যায়ে অকালমৃতা মদিনার কবরের পাশে সে কাটিয়ে দেয় বাকি জীবনটা। দাদার দেওয়া রাজকন্যা ও রাজসম্পদের মোহ মুহূর্তেই তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায় মদিনার মৃত্যুর খবর শুনে। একমাত্র প্রেমই পারে রাজসম্পদ ভুলিয়ে মানুষকে পথের ভিখারি হতে শেখাতে। জয়ানন্দ, চাঁদবিনোদ কিংবা দুলাল — তিন প্রেমিক পুরুষই তাদের প্রেমিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনজনের মধ্যে চাঁদবিনোদের কোনো অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই, কিন্তু জয়ানন্দ ও দুলালের মধ্যে আছে। দুলাল নিজের ভুল বুঝতে পারলেও জয়ানন্দের মধ্যে অনুতাপ বা অনুশোচনার পরিমাণ বেশি। এই তিন

চরিত্রের পারস্পরিক তুলনায় জয়ানন্দ অনেক বেশি রক্ত মাংসের চরিত্র। শুধু এই তিনটি চরিত্র কেন — মৈমনসিংহ-গীতিকার সমস্ত পুরুষের চরিত্রের তুলনামূলকতায় জয়ানন্দকে বেশি জীবন্ত বলে মনে হয়। জয়ানন্দ Round Character বা বৃত্ত চরিত্র, দুলালও অনেকাংশেই বৃত্ত চরিত্র। কিন্তু গীতিকার সবচেয়ে প্রেমিক চরিত্রটি - নদ্যারচাঁদ - সমতল বা Flat Character, তার কোনো বিবর্তন নেই। চাঁদবিনোদ Round ও নয়, Flat ও নয়; কাপুরুষ চরিত্র, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই, অন্যের কথায় চালিত। মলুয়ার প্রতি সে যে অবিচার করেছে তার জন্য তার মধ্যে অনুশোচনা নেই বিন্দুমাত্র। চাঁদবিনোদের মধ্যে অনুশোচনা নেই, জয়ানন্দ ও দুলালের মধ্যে আছে; কিন্তু অনুশোচনার ঊর্ধ্বে কঙ্কের অবস্থান। কঙ্কের উদারচেতা মনোভাব তার জ্ঞান পিপাসা তার প্রেমিক স্বভাবকে কিছুটা সুপ্তই রেখেছিল। কিংবা তার প্রেমিক সত্তার ঊর্ধ্বে ছিল আধ্যাত্মিক একটা মন। যে মনের দৌলতে সে অপেক্ষারতা লীলার মৃত্যুর পর এসে অনুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে গর্গকে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। যদিও কঙ্ক লীলার মৃত্যুর মতো দুলাল কিংবা চাঁদবিনোদের মতো দায়ী নয়। তারা কিন্তু তাদের প্রেমিকার মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। আসলে জাগতিক এই শোক-তাপ কঙ্ককে তেমনভাবে আলোড়িত করতে পারেনি।

'কাজলরেখা' গীতিকার সুঁচবিদ্ধ রাজপুত্র, 'কমলা' গীতিকার রাজপুত্র উভয়েই নায়ক চরিত্র বটে, তবে তাদের মধ্যে নায়কের যে গুণ তা তেমন স্পষ্ট যেমন নয় তেমনি চরিত্রগুলোর সক্রিয়তাও প্রশ্নাতীত নয়। আসলে রূপকথার প্রভাব এত প্রবল যে, চরিত্রগুলো ঠিক জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এই শ্রেণীর মধ্যে 'রূপবতী' গীতিকার মদনকেও ফেলা যায়।

'দস্যু কেনারাম পালা'র কেনারাম কোন প্রেমিক চরিত্র নয়, অথচ তার জীবনের বিবর্তন তাকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছে। কেনারাম চরিত্রে বাল্মীকির ছায়া পড়লেও দস্যু প্রকৃতির একটি মানুষের প্রবৃত্তির এই পরিবর্তন অনেক বাস্তব এবং যুক্তি সংগত। 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকাটি রসের দিক থেকে মৈমনসিংহ-গীতিকার মূল সুরের থেকে একটু ভিন্ন গোত্রের। সব গীতিকাগুলো যেখানে নর-নারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেখানে আলোচ্য গীতিকাটির বিষয় একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির — একজন হিংস্র পাশবিক প্রবৃত্তির মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তনের। মানুষের জীবন কখন যে কীভাবে বাঁক নেয় বলা যায় না। কেনারামের জীবন তেমনই। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে মামার গলগ্রহ হয়ে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অন্যের হাতে পড়ে নরঘাতী ডাকাতে পরিণত হয় কেনারাম। তারপর দ্বিজবংশীদাসের গানে মুগ্ধ কেনারামের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। তার চরিত্র পরিবর্তনে মনসার বর সংক্রান্ত অলৌকিক বিষয়টি থাকলেও কেনারামের চরিত্র পরিবর্তন অনেক যুক্তি সংগত ও বাস্তব।

মৈমনসিংহ-গীতিকার পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম চরিত্র হুমর্‍্যা বাইদ্যা। হুমর্‍্যা, দেওয়ান ভাবনা, বণিক কিংবা সন্ন্যাসীর মতো রূপলোলুপ চরিত্র নয়, অথচ ওই চরিত্রগুলোর খলস্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান। নিজের দলের মধ্যেকার সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ও মহুয়ার রূপ ও ক্রীড়ানৈপুণ্যকে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর জন্য তাকে দল ছাড়া করতে চায়নি। দলের খেলোয়াড় সুজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে মহুয়াকে দলের মধ্যে রাখতে চেয়েছিল হুমর্‍্যা। কিন্তু নদ্যারচাঁদের সঙ্গে প্রণয় হলে তা সম্ভব নয় জেনে হুমর্‍্যা তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াল। মহুয়ার হাতে বিষ মাখানো ছুরি তুলে দিয়ে নদ্যারচাঁদকে হত্যার আদেশ দিয়েও যখন সফল হওয়া গেল না, তখন হুমর্‍্যা তার জেদ বজায় রেখে মহুয়া-নদ্যারচাঁদকে একদিন খুঁজে বের করে আবার বিষ মাখানো ছুরি তুলে দেয় মহুয়ার হাতে নদ্যারচাঁদকে হত্যার জন্য। নদ্যারচাঁদকে হত্যা না করে অসহায় মহুয়া ছুরি বসায় নিজের বুকে। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে নদ্যারচাঁদকেও হত্যা করা হোল হুমর্‍্যার আদেশে। হুমর্‍্যার জেদ তিল তিল করে পারদের মতো বাড়ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে মহুয়ার আত্মহননের পরপরই নদ্যারচাঁদকে হত্যা করা হলো সে মুহূর্তেই শুরু হলো জেদের অবসানে অনুশোচনার পর্ব। নদ্যারচাঁদ ও মহুয়ার মধ্যেকার ভালোবাসার

সম্পর্ক এতদিন পর স্বীকার করে নিল হুমরা, তাদের একই সঙ্গে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে তার নিঃসঙ্গ একক যাত্রা শুরু হলো।

খলচরিত্র হিসেবে মৈমনসিংহ-গীতিকায় একাধিক পুরুষ চরিত্রকে দেখা যায়। হুমর্‍্যার কথা তো শুনলেন। মহুয়া গীতিকায় বণিক ও সন্ন্যাসীকে এই পর্যায়ে আনা যায়। 'মলুয়া' গীতিকার কাজী ও দেওয়ান, 'কমলা' গীতিকায় কারকুন, 'দেওয়ান ভাবনা'য় ভাবনা, 'কাজলরেখা'য় রাজপুত্রের বন্ধু প্রভৃতি চরিত্রগুলোকে খলচরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এরা অসৎ, কামুক এবং স্বার্থপর। নায়িকার রূপ-তৃষ্ণায় নিজেদের দৈহিক পিপাসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা সফল হয়নি। কারণ, তাদের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না। চরিত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নায়িকার স্বপ্নপূরণে প্রতিবন্ধক হয়ে তাদের জীবনে একটা বিয়োগান্তক পরিণতি ডেকে এনেছে বটে, তবে, অন্যভাবে দেখলে এই চরিত্রগুলোর প্রতিবন্ধকতা নায়িকাদের নায়কের প্রতি প্রেমের গভীরতাকে নানান ভাবে বাড়িয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনা যত পাথরের বাধা অতিক্রম করে ততই তার রূপের ছটার বিকাশ ঘটে। তেমনি আপন প্রেমের পথে নায়িকাদের জীবনে এই বাধা (অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হলেও) তাদের প্রেমের মহত্ত্বকে বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি।

পুরুষ চরিত্রের তালিকায় হুমর্‍্যার মতো গর্গ চরিত্রও রয়েছে। কিন্তু গর্গ হুমর্‍্যার মতো পালক পিতা নন। তবু গর্গের মতো বিচক্ষণ, বিদ্বান মানুষও অবিবেচকের কাজ করেন। লীলার মৃত্যুর পিছনে গর্গের ক্ষণিক উত্তেজনা ও অবিবেচনাও সক্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সোনাই-এর মৃত্যুর পিছনে ভাবনার লালসাবৃত্তি ছাড়াও মাধবের বাবার ভূমিকাও কম নয়। পুত্রের মুক্তিকল্পে স্বার্থপর বৃদ্ধ নিজ পুত্রবধূকে ভাবনার মতো মানুষের লালসার বেষ্টনীতে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সোনাই-এর মৃত্যুর দায় তিনিও কোনভাবেই এড়াতে পারেন না।

তাই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নায়ক চরিত্রগুলো যতই নিষ্ক্রিয় মনে হোক না কেন, পার্শ্ব পুরুষ চরিত্রগুলো কোন অংশে কম সক্রিয় নয়। বরঞ্চ তথাকথিত নায়ক বলে যাদের আপনারা জানছেন, সাহিত্যের নায়ক চরিত্র হওয়ার সকল বৈশিষ্ট্য তাদের আছে কিনা সন্দেহ। নায়কের প্রধান যে লক্ষণ, কাহিনি এবং অন্যান্য চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা, সে দক্ষতা মৈমনসিংহ-গীতিকার প্রেমিক চরিত্রগুলোর কতটা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বরঞ্চ কাহিনি অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পার্শ্ব চরিত্র দ্বারা। তাই পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রেমিক চরিত্র ছাড়াও পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১০১.১৬ বাংলা সাহিত্য ও মৈমনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলোর রচনা সাল নিয়ে বিতর্ক আছে। এক কথায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই গীতিকাগুলো রচিত হয়েছিল ধরে নিলেও এগুলোর রচনার কালগত জিজ্ঞাসার অবসান হয় না। এক কথায় এগুলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন ধরলেও প্রশ্ন থেকে যায় এগুলো ঠিক কোন সময় রচিত। শুধু তাই নয় এগুলো বাংলা সাহিত্যের লিখিত তথা শিষ্ট ধারার নিদর্শন, না এগুলো লোকসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে, এ নিয়েও বিতর্ক থেকেই যায়।

মোটামুটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের লিখিত তথা শিষ্ট ধারার সাহিত্যের সঙ্গে যদি এই 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলে এই সাহিত্য শাখার বেশ কিছু নতুনত্ব ও অভিনবত্ব ধরা পড়ে। যেমন —

- যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের সম্মিলিত ধারায় সমৃদ্ধ বাংলা মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্য মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আসলে বাস্তবের নর-নারীরই প্রেম, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার একটা বাতাবরণ দিয়ে তা বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত ; শাক্ত পদাবলীতে শক্তিদেবীকে কখনো কন্যা, কখনো বা জননীরূপে দেখা হলেও তাঁর দেবী মহিমাই মুখ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে ; অনুবাদ সাহিত্যেও দেবীর মহিমা প্রকাশের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি ; আর একাধিক শাখায় বিভক্ত মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ও উদ্দেশ্যের মধ্যেই তো আছে লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার।
- মধ্যযুগের মানুষ ছিল ধর্মীয় চেতনায় আচ্ছন্ন, যূথবদ্ধ মানসিকতার নাগরিক। দৈবী-মহিমা বিরোধী স্বাধীনচেতা মানুষের ছিল অভাব। মোটকথা ; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মাশ্রিত, মানুষের কাহিনিও সেখানে ধর্মীয় মোড়কে বর্ণিত।
- সে যুগে নারীর কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। তাই নারীর স্বাধীন প্রেম তো দূরের কথা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পান থেকে চুন খসলেও নারীকে দিতে হয়েছে সতীত্ব নির্ধারণের হাজার পরীক্ষা। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম আধ্যাত্মিক মোড়কে পরিবেশিত। সামাজিক ও ধর্মীয় সমষ্টি চেতনার ইষ্টকে চাপা পড়ে রক্ত-মাংসের মানুষের অভাব নিয়েই গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, প্রেম ছিল আধ্যাত্মিক বা দৈবী।

এ রকম পরিস্থিতিতে আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা প্রথম শোনালেন মানুষের কথা। তাঁদের হাতে দেবতার মহিমা প্রচার ব্যতিরেকে মানব ও মানবীর প্রেম-বিরহ নিয়ে গড়ে উঠল প্রেমের কাহিনি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের হাতে এক অভিনব ধারার সূত্রপাত হলো। যেখানে রক্ত মাংসের মানুষ এলো চরিত্র হয়ে, দেবতার মহিমা হ্রাস পেল, মানব-মানবীর প্রেম সাহিত্যে আসন পেল। এদিক থেকে আরাকান রাজসভার সাহিত্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। যেখানে সাহিত্য স্বর্গ থেকে যেন মর্ত্যে নেমে এলো, দেবতা ছেড়ে মানুষের কথা নিয়েই রচিত হোল। আরাকানী সাহিত্য লিখিত তথা শিষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। মৈমনসিংহ গীতিকা লোকসাহিত্যেরই লিখিত রূপ। আলোচ্য গীতিকাগুলোয় রচয়িতার নাম থাকলেও তার মধ্যে লোকসাহিত্যেরই উপাদান বেশি। যাইহোক মৈমনসিংহ গীতিকা কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এখানেই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ বাংলা সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। দেখা গেল বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসে গড়া মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, পাওয়া-না-পাওয়ার কাহিনি। নারীর স্বাধীন প্রেম, প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা। কোন রকম দৈবী মহিমা প্রচারের চেষ্টা নেই, দেবতার কোনো স্বপ্নাদেশের উল্লেখ নেই, নেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের অভিনব কৌশল — মৈমনসিংহ-গীতিকা নির্ভেজাল মানুষের কাহিনি। মাটির পৃথিবীর রক্ত-মাংসের কাহিনি নিয়ে গঠিত মৈমনসিংহ-গীতিকা। বৈষ্ণব পদাবলী যেখানে আধ্যাত্মিক প্রেমের আধার, অনুবাদ সাহিত্যে যেখানে দেব-মহিমাই প্রকারান্তরে প্রচারিত, মঙ্গলকাব্য তো পুরোপুরিই দেবাশ্রিত, ঠিক সেখানেই মৈমনসিংহ-গীতিকা পুরোপুরি দেব-মহিমা বর্জিত মানুষের কাহিনি। মহুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা, সোনাই — সবাই রক্ত মাংসের নারী, সবাই রক্ত মাংসের মানুষের প্রেমে-ই পাগল। শুধু প্রেমেই পাগলই নয়, প্রেমের জন্য নারী চরিত্রের এমন আত্মত্যাগ, এমন নিষ্ঠা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র নেই বললেই চলে। বেহুলা, খুল্লনা, সীতা-সাবিত্রী আছেন বটে, কিন্তু সেখানে আধ্যাত্মিকতার আবরণ বা ধর্মীয় বাতাবরণকে এড়ানো যায় না।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র নারী চরিত্রের স্বাধীনতা গীতিকা সাহিত্যের এক পরম সম্পদ। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃংখলতা নয়, সঠিক স্বাধীনতার থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা বাঁধন। মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রগুলো

প্রেমের ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীন, তেমনি আবার সে স্বাধীনতায় নেই স্বেচ্ছাচারিতার বিন্দুমাত্র প্রকাশ। মহুয়া, মলুয়া, লীলা — এরা সবাই স্বাধীনভাবে নিজেদের স্বামী নির্বাচন করেছে ঠিকই। সে স্বামী নির্বাচনে তারা পেয়েছে অশেষ যন্ত্রণা, অশেষ কষ্ট এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতিস্বরূপ তারা পেয়েছে মৃত্যুকে। কিন্তু একবারও তারা প্রেম থেকে, প্রেমিক পুরুষ বা স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা থেকে বিচ্যুত হয় নি। ভালোবাসার গভীর পরাকাষ্ঠায় মৃত্যুই তাদের পরমপ্রাপ্তি, কিন্তু তবুও তারা পিছপা নয়।

সব মিলিয়ে মৈমনসিংহ-গীতিকার কাহিনির মধ্যেই আছে নিয়তির অমোঘ প্রভাব। মহুয়া জন্মের পর থেকে নিয়তি তাড়িত, মলুয়াও ভালোবেসে অসুখকর প্রতিদান পেয়েছে, চন্দ্রাবতীর জীবনবীণা যখন মধুর ছন্দে বাজতে যাবে সে মুহূর্তেই গেল তার ছিঁড়ে, মদিনা ও লীলা দুলাল কিংবা কঙ্কের পথ চেয়ে তাদের জীবনটা শেষ করার পরই পেল পথ-চাওয়া মানুষগুলোকে। মাধব যেদিন ছাড়া পেল, সোনাইকে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর মাধব ঘরে এসে দেখল সোনাই ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাই সে পেয়েছে মুক্তি। এ ভাবেই নিয়তি তাড়িত মানুষগুলোর জীবন কাহিনি কোন না কোনভাবে বিয়োগান্তক পরিণতিতে শেষ হয়েছে। কাহিনির এই বিয়োগান্তক দিকটিও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

১০১.১৭ সারাংশ

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-ভুক্ত গীতিকাগুলি প্রেমমুখ্য। সে প্রশ্নে রক্ত-মাংসের মানব-মানবীর প্রেম। ব্যতিক্রম 'দস্যু কেনারামের পালা।' তাতে পাই এক দস্যুর হৃদয়-পরিবর্তনের কাহিনি।

প্রাক্-বিবাহ প্রেম বেশ কয়েকটি গীতিকায় দেখা যায়। যেমন 'মলুয়া', 'কমলা', 'দেওয়ান ভাবনা' 'কাজলরেখা', 'দেওয়ানা মদিনা'। আনুষ্ঠানিক বিবাহ-প্রথাকে অমান্য করে নায়ক-নায়িকা দাম্পত্য জীবন যাপন করেছে 'মহুয়া'য়। 'চন্দ্রাবতী'তে পূর্বরাগের পালা আছে, বিবাহের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে, কিন্তু নায়কের হঠকারিতায় বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নি। নায়ক অন্য এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, নায়িকা পালন করেছে কৌমার্যব্রত। 'কঙ্ক ও লীলা'য় পূর্বরাগের পালা আছে, কিন্তু নায়িকা লীলার অকালমৃত্যু হেতু বিবাহ সম্পর্ক সংগঠিত হয় নি। 'কমলা', 'রূপবতী' ও 'কাজলরেখা' শুভান্তক। অন্য গীতিকাগুলি বিয়োগান্তক।

মূলত রূপকথাধর্মী 'কমলা', 'রূপবতী' ও 'কাজলরেখা'। প্রণয়-নিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা গীতিকাগুলির নায়িকাদের বিশেষত্ব। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কমলা', 'দেওয়ান ভাবনা', 'কাজলরেখা', 'দেওয়ান মদিনা' তে তার প্রমাণ লভ্য। 'দেওয়ান ভাবনা'-র নায়িকার নাম সোনাই অন্য গীতিকার নাম গীতিকা-নামেই স্পষ্ট। বাল্য প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে 'চন্দ্রাবতী', এবং 'কঙ্ক ও লীলা' গীতিকায়। উভয় গীতিকাতেই বাল্য প্রেম অভিশপ্ত। মহুয়া, মলুয়া, সোনাই পরিস্থিতি-বিপর্যয়ে আত্মহত্যা করেছে। লীলা ও মদিনার অকালমৃত্যু আত্মহত্যারই সামিল।

নায়ক স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী' 'দেওয়ান ভাবনা' ও 'দেওয়ান মদিনা'য়। অবশ্য 'চন্দ্রাবতী' ও 'দেওয়ান মদিনা'র নায়কদ্বয় জয়ানন্দ ও দুলালের অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্ত পর্ব প্রদর্শিত হয়েছে। অত্যাচারী কাজী ও দেওয়ানকে পাই 'মলুয়া'য়, অত্যাচারী দেওয়ানকে পাই 'দেওয়ান ভাবনা'য়। সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর কারকুনের আবির্ভাব ঘটেছে 'কমলা'য়।

গীতিকাগুলিতে বেশ কয়েকটি খলচরিত্র রয়েছে। যেমন ঃ 'মহুয়া'-য় হুমর্‌া বেদে, 'মলুয়া'-য় কাজী, 'কমলা'-য় কারকুন, 'দেওয়ান ভাবনা'য় দেওয়ান ভাবনা, 'কাজলরেখায়' দাসী, 'দেওয়ান-মদিনা'য় আলাল।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অধিকতর উজ্জ্বল। মহুয়ার পাশে নদ্যারচাঁদ ম্লান, মলুয়ার পাশে চাঁদবিনোদ, চন্দ্রাবতীর পাশে জয়ানন্দ, কমলার পাশে প্রদীপ কুমার, সুনাইয়ের পাশে তার স্বামী, মদিনার পাশে দুলাল। প্রেমে, ত্যাগে, ধৈর্যে, সহিষ্ণুতায়, হৃদয়বত্তায় নারী চরিত্রগুলি পুরুষচরিত্রগুলোকে নিষ্প্রভ করে তুলেছে।

অবশ্য 'মহুয়া'য় নদ্যারচাঁদের বিপুল ত্যাগ, 'চন্দ্রাবতী'তে জয়ানন্দের অনুশোচনা ও আত্মবিসর্জন, 'কঙ্ক ও লীলা'য় কঙ্কের স্থৈর্য ও গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং 'দেওয়ান মদিনায়' দুলালের ফকিরিব্রত তাদের বিশেষ মহিমার অধিকারী করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত তারা তাই নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকে নি।

গীতিকাগুলি মূলত বিবরণাত্মক, কিন্তু নাট্যলক্ষণ বর্জিত নয়। ঘটনাগত দ্বন্দ্ব, চরিত্রগত দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতিগত দ্বন্দ্ব, সংলাপময়তা ইত্যাদি এগুলিতে রয়েছে। 'মহুয়া' গীতিকাটি তো আদ্যন্ত Action যুক্ত। নাট্যোৎকণ্ঠার পরিচয়ও গীতিকাগুলিতে লভ্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে গীতিকাগুলির স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ রচনা। দেব-দেবীর রাগ, দেব-মাহাত্ম্য এগুলিতে কীর্তিত হয়নি। রক্ত মাংসের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সফলতা-ব্যর্থতার কাহিনিই এগুলিতে পরিবেশিত। নারী-স্বাধীনতার যে পরিচয় এগুলিতে পাওয়া যায় তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনও শাখায় পাওয়া যায় না। দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেছিলেন, এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা মাতৃতান্ত্রিক হাজং জনগোষ্ঠীর প্রভাবের ফলেই এমনটি ঘটেছে। গীতিকাগুলিতে নিয়তি-তাড়িত মানব-মানবীর যে জীবনলীলা প্রদর্শিত হয়েছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র তা দেখা যায় না।

১০১.১৮ অনুশীলনী

১। সঠিক প্রশ্নের উত্তরে টিক (✓) দিন ঃ—

(ক) চন্দ্রাবতী গীতিকাটির রচয়িতা —

- ☐ মনসুর বয়াতি
- ☐ দ্বিজ ঈশান
- ☐ নয়ানচাঁদ ঘোষ

(খ) দস্যু কেনারামকে দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেন —

- ☐ হুমর্‍্যা বেদে
- ☐ দ্বিজ বংশীদাস
- ☐ দেওয়ান ভাবনা

(গ) চিকন গোয়ালিনির আবির্ভাব ঘটেছে —

- ☐ 'মলুয়া' গীতিকায়
- ☐ 'কমলা' গীতিকায়
- ☐ 'কাজলরেখা'য়

(ঘ) দুলালের স্ত্রীর নাম —

- ☐ মদিনা
- ☐ সোনাই
- ☐ লীলা

(ঙ) বিচিত্র-মাধবের উল্লেখ আছে —

- ☐ 'চন্দ্রাবতী'তে
- ☐ কঙ্ক ও লীলা'য়
- ☐ 'মলুয়া'য়

২। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ—

(ক) মলুয়াকে কেন আত্মহত্যা করতে হলো?

(খ) জয়ানন্দের অনুতাপের কারণ কি?

(গ) সোনাই-য়ের স্বামী কিভাবে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেল?

(ঘ) রাজকন্যা রূপবতীর সঙ্গে ভৃত্য মদনের বিয়ে কেন দেওয়া হয়?

(ঙ) লীলার অকালমৃত্যুর জন্য প্রধানত কে দায়ী?

৩। প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ—

(ক) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত 'দস্যু কেনারামের পালা' কেন ব্যাতিক্রম রচনা?

(খ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-ভুক্ত গীতিকাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যলক্ষণযুক্ত। —আলোচনা করুন।

(গ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

(ঘ) 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'-র পুরুষ চরিত্রগুলি নারী এই চরিত্রগুলির পাশে নিতান্তই ম্লান, নিষ্প্রভ। —যথার্থ্য বিচার করুন।

(ঙ) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। —উক্তিটির যাথার্থ্য নিরূপণ করুন।

১০১.১৯ উত্তর-সংকেত

১। (ক) নয়ানচাঁদ ঘোষ।

(খ) দ্বিজ বংশীদাস।

(গ) 'কমলা' গীতিকায়।

(ঘ) মদিনা।

(ঙ) ‘কঙ্ক ও লীলা’য়।

২। (ক) ১০১.৪ অংশের আলোচনা দেখুন।

(খ) ১০১.৫ অংশের আলোচনা দেখুন।

(গ) ১০১.৭ অংশের আলোচনা দেখুন।

(ঘ) ১০১.৯ অংশের আলোচনা দেখুন।

(ঙ) ১০১.১০ অংশের আলোচনার সাহায্য নিন।

৩। (ক) আলোচনার জন্য ১০১.৮ অংশের সাহায্য নিন।

(খ) ১০১.১৩ অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(গ) ১০১.১৪ অংশের আলোচনা দেখুন।

(ঘ) ১০১.১৫ অংশের আলোচনার সাহায্য নিন।

(ঙ) আলোচনার জন্য ১০১.১৬ অংশটি দেখুন।

১০১.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত — মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯২৩)

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড ঃ ১৯৬২)

৩। Dusan Zbavitel – Bengali Folk-Ballads from Mymensingh and Problem of their Authenticity (1963)

৪। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত — ময়মনসিংহ-গীতিকা (১৯৯১)

৫। আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত — মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯৯৬)

৬। ক্ষেত্রগুপ্ত — প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন (১৯৯৬)

৭। সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত — মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯৯৯)

একক ১০২ ❒ লোকসাহিত্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন ঃ

১০২.১ উদ্দেশ্য
১০২.২ প্রস্তাবনা
১০২.৩ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতিচর্চার সূত্রপাত
১০২.৪ রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থ
১০২.৫ প্রবন্ধ বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক সূত্র ঃ ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ১
১০২.৬ ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ২
১০২.৭ ছেলেভুলানো ছড়া ও রবীন্দ্রনাথ
১০২.৮ ছেলেভুলানো ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সীমায়তি
১০২.৯ কবি-সংগীত
১০২.১০ প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে কবি-সংগীতের পার্থক্য
১০২.১১ কবি গানের প্রকৃতি
১০২.১২ কবি-সংগীতের গুরুত্ব
১০২.১৩ গ্রাম্য সাহিত্য
১০২.১৪ গ্রাম্য সাহিত্যের প্রকৃতি
১০২.১৫ গ্রাম্য সাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্য
১০২.১৬ বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ
১০২.১৭ সারাংশ
১০২.১৮ অনুশীলনী
১০২.১৯ উত্তর-সংকেত
১০২.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১০২.১ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তাঁর সৃষ্টির মুখ্য অংশ জুড়ে আছে কবিতা; তাঁর আত্মাও কবির; তবু সাহিত্যের অন্যান্য উপকরণও তাঁর হাতে ফুলের মতো ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ শিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা। শিষ্ট বা নাগরিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ তা লিখিত রূপ পায়। কিন্তু সাহিত্যের এই লিখিত ধারার পাশাপাশি একটা ঐতিহ্যভিত্তিক মৌখিক ধারাও আছে, সাধারণত যেটি অলিখিত, অর্থাৎ বাক্‌কেন্দ্রিক বা মৌখিক। বংশ বা লোকপরম্পরায় প্রবাহিত সাহিত্যের এই মৌখিক রূপটি এক কথায় লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। লোকসাহিত্য সাধারণত লোকসংস্কৃতির বাক্ কেন্দ্রিক ধারা। একটা দেশ বা একটা জাতির শিষ্ট সাহিত্য ধারায় থাকে সে দেশের সমাজ-জীবনের উপরিসৌধের কথা। কিন্তু তার মৌখিক ধারায় থাকে সমাজ-জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অথচ প্রাণের কথা। একটা দেশ, একটা জাতির অপরিমার্জিত প্রকৃত রূপ ও ইতিহাসটি নিহিত থাকে তার অলিখিত ধারায়। রবীন্দ্রনাথ, লিখিত তথা শিষ্ট সাহিত্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম; অথচ তাঁর এই অলিখিত ধারার প্রতি অনুরাগের অন্ত নেই।

শৈশব থেকে বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রাণের যোগ, বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-ই কেবল তাঁকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়নি। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান' ছড়াটিও বাল্যকালে তাঁর কাছে ছিল মোহমন্ত্রের মতো। শৈশবের সেই মোহ, পরিণত বয়সে কেবল অনুরাগে পরিণত হয়নি, জাতীয় দায়বদ্ধতায় তিনি লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পর্যালোচনায়ও নিযুক্ত হন। 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থটি তার নিদর্শন। পরবর্তী আলোচনায় আপনারা জানতে পারবেন —

বাংলা লোকসাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

১। লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার স্বরূপ।

২। ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

৩। ছড়া সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

৪। গ্রাম্য সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত।

৫। কবি সংগীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত ইত্যাদি।

১০২.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতির মূলত দুটি ধারা; একটি শিষ্ট বা নাগরিক বা পরিমার্জিত সংস্কৃতি; অপরটি লোক বা গ্রামীণ বা লোকায়ত সংস্কৃতি। আজকে যদিও দুই সংস্কৃতির মধ্যে অর্থাৎ গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে ভাবের ব্যাপক আদান-প্রদান হচ্ছে, তবু দুই সংস্কৃতির মৌলভিত্তি কিন্তু ভিন্ন। নাগরিক সংস্কৃতির আবির্ভাব পরবর্তীকালে এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিমার্জিত কৃত্রিমতাই প্রধান। তুলনায় গ্রামীণ সংস্কৃতি অসংস্কৃত হলেও এর মধ্যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়টি বিদ্যমান। নাগরিক বা শিষ্ট সাহিত্যের চাকচিক্যের কৃত্রিমতার কাছে লোকায়ত সংস্কৃতি আপাত পরাজিত হলেও, এর চিরগুণত্ব অস্বীকার করার নয়। একটা দেশ, একটা জাতির সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক ইতিহাসের আপাত তুচ্ছ রূপটি এতে বিবৃত। লোকসংস্কৃতির সঠিক অনুসন্ধানে ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে একটা জাতি ও একটা দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি একটা জাতি হতে পারে ঐক্যবদ্ধ। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে লোকসংস্কৃতির সঠিক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চায়। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলায় লোকসংস্কৃতিচর্চায় এই মানসিকতা প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ কবি, কল্পনা তাঁর অন্যতম হাতিয়ার, কিন্তু সমাজ ভূমিকে অস্বীকার তিনি কোনদিন করেন নি। না কবিতায়, না গদ্যে। এমনকি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও। বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি আমাদের মুখ্য লক্ষ্য হলেও, এই গ্রন্থ আশ্রয় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ধারণার পরিচয়ও নেওয়া হবে। এথেকে আপনারা জানতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির উপকরণ সমূহের বিশেষত্ব, সংগ্রহের পদ্ধতি, ও সমীক্ষা তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, তাঁর মূল লক্ষ্য এবং লোকায়ত সাহিত্য অবলম্বনে তাঁর শিষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার দিকটিও আপনাদের জানার পরিধির মধ্যে পড়বে।

১০২.৩ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৭ চৈত্র। স্থান ক্লাসিক থিয়েটার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে মফস্বল থেকে আগত ও কলকাতার কলেজের ছাত্রদের সংবর্ধনা সভা। মুখ্য উদ্দেশ্য সংবর্ধনা হলেও আর একটি উদ্দেশ্য

ছিল — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে উক্ত ছাত্র সমাজের সম্বন্ধস্থাপনা। সভার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে ওই সভায় রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ''ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যেন এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি যেন ছাত্রদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী সঞ্চারিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল দেশপ্রেমের প্রকাশ। দেশীয় যুব-সমাজের পাশ্চাত্যমোহ, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, শিক্ষাকে বাহন করার পরিবর্তে বহন করার মানসিকতা, নিজের দেশকে না জেনে, নিজের পরিবেশের চারপাশকে না বুঝে বিদেশির চোখে-বিদেশি ভাষায় স্বদেশ ও স্বদেশের ইতিহাস জানার প্রবণতা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাদের দেশীয় ভাষা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি অনুরাগী করে তোলার চেষ্টা করেন তাঁর ভাষণে। দেশের যুব তথা ছাত্র সমাজকে দেশীয় ঐতিহ্যানুরাগী করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়টির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চান, সেটি মূলত লোকসংস্কৃতি। আমাদের দেশে শিষ্ট সংস্কৃতির পাশাপাশি সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার থাকলেও, তা ছিল মূলত ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়। প্রতিদিনের আটপৌরে জীবনে লোকজীবনের বহুল বিষয় আমাদের ব্যবহারের মধ্যে পড়লেও, সে বিষয় নিয়ে আমরা তেমন সচেতন নই। নই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীলও। দু'একজন বিদেশি, বিভাষী মানুষের দেখাদেখি আমাদের দেশীয় কিছু মানুষ অপাংক্তেয় এই লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো মহান ব্যক্তিত্ব ও কবি এর আগে এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি। এলেও তাঁরা আবার দেশীয় ভাষা ছেড়ে বিদেশি ভাষাকে মাধ্যম করেছিলেন। তার একটা ভালো দিক ছিল এই যে, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি বিশ্বের সামনে তার ব্যাপক ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, ইংরেজিতে তা প্রকাশিত হওয়ায়। কিন্তু পরাধীন একটা জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটাতে, বিদেশি ভাষার তুলনায় স্বদেশি ভাষায় সে কাজ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। দেশের ব্যাপার দেশিয় মানুষেরা জানলো না, অথচ তা বিদেশিদের গবেষণার খোরাক হল এ আদৌ মানা চলে না। দেশের মানুষ দেশ, দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস জানুক এবং তা দেশীয় ভাষায়—এটাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন। আমরা আমাদের গ্রামের কোন সম্প্রদায়ের জাতিগত নৃতত্ত্বগত ঐতিহ্যের কোন পরিচয় জানলাম না। অথচ ইংরেজের লেখা গ্রন্থ পড়ে নিজের দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ভান করলাম, এ আদৌ দেশপ্রেমের কাজ নয়, পুঁথিগত শিক্ষাকে বহন করার প্রবণতা। ছাত্র সমাজের এই মৌলিকতাহীন পুঁথিগত মুখস্থবিদ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার একটা দিক এই চিন্তার সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার বিষয়টিও অনেকাংশে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঞ্চারিত। দেশের লোকসংস্কৃতি চর্চায় তিনি দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে যোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর, বিশেষত দেশের যুব সমাজের পরিচয় ঘটানো এবং এর মধ্যে থেকে তাদের অন্তরে একটা দেশানুরাগ জাগানো। যেটা পরাধীন দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনের। দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস— যা আমরা দেখি, যারমধ্যে দিয়ে আমরা বড়ো হচ্ছি, অথচ যার সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে জানি না, ভাবি না, চিন্তা বা গবেষণা করি না সে সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ এনে দেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। স্বয়ং ম্যাক্সমুলারও তাঁর চিঠিতে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের অতীত ইতিহাস ও অতীত ঐতিহ্য অনুসন্ধানের কথা জানান। এইভাবে জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করে একটা জাতিকে তার আত্মমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ জুড়ে দিলেন নতুন মাত্রা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি 'বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া'

নামক একটি সুদীর্ঘ আলোচনা ও ছড়া সংগ্রহ প্রকাশ করলেন। এই সুদীর্ঘ ও মননঋদ্ধ আলোচনা বাংলায় বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কিত সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনাই-ই কেবল নয়, এমন আলোচনা পরবর্তীকালেও আর হয়নি। রচনাটি বাঙালি পাঠকের সামনে কেবল একটি অপরিচিত বিষয়ের অবতারণা করলো না, বিদগ্ধ বাঙালি সমাজের সচেতন চিত্তভূমিতে এক অনন্ত রসের উৎস খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জনগণের অন্তরে স্বদেশ প্রেমের এক নতুন ভাবনা সঞ্চার করে দিল রবীন্দ্রনাথের এ রচনা। রবীন্দ্রনাথের এ আলোচনার পূর্বে বাংলায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে যে আলোচনা হয়নি, তা নয়; কিন্তু সে সব রচনা ও উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহকর্ম বাঙালি চিত্তকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। স্ত্রী চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বৈষ্ণবপদ রচিত হোত, কিন্তু তাঁর জন্মের পর বৈষ্ণব পদরচনায় ঘটে গেল বিপ্লব। পদাবলী সাহিত্যে এলো সুবর্ণযুগ। তেমনি রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ রচনার আগেও বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চা হয়েছে গ্রন্থ প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে এবং সংগ্রহ কর্মে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দশ বছর ধরে ক্রমাগত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এ দেশের লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হতে লাগলো। মানে এবং মননে হয়তো সেগুলো রবীন্দ্রনাথের রচনার সমতুল নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে লোকসংস্কৃতিচর্চার যে নতুন দিগন্ত খুলে গেল সে দিকটি অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে শুরু করে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের মতো মানুষেরা বাংলা লোকসাহিত্যের এক একটা শাখার সংগ্রহ কর্মে ও মননঋদ্ধ আলোচনায় এগিয়ে এলেন। কেবল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দশ বছর ধরে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার ও সংগ্রহের প্রকাশ ঘটলো না, মূলত রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের আগমনে আলোচনায় ও সংগ্রহে নিযুক্ত হওয়ার ফলে বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চায় ও গবেষণায় নতুন জোয়ার এলো। আজও সে ধারা অব্যাহত।

১০২.৪ রবীন্দ্রনাথের ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের ‘লোকসাহিত্য’ (১৯০৭) গ্রন্থটি মোট ৪টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধ ৪টি যথাক্রমে —

(১) ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ১

(২) ছেলেভুলানো ছড়া ঃ ২

(৩) কবি-সংগীত

(৪) গ্রাম্য সাহিত্য

এর মধ্যে ‘ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২’ নামক রচনাটি মূলত ছড়া সংগ্রহ। শুরুতে অল্প একটু ভূমিকা দেওয়ার পর সংখ্যা দিয়ে সংগৃহীত ছড়ার সংকলনে-ই এই প্রবন্ধের বিস্তার। মোট ৮১টি ছড়া এই অংশে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে সমস্ত ছড়া ক্ষেত্র সমীক্ষা করে সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়। ৬১-৬৪ সংখ্যক ছড়া বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক ভদ্রগৃহস্থের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন। এই প্রবন্ধের শুরুতে ছড়ার পাঠান্তর নিয়েও আলোচনা করেছেন যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রবন্ধ চারটির প্রথম দুটি ছেলে ভুলানো ছড়া বিষয়ক। প্রথম অংশটিতে ছড়ার দৃষ্টান্তসহ কবির কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং ছড়া সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। দ্বিতীয় অংশে ছড়ার পাঠান্তর ও সংগ্রহ। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে কবি সংগীতের স্বরূপ-নির্ধারণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা আর শেষ তথা চতুর্থ প্রবন্ধটিতে গ্রাম্য সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এবং নীতি সাহিত্যের দুটি ধারার আলোচনা।

আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতিচর্চা মূলত লোকসাহিত্য আশ্রয়ী। তার মধ্যে আবার ছড়ার আলোচনাই সিংহভাগ অধিকার করেছে। ছড়ার আবার বিশেষীকরণ ঘটে, তা হয়েছে 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। 'কবি-সংগীত' ও স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে পুরোপুরি মৌখিক সাহিত্যের বাক্‌কেন্দ্রিক ধারার ওপর আলোকপাত করেছেন।

১০২.৫ প্রবন্ধ-বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক সূত্র ঃ ছেলেভুলানো ছড়া-১

আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণ-প্রবন্ধ হলো প্রথম প্রবন্ধ 'ছেলে ভুলানো ছড়া-১'। লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা ছড়া সম্পর্কে এ প্রবন্ধে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা মেলা ভার। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টিভঙ্গির দিক নির্দেশ করে দিয়ে বলেছেন ''আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরনীয় বোধ হইয়াছিল।'' অর্থাৎ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলোকে মুখ্যত কবির দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করবেন সে বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কবি বলেই যে তিনি কেবল কল্পলোকেই বিরাজ করবেন তা নয়, ছড়ার মধ্যে যে সমাজ ইতিহাস নির্ণয়ের একটা সুযোগ আছে, সে দিকটিও তাঁর অনুধ্যানে ধরা পড়ে গেছে।

প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচ্য ছড়াগুলোকে ছেলে ভুলানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মেয়েলি ছড়া বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও এছাড়া আরো নানা রকম ছড়া সমাজে প্রচলিত আছে, তবু সমগ্র প্রবন্ধ ছেলে ভুলানো ছড়ার স্বরূপ প্রকৃতি নিয়েই মূলত আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেবলমাত্র ছড়ায় ছেলে ভুলানো স্বভাবটিই তাঁর রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে থাকে নি, ছড়ার চিত্রধর্মিতা ও ধ্বনিময়তার দিকটি সমাজ-ইতিহাসের উপকরণের দিকটি এবং পরিবর্তনশীলতার দিকটি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা আজও ছড়া সম্পর্কিত আলোচনার অন্যতম দিক-দর্শন রূপেই প্রচলিত। কাব্যরস আস্বাদন লক্ষ্য নিয়ে ছড়ার বর্ণময় বিচিত্রতাকে তিনি যেভাবে আলোচিত ও নির্দেশিত করেছেন, তা কেবল বাংলা লোকসংস্কৃতিচর্চার সেই আদিযুগেই অভিনব নয়, আজও তা সমানভাবে সজীব ও অনুকরণীয়।

ছড়াকে কেন রবীন্দ্রনাথ 'ছেলে ভুলানো' বললেন তার একটা বাস্তব-মানসিক ভিত্তি বোধহয় কবি স্বয়ং। তাঁর শৈশবে বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র যে ছন্দ তাঁর শিশু-হৃদয়কে আন্দোলিত করেছিল, তার রেশ তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। সেই শিশু-হৃদয়টি মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল প্রচলিত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদে এল বান' ছড়াটি শুনে, শুধু মোহমুগ্ধ হওয়া নয়। ছড়াটি যেন তাঁর শিশু-হৃদয়ের ক্ষুদ্র মানস সরোবরটিকে কাব্য রসের ধারায় টই-টম্বুর করেও কিছুটা কাব্যরস উপচিয়ে দিয়েছিল। ছড়ার কাব্যরসে শিশু-হৃদয়ের সেই পরিপূর্ণতা আজীবন তিনি বহন করেছেন এবং শৈশবের সেই ভালোলাগারও অধিক কিছুকে ছড়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছ ড়াকে, শিশুকে, শিশু-হৃদয়কে চিরন্তন-ভাবলোকের বিষয়ে পরিণত করেছেন কবি।

কবি বা সাহিত্যিকের প্রতিভা প্রকাশের একটা বড়ো হাতিয়ার হলো উপমা প্রয়োগ কৌশল, যার মধ্যে দিয়ে তাঁদের সমাজ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দক্ষতা প্রকাশিত হয়। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রাবন্ধিক ও বিশ্লেষক। কিন্তু এখানেও তাঁর কবি প্রতিভা নিশ্চুপ নয়। অপরূপ উপমা প্রয়োগ দক্ষতায় তিনি তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে ছড়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন।

শুরুতেই ছেলে ভুলানো ছড়ার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, ''এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনকালে কোন রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই... এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।'' ছেলে ভুলানো ছড়া সম্পর্কে এই রবীন্দ্র অভিমত কোন ছেলে ভুলানো ছড়াই নয়, সকল ছড়া সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শুধু, সকল ছড়াই বা কেন এই বক্তব্য আজ বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং লোকসংস্কৃতিবিদ্দের দ্বারাও স্বীকৃত। অথচ কোনো বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নয়, নিজের কবি মনের গভীর চিন্তনে এবং শৈশবের মোহমুগ্ধতার সূত্র ধরেই তিনি এই সূত্রে উপনীত হন। কেবল কবির কল্পনা নয়, কবির মন আছে বলেই তিনি মিশতে পারেন শিশুর মনের সঙ্গে, বলতে পারেন 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।'' শিশুর এই নবীন চিরত্বের কারণ, শিশু প্রকৃতির সৃজন। ''কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।'' প্রবন্ধের নাম 'ছেলে ভুলানো ছড়া' দেওয়ার সার্থকতা রবীন্দ্রনাথ এখানেই প্রতিপন্ন করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার প্রকৃতি ও শিশুর প্রকৃতির মধ্যেকার সামঞ্জস্য দেখিয়ে, শিশুর সঙ্গে বয়স্ক মানুষের তুলনা দেখিয়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে শিষ্ট সাহিত্যের সম্পর্কটিও স্পষ্ট করে দিলেন। শৈশব আসলে মানব জীবনের একটা স্তর। শিশু ভেদে শৈশব কখনই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। শৈশব হলো পূর্ণ বয়স্ক মানুষ গড়ে ওঠার একটি পর্ব। শৈশবে সব শিশুই প্রায় এক রকম আচরণ করে। সব বাবা-মায়ের সন্তান তার শৈশবে প্রায় এক রকম থাকে। কারণ, মনুষ্য জীবনের এই পর্বটি ফুলের কুঁড়ির মতো। তারপর ফুল যখন ফোটে কিংবা মানুষ যখন প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতায় বড়ো হয়ে ওঠে, তখন আর তার মন শৈশবের সরলতায় ও স্বপ্ন দেখার স্বভাবে থাকে না। স্বার্থ, যশ, হিংসা, দ্বেষ নামক প্রতিকূলতায় তার সব পরিবর্তন হয়। নিজেকে ছাড়া আর সে কিছুই বোঝে না। মানুষের বয়স বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কলঙ্কমুক্ত, স্বার্থ শূন্য শিশু হৃদয়ের বা শৈশবের কোন বয়সের হেরফের হয় না। তাই সে চিরন্তন, চির নবীন। আর তারই মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাখনা যেখানে ডানা মেলে দেয় সেই ছড়ার জগৎও বয়সের ভারে কর্তব্যপরায়ণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো বৃদ্ধ হয় না। তা চির নবীন, শৈশবের স্বপ্নলোকের সঙ্গে তার সুগভীর ওতপ্রোত যোগাযোগ।

শিষ্ট সাহিত্য বয়স্ক মানুষের কষ্টকল্পিত স্বকপোল ভাবনা। তার নির্দিষ্ট রূপ আছে, যা লিখিত এবং এই লিখিত রূপের বাইরে তা যেতে পারে না। অন্যদিকে ছড়া, যা শিশুমনের সৃষ্টি, তা শিশুর স্বভাবের সঙ্গে নিপাট সাদৃশ্যে জড়িত। তা শিশু সাহিত্য, শিশুর মধ্যে তার প্রচার-প্রসার; শিশু তার আলোচ্য চরিত্র, শিশু মনের অবাধ কল্পনার মতো ছড়ার আচরণ। শিশুর চঞ্চলতার সঙ্গে ছড়ার দ্রুত বিষয়ান্তর তুলনীয়। তা মানবজীবনের শৈশব মনের আপনি বিকশিত সৃষ্টি। এর যেমন কোন নির্দিষ্ট প্রথা নেই, তেমনি নির্দিষ্ট লিখিত রূপ ছিল না। বয়স্ক মানুষের নিয়মের নিগড়ে বাঁধাধরা পথে শিশু যেমন চলে না, শিশু সাহিত্য ছড়াও তেমনি শিষ্টসাহিত্যের নিয়মবদ্ধ প্রকরণের পথে পা বাড়ায় না। শিশুর ভাবনার সঙ্গে বয়স্ক মানুষের ভাবনা যেমন মেলে না, ছেলে ভুলানো ছড়াও তেমনি বয়স্ক মানুষের বাঁধা পথের পথিক নয়। তা আদি এবং অকৃত্রিম। বয়স্ক মানুষ বুড়ো হয়, শৈশবের কোন বয়সের পরিবর্তন নেই। ছড়াও তেমনি চিরন্তন। চির নবীন। চিরসবুজ।

এরপর তিনি ছড়া-সৃষ্টি প্রসঙ্গে বললেন যে, মানবমনে তা আপনি জন্মেছে। বাতাসের মধ্যে যেমন পথের ধুলো, ফুলের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্রশব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের কণা ইত্যাদি অহর্নিশ অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ খালি চোখে সবকিছু হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশ্বের দ্রুতগামী যানের মধ্যে মন-ই বোধ

হয় প্রথম। এই মনের মধ্যে, আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে ওই বাতাসের মতো কত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, কত কল্পনার বাষ্প, চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থ সকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভেসে বেড়ায়। আমরা তা খেয়াল করেও খেয়াল করি না। আমাদের সেই অসচেতন মনের অসংলগ্নভাবের কোন খণ্ডাংশ বা ক্ষুদ্রাংশ থেকেই ছড়ার জন্ম। মানুষ যখন জেগে থাকে, মন তখন সক্রিয়। এই মন নামক পদার্থটি যখন অতিশয় প্রভুত্বশালী হয়ে ওঠে, তখন সে কোন অসংলগ্ন রেণুজালকে প্রশ্রয় দেয় না। সেই সচেতন মনের প্রভুত্বশালী ভঙ্গিতে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, সে সাহিত্য শিষ্ট সাহিত্য। কিন্তু মন যখন ভাটির টানে ছেড়ে দেওয়া নৌকোর মাঝির মতো নিষ্ক্রিয়, কিংবা মধ্যাহ্ন পূর্ব শরতের গাছের ছায়ায় ক্লান্ত রাখালের মতো নিদ্রালু, তখন তার মধ্যে স্বপ্নের অসংলগ্ন জাল বোনা চলে। ভেসে আসে তার মধ্যে এই পৃথিবীর কত পাখির ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটো-বড়ো কত প্রকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-যা পৃথিবীর হয়েও পৃথিবীর নয় বলে মনে হয় অনেক সময়। মনের এই নিদ্রালু অবস্থার স্বপ্ন থেকেই যেন ছড়ার সৃষ্টি। স্বপ্ন যেমন স্থির নয়, স্পষ্ট নয়, বাস্তব নয় — আমাদের অন্তরলোকও তেমন ভাবনায় — অনুভাবনায়, শব্দ, গন্ধ-স্পর্শে একটা নির্দিষ্টি বিষয়ে স্থির নয়। ‟এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।” মনই হলো ছড়ার উৎসভূমি। আপাতভাবে মনে হতে পারে আমাদের মনের অসচেতন, অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই ছড়ার সৃষ্টি। কিন্তু ছড়া যে কেবল অসচেতন সৃষ্টি নয়, তা যে কেবল ছেলে ভুলানো নয় এমন কি কেবলমাত্র মেয়েলি নয়, তাও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে এক সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ছেলে ভুলানো ছড়া ১’ প্রবন্ধে ছড়াগুলোকে যেহেতু ছেলে ভুলানো এবং মেয়েলি বলে উল্লেখ করেছেন, তাই এ ছড়াগুলো আলোচনায় তিনি এর প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকে কোনভাবে অস্বীকার করতে চাননি। কারণ, লোকসাহিত্যের বিশেষ এই শাখাটি যাদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রচারিত সেই নারী ও শিশুর ‘স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ’ ব্যতীত এগুলো যেন নিষ্প্রাণ। বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তেমনি মর্যাদাভীরু গম্ভীর স্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী তলে এই ছড়াগুলোর শবব্যবচ্ছেদ না করে, তাকে তার আপন ক্ষেত্রেই ধ্বনিত হতে দেওয়া দরকার। না হলে এক একটি ছড়ার মধ্যে, এক একটি ছড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোন অংশের মধ্যে যে স্নেহ, যে সংগীত, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিনের মতো একাত্ম হয়ে আছে তাকে হারাতে হয়। তবে ভরসা এই যে ছড়াগুলো আপনক্ষেত্রচ্যুত হলেও তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা স্মৃতির মোহমন্ত্রটি হারায় না। স্মৃতি অনুষঙ্গে আপন ক্ষেত্রে সহজ সরল এই মেয়েলি ছড়াগুলো অকৃতবেশা অসংস্কৃতা গৃহচারিণী গ্রাম্যবধূর সঙ্গে উপমিত। সাধুভাষার আটঘাট-বাঁধা প্রবন্ধের মাঝখানে গ্রাম্য ছেলে ভুলানো এই মেয়েলি ছড়াগুলি যেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঘরের বউ। চতুর উকিলের প্রশ্নজালে তাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় বটে এবং সেই বিষয়টির মধ্যে গৃহবধূর ওপর হয়তো কিছুটা অন্যায় নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়ে যায়। কিন্তু সে নিষ্ঠুরতাকে না মানলে যে ছড়ার মেয়েলি শিশু ভুলানো স্বভাবটি শিশু ভুলানোই থেকে যায়, তার প্রকৃতস্বরূপ ও বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটন করা হয় না।

মেয়েলি ছড়ার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ ধরা পড়ে প্রবন্ধটির মধ্যে। সেখানে তিনি দেখান ছড়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে সংলগ্নহীনতা এবং চিত্রধর্মিতা। ছড়ার বিষয় যেখানে অসংলগ্ন সেখানেই তা স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়। সংলগ্নহীনতা শিশু স্বভাবেরও বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন ‟যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে / যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজীতলা দিয়ে।।” ছড়াটির পারস্পরিক দুটো পংক্তির মধ্যে আপাত অর্থ-অসংলগ্নতা দেখে রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে শিশু-আচরণের ও শিশু প্রকৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করলেন।

ছড়াটির মধ্যে কতকগুলো অসংলগ্ন ছবি যেন সামান্য প্রসঙ্গ সূত্রে চিত্রিত হয়েছে। শিষ্ট সাহিত্যে কতকগুলো, অসংলগ্নভাবের এই সামান্য সূত্রে চিত্রিত হয়েছে। শিষ্ট সাহিত্যে কতকগুলো, অসংলগ্নভাবের এই সামান্য সূত্রে উপস্থাপিত হওয়াকে কোনভাবেই মানতো না বলেই, রবীন্দ্রনাথ বিষয়টির একটি সুন্দর উপমা দিলেন, ''যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনোপ্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ অন্বেষণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন কি, মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া, কল্পনার অভ্রভেদি মায়া প্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে -'' কত সহজ উপমায় ছড়ার বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠল, আবার শিষ্ট-সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের বিশেষত্ব ছেলে ভুলানো ছড়ার পার্থক্যটুকু সূচিত হয়ে গেল। স্বার্থপর দৈত্যটি যখন উদার, সরল ও দয়ালুচিত্তে উপনীত তখন তার বাগানে শিশুরা সহজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেল। কিন্তু, যখন দৈত্য স্বার্থপর, তখন কেউ পারলো না, তার বাগানে প্রবেশ করতে। উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে বিবৃত ভাবগুলোর অসংলগ্নতা গুণে কোনোভাবেই তাকে কাব্য পদমর্যাদা দেওয়ার কথা নয়। অথচ, কবিত্বের সিংহদ্বারের দ্বারবানের অসচেতনতায় তা কবিত্বের সিংহাসন ছুঁতে পারে। এখানে মন হলো সেই নিদ্রালু দ্বারবান। যার একটুখানি অসচেতনতায় শিশুর অসংলগ্ন আচরণও কাব্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, ছড়াটির এই অসংলগ্ন বিষয় কোন শিষ্ট কবির হাতে পড়লে তা একটা এমন সুগঠিত রূপ পেতো যে ছড়াটির শুরুর বিবাহ অসম্পন্ন যমুনাবতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতার নায়িকাতেই পরিণত হয়ে যেতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, যেহেতু এটি ছেলে ভুলানো ছড়া, তাই শিশুর আচরণই এখানে আচরিত। এ যেন শিশুর খেয়ালী মনের সৃষ্টি। এই বিশ্ব যেমন বিরাট শিশুর আনমনে গড়ে তোলা পুতুল খেলা, তেমনি শিশু বলেই তার আচরণে জগৎ পারাবারের তীরে বালির ঘর বাঁধার স্বভাব স্পষ্ট। ইচ্ছাময় আনন্দে সে দুহাতে গড়ে তোলে বালির ঘর, ইচ্ছামতো গড়ে, ইচ্ছামতো ভাঙে। বালি বলেই তা সহজে গড়া যায়, সহজে ভাঙা যায়। ছড়ার জগৎও তেমনি সুসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্রবিহীন স্বপ্নের মতো, শিশুর কল্পনার মতো পারম্পর্যহীন। বাস্তব পৃথিবীর বয়স্ক মানুষের ব্যস্ত মনের বিষয়ী বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝা কঠিন, এমন কি দুঃসাধ্যও বটে। তাই আমাদের কাছে যেটা অসংলগ্ন, শিশুর কাছে তা স্বাভাবিক। অতএব, শিশু ভোলানো ছড়ার এই সংলগ্নহীনতা আমাদের পরিণত মনের আপাত একটা নির্বুদ্ধিতামাত্র।

তাই ছেলে ভুলানো ছড়ার অসংলগ্নতার তুলনায় তার মধ্যে ফুটে ওঠা ছবি আমাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। ছড়ার ঘটনাগুলো ছবির মতো, ছবিগুলো স্বপ্নের মতো অদ্ভুত কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ। ছড়ার এই বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ নাম না উল্লেখ করে দার্শনিক পণ্ডিতদের স্বপ্নতত্ত্বের সন্ধান করেন এখানে। অনেক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। অনেকে আবার প্রত্যক্ষ সত্যকে উড়িয়ে দিয়ে স্বপ্নসত্যকে স্বীকার করেন। সেই সত্যস্বপ্ন কেবল সজাগ স্বপ্ন নয়। নিদ্রাগত স্বপ্নকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই ''প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্ন জগৎ নিত্য স্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।'' আসলে একটা শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার পরিবেশ ও প্রকৃতি পরিচয় ঘটে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গ যেমন বৃত্তাকারে ছড়িয়ে যায় ওই ঢিলের কেন্দ্র থেকে তেমনি করে। শিশুর কাছে যতই বাইরের পরিবেশ অপরিচিত থাকে ততই সেই অজানা ও অজ্ঞানতাকে সে পুষিয়ে নেয় কল্পনা দিয়ে। শিশু অপুর মতো কিংবা বালক অমলের মতো তারাও নীলুদের তালগাছটার ওপারের আকাশে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে গেঁথে যেতে দেখে কিংবা দইওয়ালাদের গ্রামের একটা ছবি সে অবিকল চিত্তে কল্পনা করে যেতে পারে, এমন কি যেতে পারে, এমন কি সেখানকার মেয়েদের পোশাকের রঙটিও। ছড়ার মধ্যে শিশুর তথা মানুষের সেই কল্পনাচারী মনেরই প্রকাশ ঘটে। মানব শিশুর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার হ্রাস ঘটে। এবার সে প্রত্যক্ষতার সম্মুখীন হয় বটে, অন্তরের কল্পনাচারিতার ক্ষীণ রেশটুকু থেকে যায় কোনোস্থানে, কোনো

মনে। অমল কিংবা অপু মানুষের মনের তিল তিল কল্পনার সংগঠিত রূপ। আর ছেলে ভুলানো ছড়া মানুষের মনের সেই কল্পনারই ফসল। কল্পনা মাত্রই এক প্রকারের স্বপ্ন। শিশু যেহেতু অভিভাবকের তর্জনী হেলনে ও রক্তচক্ষুর শাসনে বাইরের জগতে বের হতে পারে না — রবীন্দ্রগনের স্মৃতিচারণে কথিত শ্যামের শাসনে তাকে সীতার গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়, তাই বাইরের জগৎকে সে জানে, দেখে কল্পনার মধ্যে দিয়ে, কল্পনাই তার সে বয়সের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ও আশ্রয়। কাজেই সে নিত্যস্বপ্নদর্শী। আর ছড়ার জগৎ সেই স্বপ্নের জগৎ। বয়স্ক মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ জগৎটাই সত্য। কিন্তু তার মধ্যে যে শিশু মনের বীজ থেকে যায়, সেই মনের সঙ্গে যখন বাস্তবের প্রত্যক্ষ জগৎ মেলে না তখন বয়স্ক মানুষের এই প্রত্যক্ষ জগতের সত্যতাও অনেক সময় প্রকৃত সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাই আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের সত্যের তুলনায় ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী শিশু বা বালকের কাছে অধিক সত্য হয়ে ধরা পড়ে। কারণ, শিশু যেহেতু পরিণত মনের ও বাইরের জগতের প্রত্যক্ষ সত্যের ধোঁকাতে অভ্যস্ত নয়, তার কল্পজগৎ যেহেতু বাস্তবের নিদারুণ নিষ্করুণতায় বিপর্যস্ত নয়, তাই কল্প জগৎ-ই তার কাছে একমাত্র জগৎ এবং সে জগৎ সত্য বৈ মিথ্যা নয়। ছড়ার স্বপ্ন জগৎ তাই তার কাছে বয়স্ক মানুষের প্রত্যক্ষ সত্য জগতের তুলনায় অধিক সত্য। কারণ, ছড়া তার কল্পবিলাসী মনেরই উৎসভূমি।

কিন্তু ছড়া যতই শিশু মানবের কল্পলোকের বিষয় হোক না কেন, সে কল্পলোকজাত ছড়া কখনই বাস্তবতা শূন্য নয়। তার মধ্যে অনেক সময় পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ থেকে গেছে। যেমন —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।।

— শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চারটি ছত্র ছিল বাল্যকালের মেঘদূতের মতো। অপরূপ এক চিত্রকল্পময়তায় শিশু কেন, বয়স্ক পাঠকেরও মন ভরে যায়। শিব ঠাকুরের জীবনটিকে তাদের কাছে বড়ো সুখের মনে হয়। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও সমাজ জীবনের যে কয়েকটি ছবি ফুটে ওঠে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রথমত, বহু বিবাহ এবং দ্বিতীয়ত, বহু বিবাহজনিত সতীন সমস্যা। প্রথম প্রথম শিব ঠাকুরকে বড়ো সুখী মনে হলেও, দ্বিতীয় কারণে তাঁর জীবন আদৌ সুখের নয়, তা বেশ বোঝা যায়। প্রবন্ধটির মধ্যে উদ্ধৃত ছড়াগুলোর ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্ব শক্তির অপরূপ পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে থেকে বের করে এনেছেন অপরূপ কবিত্ব রস। অবশ্য প্রবন্ধের শুরুতেই তাঁর এই দুর্বলতার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ছড়াগুলির অন্তর্নিহিত সমাজ ইতিহাসের গুরুত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন নি।

ছড়ার ছবি নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের কল্পনার ছবি-ই কেবলমাত্র নয়। তার মধ্যে দিয়ে সমাজের, সংসারের জাতির চিত্রও পরিস্ফুট। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি না খুঁজেই বলা যায়, শুরুতে যে ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ অসংলগ্নতা লক্ষ্য করেছিলেন, যাকে ছেলে ভুলানো মেয়েলি ছড়া বলে অভিহিত করেছিলেন, যা শিশুর কল্পলোক বলেই তাঁর মনে হয়েছিল, সেই ছড়ার মধ্যে এবার তিনি খুঁজে পেলেন বাস্তব পৃথিবীর ছোঁয়া। ছড়াকে এবার তিনি গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে আনলেন। যার মধ্যে বাংলাদেশের মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত ও গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। তবে বিষয়টি যে ব্যক্তি অনুভূতির উপর নির্ভর করে সে বিষয়ে তিনি সচেতন, কারণ ভিন্নরুচির্হি-লোকঃ'। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে যে ছড়ায় তিনি সংগীত, মূর্তি কিংবা গৃহের আস্বাদ খুঁজে পান অন্যে তা নাও খুঁজে পেতে পারেন।

ছড়ার সহজ সরলতা, বিষয়ের তুচ্ছতা ও বিষয়বস্তুর পারস্পরিক অসংলগ্নতা দেখে মনে হতে পারে যে ছড়া রচনা খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু ছড়াতে যেখানে অসংলগ্নতা থাকে, স্বপ্ন থাকে, সহজ সরলতা থাকে — তা

সৃষ্টি করা সহজ নয়। কারণ, স্বপ্ন রচনা করা বড়ো কঠিন। বয়স্ক মানুষ কঠিন জীবনে জটিলের এত ভক্ত যে সহজ-সরলতাকে তার কাছে বালখিল্যপনা বলে মনে হয়। কেবল শিশুই পারে সহজ মনে সরল কথা বলতে, স্বপ্ন রচনা করতে। কারণ, কল্পনাই তার স্বপ্ন দেখার একমাত্র অবলম্বন। এই স্বপ্নের মধ্যেও সে যে ছবি আঁকে, তা বয়স্ক মানুষের মতো স্বপ্নবৎ মনে হলেও, একেবারেই অবাস্তব নয়। ''অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিদ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্তৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।''

ছড়া একই সঙ্গে অসম্ভব, আবার একই সঙ্গে বাস্তব। বিষয়ের এই অস্থিরতা আসলে শিশু চিত্তের চঞ্চলতারই প্রকাশ বোধ হয়। অজিত দত্তের কবিতায় মেয়েটির মতো — ''একটি আছে দুষ্টু মেয়ে একটি ভারি শান্ত / একটি মিঠে দক্ষিণ হাওয়া, আর একটি দুর্দান্ত। আসল কথা দুটিতো নয়, একটি মেয়েই মোটে / কান্না-হাসির লুকোচুরি লেগেই আছে ঠোঁটে।'' ছেলে ভুলানো ছড়া কখনও বাস্তব, আবার কখন অবাস্তব; কখন আবার একই সঙ্গে বাস্তব-অবাস্তব। ছড়ার মধ্যেকার অসম্ভবতা বা অদ্ভুতত্ব আসে শিশুর অনুষঙ্গে। কারণ, 'ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই; কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই।' 'সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর একটি জিনিসই বা কেন অদ্ভুত হইবে?' তাই তার কাছে একমুণ্ডওয়ালা মানুষ যেমন প্রত্যক্ষ সত্য তেমনি দুই মুণ্ডওয়ালা মানুষ কিংবা মুণ্ডহীন মানুষও তার মনের অনুভূতির অগম্য নাও হতে পারে। ছড়ার বিষয়বস্তুর সম্ভব-অসম্ভবতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের এক সরল যুক্তির উপর নির্ভরশীল থেকে শিশু-প্রকৃতি ও ছড়া-প্রকৃতির সাদৃশ্য নির্ণয় করলেন। উদাহরণ দিলেন ''আয় রে আয় টিয়ে / নায়ে ভরা দিয়ে।'' ছড়া থেকে। ছড়াটির মধ্যেকার টিয়ে পাখির নৌকো চড়ে আসার দৃশ্য কোন বালক তার জীবনে নাও দেখতে পারে, কিন্তু ওই অসম্ভবতাই ছড়াটির প্রাণশক্তি। তবু টিয়ে পাখির নৌকো চড়ে আসা মানা যায়, কিন্তু

'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।।
খোকা বলে পাখিটি কোন বিলে চরে।
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।।'

ছড়াটির মধ্যে অসম্ভবতার এক চূড়ান্ত মাত্রা ছুঁয়েছে। অসম্ভব বিষয় শুধু ছড়াতেই সম্ভব হয় না, অপরূপ ব্যাখ্যা গুণে সেই অসম্ভবতা যে কি কাব্যগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে, তা এই ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা না দেখলে বোঝা যায় না। ছড়া সম্পর্কে ও ছড়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব কবিত্ব শক্তি সংমিশ্রিত ব্যাখ্যা আগে পাওয়া যায়নি। পরে আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

অসম্ভবতার চিত্র অঙ্কনে ছেলে ভুলানো ছড়ার শিল্পী যে কোনও প্রতিষ্ঠিত চিত্রকরকেও হারিয়ে দিতে পারে। যেখানে খোকা মাছ ধরতে যায় ক্ষীরনদীতে, তার ছিপ নিয়ে যায় কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে যায় চিলে। খোকা কখনও আবার পাখি হয়, বিলে চলে সারাদিন; কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন মায়ের ডাক শোনে, তখন পাতার পাখনা মেলা তাল গাছটার মতো পৃথিবীর কোণে ফিরে আসে, কারণ মা যে হয় মাটি তার। শিশুও তেমনি মায়ের ডাকে উড়ে এসে পড়ে, মায়ের বুকে। সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যায় ছড়ার স্বাভাবিক কল্প জগতে। আর ছড়াটি যখন ছেলে ভুলানো মেয়েলি ছড়া হয়, তখন সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহে, আদরে সকল অসম্ভবতার বাধা দূর হয়ে যায়। ভালোবাসার মতো সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার আর কিছু নেই। ভালোবাসাই ভরিয়ে দেয় সকল অভাব ও অসম্ভবতাকে। ছেলে ভুলানো ছড়ার ভাণ্ডারটি ভরে আছে এই ভালোবাসার রসে। তাই ছড়ার মা বলতে পারেন — 'ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।'

কী নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।।' / বনের মধ্যে খাদ্যের অভাব হবে জেনেও সন্তানকে নিয়ে মা বনে যেতে চান। খাদ্যের অভাবের ভাবনায় ভাবিত নয় মা, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতে পারেন অনন্তকাল। মা ও সন্তানের আদর-ভালোবাসায়, স্নেহ ও মমতায় এই মর্ত্য পৃথিবীতেই স্বর্গ নির্মিত হয়। এ কেবল ছেলে ভুলানো ছড়াতেই সম্ভব।

ছড়া, বিশেষত ছেলে ভুলানো ছড়া লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা। লোক সাহিত্যের কবিত্ব শিথিল কবিত্ব। শিষ্ট সাহিত্যের কবিত্বের সঙ্গে সে কবিত্বের বেশ কিন্তু পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু, লোকসাহিত্যের নির্দিষ্ট কোন লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই কবিত্বের দাবিদার সেখানে তেমন জোরদার নয়। তবুও ছড়ার অসংলগ্ন অসম্ভবতার মাঝেও কবিত্বের সূর্য উঁকি দেয়। ছড়ার এই সহজ-সরল শিথিল কবিত্বকে রবীন্দ্রনাথ নক্ষত্রের জন্ম নেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন, "জ্যোতির্বিদগণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান সেই জ্যোতির্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকা রাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সেই সকল নবীন সৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই; প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনো সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই।" এ প্রসঙ্গে তিনি 'জাদু এতো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ। ছড়াটির উদাহরণ দিয়ে শিষ্ট কবি ও লোক কবির রচনা-প্রণালীর তুলনামূলকতার মাধ্যমে ছড়ার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। শিষ্ট কবির রচনা অনেক পরিমার্জিত, পরিকল্পিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুলনায় লোক কবি বিশেষত ছড়ার দ্রষ্টা বিষয় নিয়ে, উপস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে তত চিন্তা করে না। তাদের রচনা সামঞ্জস্যতার ধার ধারে না। শিষ্ট কবি কোন বিষয় উপস্থাপনায় যত ভূমিকা করে বা আটঘাট বাঁধে, বিশেষত প্রেমের ক্ষেত্রে, ছড়ার স্রষ্টা তেমন ভূমিকায় যায় না, বয়স্ক মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনায় শিশুর আচরণ যেমন খামখেয়ালী ও উচ্ছল, তাকে সমাজে চলতে গেলে যেমন অনেক পরিমার্জিত, সংশোধিত ও শিক্ষিত হওয়ার দরকার; ঠিক তেমনি শিষ্ট সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসাহিত্য, উপস্থিত ক্ষেত্রে ছেলে ভুলানো ছড়াও অপরিমার্জিত, অসংলগ্ন ও অসম্ভবের সম্ভাবনায় ব্যাপ্ত। তা শিষ্ট কবির হাতে পড়লে অনেক সংশোধিত এবং পরিমার্জিত ও আঁটোসাঁটো হয়ে তারপর উপস্থাপিত হত।

ছেলে ভুলানো ছড়াগুলো রবীন্দ্রনাথের মতে, "একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কদমতটের উপর বিলুপ্ত বংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল — ... তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছাদগুলির মধ্যে অনেক হৃদয় বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।" আসলে, আমাদের পাঠ্য ইতিহাস আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে কখনোই সম্পূর্ণভাবে ধরতে পারে না। ইতিহাস লেখে রাজ রাজড়ার কাহিনি। সে কাহিনি সাল-তারিখের নিরিখে কতকগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা ব্যক্তিচরিত্রকে দেখা মাত্র। সেখানে দেশের সাধারণ মানুষ যেমন স্থান পায় না, তেমনি মানুষের হৃদয়ের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ কিছুই জায়গা করে নিতে পারে না। অথচ এই বিপুল সংখ্যক জনগণ শিষ্ট সাহিত্যেও তেমন করে জায়গা করে নিতে পারে না। তাহলে এই বিপুল জনসমষ্টির হৃদয়ভার কিংবা তার যন্ত্রণা ভারমুক্ত হয় কোথায়? এর একমাত্র অবলম্বন হল লোকসাহিত্য। প্রবাদ, লোকগীতি, লোককথার পাশাপাশি ছড়া হল সেই উন্মুক্ত অঙ্গন, যেখানে সাধারণ মানুষ ও সাধারণ সমাজ খুব সহজে, কোনো রকম পরিমার্জনার বালাই না রেখে আত্মপ্রকাশের একটা সুযোগ পায়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে সহজ করে বোধগম্যতার মধ্যে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ —

'ও পারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।।
'এ মাসটা থাক্ দিদি কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে।'
হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।।'

ছড়াটি যে একটি আস্ত জগতের ভাঙাটুকরো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছড়াটির মধ্যে সদ্য শ্বশুর ঘরে যাওয়া বাঙালি কন্যার হৃদয়ের আর্তি-ই প্রকাশিত। বিবাহযোগ্যা কন্যা বাঙালি ঘরের দায়। তাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ না করা পর্যন্ত বাবা-মায়ের চিন্তা দূর হয় না। কিন্তু পিতা-মাতা দায়মুক্ত হলেও কি দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারেন? স্বাভাবিকভাবে এতদিন ধরে বাবা-মায়ের স্নেহে বড়ো হতে থাকা মেয়েটি শ্বশুর বাড়ির নতুন পরিবেশে এবং তাদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ভাইয়ের কাছে আর্জি জানায় কিছুদিন বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শ্বশুরবাড়ি জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ কন্যার বাপের বাড়ি যেতে চেয়ে ভাইয়ের কাছে খবর পাঠানোর বিষয়টি অতি পরিচিত এবং নারী মনের এই যন্ত্রণার দিকটি খুব সাধারণ (Common)। ভাটিয়ালি গানেও সে ছবি আছে। এ সমস্যা বাঙালি সংসার জীবনের আটপৌরে একটা ঘটনা, কেবল আটপৌরে নয়, চিরন্তনও বটে।

বাঙালি সমাজে কন্যা সন্তান মানেই একটি গলগ্রহ, কোনভাবে তাকে পরঘর করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু পরের ঘরে যন্ত্রণার যে শেষ নেই। তাই বলে পরের ঘরে যন্ত্রণায় বাপের ঘরে ফিরে এলেই যে শান্তি তাও নয়, সেখানে ভাই-ভাজের দুর্ব্যবহার যে আরও অধিক। তাই বাঙালি মেয়ের যন্ত্রণা সমাজেরই একটি দায়। ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে সেই আস্ত জগতের টুকরো ছবি। কিংবা সমাজ-সাগরের এক অঞ্জলি চোখের জল যেন সহজভাবে রূপ পেয়ে গেছে এই ছড়াটির মধ্যে —

''ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে।।
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর।।
পরের বেটা মারলে চড়।
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ি।।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা, 'চল্ শ্বশুরবাড়ি'।।''

বাঙালি নারীর যন্ত্রণার অকপট নিখুঁত চিত্র। কিন্তু যন্ত্রণা যে আরও অন্যস্থানে। কন্যা সন্তান যদিও এত গলগ্রহ, বিয়ে দিয়ে পাত্রস্থ করলে বাঁচা যায়, তবু যেদিন সত্যিই তার বিদায়ের লগ্ন আসন্ন হয়, সেদিন বাবা-মায়ের চোখের জল যে আর বাঁধ মানে না। কন্যা যখন ছোট, একেবারেই শিশু, তখন তার বিয়ের কথাতে আনন্দ-ই প্রকাশিত —

'পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল, কোমর বেঁধেছে।।'

কিন্তু আর একটি ছড়ায় ''আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কতদিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে!' —

'দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।।
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর।।'

— বাল্য বিবাহের যন্ত্রণা এবং পাশাপাশি সে যন্ত্রণা লাঘবের, এক চিরন্তন বাণী। কন্যাকে বিদায় দিতে মাতৃ হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি। অথচ ওই মা-ই তো তাঁর মাকে একদিন কান্নায় ভাসিয়ে শ্বশুরঘরে এসেছিলেন। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে আস্ত জগতের টুকরো ছবির সন্ধান রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি ছড়ার মধ্যেও পেয়েছেন। শৈশব বিবাহ সংক্রান্ত ছড়া দুটোর মধ্যে কল্পনা ও কালের একটা ব্যবধান থেকে গেছে। কিন্তু সত্যি-সত্যি-ই যখন কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময় হয়, তখন কেবল মা নয়, বাড়ির সকল সদস্যই মায়ের সঙ্গী। কন্যা বিদায়ের মতো মর্মন্তুদ ঘটনা বাঙালি সংসারে আর নেই। সেই মুহূর্তে বাড়িঘর পরিস্থিতিটুকু ধরা পড়ে এই ছড়ায় —

'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে।।'

— এরপর সেই লম্বা ফিরিস্তি, মা, বাবা, মাসি, পিসি, ভাই, বোন — একান্নবর্তী পরিবারের সকল সংশ্লিষ্ট সদস্যই এই শোকাবহ সময়ের সাক্ষী। এবং এক একজনের কান্নার স্থান ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, বিদায়ী কন্যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ওই স্থানের অনুষঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিংবা তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রেই বসে কাঁদেন। বাবা দরবারে, মাসি হেঁশেলে, পিসি গোয়ালে। কিন্তু মা কাঁদেন ধুলায় লুটিয়ে। মায়ের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক, অকৃত্রিম এবং আদি। তাই তাঁর কান্নার নির্দিষ্ট স্থান নেই। ভাই কাঁদে আঁচল ধরে বোন কাঁদে খাটের খুরো ধরে। এদের তো কোন কর্মক্ষেত্র নেই, তাই একটা অবলম্বন তো চাই কান্নার জন্যে। অবলম্বন ব্যতীত শুধু শুধু কাঁদা যায় না। বিষয়টিও অসংলগ্নতার মাঝে হারিয়ে যায় নি। সবার কান্না অকৃত্রিম, তবে মা ও বোনের কান্না সবচেয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা। মা হারাচ্ছেন তাঁর বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া-ধন। আর বোনের মধ্যে শৈশবের খুনসুটির অপরাধবোধ। যে গালি সে শৈশবে দিদিকে দিয়েছিল, এতদিন তার কোন অর্থ ছিল না। কিন্তু আজ সেই অভিশাপের গুরুত্বটুকু সে যেন অনুধাবন করতে পারলো। স্বামী না থাকলে, স্বামী হারানোর ভয় থাকে না। কিন্তু আজ যখন দিদি স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছে, তখন স্বামী হারানোর যে অভিশাপ একদিন বোন গালির মধ্যে দিয়েছিল, তা যদি ফলে যায় এই অপরাধবোধে, অনুশোচনায় অনুতপ্ত বোন দিদির আসন্ন বিদায়-লগ্নকে অশ্রুভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অনেক অসংলগ্নতার ভিড় থেকে জীবনের এই বাস্তব টুকরো ছবি ছড়া তার অন্তরে ফুটিয়ে তুলেছে সুনিপুণভাবে। সমাজ ও সংসার ইতিহাসের এই দুর্বল মুহূর্ত কোন ইতিহাস, কোন শিষ্ট সাহিত্য কখনই স্থান দেয় না। মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াই এদের ধারক। একজন শিষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা হয়েও ছড়ার এই স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁর মনের উদারতার পরিচয় দেন নি। আমাদের প্রকৃত সমাজ ইতিহাস জানার সন্ধানটুকুও দিয়েছেন।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ছড়া মেঘের মতো। তিনি বলেন, "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে, যদৃচ্ছ ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞান ও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।" আকাশে ভাসমান মেঘ জলীয় বাষ্পের কণা। ভূপৃষ্ঠের জল সূর্যের রোদে শুকিয়ে শুকনো জলীয় বাষ্প মেঘ হয়ে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। এই ভাসমান মেঘের নির্দিষ্ট কোন স্থির একটা অবয়ব থাকে না। বাতাসের স্রোতে তা মুহুর্মুহু রূপ পরিবর্তন করে। বাতাসে পরিবর্তিত হয় মেঘের রূপ, আর ঘন ঘন রূপ পরিবর্তিত সেই মেঘের উপর সূর্যের আলো পড়ে পাল্টে দেয় তার রং। এক এক সময় মেঘের এক এক রকম রূপের বাহার। বাতাস ও সূর্যের রূপ-রঙের এই খেলায় যেথা খুশি সেথা যায় ভেসে মেঘের দল। হালকা হাওয়ার পাখা মেলে মেঘের এই রূপ ও রঙের পরিবর্তন শিশুর খেয়ালীতে ভরা। শুধুই বা শিশু কেন, শিশু ভুলানো ছড়ার সঙ্গে তা উপস্থিত। মেঘ যেমন হালকা, ছড়ার বিষয়ও তেমনি গুরু-গম্ভীর হলেও হাল্কা ভাবে উপস্থাপিত, প্রতি মুহূর্তে তা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ছড়ার বিষয় কখনই একমুখী নয়, অখণ্ড নয়। অতিদ্রুত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাত্রা ছেলে ভুলানো ছড়ার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। ছড়ার এই বিষয় পরিবর্তন মেঘের রূপ পরিবর্তনের মতো। সূর্যের আলো মেখে মেঘের রঙ যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যায়, তেমনি স্রষ্টা শিশুর কল্পনার রঙ মেখে ছড়ার বিষয়ও প্রতিনিয়ত রূপ ও রঙ পরিবর্তন করে। মেঘ যেমন হালকা হাওয়ায় যদৃচ্ছ ভেসে বেড়ায়, ছড়াও তেমনি কারুর ব্যক্তি সম্পত্তি নয়। লোকমুখে ঐতিহ্যসূত্রে তা প্রচারিত হয়। স্থানভেদে, ব্যক্তিভেদেও তার রূপ ও বিষয়ের পরিবর্তন হয়, মেঘও যেমন স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। মেঘ ও ছড়া কেবল এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তুলিত নয়। একটা শিশু কেন্দ্রিক, আর একটি শিশুর মতো। খেয়ালী ও দুরন্ত। চঞ্চল ও রূপান্তরিত। অস্থির ও রঙিন। ছড়ার এই মেঘের মতো রূপান্তরিত ও বর্ণান্তরিত স্বভাবের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ একে পরবর্তী প্রবন্ধে ছড়ার কামরূপচারী ও কামরূপধারী বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন। আর প্রথম প্রবন্ধটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন মেঘের সঙ্গে ছড়ার চূড়ান্ত একটি তুলনা দিয়ে — "মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।" আকাশের মেঘ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারায় ধরা যে শস্যশ্যামল হচ্ছে তা সহজ দৃষ্টিতেই বোঝা সম্ভব। যদি বৃষ্টি না হত সমগ্র পৃথিবী একদিন মরুভূমিতে পরিণত হতো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেঘ থেকে বর্ষিত বৃষ্টি সবুজ শিশু-শস্য ক্ষেত্রকে রস জোগায় বলেই সে হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। পৃথিবী শস্য-শ্যামল হয়। তেমনি, ছড়া যে উদ্ভট কল্প-রস বর্ষণ করে, তাতে বয়স্ক হৃদয় তেমন করে সিক্ত না হলেও শিশু-হৃদয়কে তা উর্বর করে তোলে। ছড়ার মধ্যে শিশু তার আপন জগৎকে যেন ফিরে পায়, তার কল্পনার জগৎ যেন মুক্তি পায় ছড়ার মধ্যে। বয়স্ক মানুষের বুদ্ধি ও বিদ্যায়, স্বার্থে ও সচেতনতায় যে সাহিত্য তা শিশুর পক্ষে আদৌ সহজপাঠ্য ও সহজপাচ্য নয়, ছেলে ভুলানো ছড়াই তার সহজাত সত্তা, সেখানে তার শিশু হৃদয়ের মুক্তি ও বৃদ্ধি। বিশ্বের সকল শিশু-শস্য যেমন মেঘের বারিধারায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সবুজ ও সমৃদ্ধ হয়, বিশ্বের সকল শিশুও তেমন ছড়ার কল্প জগতে ও রসমাধুর্যে আপনাকে নতুনভাবে ফিরে পায়, প্রাণবন্ত হয়, আনন্দিত হয় — ছড়া কেন যে শিশুর ভালো লাগে তা শিশুই বোঝে। শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র ধরে ছড়া রচিত না হওয়া সত্ত্বেও ছড়া শিশুর প্রাণে খোরাক জোগায়। তার সকল বায়না ভোলার, তার কান্না থামায়। আসলে তার প্রাণ ও মনের মুক্তি ঘটে ছড়ার জগতে।।

১০২.৬ ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২

আলোচ্য প্রবন্ধটি আসলে পুরোপুরি প্রবন্ধ-ই নয়। এটি ভূমিকাযুক্ত ছড়ার একটি সংকলন মাত্র। আগের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষক, সমালোচক — সেখানে তিনি প্রাবন্ধিক কবি। ছড়ার প্রকৃতি নির্ণয়ে স্বরূপ আলোচনায়

— সমালোচনায়-সাহিত্যে নতুন দিগন্ত তৈরি করে দিয়েছেন। আর এখানে রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাহক। সংগ্রহ কর্মের শুরুতে তিনি একটা ছোট্ট ভূমিকা দিয়েছেন। এই ভূমিকাটি আবার প্রথম প্রবন্ধের কিছু রেশ নিয়েই লেখা। প্রথম প্রবন্ধে ছড়ার বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় যে কথাগুলো বলা হয়নি, সেকথাগুলো এ প্রবন্ধে বললেন। কিছু পুনরাবৃত্তিও আছে। প্রবন্ধে তিনি ছেলে ভুলানো ছড়ার রস নির্ণয় করতে গিয়ে, তাকে 'বাল্যরস' বলে উল্লেখ করলেন। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে এজাতীয় একটা রস (বাৎসল্য রস) পাওয়া যায় বটে, তবে তার সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে। সদ্য কর্ষিত মাটি থেকে এক রকমের গন্ধ বের হয়, কিংবা শিশুর ননীর মতো দেহ থেকে স্নেহ উদ্বেলকর এক রকম গন্ধ নির্গত হয়, যাকে ঠিক আমাদের পরিচিত পুষ্প চন্দন-গোলাপ জল, আতর বা ধূপের গন্ধের সঙ্গে মেলানো যায় না। তার মধ্যে যেমন একরকম অপূর্ব আদিমতা থাকে, তেমনি ছেলে ভুলানো ছড়াগুলোর মধ্যেও একটি আদিম সৌকুমার্য আছে — তা তীব্র নয়, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরস।

ছেলে ভুলানো ছড়ার এই আদিম আকর্ষণই কবিকে তা সংগ্রহে ব্রতী করেছে, আর তার সঙ্গে জুড়ে গেছে জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সংগ্রহের প্রতি সুপ্ত দেশপ্রেম। অকৃত্রিম এই দেশীয় সাহিত্য তথা জাতীয় সম্পত্তি সংগ্রহের আরো একটি বড়ো কারণ, এই ছড়াগুলি পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাই এগুলি সংগ্রহের প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল দেশের যুব সমাজ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতির এই ঐতিহ্যের পরিচয় সংগঠন দেশপ্রেমের উদ্বোধন।

ছড়া-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার স্বরূপ প্রকৃতির কথাও বলেছেন, ছড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি ছড়ার একাধিক পাঠান্তরের পরিচয় পেলেন। স্থান ভেদে ও ব্যক্তিভেদে ছড়ার এই পাঠান্তরের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে বললেন — 'একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে।' ছড়ার এই পাঠান্তরের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেও যে বিশেষ প্রয়োজনে পাঠান্তর কার্যকরী সেই আদি পাঠ নির্ণয় সম্পর্কে তিনি কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, 'ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই।' লোকসাহিত্যের পাঠান্তর সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কিন্তু আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অনুকূলে যায় না। যাইহোক, পাঠান্তর স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার নতুন একটি প্রকৃতি নির্ণয় করে বললেন, এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা, ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত নীতির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকাল পাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।''

কামচারিতা ও কামরূপধারিতা — কামনা অনুযায়ী আচরণ করা হল কামচারিতা। আর কামনা অনুযায়ী রূপধারণ করা হল কামরূপধারিতা। ছড়ার সঙ্গে মেঘের তুলনা তিনি প্রথম প্রবন্ধে করেছেন। সেই প্রসঙ্গেই কামরূপধারিতা ও কামচারিতার প্রসঙ্গ এসে যেত। কিন্তু ছড়ার পাঠান্তর প্রসঙ্গে সেই বৈশিষ্ট্যটি এসে গেল। কামনা অনুযায়ী রূপ ধারণ করা ও কামনা অনুযায়ী আচরণ করার মধ্যে আছে ছড়ার পরিবর্তনশীলতা। শিশুর আচরণ যেমন তার মনের ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে, তেমনি ছড়ার দ্রুত বিষয়ান্তর ও স্থান ভেদে ছড়ার নানা রূপান্তর তার কামচারী ও কামরূপধারী স্বভাবের পরিচয়। ছড়া যে অতীত নীতির মতো মৃত কোনও ব্যাপার নয়, তা যে সজীব সচল এবং দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থান উপযোগী করে তুলছে তা বোঝা যায় এর কামচারী ও কামরূপধারী বৈশিষ্ট্যে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে আছে আলোচনা। দ্বিতীয় অংশে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে ছড়ার পাঠান্তরের আর তৃতীয় তথা শেষ অংশে আছে ছড়া-সংগ্রহ। এ পর্যায়ে মোট ৮১টি ছড়ার দৃষ্টান্ত আছে।

১০২.৭ ছেলে ভুলানো ছড়া ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ছাত্রদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে বলেছিলেন — ''সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পাঠনগুলি বাংলার এক অংশে, যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।'' মূলত এই উদ্দেশ্য স্মরণে রেখেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ '১' এ 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২' লিখি। প্রথম প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার কাব্যরসের উপর নির্ভর করে যে বিশ্লেষণ করলেন, তার ভিত্তিতে বাংলার এই নগণ্য মৌখিক লোকায়ত সাহিত্যধারাটি নাগরিক শিষ্টসমাজের দৃষ্টিগোচর হলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই যে কবি ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ রসবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়ার যে পরিচয় দিলেন তা অতুলনীয়। নগণ্য জিনিসও তাঁর বিশ্লেষণ গুণে অসামান্য হয়ে উঠলো।

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' করে তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ ও সন্ধানের পরামর্শ দিলেন, তা কেবল পরামর্শমাত্র হয়ে রইলো না। নিজেও সংগ্রহ ও সন্ধান কর্মে যোগ দিয়ে এবং সংগৃহীত ছড়ার রসাত্মক বিশ্লেষণ করে উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। ঠিক উদাহরণ সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ এ কাজ করলেন না, এর মধ্যে ছিল মনের তাগিদ, অনুরাগের প্রাবল্য এবং দেশের প্রতি গভীর প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের এই লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রভাব পড়ল অভিজাত ও শিষ্ট সমাজে। অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র কিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, রামেন্দ্রসুন্দরের মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লোকসংস্কৃতিচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। লোকসংস্কৃতি চর্চায় জোয়ার এলো। ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সরস আলোচনা লোকসংস্কৃতি চর্চাতে অনেককেই আগ্রহী করে তুললো।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করলেন। আমাদের সমাজ-মানস থেকে মৌখিক সাহিত্যের যে ধারাটি ক্রমবিলীয়মান তাকে রক্ষার চেষ্টা করলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা ছড়া যে সংগৃহীত হয় নি তা নয়, কিন্তু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এমন সরস বিশ্লেষণ হয়নি। শুধু কবির দৃষ্টিতে দেখা নয়, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিও যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের শুরুতে বলেছেন যে, মূলত কাব্যরসের দিক দিয়েই তিনি ছড়াগুলোকে বিচার করেছেন। কিন্তু তাঁর এই কাব্যরসের দৃষ্টিভেদ করেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন ছেলে ভুলানো ছড়ার, যার মধ্যে দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ ও লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানীর মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য 'ছেলে ভুলানো ছড়া' হলেও, ছড়ার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে তিনি যে সব কথা বলেছেন, তার অনেক কথা লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

১০২.৮ ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সীমায়তি

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব রস-রুচি ও সৌন্দর্যবোধ অনুযায়ী ছড়াগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। যে সকল ছড়া তাঁর মতে অতিরিক্ত গ্রাম্যতা-ভাবাপন্ন, তা তাঁর সংগ্রহ ও আলোচনায় স্থান পায় নি। এর একটা শুভ দিক এই যে, গ্রাম্যতা দোষ-পুষ্ট কোনো কোনো ছড়া তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে বাদ দিলেও, কোন ছড়ার ব্যাপক পরিবর্তন তিনি ঘটান নি।

তবে, ব্যাপক পরিবর্তন না করলেও কোনও কোনও শব্দের পরিবর্তন সাধন করেছেন। এবং সে পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে তাঁর নাগরিক রুচি। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়। সংগ্রহ কর্মে মূলের কোনওরূপ পরিবর্তন কাম্য নয়। যেমনটি শোনা যায়, অবিকৃতভাবে তেমন লিপিবদ্ধ করাই নিয়মসঙ্গত। কারণ, একটা শব্দের পরিবর্তন সমগ্র গবেষণার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে' ছড়াতে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। যেমন — ''বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে। সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামী খাকী বলে'' —

এই উদ্ধৃতিতে 'স্বামী' শব্দটি তিনি 'ভাতার' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। শিষ্ট সমাজে 'ভাতার' শব্দটি অশ্লীল বলে মনে করা হয়। অথচ 'ভর্তৃ' থেকে 'ভাতার' শব্দের আগমন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্টরুচির ওপর নির্ভর করে শব্দটির পরিবর্তন সাধন করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় পরিবর্তন সাধন লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান অনুমোদন করে না।

ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২ — এ রবীন্দ্রনাথ ছড়ার পাঠান্তরকে স্বীকার করেছেন, মেনেছেন তার প্রয়োজনীয়তা। পাঠান্তরের এই প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব স্বীকার আধুনিক মনস্কতার পরিচয়বাহী। কিন্তু, 'ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই' — এ অভিমত সম্পূর্ণভাবে মানা যায় না। কারণ একাধিক পাঠান্তরের মধ্যে তুলনামূলকতার সূত্রে লোকসাহিত্যের যে কোন পাঠের আদি পাঠ নির্ণয় করা সম্ভব। এবং এই আদি পাঠ নির্ণয় ব্যাপারটি লোকসংস্কৃতির গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতিচর্চার পুরাতন পদ্ধতির পথিক বলেই মনে হয়। আর ছড়া যেহেতু মৌলিক সাহিত্য পাঠান্তরের বদলে কথান্তর শব্দটির প্রয়োগই সঙ্গত হতো। তবে, এসব স্বীকার করেও বলা যায়, আজ থেকে শতাধিক বছরেরও পূর্বে এ ধরনের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে গভীর সহনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

১০২.৯ কবি-সংগীত

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ 'কবি-সংগীত'। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। প্রথমত লোকসাহিত্য বলতে যদি আমরা গ্রামীণ, কৃষিজীবী, অশিক্ষিত সংহত সমাজের মানুষের অলিখিত মৌখিক সাহিত্য বুঝি, তাহলে কবি-সংগীত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ, লোকসাহিত্যের কোন লিখিতরূপ থাকে না, থাকে না তার নির্দিষ্ট কোন স্রষ্টা। অথচ, যাকে আমরা 'কবি-সংগীত' বলি তা নির্দিষ্ট কিছু কবির রচনায় পর্যবসিত হয়। সুরে-তালে ওস্তাদী সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ রীতি-নিয়মের অধীন। পূর্বে এগুলি ছিল বাঁধা গীত। পরবর্তীকালে অবশ্য কবি সংগীত মৌখিক রচনায় পর্যবসিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'কবি-সংগীত' ঠিক লোকসাহিত্য নয়। কিন্তু 'লোকসাহিত্য' বলতে যদি লোকের বা সাধারণের সাহিত্য বুঝি, তা'হলে আলোচ্য 'কবি সংগীত' ও লোকসাহিত্য। কারণ, রাজসভা ছেড়ে, এই প্রথম সাহিত্যের কোন ধারা সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য সাধারণস্তরে নেমে এলো। লোকের মনোরঞ্জনার্থে যে সাহিত্য তা যদি লোকসাহিত্য হয়, তাহলে 'কবি-সংগীত' ও লোকসাহিত্য।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের ন্যূনতম সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন এ প্রবন্ধে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬২ খ্রিঃ) পর থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দল

কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁরা ঠিক কবি নন, কবিয়াল বা কবিওয়ালা। এই কবিওয়ালা গোষ্ঠীর রচনাই 'কবি-সংগীত' বলে পরিচিত। এঁদের রচনা 'কবি-সংগীত' বলে পরিচিত হলেও তা কতটা 'সাহিত্য' সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, সাহিত্য হলো 'সহিতের ভাব', বা যা সহিতত্ত্ব স্থাপন করে তাই সাহিত্য, সাহিত্য হতে গেলে তাকে অবশ্যই জীবনে জীবন যোগ করতে হয়। কিন্তু, এই রচনাগুলো জীবনে জীবন যোগ করা দূরে থাক, জীবনের উপরিভাগের ক্ষণিক আনন্দদানের মধ্যেই নিঃশেষিত। চারজোড়া ঢোল ও চারটি কাঁসির উদ্দাম আওয়াজের সঙ্গে একদল মানুষের জান্তব চিৎকার এবং তা শুনে উৎফুল্ল অসংখ্য মানুষের আনন্দ খুঁজে পাওয়ার বিনিময়ে উত্তেজনা প্রশমিত করার মধ্যেই 'কবি সংগীতে' র সীমাবদ্ধতা। দুই-কালের দুই ভিন্নমুখী সাহিত্যধারার মাঝখানে হঠাৎ করে একদল 'নষ্ট পরমায়ু' কবিদলের কলকাকলি-ই হলো কবি-সংগীত। সংগীত তা ঠিকই, কিন্তু তাতে সুরের চেয়ে তাণ্ডব আওয়াজেরই অধিক প্রাধান্য।

কবি-সংগীতের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিগানের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যধারা এবং তার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন এবং দুই দিকের দুই সাহিত্য ধারার মাঝখানে আবির্ভূত 'কবি-সংগীতে' র স্বরূপ নির্দেশেই তাঁর কৃতিত্ব।

প্রথমেই তিনি আলোচনা করেছেন 'কবি-সংগীত' পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য নিয়ে। সে সাহিত্য মূলত মধ্যযুগীয় সাহিত্য। কিন্তু সেই মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অপূর্ব সৌন্দর্যগুণ ও কাব্যগুণ ছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিরাট অংশ ছিল রাজসভার ফরমায়েসী রচনা। কিন্তু ফরমায়েসী রচনার মধ্যেও সৌন্দর্য এবং সাহিত্যগুণের অভাব হয় নি। সে সাহিত্যের ব্যাপক অংশ জুড়ে ছিল গীতি কবিতার ধারা। ''গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতি কবিতাই বহু সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্প মঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য।'' শুধু বৈষ্ণব পদাবলীই বা কেন, ফরমায়েসী রাজসভার কাব্য রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান ও ''রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য''। কিন্তু আলোচ্য কবিগান বা কবি-সংগীত গীত হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে ভাবের সেই গাঢ়তা এবং গঠন-পারিপাট্য আদৌ নেই। কবি-সংগীতে পূর্ববর্তী সংগীতধারার ভাব ও সৌন্দর্যগত পারিপাট্যের অভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কারণ দেখিয়েছেন তা হলো — ''পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত — সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেই জন্যে রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল; তখন গুণী সভায় গুণাকর কবির গুণপনা প্রকাশ সার্থক হইত।''

১০২.১০ প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে কবি-সংগীতের পার্থক্য

প্রাচীন সাহিত্য এবং কবি-সংগীত-উভয় প্রকার রচনাকেই রবীন্দ্রনাথ গান বলে অভিহিত করলেও, উভয় গানের মধ্যে বিস্তর গুণগত ও সৌন্দর্যগত পার্থক্যও তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ মূলত বৈষ্ণব পদাবলী কেবল মাত্র গানই নয়, একে তিনি গীতি কবিতা বলেও উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা মুখ্য হলেও এর চারপাশ ঘিরে একটা আধ্যাত্মিক বাতাবরণ বা পরিমণ্ডল ছিল। প্রেমের সৌন্দর্য মণ্ডিত ভাবাবেশ ছিল এ গানের মুখ্য অবলম্বন। সে প্রেম কোন ভাবে কামে পরিণত হয় নি। কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎ ভাবের জগৎ। তার সৌন্দর্য, রস সুর সবই ছিল হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে, অনুভূতির গভীরতা থেকে উত্থিত। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি গুলি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় বাতাবরণে তৈরি। ধর্মীয় কারণে সে আখ্যান কাব্যগুলোর উদ্ভব। ধর্ম ছিল তাদের

মূল উপজীব্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে ছিল হৃদয়ের শাসন, মঙ্গলকাব্যে ছিল ধর্মীয় শাসন। ফলে এসমস্ত সাহিত্য বা গান কোনভাবেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারেনি। এমন কি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যসম্পর্কেও একই কথা স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু ভাব আবেগ বা ধর্মীয় অনুশাসন জনিত কারণে নয়। সেকালের সাহিত্যে সাহিত্য গুণ, তার ভাষা, ছন্দ, রাগিণী সবই ছিল উৎকৃষ্ট। কারণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ অবসরকে একটা মুখ্য ভূমিকা দিয়েছেন। কবির রচনা করার এবং শ্রোতাদের শোনার ছিল অখণ্ড অবসর। গুণসভায় গুণীর গুণের কদর ছিল। সাহিত্য সৃষ্টির অবসর ছিল। সাহিত্যের কদর ছিল। সাহিত্য ও সংগীত তাই উৎকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু কবি-সংগীত যখন বাংলা সাহিত্যে এলো, তখন সময় ও পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। রাজসভা থেকে সাহিত্য এবার জনসভায় পাড়ি জমিয়েছে। ফলে সাহিত্যের-সংগীতের লক্ষ্য ও উপায় গেছে আমূল পরিবর্তিত হয়ে। আসল কথা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের জগৎটিও পাল্টে গেছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানি জয়লাভ করার ফলে বণিকের মানদণ্ড রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলো ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতা নগরীর পত্তন ঘটলো। জমিদারি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী প্রথা কায়েম হলো। ইংরেজ কোম্পানির চাকরির লোভে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বাঙালি আকৃষ্ট হলো। চাকরি পাওয়ার লোভে বাঙালি কলকাতা অভিমুখী হলো। গ্রাম্য জমিদাররাও ছুটলো শহর কলকাতার অভিমুখে। জমিদার ও নতুন 'বাবু' কালচারে মেতে উঠল কলকাতা। কাঁচা পয়সার আমদানি, অবসরের স্বল্পতা, মূল্যবোধহীনতা, ঐতিহ্যে অস্বীকৃতি, পরিবর্তিত এই সমাজব্যবস্থায় সাহিত্যের প্রকৃতিও পাল্টে গেল। এখন আর অখণ্ড অবসরে কাব্যের ও সংগীতের রসসুধা পান করার ইচ্ছা থাকলো না; ক্ষণিক উত্তেজনা ও আমোদ লাভই উদ্দেশ্য হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে, 'কবি-সংগীতে'র উদ্ভব। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাপক পার্থক্য থাকবেই।

কারণ, ''ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থুলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।'' কবিসংগীতের উদ্ভবের অন্যতম কারণ হলো, একমাত্র এই গানই পারে মানুষকে আমোদের উত্তেজনা দিতে, ক্ষণিকের আনন্দ নামক উদ্দামতা দিতে। তা রসিয়ে-বসিয়ে সাহিত্য রস আস্বাদন করা, সংগীতের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দ খোঁজার মতো ফুরসৎ এবং চাহিদা তখন সাধারণ মানুষের ছিল না। নতুন রাজধানীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বিলাসিতার ও আনন্দ বিনোদনের মাত্রা ও মাপকাঠি পুরোপুরি পাল্টে গেছে, দু'দণ্ডের উত্তেজনাই তাদের লক্ষ্য। মাতাল যেমন মদের মধ্যে খোঁজে তৃপ্তি ও নেশার আনন্দ, কলকাতা কেন্দ্রিক বাবু সমাজও কবিগানের ক্লেদাক্ততায় খুঁজে পেতে চাইলো ক্ষণিকের আনন্দ ও সংগীতের সুধা। সাহিত্য রস তাদের কাম্য ছিল না।

১০২.১১ কবি গানের প্রকৃতি

পরিবর্তিত অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, ছিল না পুরাতন আদর্শ। কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে অনেকেই হঠাৎ ধনী হয়ে উঠল। অথচ তাদের রাজকীয় কোন ঐতিহ্যও নেই, গাম্ভীর্যও নেই, নেই উদারতাও। তাদের চিত্তবিনোদনের সাহিত্যও হয়ে উঠলো তেমনি গেঁজে ওঠা তালরসের মতো। পান করলে নেশা হয়, কিন্তু আস্বাদনীয় নয়। উত্তেজনা প্রশমনের উপাদান আছে, তিক্ত হৃদয়কে মধুরতায় ভরিয়ে তোলার গভীরতা নেই। অত্যন্ত লঘু সুরে চার জোড়া ঢোল ও চারখানি কাঁসির গগনভেদী উদ্দাম বাজনার সঙ্গে সদলবলে চিৎকারই হয়ে উঠল সঙ্গীত। যার মধ্যে আছে অন্যদলের প্রতি কুৎসা, নিন্দা প্রচারের অবাধ

অনুতাপযুক্ত অশ্লীলতা, আর লড়াই করে হার জিত লাভের উত্তেজনা। অর্থাৎ কবিসংগীত, একই সঙ্গে সংগীত আবার উত্তেজনার খোরাক। সবস্বতীর বীণার তারের ঝন্-ঝন্ শব্দ-ঝংকার শুধু থাকলে চলবে না। এর মধ্যে বীণার কাষ্ঠদণ্ডের টক্ টক্ লাঠি-যুদ্ধও থাকতে হবে। গান হবে, অথচ যুদ্ধও হবে। আনন্দ ও উত্তেজনা উভয়ই হবে এর উপাদান। কাব্যের গভীরতা, সৌন্দর্যের প্রকাশ কিংবা ভাষা ও ছন্দের লালিত্য কবিগানে ছিল না। অনুপ্রাসের ঝংকার ছিল, কিন্তু তা অর্থহীন একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রতিপক্ষকে জব্দ বা পরাস্ত করার জন্য এই অর্থহীন রকমারি শব্দের খেলা যে আনন্দ দিত তা আসরেই সীমবদ্ধ থাকতো। আসরের বাইরে কবি-সংগীতের কোন সাহিত্য রস বা সংগীত-মূর্ছনার রেশ থাকতো। আসরের বাইরে কবি-সংগীতের কোন সাহিত্য রস বা সংগীত-মূর্ছনার রেশ থাকতো না। সুলভ অনুপ্রাস এবং ঝুটা অলংকারের মধ্যে দিয়ে আসরের আনন্দ বিনোদন বা ধনী পৃষ্ঠপোষকের স্তাবকতাই ছিল কবি-সংগীতের মূল লক্ষ্য। ‘‘ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর-রঞ্জনের জন্য গান-রচনা বর্তমান বাংলার কবি ওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন।’’ ‘‘কবিওয়ালাদের গানে সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা-উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।’’ কবিগানর এই জন মনোরঞ্জনী স্বভাব থেকে একটা ভালো দিকের ইঙ্গিত অন্তত পাওয়া যায়, তাহল সাহিত্য রাজসভা ছেড়ে সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে এই গানের মধ্যে দিয়ে।

১০২.১২ কবি-সংগীতের গুরুত্ব

সাহিত্যের এই সাধারণীকরণ বা গণতান্ত্রিকতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের দুটো ধারা লক্ষ্য করেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ‘‘সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক-না কেন, তাহাদের আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে।’’ তাঁর মতে, আজকের দিনের খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলো সেই শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করেছে। এই সত্যের ওপর নির্ভর করে তিনি কবি-গান পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতির কিছু পরিচয় দিয়েছেন। কবি-গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য দেখা গিয়েছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত নাটকগুলোতে তারই সামান্য পরিবর্তিত রূপই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এই ক্ষণকাল জাত সাহিত্যে ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার এবং সববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার এবং সববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম লক্ষিত হয়। সাহিত্যের এই গণতন্ত্রীকরণ ও তার মধ্যেকার এই অ-সাহিত্যিক স্বভাব যে চিরদিন থাকতে পারে না। এরও যে পরিবর্তন সাধিত হয়ে বাংলা সাহিত্য নতুন ভাবে জেগে ও বেঁচে উঠে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির শেষ লগ্নে দিয়ে বলেছেন, ‘‘অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, তাহার অবসর-বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব। তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।’’

সবশেষে, রবীন্দ্রনাথ কবি-সংগীতের প্রকৃতি অনুযায়ী, তাকে সমালোচনায় বিদ্ধ করলেও ; তাকে কোনভাবেই আমাদের সমাজ-ইতিহাসের অঙ্গ থেকে বাদ দিতে চাননি। তিনি সকল ত্রুটিকে স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন, ‘‘তথাপি এই নষ্ট পরমায়ু ‘কবি’র দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজ ইতিহাসের একটি অঙ্গ, এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।’’ তাই, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সময়কে সৃষ্টিকে মেনে নিয়ে, তাকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেও, তার মধ্যে যে গুণটুকু স্বীকার করার সেটুকুকে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তবে আলোচ্য প্রবন্ধটি লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। কবি-সংগীত কতটা লোকসাহিত্য, তা প্রশ্নাতীত নয়। ব্যক্তি বিশেষ তার স্রষ্টা লিখিত রূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসাহিত্যে ব্যক্তি স্রষ্টার স্থান নেই। তার কোন লিখিত রূপও থাকে না। তবে, প্রথম দিকে কবি-গানের আসরে নামার আগে উভয় সম্প্রদায় কথা বলে নিয়ে গানের একটা লিখিত রূপ নির্দিষ্ট করলেও, শেষের দিকে তার লিখিত রূপ ছিল না। আসরে উপস্থিত হয়ে, উপস্থিত বুদ্ধি ও পরিস্থিতিতে এ জাতীয় গান রচিত হতো। এই পদ্ধতিটির ওপর নির্ভর করে কবি-সংগীতকেও লোকসাহিত্য বিবেচনা করা যায়। আর জনমনোরঞ্জনার্থে যে কবি গানের উদ্ভব। সে কবিগানকে লোকের সংগীত বা লোক-সংগীত বলেও অভিহিত করাও যায় অতি কষ্ট কল্পনায়।।

১০২.১৩ গ্রাম্যসাহিত্য

যাকে বলা হয় লোকসাহিত্য, তারই আর একটা নাম গ্রাম্যসাহিত্য। কারণ, লোকসাহিত্যের প্রাচীন ধারণায় লোকসাহিত্য মূলত গ্রামের কৃষিজীবী, অক্ষর জ্ঞানহীন বা স্বল্পাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, সংহত সমাজের মৌখিক সাহিত্য। এই মর্মে লোকসাহিত্যের অপর পরিচয় গ্রাম্যসাহিত্য বলে। কিন্তু লোকসমাজ ও লোকসাহিত্যের প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে লোকসংস্কৃতির আধুনিক ধারণায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়, সেই আধুনিক ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। কালগত সমস্যা এবং জীবদেহের নশ্বরতাই এই জন্য দায়ী, রবীন্দ্রনাথের সেখানে কোনও ভূমিকা নেই।

আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যসাহিত্য বলতে প্রাচীন ধারণার লোকসাহিত্যকেই বুঝিয়েছেন। তবে, লোকসাহিত্যের যে একাধিক শাখা থাকে — ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গান, কথা ইত্যাদি তার সকল দিককে কিন্তু তিনি এ আলোচনার মধ্যে স্থান দেন নি। তিনি কেবল বিশেষ দুজাতীয় নীতিকে তাঁর আলোচনার মধ্যে এনেছেন। শুধু তাই নয়, সেগুলির সঙ্গে শিষ্ট সাহিত্যের একটা তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

১০২.১৪ গ্রাম্য সাহিত্যের প্রকৃতি

গ্রাম্যসাহিত্য মূলত স্থানীয় বা লৌকিক। গ্রাম্যসাহিত্য একদিকে আটপৌরে, বাস্তব, আবার অন্যদিকে তা ভাবেরও বটে। আমাদের প্রতিদিনকার যে জীবন, সেই জীবনের বাইরে গ্রাম্যসাহিত্যের অবস্থান নয়। গ্রাম্যসাহিত্য যখন গ্রাম্য তখন তা লৌকিক বা স্থানীয়, আর তা যখন সাহিত্য, তখন তা সর্বকালের।

গ্রাম্যসাহিত্যের কবি যে-সকল সাংসারিক ব্যাপারের মধ্যেও সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবৃত তাকেই ছন্দে লয়ে মণ্ডিত করে তার ওপর নিত্য সৌন্দর্যময় ভাবের একটা রশ্মিপাত করে দেখতে চান। এর ফলে স্থানীয় এবং আটপৌরে ব্যাপারও সাহিত্যে গুণান্বিত হয়ে ওঠে।

তবে এর জন্য চাই একটা ছন্দ ও একটা সুর। কারণ, আটপৌরে জীবনের নীরস বস্তুগত কথাকে, নীরস করে বললে তা কখনই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। তা আটকে থাকে তার বস্তুসীমার মধ্যেই। কিন্তু, এই বস্তুভার যুক্ত আটপৌরে বিষয়ও যখন রসযুক্ত হয় তখনই তা হয়ে ওঠে সাহিত্যের বিষয়। এর জন্য চাই ছন্দ ও সুরের সংযুক্তি।

- শুধু ছন্দ ও সুরের সংযুক্তিতেই গ্রাম্য রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই পারিপার্শ্বিকতার সাহচর্য। ‘‘বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত

লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয় ; তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে ; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।

- গ্রাম্য সাহিত্যের পারিপার্শ্বিকতা এবং তার সঙ্গে মিলিত ছন্দ ও সুরের সমন্বয়ে কিভাবে যে সাধারণ আটপৌরে গ্রাম্যতা ও সাহিত্যের সরণী বেয়ে ভাবলোকে একেটা আসন গ্রহণ করে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের শুরুতেই দিয়েছেন — একদিন শ্রাবণের শেষে অস্তগামী সূর্যের আভায় মেঘে মেঘে যখন রঙ ধরেছে তখন নৌকোযোগে পাবনা-রাজশাহির মধ্যে ভ্রমণ করতে গিয়ে কবি দেখলেন দশ-বারোজন লোক একখানি ডিঙি বেয়ে চলেছে এবং তাদের কণ্ঠ থেকে একটা গান ভেসে আসছে। বহু কষ্ট করে উচ্চকণ্ঠের সে গান থেকে তিনি ধুয়ার দুটি পংক্তি উদ্ধার করলেন —

  'যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
  পাবনা য্যাছে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।।'

  পরিবেশ অনুযায়ী গানটির উপযোগিতা নিয়ে কবির মনে প্রশ্ন জাগলেও, গানটির উক্ত দুটি চরণে সেই শ্যাওলা ঘেরা জলধারার মাঝখান থেকে যেন সমস্ত গ্রামগুলো কথা বলে উঠল। একটা মুহূর্তের মধ্যে কবির মনে হল ‘‘এই গোয়ালঘরের পাশে এই কুলগাছের ছায়ায় এখানেও যুবতী মন-ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।’’ এই সব কিছুই মিলে গ্রাম্য সাহিত্য। ওই জল-ভরা পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ছোটো ছোটো গ্রামগুলো জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জেগে থাকে। অস্তগামী সূর্যের অস্তরাগ লাগা, ওই ঝপ্ ঝপ্ শব্দে তালে তালে বাখারি ফেলে জল কেটে চলা এবং তারই সঙ্গে এক যোগে ওই মাঝিদের উচ্চৈস্বরে গাওয়া গান — সব মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দকেও চিরকালের করে তোলে। আর এই সমস্ত বিষয়টিকে আরো সজীব ও চিরকালীন করে তোলে অনাম্নী ওই গ্রাম্য যুবতীর অভিমান এবং তার মান ভাঙানোর প্রচেষ্টা।

- গ্রাম্য সাহিত্য এই রকমই কাজের মধ্যে, ব্যস্ততার মধ্যে গড়ে ওঠা সাহিত্য। শিষ্ট সাহিত্যের মতো আলাদা কোন অবসর ও অবকাশ সে দাবি করে না। ‘‘জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে, সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দানের মোটরি নির্মাণ হইতেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে — তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।’’ গ্রাম্য সাহিত্যের বিশেষত্ব এখানেই, তা কাজের মধ্যে-ব্যস্ততার মধ্যে, সহজ-সরল আবেগ-অনুভূতির মধ্যেই তার সৃষ্টি এবং গতায়াত।

১০২.১৫ গ্রাম্য সাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্য

প্রসঙ্গক্রমে গ্রাম্য সাহিত্য ও শিষ্ট বা নাগরিক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্যের দিকটিও রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়ে গেছেন। সাধারণ ভাবে গ্রাম্য সাহিত্য সহজ, সরল, আটপৌরে। শিষ্ট সাহিত্য মার্জিত, শিষ্ট এবং রুচিশীল।

গ্রাম্যসাহিত্যে লোককবি তাঁর চর্মচক্ষে যা দেখেন তাকেই অকৃত্রিম এবং অকপটে প্রকাশ করেন। অন্যদিকে শিষ্ট সাহিত্য বাস্তবকে স্বীকার করলেও, তাকে কল্পনার ওপর নির্ভর করে দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে উঠতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, যুবতীচিত্তের বিমুখতা সাংসারিক যত দুর্বিপাক আছে, তার মধ্যে অন্যতম। সেই অভিমানিনীর মান ভাঙানোর মতো বিষয় শিষ্ট সাহিত্যের কবিদের হাতে পড়লে বায়নাক্কার অন্ত থাকে না। ''কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানস সরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লানমুখে হাঁকিয়া বসিতেন। এবং উজ্জয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তাছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।'' কিন্তু লোককবি তাঁর মানিনী প্রিয়ার মান ভাঙাতে, যা চোখে দেখেননি, সেই কল্পনার কল্পলোকে যাওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তিনি তাঁর সাধ্য ও দৃষ্টের সীমাতেই আবদ্ধ। একটাকা দামের মোটরি এবং সেটা পাবনার — এই বস্তুটিই পারে তাঁর প্রিয়ার মন ভোলাতে, মান ভাঙাতে। স্পষ্ট করে সহজভাবে সে কথাটিই তিনি জানিয়ে দেন।

তবে, এত স্পষ্টতা, এত অতি সাধারণ বিষয় ও বস্তু সাহিত্য গুণান্বিত হতে গেলে তাকে তার বস্তু এবং নিত্যতার সীমা ছাড়াতে হয়। সুর এবং ছন্দ সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করে। সুর ও ছন্দে ছোঁয়া পেয়ে, পারিপার্শ্বিকতার সাহচর্যে গ্রাম্য কবির সাধারণ বস্তু ও বিষয়ও চিরকালের হয়ে যায়। অভিমান যে কেবল কালিদাসের নায়িকাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তা যে এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়া কিংবা বাঁশ বাগানের কোণের কুৎসিত দর্শনা যুবতীর মধ্যেও আছে — তা বোঝা যায় লোককবির এই দুটি গানের চরণে। এখানে স্থানিক হয়েও গ্রাম্য সাহিত্য চিরকালীনতাকে স্পর্শ করে।

প্রসঙ্গশেষে, গাছের উপমা দিয়েই লেখক শিষ্ট ও লোকসাহিত্যের সম্পর্ক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন — ''গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশিয়, স্থানীয়।'' নিচের অংশটিকে গ্রাম্য সাহিত্য এবং উপরের অংশটিকে শিষ্ট সাহিত্যরূপে কল্পনা করা যেতে পারে। শিষ্ট সাহিত্যের কবিকেও মাটি থেকে রস ও রসদ সংগ্রহ করতে হয়। সাহিত্য কল্পনার বিষয় হলেও সাহিত্যিককে মাটিতে পা রেখে হাঁটতে হয়। তিনি নভশ্চর নন। কবিকঙ্কন মুকুন্দ থেকে অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র কেউ-ই বাদ যান না।

১০২.১৬ বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে পড়ে ছড়া, গান, কথা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত দু জাতীয় নীতির ওপরই জোর দিয়েছেন। অবশ্য তিনি এগুলিকে ছড়া বলতে চেয়েছেন। তা যথার্থ নয়। এবং লোকগীতিও নানা ধরনের হয়ে থাকে। যাইহোক, আমাদের গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত গীতিগুলোকে তিনি মুখ্যত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন (১) হরগৌরী-বিষয়ক, (২) রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক।

হরগৌরী বিষয়ক যে গীতি তাতে আছে বাঙালির ঘরের কথা। আর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে গীতি তাতে আছে বাঙালির ভাবের কথা। হরগৌরী বিষয়ক গীতিতে প্রকাশিত সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিতে আছে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে কখনও বলেছেন ছড়া, কখনও বলেছেন গান — ''হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি।''

হরগৌরী বিষয়ক গান ঃ হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে আমাদের গ্রাম্য সাহিত্যের যে ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তার মধ্যে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে আমাদের বাঙালি সমাজ ও পরিবার জীবনের যোগ রয়েছে। হরগৌরীর প্রেম সমাজ স্বীকৃত। কারণ, তাদের প্রেম বিবাহ পরবর্তী, এ সমাজ ব্যবস্থায় দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেমকে স্বীকৃতি জানায় না। ফলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সমাজ বহির্ভূত প্রেম বাঙালির জীবন-কথার সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। সেখানে কলহ ও দ্বন্দ্বপূর্ণ আটপৌরে সংসার জীবনের নাগপাশে মানুষ বন্দী আর সাংসারিক কলহের অন্যতম বড়ো কারণ আর্থিক সংকট। দিন-এনে দিন খেয়ে কোনভাবে চলে যায় বাঙালির জীবন। সেই জীবনে সমাজ বন্ধন অতিরিক্ত প্রেমের অবকাশ কোথায়। আমাদের শিবায়ন কাব্যে কিংবা লোকসমাজে প্রচলিত গান কিংবা ছড়ায় হর-গৌরীর যে দাম্পত্য জীবনের ছবি অঙ্কিত, তা আসলে কষ্ট কল্পিত কোন স্বর্গীয় ব্যাপার নয়। বাঙালি কবি তাঁর নিজের দেখা ও নিজের সংসারেরই চিত্রকে সেখানে এঁকেছেন। একাধিক সন্তান নিয়ে আপন-ভোলা কর্মবিমুখ অলস পুরুষটি ভোজন বিলাসী, কিন্তু অন্নের সংস্থান করার দিকে তার নজর নেই। ফলে গিন্নির সঙ্গে তার কলহের অন্ত নেই। কিন্তু, এ কলহ মেঘ কেটে যায় দাম্পত্য প্রেমের আবেশে। হরগৌরীর জীবনের এই দ্বন্দ্ব-মধুর চিত্র-ই আসলে বাঙালির আপন ঘরেরই চিত্র। এ ছবি আঁকতে কবিকে কল্পলোকে পাড়ি দিতে হয় না। আমাদের দৈনন্দিন সংসারের দিকে তাকালে এর উপাদান পাওয়া যায়। হরগৌরীর গান তাই সমাজের গান। বাঙালির ঘরের কথা।

বাঙালি সংসারের আর এক যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা হলো কন্যার বিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দেওয়া। বাঙালির ''একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমন-কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই- কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়।... আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ।'' ঘুরে ফিরে মানুষের দেহের ক্ষতস্থানেই আঘাত লাগার মতো বাঙালির জীবনের কথা যখন সাহিত্যে রূপ পায় — সেই হরগৌরীর গানে এই বেদনার দিকটিও মুক্তি পায়। কন্যা সেখানে উমা, মাতা মেনকা, পিতা পাষাণ সম হিমালয়। সে গানে জামাইয়ের নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের কলহ, গৃহস্থালীর বর্ণনাগুলো স্থান পায় — তাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই থাকে না। ''তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতেই কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।'' সব মিলিয়ে হরগৌরী প্রতীকমাত্র। তাদের আড়ালে বাঙালি জীবনেরই কথা প্রতিবিম্বিত।।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান ঃ হরগৌরীর প্রেম দাম্পত্য প্রেম। সমাজ বন্ধনযুক্ত প্রেমই সেখানে প্রকাশিত। কিন্তু মন তো সব সময় সমাজবন্ধন মানে না। মন যেখানে স্বাধীন, সেখানে সে যে প্রেমিক, সেখানেই রাধা-কৃষ্ণ কথা। এই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলির জাতি স্বতন্ত্র। ''সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া-রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানসরাজ্য।'' কারণ, মধ্যযুগীয় বাঙালি সংসার ও সমাজে সমাজবন্ধন মুক্ত প্রেমের কোন স্বীকৃতি নেই। অথচ মনের প্রেমিকসত্তাকে তো জোর করে সমাজ বন্ধনে আটকানো যায় না। তাই মন যখন তার স্বাধীনতাকে সমাজ জীবনে মুক্ত করতে পারে না, তখন সে ভাবের জগৎকে আশ্রয় করে। কল্পলোককে ভর করে। মনোরাজ্যে মানুষের অভিসার ঘটে। কৃষ্ণ-রাধার প্রেম সেই ভাবের কথা, মনোরাজ্যের কথা, সৌন্দর্যের গান। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে বাংলার গ্রাম্যদৃশ্য গৃহচিত্র কিছুই নেই। কারণ, ''এ-সমস্ত ভাবের সৃষ্টি। রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ

বা মনুসংহিতা নাই, ইহা আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড।" সমাজের বন্ধন ও অনুশাসন যেখানে মানুষকে বাধা দেয়, মানুষ সেখানে ভাবলোকে যাত্রা করে মনের স্বাধীনতাকে মুক্তি দিতে। বাংলার সমাজে যেহেতু এই সুযোগ নেই, বাঙালি তাই তার ভাবজগৎকে মুক্তি দিতে চলে যায় বৃন্দাবন, মথুরা ও যমুনা তীরে। বৃন্দাবনের যমুনা তীর, কৃষ্ণের বাঁশির ডাক, ময়ূরপুচ্ছ, সংসারের গৃহবধূর মনের উচাটন — সবই বাঙালির কাছে ভাবলোকের বিষয়, বাস্তবের নয়। কারণ, তার বাস্তবজীবন হর-গৌরীর সংসারেই বাঁধা। রাধাকৃষ্ণের গান তাই বাঙালির ভাবের কথা।

প্রসঙ্গত রাম-সীতার কথাও উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন — "বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।" রামায়ণ কথা যে বাংলা গ্রাম্য সাহিত্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারেনি, তার কারণ বাঙালির মজ্জাতেই লুকিয়ে আছে। রামায়ণের মধ্যে যে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য; যে পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতা আছে তা বাঙালির স্বভাব বিরোধী। বাঙালি সংসার জীবনে শিবের মতো অলস ও ভোজন বিলাসী, ভাবের জগতে কৃষ্ণের প্রেমিক, রাম চরিত্রের মতো কাঠিন্য তার নেই। তাই বোধ হয় বাংলা গ্রাম্য সাহিত্যে রামায়ণ তেমন উচ্চ আসন পায়নি। এভাবেই গ্রাম্য সাহিত্যের বিষয়গত প্রকৃতি নির্ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ শেষ করেছেন তাঁর গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধটি।।

১০২.১৭ সারাংশ

'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ১' প্রবন্ধটি মূলত রসজ্ঞের আলোচনা। ছেলে ভুলানো ছড়া বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন 'অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক'কে। এগুলি সচেতন মনের সৃষ্টি নয়, স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। বিষয়মুখ্য নয়, ধ্বনি ও চিত্রমুখ্য। ভাবগত অসংলগ্নতা ও অস্পষ্টতা ছড়ার প্রধান বিশেষত্ব। ছড়ার জগৎ স্বপ্নের জগৎ। সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা নির্দেশ সে জগতে অচল। ছড়ার রস অদ্ভুত রস। এগুলি শিশু সাহিত্যে, মানব মনে আপনি জন্মেছে।

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার রস-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্বের উল্লেখও করেছেন।

'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার কথান্তর বা রূপান্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলি দেশে কালে পরিবর্তিত হয়। স্বভাবে এগুলি কামচারী ও কামরূপধারী। অর্থাৎ কামনা মতো আচরণের ও কামনা মতো রূপধারণের ক্ষমতা এদের আছে। প্রয়োজনমতো এগুলি রূপ বদল করে, পরিবর্তিত হয়।

'কবি সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, এগুলি বিশেষ সময়ের সৃষ্টি। সাহিত্য আবেদন বিশেষ নেই। ক্ষণিক আনন্দদান ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস এগুলিতে দেখা যায়। রাজসভার আশ্রয় ত্যাগ করে সেই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্য জনসভা-আশ্রয়ী হলো। সেখানেই এগুলির গুরুত্ব।

'গ্রাম্য সাহিত্যে' প্রবন্ধে হরগৌরী বিষয়ক গানগুলির স্বরূপ-প্রকৃতি আলোচিত। হরগৌরী বিষয়ক গানগুলি সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি সৌন্দর্যের গান।

১০২.১৮ অনুশীলনী

১। **সঠিক উত্তরে টিক দিন ঃ—**

(ক) কোন ছড়াটি রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে মেঘদূতের মর্যাদা পেয়েছিল?

- ‘আজ দুর্গার অধিবাস’
- ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’
- ‘এতো বড়ো রঙ্গ জাদু’

(খ) ‘ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২’ প্রবন্ধটিতে সঙ্কলিত ছড়ার সংখ্যা

- একশো
- সত্তর
- একাশি

(ক) ‘ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২’ প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়
- বঙ্গদর্শনে
- সাধনায়

২। **সংক্ষেপে উত্তর দিন —**

(ক) ‘ছড়াগুলি মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে’ — উক্তিটির তাৎপর্য কি?

(খ) ‘ছড়ার জগৎ স্বপ্নের জগৎ’ — কেন বলা হয়েছে?

(গ) ‘আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কতদিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে।’ — কোন ছড়া প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে? কেন?

(ঘ) ‘আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি।’ — এরূপ উক্তির তাৎপর্য কি?

(ঙ) ‘কামচারিতা ও কামরূপধারিতা’ শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? ছড়াকে কেন কামচারী ও কামরূপধারী বলা হয়েছে?

৩। **নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন —**

(ক) রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে ছেলে ভুলানো ছড়ার রস — সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

(খ) ছড়ায় কথান্তর বা রূপান্তর কীভাবে ঘটে থাকে দৃষ্টান্ত সহ দেখান।

(গ) ছেলেভুলানো ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের যে সীমায়তি লক্ষ্য করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঘ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি — সংগীতের গুরুত্ব বিচার করুন।

(ঙ) হরগৌরী বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

১০২.১৯ উত্তর-সংকেত

১। (ক) 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'

(খ) একাশি

(গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়

২। (ক) ১০২.৫ অংশের আলোচনার সাহায্য নিন।

(খ) ১০২.৫ অংশের আলোচনা দেখুন।

(গ) ছড়াটি হলো 'দোল দোল দুলুনি'। আলোচনার জন্য ১০২.৫ অংশ দেখুন।

(ঘ) ১০২.৫ অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(ঙ) ১০২.৬ অংশের আলোচনার সাহায্য নিন।

৩। (ক) 'প্রবন্ধ-বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক সূত্র ঃ ছেলে ভুলানো ছড়া-১' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

(খ) 'ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ ২' শীর্ষক আলোচনার সাহায্য নিন।

(গ) 'ছেলে ভুলানো ছড়ার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সীমায়তি' অংশটি দেখুন।

(ঘ) 'কবি-সংগীতের গুরুত্ব' অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(ঙ) 'গ্রাম্য সাহিত্যে প্রবন্ধের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ' আলোচনা-অংশটির সাহায্য নিন।

১০২.২০ গ্রন্থপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোক সাহিত্য (১৯০৭)

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড ঃ ১৯৬২)

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক সাহিত্য (২য় খণ্ড ঃ ১৯৬৩)

৪। আশুতোষ ভট্টচার্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ও লোক সাহিত্য (১৯৭৩)

৫। আশরফ সিদ্দিকী ঃ লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড ঃ ১৯৯৪)

একক ১০৩ ❒ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি

গঠন ঃ

১০৩.১ উদ্দেশ্য

১০৩.২ প্রস্তাবনা

১০৩.৩ প্রাচীন কালের ভারতীয় সাহিত্য (এক)

১০৩.৪ প্রাচীন কালের ভারতীয় সাহিত্য (দুই)

১০৩.৫ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য

১০৩.৬ আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্য

১০৩.৭ সমস্ত আলোচনার সারাংশ

১০৩.৮ অনুশীলনী

১০৩.৯ উত্তর সংকেত

১০৩.১ উদ্দেশ্য

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিঃসন্দেহেই জাতীয় সংহতির বোধকে জাগিয়ে তোলে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অপরিচয় এবং অজ্ঞতা এর ফলে নির্মূলিত হয়। বহু ভাবেই যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং জাত-পাত-ধর্ম-ভাষা ইত্যাদি কেন্দ্রিক যেসব অস্থিরতা দেখা দেয় আমাদের দেশে, এই অধ্যয়ন অন্বেষণ তার অনেকটাই প্রশমন করতে পারে।

১০৩.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় সাহিত্য বলতে ঠিক কী যে বোঝায়, তার সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ রূপায়ণ করেছেন (তামিল মহাকবি) সুব্রহ্মণ্য ভারতী তাঁর একটি কবিতার মধ্যে; তিনি লিখছেন "সে (অর্থাৎ, ভারতবর্ষ) কথা বলে আঠারোটি ভাষায়, কিন্তু তার ভাবনাচিন্তার মাধ্যম একটাই মাত্র।" ("সেপ্‌পু কোটি পাধিনেট্টু উডয়াল / এনিল চিন্তনই অনুরডয়াল।") ১৯০৯ সালে এমন কথা বলার পর প্রায় এক শতাব্দী কেটে গেলেও, 'ভারতীয় সাহিত্য'-এর ভাবরূপ নিয়ে তো বটেই, এমনকী তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় পোষণ করেন, এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়। এঁদের মূল বক্তব্য হল ঃ 'ভারতীয়' সাহিত্য বলে কিছু হয় না; 'ভারতের' সাহিত্য বলা যেতে পারে। এঁদের বক্তব্য অবলম্বন করেই আলোচনাটার সূত্রপাত করি বরং এঁদের একটা কথা না মেনে উপায় নেই যে, যে-অর্থে জার্মান সাহিত্য কিংবা রুশি, কি জাপানি সাহিত্য বলতে পারা যায়, ঠিক সেই অর্থে 'ভারতীয় সাহিত্য'

কথাটি ব্যবহার করা যায় না। এই একশো কোটিরও বেশি মানুষের দেশ — সমগ্র উপমহাদেশকে ধরলে তা আরও প্রায় চল্লিশ কোটি বাড়ে সংখ্যাটা — এখানে এতগুলো ভাষা, এতগুলো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, এত রকমের ধর্মমত, এত বিচিত্র রকমের সামাজিক বিধিবিধান — খাদ্য, পোশাক ইত্যাদির পার্থক্যের কথা আর না-হয় বললামই না — তাহলে এই বৈচিত্র্যের বা বৈপরীত্যের মধ্যে যে-সব পৃথক-পৃথক ভাষা নির্ভর সাহিত্য গড়ে উঠছে, তাদের সবাইকে একটি শিরোনামের বেষ্টনীর মধ্যে ধরে রাখতে চাওয়াটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত?

সরাসরিভাবে এর উত্তর দেওয়া যায় না অবশ্যই। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে এ-অবধি ভারতবর্ষ বলতে একালে যা বোঝায়, তার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি, তাহলেই কিন্তু ঐ কূট প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব হবে। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে ভাষাগত বিভিন্নতার প্রশ্নটার নিরসন করা দরকার।

সুব্রাহ্মণ্য ভারতী আঠারোটি ভাষার কথা বললেও বস্তুতপক্ষে সংখ্যাটা অনেক বেশি। পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ কথা বলেন, এমন ভাষার সংখ্যা এই উপমহাদেশে আড়াইশোরও বেশি।

ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীভুক্ত	—	১২৪
দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত	—	৩০
ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীভুক্ত	—	৭৩
অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত	—	২৩
অনির্ণীত বর্গীয়	—	৯
	মোট	২৫৯

বিভিন্ন ভাষার অন্তর্গত উপভাষা / বিভাষাগুলিও এই তালিকার অন্তর্গত; তার ফলে কিন্তু বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের ব্যাপারটা আরও বিস্তার লাভ করে। এই এতগুলি ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিগুলিও নিজেদের ভাষায় কথা বলেন এবং সেই সংখ্যাটাও চারশোর কম নয়, বরঞ্চ বেশিই হবে। এই সাড়ে ছশো ভাষার বৃহদংশেরই লিপি নেই বলে লিখিত সাহিত্য নেই; কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই অন্তত মৌখিক সাহিত্য রয়েছে। আর সেই সবেরই সমাহারে গড়ে উঠেছে ‘ভারতীয়’ সাহিত্য, বা ‘ভারতের’ সাহিত্য যা-ই বলি না-কেন!

এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ‘ভারতীয়-ত্ব’ — এই ধারণাটা একান্তই বয়োনবীন। মোটামুটি ভাবে ব্রিটিশ আমলের আগে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম’ বলে কোনও চিন্তা ছিল যে, তার প্রমাণ এখনও অপ্রাপ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে অঙ্গ-বঙ্গ-ঔড্র-মগধ-কাঞ্চী-কোশল-অবন্তী-মালব-কলিঙ্গ-গান্ধার-কামরূপ-গুর্জর-চোল-প্রতিহার-চেদী-সিন্ধু-সৌবীর-পাঞ্চাল-চের-কর্ণাট ইতাদি, ইতাদি অজস্র ছোট-বড় স্বরাট্ অঞ্চলগুলি মিলে যে-রাষ্ট্রিক ধারণাটার সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যে ‘ভারতত্ব’ ছিল না। অশোক-চন্দ্রগুপ্ত (২) — হর্ষবর্ধন প্রমুখ প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটরা যখন বিরাট-বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন, তখন একটা বিশাল ভুখণ্ড একটা শাসনব্যবস্থার আওতায় এসেছে; কিন্তু কালক্রমে সেগুলো আবার ভেঙে-ভেঙে টুকরো হয়ে ‘স্বাধীন’ বলে নিজেদের মনে করেছে। মুঘল আমলে ব্যাপারটা একটু পরিবর্তিত হলেও, শিখ-রাজপুত-মারাঠা রাজ্যগুলি, মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোনও আত্মিক যোগাযোগে প্রত্যয়ী ছিল না। কিন্তু তারপরে, ব্রিটিশ আমলে ধীরে-ধীরে একটাই শাসনবিধি, একটাই মুদ্রাব্যবস্থা, একটাই সরকারি-প্রয়োজন মেটানোর ভাষা, একটাই কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত সামরিক বাহিনী, একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো-অনুসারী এবং সুনির্ধারিত ভাষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক-কিছু মিলে একটা আর্থ-রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বাস্তবায়িত করল। এরই সঙ্গে-সঙ্গে, দুশো বছরের বিদেশি শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে সমস্ত অঞ্চলের মানুষই এই প্রথম পরস্পরের সঙ্গে একটা সহমর্মিতা অনুভব করতে শুরু করল। এছাড়াও, ব্রিটিশ শাসকরা—সন্দেহ নেই, নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই — রেল-ডাক-তার ইত্যাদির মাধ্যমে

শাসনধীন সমস্তটুকু অঞ্চলের মানুষদেরই ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। আর ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ''নানাভাষা-নানামত-নানাপরিধান''-এর মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পারল, কর্মসূত্রে এবং অন্যান্য অনেক ভাবেই। তার এইভাবেই 'ওয়ান নেশান' ধারণাটার দৃঢ়ভিত্তিক পত্তনি ঘটল।

ভাব-ভাষা-জাতি-ধর্মের ফারাক অবশ্য এর পরেও থেকে গেছে। অবশ্য সেটা আগে যা ছিল — এ আসলে তার কিছুটা, বেশ কিছুটাই বদল ঘটল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানসিক বিচ্ছিন্নতা যতখানি ছিল, ব্রিটিশ আমলে সেটা কমে যেতে বাধ্য হয়েছে পারিপার্শ্বিক কারণেই। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যও 'ভারতীয়তার' বোধটা গাঢ়বদ্ধ হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই গাঢ়বদ্ধ বোধটুকুই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। 'ভারতীয় সাহিত্য' পাঠের মাধ্যমে সেই প্রগাঢ় জাতীয়তার ভাবরূপটি আয়ত্ত করা অনায়াসসাধ্য হয়। জাতীয় সংহতির চেতনা গড়ে তুলতে তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০৩.৩ প্রাচীনকালের ভারতীয় সাহিত্য (এক)

অতঃপর একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে, ভৌগোলিকভাবে যাকে ভারতীয় উপমহাদেশ বলা হয়, বহু ধরনের পার্থক্যের কারণে তার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্যসূত্র বলে কিছুই ছিল না। এমনই কি মনে করতে হবে? ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিক থেকে কিন্তু তেমন কথাটাও ঠিক নয়। বহুবিচিত্র পার্থক্যও যেমন ছিল, তেমনই আবার সাংস্কৃতিক ভাববন্ধনও ছিল এবং সেই বাঁধনটা যথেষ্টই দৃঢ়।

প্রথমত, প্রাচীন ভারতের প্রায় সর্বত্রই রামায়ণ এবং মহাভারতের গল্পগুলি আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে দৃঢ়প্রোথিতভাবে স্থান করে নিয়েছিল। এটা ঠিকই যে, রামায়ণ এবং মহাভারত শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ার আরও অনেক দেশেই ব্যাপকভাবে পুনর্লিখিত এবং চর্চিত হয়েছে, এখনও হয়ে থাকে। ফলত, এদেরকে 'প্যান-এশিয়ান এপিক' আখ্যাও হয়ত বা দেওয়া চলে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেই 'প্যান-এশিয়ানত্ব'-এর অতিরেকে আরও কিছু বক্তব্য থেকে গেছে।

রামায়ণ এবং মহাভারতকে যদিও ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচার করা হয়ে আসছে বহু শতাব্দী যাবৎ (এখনও তা করা হয়ে চলেছে রাজনৈতিক স্বার্থে), তবু মুক্তবুদ্ধি-মানুষ মাত্রেই এদেরকে নিছক, নেহাত ধর্মীয়তার বেড়াবন্দী করে রাখার ব্যাপারে সম্মত হবেন না। বস্তুতপক্ষে, এই কাহিনীমালাদুটির এত ধরনের অঞ্চলগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত — এমনকি ধর্মগত রূপান্তর আছে, যাতে কোনও একজন ব্যাস বা কোনও একজন বাল্মীকির 'রচিত' গ্রন্থ হিসেবে এদেরকে গণ্য করলে সামগ্রিকভাবে রামায়ণ-সাহিত্য এবং মহাভারত-সাহিত্যকে অনুধাবন করা কঠিন হবে। প্রায় প্রতিটি প্রধান ভারতীয় ভাষাতেই এই কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে এক / একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে যার ফলে অনেক কিছু বিভিন্নতা থাকলেও, সব মিলিয়ে এরা একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সূচিত করেছে। এমন কি বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতির মৌখিক সাহিত্যেও এই সমস্ত কাহিনীগুলির অজস্র রূপান্তর মেলে। সুতারাং রাম-রাবণ কথা এবং কুরু-পাণ্ডবকথার যৌথ সমন্বয়ে দু-হাজার বছরের কাছাকাছি সময় ধরে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের বহুভাষী মানুষেরা একটা সাধারণী-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে আসছেন। 'ভারতীয় সাহিত্য' বলতে যা বোঝায়, তার ভিত এখান থেকেই তৈরি হতে শুরু করেছে।

কথাটা একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। একটা জাতির সাহিত্য গড়ে ওঠে অনেক কিছু উপকরণের বিমিশ্রিত নির্যাসে সঞ্জীবিত হয়। তার সামাজিক বিধি-বিধান, নৈতিক আচার-সংস্কার, ব্যবহারিক রীতি-প্রকরণ , ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার, জীবনচর্যার আদর্শ ইত্যাদি বহু কিছুর প্রতিভাস তার ওপর পড়ে। ধর্মীয় অবলেপনটুকু

সম্পূর্ণরূপে নিমূলিত করে ফেলে 'সেকুলার' বিশ্লেষকের মন নিয়ে যদি কেউ অণ্বেষণ করেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতিবলয়ে তাদের নিজস্ব পরম্পরায় গড়ে-ওঠা উপরোক্ত পাঁচটি উপকরণের মধ্যে রামকথা-মহাভারতকথার অসংখ্য রেণুকণা অনিবার্যভাবে মিশে রয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, জীবনাদর্শে — সর্বত্রই সেটা ঘটেছে। কাজে-কাজেই সীতার সাধ্বিতা, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের আনুগত্য, কৈকেয়ীর কুটিলতা, হনুমানের প্রভুসেবা, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা, রাবণের উচ্চাভিলাষ ও কামবশ্যতা, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, একলব্যের গুরুদক্ষিণা, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রস্নেহ, ভীমের শক্তিমত্তা, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম, স্বর্ণলঙ্কাদাহন, স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণ, রাবণের অনির্বাণ চিতাগ্নি, কাঠবিড়ালের সাহায্য, বিশল্যকরণীর দ্বারা প্রাণসঞ্জীবন — এবং এই রকমের শত-শত ভাবনা প্রতিটি অঞ্চলের, প্রতিটি ভাষার মানুষদের মনে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। সুতরাং নানান ফারাক থাকা সত্ত্বেও চোখের আড়ালেই একটা 'কমন হেরিটেজ'-এরও সৃষ্টি হয়েছে। আর তারই অনুষঙ্গে সমাজমানসের মধ্যেও ভাবনার সমমাত্রিক অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায়।

ঠিক এই কারণেই উত্তর ভারতের রামকথা এবং দক্ষিণী রামকথার মধ্যে প্রবণতার পার্থক্য থাকলেও মূল ভাবনাকাঠামো অভিন্ন। রামকে বিষ্ণুর অবতার না বানিয়েও বৌদ্ধরা, জৈনরা, মুসলিমরা নিজেদের মতো করে রামায়ণ রচনা করেছেন। মিল-গরমিল সব মিলিয়েই কিন্তু বিভিন্ন বলয়ে যেসব সোস্যাল সাইকিগুলি (সামাজিক-মানসিকতা) সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে তাদের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রও থেকে গেছে।

রামকথা-মহাভারতকথা নিয়ে বিস্তৃতভাবে যে-কথাগুলি এতক্ষণ বলা হোল, অল্পবিস্তর সেই একই পরিপ্রেক্ষিতে আরও কতকগুলি প্রসঙ্গ বিচার্য। সাধারণ্যে এবং বিদ্বৎবর্গে, রামায়ণ-মহাভারতের অভিঘাত বহুধাব্যাপ্ত হলেও, ধ্রুবপদী চিন্তাজাত গভীরতর সৃষ্টিগুলি (যেমন চারটি বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি, বিভিন্ন পুরাণ এবং উপনিষদ গ্রন্থ) কেবলমাত্র বুদ্ধি-ও-ঋদ্ধিজীবী স্তরেই অনুশীলিত হয়েছে। উপনিষদগুলির ভাবনালীন প্রজ্ঞা সমস্ত অঞ্চলের, সমস্ত ভাষার, সমস্ত সমাজের পণ্ডিতদেরই প্রভাবিত করেছে। এর ফলে ভাববাদী এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বস্তুবাদী যে-দর্শনধারাগুলি গড়ে উঠেছে, তারাও বিদ্বৎমণ্ডলে কমন হেরিটেজ (সাধারণী উত্তরাধিকার) সৃষ্টি করেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। সেই জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত জল চুঁইয়ে নেমেছে লোকজীবনে — সংস্কৃতির তৃণশষ্পের শিকড়ে মৃদু অভিসিঞ্চন হয়েছে তাতেও। আর এটা ঘটেছে সমস্ত ভারতবর্ষেই।

এখানেও একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রয়েছে। গীতা-ধর্মসূত্র-উপনিষদ-বেদান্ত-ন্যায়-বৈশেষিক-চার্বাক-লোকায়ত ইত্যাদির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বসাধারণ বলতে যাঁদেরকে বোঝায়, তাঁদের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না অবশ্যই। কিন্তু এই সবের দ্বারা প্রলেপিত হয়ে যে-সমস্ত ধর্মীয় বিধি, সামাজিক বিধান 'অমোঘ শাস্ত্রীয়তার' দোহাই পেড়ে রচিত হয়েছে, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন — বরং বলি প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছেন — সাধারণ মানুষও। সুতরাং গীতা পড়ুক আর না-ই পড়ুক, বেদান্তের মায়াবাদ কী তা জানুক বা না জানুক, মনুস্মৃতি আর গৌতমগৃহ্যসূত্রে কিংবা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্র-বৈশ্যের কী-কী করণীয় আর কী-কী প্রাপনীয়—তা পড়ে থাকুক আর না-ই থাকুক — সমাজপতিদের লৌহকঠিন অনুশাসনে সাধারণ মানুষেরা বিশদ না জেনে-বুঝেই, না পড়ে-শুনেই সে-সব মুখবুজে মানতে বাধ্য হতো। যেখানে বিপরীত কথা এসেছে — যেমন ধরুন, চার্বাকী বা লোকায়তিকদের ক্ষেত্রে — সেখানেও সাধারণ মানুষ যদিও অতশত পড়েনি, শেখেনি — কিন্তু তাঁদের ভাবধারায় অল্পবিস্তর প্রভাবিত হতো — যা তাদের দৈনন্দিনতার চর্যা-চর্চায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আজও টিঁকে রয়েছে।

সুতরাং, চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক, গীতা-স্মৃতি-শ্রুতি-সূত্র প্রভৃতির মারফতে চাপানো বর্ণভেদ-কর্মফল-শাস্ত্রবিধি-পাপপুণ্য-কৃত্যাকৃত্য ইতাদি বহুবিধ প্রকরণের বিষয়, ভারতবর্ষ জুড়ে সর্বত্রই ওপরতলার মানুষদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার রূপে সর্বসাধারণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত করে এসেছে

(এবং আসছে) যেগুলি, সেসবের অভিঘাতও সমস্ত বলয়েই ব্যাপকভাবে পড়েছে। ‘সোস্যাল সাইকি’ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কার্যকারণ পরম্পরিতভাবে সাহিত্যেরও ওপর তার প্রতিভাস পড়েছে অনিবার্য হয়ে।

একটু উদাহরণ দেখানো বোধহয় ভাল। আধুনিক কাল অবধি ঐ প্রাচীন অভিঘাত কী গভীর হয়ে রয়েছে, তার খোঁজ নেবার জন্য দুটি অতিপরিচিত গল্পের কথা একটু বলি শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ এবং মুন্সি প্রেমচন্দ্রের ‘সদ্‌গতি’। দুটি কাহিনীর স্থান-কাল-পাত্র আলাদা। কিন্তু, দুটির মূল চরিত্র যারা — অভাগী দুলেনি এবং দুখিয়া চামার — তাঁদের বিশ্বাস, ভাবনা, সব কিছুর মধ্যেই একটা সুপ্রকট সাদৃশ্য রয়েছে। (তথাকথিত) উচ্চবর্ণীয়রা যে তাঁদের অপমান, লাঞ্ছনা, পীড়ন, বঞ্চনা, শোষণা করে, করতে পারে, তার কারণ, সেইটাই তাঁদের জন্মসূত্রের লব্ধফলরূপে প্রাপ্য — এটা তাঁদের দুপক্ষেরই ধারণা!

এই ধারণাটাকেই সমস্ত ভারতের আমজনতাকে গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বহু শতাব্দী ধরে। ফলত, ভাষা-সমাজ-দেশাচার ইত্যাদির যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, ব্যাপারটা সর্বত্রই সমরূপ থেকেছে। ঐ অভাগী দুলেনি এবং দুখিয়া চামার তো সেই আমজনতারই প্রতীকী প্রতিনিধি হয়ে দুটি পৃথক ভাষা-ও-সংস্কৃতিবলয়ের দুই মহান সাহিত্যস্রষ্টার কলমে মূর্তিমন্ত হয়েছে। এ রকমের বিভ্রান্ত হয়ে থাকা অগণ্য মানুষদের শষ্পমূলে রেখে যে সাহিত্যগুলি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়ে আসছে, তাদের অন্তর্লীন সাধর্ম্য কি সত্যিই অস্বীকার করা যায়?

১০৩.৪ প্রাচীন কালের ভারতীয় সাহিত্য (দুই)

পালিভাষা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্য মন্ত্রগুলির কথাও মনে করতে হবে, তাদের সমসাময়িক ধ্রুবপদী সংস্কৃত গ্রন্থগুলির পাশাপাশি। ধ্রুবপদী সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থগুলির সর্বভারতীয়তা একটা ছিল ঠিকই, তবে সীমাবদ্ধভাবে। একেই খুব স্বল্পসংখ্যক মানুষই তাতে পারঙ্গম ছিলেন, তার ওপরে মুদ্রণব্যবস্থা তো তখন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পালিজাতক কথাগুলি বা প্রাকৃত ভাষার প্রচুর সংখ্যক কাহিনী তখন মুখে-মুখে ফিরত। পালি ভাষাটাই তো গড়ে তোলা হয়েছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে (অবশ্যই তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ‘সর্বভারত’ বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে) একটা সাহিত্যিকআদান-প্রদানের ভাষারূপে। বহু অঞ্চলের প্রচলিত লোককথাগুলি এর মধ্যে সমাহৃত হয়েছিল, যেমন হয়েছিল পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা গুণাঢ্যের সংকলিত ‘বৃহৎকথা’-র মধ্যে। প্রাকৃত / অপভ্রংশ ভাষাগুলি যে-বর্গীয়ই হোক না কেন, উত্তরাপথের প্রায় সর্বত্রই তাদের এক ধরনের (সর্বজন যদি না-ও হয়) বহুজনবোধ্য গ্রহণীয়তা ছিল। ‘বৃহৎকথা’ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তার সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত রূপান্তরণ সোমদেব-কৃত ‘কথাসরিৎসাগর’ এবং ক্ষেমেন্দ্রের ‘বৃহৎকথামঞ্জরী’-র মাধ্যমে গল্পগুলি সর্বভারতীয় (পূর্বোক্ত তাৎপর্যেই) প্রেক্ষিতে ঐ জাতককথাগুলির মতোই প্রচলিত ছিল।

ভরতের ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ চরিত্রসংলাপ রচনা করার জন্য যে-সব বিধান দেওয়া আছে সেগুলি অনুধাবন করলে, প্রাকৃতভাবগুলির সর্বত্রগ্রাহ্যতার কথাটা বেশ বোঝা যায়। রাজা-বিপ্র-সেনানী-শ্রেষ্ঠীরা সংলাপ বলবেন সংস্কৃতে; উচ্চবর্ণীয়া নারীর মুখের ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও সঙ্গীত এবং প্রেমের কথার সময়ে তাঁরা ব্যবহার করবেন শৌরসেনী প্রাকৃত; আপনার-আমার মতন সাধারণ আমজনতার ব্যবহার্য — মাগধী প্রাকৃত; আর তস্কর, দস্যু, গ্রন্থিচ্ছেদক, নট, চেট এদের উপজীব্য পৈশাচী প্রাকৃত। তাহলে সবগুলি প্রধান আঞ্চলিক ভাষাই তো সর্বত্র প্রযুক্ত হতো।

এতক্ষণের এই প্রদীর্ঘ প্রস্তাবনার সূত্রে সম্ভবত এটুকু প্রতিষ্ঠিত করা গেছে যে যতই ভাষা-সংস্কৃতি-সমাজের হেরাফেরি থাকুক না কেন, সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ-দেশে সামগ্রিকভাবে একটা নির্দিষ্ট সাহিত্যমাধ্যম তৈরি হবার পরিপ্রেক্ষিত ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ‘ভারতের’ সাহিত্যগুলি তখন থেকেই ‘ভারতীয়’ সাহিত্য নির্মাণের মালমশলা সরবরাহ করতে শুরু করেছিল।

এই পটভূমি থেকেই মধ্যযুগের সীমান্তের দিকে পা বাড়াতে হয়। সমস্ত উপমহাদেশ জুড়েই বিভিন্নতার মধ্যেই নিহিত হয়ে থাকা সমতুল্যতার যে প্রচুরায়ত নিদর্শন প্রাচীনকাল থেকেই মিলছে, তারই নূতনতর রূপায়ণ ঘটেছিল মধ্যযুগে। অতঃপর সেই আলোচনা।

১০৩.৫ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য

মধযুগে ইসলামের আবির্ভাব হল যখন তখন ভারতে আরেকটি ধর্মেরও ব্যাপ্তি ঘটল। তার আগেই অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রায় নিরস্তিত্ব হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী ধর্মমত হিসেবে বৌদ্ধধর্ম যে-ভূমিকাটা পালন করেছিল, ইসলাম ধীরে-ধীরে ঐ শূন্যতাটা পূরণ করতে আরম্ভ করে। সেটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রতিভাসিত হল স্বাভাবিকভাবেই। আগের আমলে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা থেকে উৎসারিত-হওয়া পালিভাষার মাধ্যমে যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলত, ঠিক তেমনই গড়ে-তোলা হল মুঘল সৈন্যশিবিরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা নানাভাষী মানুষদের পারস্পরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি নতুন ভাষা উর্দু। উর্দিধারীরা ব্যবহার করতেন বলেই সম্ভবত এই নামকরণ। হিন্দি-ফারসি-যৎসামান্য আরবি এবং কিছু-কিছু বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শব্দ ও প্রয়োগবিধির সমাহার ঘটল এর মধ্যে। তারপরে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ এলাকায় এর ব্যাপ্তি ঘটে। উত্তর-দক্ষিণে যোগাযোগ ঘটার মতো একটা ভাষা এতদিনে সৃষ্ট হল। এর আগে দক্ষিণী দ্রাবিড়বর্গীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে সামান্য কিছু সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটা একমাত্র সংস্কৃতের মাধ্যমেই উত্তরাপথের মানুষদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তাও সেটা মূলত বেদ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির বাবদেই শুধু। উর্দুর জন্মের পর ব্যাপারটা হল অন্যরকম। ফার্সি মোটামুটিভাবে মুঘল শাসনাধীন অঞ্চলের সরকারি পর্যায়ে ব্যবহার্য ভাষা বলে গণ্য হল, ফার্সিও শিক্ষিত সমাজের কাছে সমাদৃত হতে লাগল ধীরে-ধীরে। (এখানে স্মরণ করতে পারেন সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্র। ‘‘আর্শি, আর্শি, আর্শি/আমার সোয়ামি পড়ুক ফার্সি।’’) ফার্সি এবং উর্দুতে লেখালিখি ব্যবহারিক প্রয়োজনের গণ্ডী পেরিয়ে ধীরে-ধীরে সাহিত্যের সৃজনকার্যেও এগোতে শুরু করল। ফলে বহু এলাকার মানুষেরই একটি ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশের সুযোগ ঘটল।

কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মধ্যযুগে ঘটেছিল। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম—সর্বত্রই মোটামুটি এক/দেড় শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিবাদী মানবতামুখিন কতকগুলি ধর্মধারা বিকশিত হয়ে উঠল। নানক-চৈতন্য-কবির- নামদেব-তুকারাম-প্রমুখ সন্তসাধকদের কেন্দ্র করে ঐ যে-সমস্ত মানবতাবাদী ধর্মধারাগুলি প্রায় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের একটা সামগ্রিক অভিজ্ঞানও জনজীবনে গভীরভাবে পড়ে।

এই অনুষঙ্গে ভক্তিসাহিত্যের ব্যাপক একটি উৎসারণ ঘটে যায় সর্বত্রই আপীয়ার, নম্মলবর, বাসবেশ্বর, এজুথাচান, নিন্ন্যায়ইয়া, প্রমুখ-দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাতে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণবপদসাহিত্যে, কৃত্তিবাস, সরলা দাস, শঙ্করদেব, মাধবদেব—পূর্বভরতে, নানক, কবির, লালদেদ, সুরদাস, তুলসিদাস-প্রমুখ উত্তর ভারতে এবং নামদেব, তুকারাম, মীরাবাঈ, জ্ঞানেশ্বর, নরসিম্হাইয়া পশ্চিম ভারতে যে-ভক্তিবাদী সাহিত্যকে বিপুলভাবে ব্যাপ্ত করেছিলেন তার সার্বিক গুরুত্বটা ছিল খুবই বেশি। সুফি সাধকরা তার অনেক আগে থেকেই এদেশে মানবতা ও ভক্তিমিশ্রিত ধর্মসাধনার প্রবর্তন করেছেন। সেই জমির উপরে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্ম-ভাষা-সামজিক প্রেক্ষিত নির্বিশেষে জনজীবনকে এই সাহিত্য আপ্লুত করল।

এই সময়েও রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে রচিত হয়েছে এবং পূর্বতন পর্বের ধারাটাকে অব্যাহত রেখেছে। ঐ ভক্তিবাদী সাহিত্য এবং এই মহাকাব্যিক সাহিত্য একত্রে সমাবিষ্ট হয়ে 'ভারতীয়' সাহিত্যের সুস্পষ্ট মূর্তিবিধান করতে শুরু করল মধ্যযুগে।

১০৩.৬ আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্য

এই যে পরম্পরিত একটি ঐতিহ্য ধীরে-ধীরে রূপান্বিত হতে থাকল, তার পরিপূর্ণ উদ্‌ভাস ঘটল ব্রিটিশ আমলে। সেই সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যবিধ যোগাযোগের মাধ্যমে যে-দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্রীয় চরিত্র তৈরি হল, তার ফলশ্রুতিস্বরূপ শিক্ষা সংস্কৃতির জগতেও বিরাট একটা অভিঘাত পড়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সমস্ত ভারতের সরকারি-বেসরকারি নানা স্তরে একটা এলিট (বাছাই করা) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। মূলত এঁরাই বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ-রম্যরচনা ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন। এখনও অবধি এই বিশেষ সাংস্কৃতিক শ্রেণীটিই সাহিত্য সৃজনের দায়ভার বহন করে চলেছেন। উনবিংশ শতক থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লেখকরা ইংরেজিতেও যথেষ্ট পরিমাণে লিখে চলেছেন। এই সমস্তটাকে মিলিয়েই আধুনিককালের 'ভারতীয় সাহিত্য' গড়ে উঠেছে।

এই 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' এমন একটা পর্বে রচিত হতে শুরু করেছে যখন প্রাচীন ও মধ্যযুগের তুলনায় অনেক, অনেক বেশি পরিমাণে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জানাশোনাটা হতে পারছে। একথা অনস্বীকার্য যে, এখনও ভারতবর্ষের—প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশেরই—শিক্ষিত মানুষদের বৃহত্তম অংশের মানুষ ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্যের যতটা খোঁজ খবর রাখেন (বা, রাখতে পারেন), তার একটা ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের জ্ঞানও ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে নেই। (এখানে একটা খুব বড় বেদনারও উপলক্ষ আছে! এই না জানার জন্য দুঃখ-লজ্জা-অস্বস্তি নেই এদের অধিকাংশেরই। বরং এই বিশেষ জ্ঞানশৃঙ্খলার বিকাশের পথেও বিদ্রুপমিশ্রিত বিঘ্নবিধান করতেও যে এই শিক্ষিত মানুষগুলির অরুচি নেই, তারও অজস্র প্রমাণ সাবুদ হাজির করা যায় বিনা আয়াসেই।)

কিন্তু যোগাযোগ-ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সংবাদপত্র-রেডিও-সিনেমা-টি.ভি. ইত্যাদির মাধ্যমে এক অঞ্চলের—একটি বিশেষ ভাষা-ভাষী মানুষ অন্যান্য অঞ্চল-সংস্কৃতিবলয়-ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন। কাজে-কাজেই, 'ভারতীয় সাহিত্য' (অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য) সম্পর্কে তাঁদের অনুধাবন করাটা অনেক সহজসাধ্য আগের তুলনায়। এখন তো ভারতের যে-কোনও রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয়, আর অর্থনৈতিক কাঠামোটা সারা দেশেই সমরূপ—ফলে একভাষায় সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদন অন্যভাষায় পাঠকের কাছে অনেক বেশি স্পন্দনময় হয়ে পৌঁছতে সক্ষম।

অখণ্ড জাতীয়তার বোধ, জাতীয় সংহতির অনুভব এবং পারস্পরিক ভাবগত নিবিড়তা সৃষ্টি করার জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন, সেটার প্রচুরায়ত উপাদান দিতে পারে ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যগুলিই। অনুবাদের এক্ষেত্রে খুব বড় একটা ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় বিশ্বস্তভাবে যদি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতিগুলি নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে পারস্পরিক আদান-প্রদান নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গভীর হয়। তার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য—হয়ত বা রাজনৈতিকও, বড় কম নয়।

সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ-পীড়ন এবং সর্বোপরি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন—এ সবের অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটি বড় হাতিয়ার বলে এই ব্যাপারটাকে গণ্য করা উচিত। এছাড়া আরও কিছু কথা বলার আছে : বাংলা, পাঞ্জাবি, উর্দু, সিন্ধি, তামিল এবং নেপালি—এই ভাষাগুলি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই সীমানায় আবদ্ধ হয়। বিশেষত, বাংলা এবং উর্দু তো যথাক্রমে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাও। ফলে, সামগ্রিকভাবে এই উপমহাদেশ উপকৃতই হবে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক লেনা-দেনাটা যদি ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়। শুধুমাত্র সাহিত্য দিয়ে রাজনৈতিক 'টেন্‌শন' কমানো যায় না ঠিকই, কিন্তু অন্তত সাংস্কৃতিবান্ মানুষদের শুভবুদ্ধিটুকু এর বাবদে সঞ্জীবিতই হবে।

যে-কথা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক সময়ে বলেছিলেন : ''ইন্ডিয়ান লিটেরেচার ইজ ওয়ান, বাট রিট্‌ন ইন মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস' সেটার যাথার্থ্য (সুব্রহ্মণ্য ভারতীয় কবিতা উদ্ধৃতিটি আবারও স্মরণ করুন) বিচার করাটা এখন একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

১০৩.৭ ভারতীয় সাহিত্য : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[প্রবন্ধটি বিনয়কৃষ্ণ গোকক সম্পাদিত *Literature in Modern Indian Languages* গ্রন্থের (১৯৫৪) ভূমিকা অংশের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রাথমিক পর্বের আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বোঝাপড়া উপলব্ধিতে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটির নাম দিয়েছিলেন Indian Literature—অনুবাদক]

ভারতীয় সাহিত্যের রূপ ও তার সার্বিক বিস্তার, বিষয়-বৈচিত্র্য, পরিশীলনতা, শিল্পিত রচনাশৈলী, মানবতার সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের প্রকাশ ও তদুপরি আত্ম-জিগীষার অসীম আগ্রহের ওপর নির্ভর করেই গঠিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের সূচনা বেদের রচনাকাল থেকে। প্রাপ্ত দলিল থেকে একথা জানা সম্ভব যে, বেদের সূচনাকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে যা ছিল হোমারের[১] (যাঁর রচনা ইউরোপীয় সাহিত্যের সূচনা বলে ধরা হয় রচনাকালের থেকেও পূর্বের। সেক্ষেত্রে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সন থেকে আজ ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত—প্রায় ৩০ শতকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে; যা-কিনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শুধুমাত্র চৈনিক, ইহুদী ও গ্রীক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। বৈদিক, ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি ও কিছু পরিমাণে প্রাকৃত আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন স্তরের পরিচায়ক; এছাড়াও আছে দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রাচীনতম (যা ভারতীয় আর্যভাষার বর্গভুক্ত ছিল না) পর্যায়ের পরিচয়জ্ঞাপক প্রাচীন তামিল ভাষা। আমাদের ধারণা করা এইসব ভাষাগুলি যা সূচনাপর্বের ভারতীয় সাহিত্যের ধারক, তা সৃজন করেছিল অসংখ্য মহান সাহিত্যকর্ম যা মানবতার 'চিরকালীন সম্পদ'। উদাহরণস্বরূপ আমরা বেশ কিছু সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করতে পারি : যেমন, বেদ (ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ), উপনিষদ, মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি। এছাড়াও চাণক্য বিরচিত '*অর্থশাস্ত্র*'[২] ও বাৎস্যায়ন বিরচিত '*কামসূত্র*'[৩] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের রচিত সংস্কৃত নাটক '*শকুন্তলা*' ও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ ব্যাতীত বেশ কিছু নান্দনিক ও কেজো সংস্কৃত রচনার কাল এই সময়। এই সময়ে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় তৎকালিন ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের ধ্যানধারণা বিষয়ক বেশ কিছু রচনা আজও প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় সাহিত্যের আদি পর্বের অন্তর্গত এই সমস্ত সাহিত্যকর্ম গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার দাবী রাখে এবং তা ইউরোপীয় ও আমেরিকান গবেষকদের কাছেও সমানভাবে আকর্ষণীয়।

অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও তার জাতীয় সম্প্রসারণের সূচিতে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করলে এই প্রবন্ধটি ভূমিকা হিসেবে পঠিত হয়। এখানে শ্রোতৃকূলের সামনে ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন বিবর্তমান ভাষাগুলি অথবা নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার আধুনিক পর্যায় সম্পর্কে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মতই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস দুটি ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচীন পর্বকে আবার দুটি ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, প্রাচীন ও আদি-মধ্য—যার বিস্তৃতি এক হাজার খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সেই সময় যখন ভারতীয়রা তাদের রাজ্যনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করেছিল। এ সময়ে উত্তর ভারতের আর্য-ভাষাগুলি (বর্তমানে যেমন আছে) পূর্বের বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃতের অপভ্রংশ ও প্রাকৃত (পূর্বে যেমন ছিল) ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়ে নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ঘটে। যেমন : বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগধী ও ভোজপুরী; কৌশালী (পূর্বী হিন্দি), ব্রজভাষা ও অন্যান্য ভাষা যা পশ্চিমা হিন্দির অন্তর্গত; পার্বত্য বা হিমালয়ের উপভাষাগুলি, রাজস্থানের উপভাষাগুলি, মালওয়া'র সঙ্গে গুজরাটী, মারাঠী এবং কোঙ্কনী, পূর্ব-পাঞ্জাবের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা ও সিন্ধী এবং কাশ্মীরী। এই সবগুলি ভাষারই সেটা ছিল প্রথম আবির্ভাব।

একথা অনস্বীকার্য যে, এই ধারা সমগ্র ভারতবর্ষে চর্চিত আধুনিক মনন ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপট ও যোগসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেদান্ত ও ভক্তিমার্গে 'জ্ঞান', 'কর্ম' ও 'যোগ' এবং অন্যান্য মহতী ধারণার বিকাশ ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তার দর্শন প্রসারের অনুকূল বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এই প্রাচীন ভারতীয় উত্তরাধিকারের পাশাপাশি সেখানে বহতা ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজমান স্থানিক ধর্মবিশ্বাস ও রূপকথা; যদিও এগুলি প্রাগার্য ও বিভিন্ন অর্বাচীন ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিভিন্নতা মুছে গিয়ে এসমস্ত কিছুই দ্রুত ব্রাহ্মণ্যায়িত হয়ে উঠেছিল। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের সূচনা পর্বে এসব ধর্মবিশ্বাস, রূপকথা ইত্যাদি লোকপ্রিয় রচনার উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য (উর্দু, সিন্ধী এবং কিছুটা হলেও পাঞ্জাবী ব্যতিরেকে) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা অপরিহার্য। বিশেষত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় এই মূল্যায়নকে সহায়ক ও সহজ করে তোলে। এক মধ্যযুগীয় ফরাসী কবি বিষয়গত উপাদানের ওপর নির্ভর ক'রে ফরাসী রোমান্সকে তিনভাগে ভাগ করেন : (ক) ব্রিটেনের উপাদান-সম্বলিত (খ) ফ্রান্সের উপাদান-সম্বলিত (গ) রোমের উপাদান-সম্বলিত। ব্রিটেনে উদ্ভূত আর্থারিয়ান রোমান্সের নাম ব্রিটেনীয় রোমান্স, ফরাসীদেশের গল্পে Charlemagne-এর[৪] প্রভাব যে সমস্ত রোম্যান্টিক গল্পে তাকে ফরাসী রোমান্স বলা হল এবং প্রাচীন রোম-গ্রীসের কিংবদন্তি গাথাগুলির ওপর আধারিত গল্পগুলি রোমক রোমান্স বলে চিহ্নিত করেছিলেন সেই ফরাসী কবি।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের গোড়ার দিকে বর্ণিত গল্প-কাহিনিকে (সে কোনো রোমান্স হোক বা বর্ণনাধর্মী আখ্যান) মূলত দুটি সুনির্দিষ্ট বিষয়-সম্বলিত প্রকারে বিভক্ত করা চলে; (ক) প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষয়-সম্বলিত আবর্তন (Cycle); যা মূলত সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে সংরক্ষিত (খ) আঞ্চলিক অথবা বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর বিষয়-সম্বলিত আবর্তন, যাকে বলা যেতে পারে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের উপাদান; একটি নয় বহু ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যে যা চিত্রিত। সেজন্য একে বলা যেতে পারে আন্তঃআঞ্চলিক অথবা প্যান-ইন্ডিয়ান সাহিত্য। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের উপাদান-সম্বলিত বিষয়ের ওপর আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রতিনিধিস্থানীয় ও সুনির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম সৃজিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে উত্তর-ভারতীয় কিছু ভাষা যেমন হিন্দুস্থানী, হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি ভাষাগুলি মুসলমানী প্রেরণা থেকে নতুন উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে; বিশেষত পারস্য ও আরবদেশীয় ইসলাম বিশ্বের ভাবাদর্শ থেকে। উর্দু প্রভাবিত হিন্দী বাগ্‌ধারায় ও প্রাচীন Dakhni-তে এই ঐস্লামিক ভাবাদর্শের প্রভাব যথেষ্ট প্রকট। অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম-বিশ্বের নানাবিধ ধর্মমূলক, পুরাণকথামূলক, রূপকথাধর্মী ও প্রেমগাথামূলক কাহিনী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে থাকে। অন্যান্য প্রদেশের যেখানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল সেখানের সাহিত্যেও এর সূক্ষ্ম সাদৃশ্যমানতা পরিলক্ষিত হতে থাকে; যেমন : তামিলনাড়ু বা উত্তর বিহার বা মারাঠা অঞ্চল অথবা রাজস্থান। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত প্রথম পর্বের সাহিত্যগুলি প্রধানত কাব্যধর্মী অথবা আখ্যানমূলক। এই লিরিকধর্মী সাহিত্যসম্ভার স্বভাবতই প্রেমগাথা বা ধর্মীয় ভাবমূলক মন্ময়ধর্মী আখ্যানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে আখ্যানমূলক সাহিত্য বিষয়গতভাবে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ বা স্থানিক ধর্মীয় অনুষঙ্গ অথবা মুসলিম প্রেরণামূলক আরবী ও ফার্সীর পৌরাণিক ও ঐতিহ্যমূলক গল্পকথাকে আশ্রয় করেছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে, এই দুটি প্রকরণ *'পদ'* ও *'মঙ্গল'* নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যেও (১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে) বিষয় ও কাব্যরূপের নিরিখে সংস্কৃত থেকে সরে এলে মৌলিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। সেখানেও দেখা যাবে সাহিত্যের দুটি ভাগ *'আকাম'*[৫] অর্থাৎ অন্তর্মুখী বা মন্ময় লিরিকধর্মী রচনা এবং *'পুরাম'*[৬] অর্থাৎ বহিরঙ্গের বা তন্ময় আখ্যানধর্মী সাহিত্য। পার্সী শব্দ *'বাজাম'* অর্থাৎ 'সম্মেলন' এবং *'রাজম'* অর্থাৎ 'যুদ্ধ'; যার নিহিতার্থ যথাক্রমে 'লিরিক্যাল' এবং আখ্যানমূলক বা রোমান্টিক কাব্য। শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয় উর্দু সাহিত্যের দুটি প্রকরণের পার্থক্য বোঝানোর জন্য।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষ আমাদের হতাশ করেনি। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের অবলম্বনে ও কাব্যানুবাদে প্রভূত সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও অন্যান্য সন্তদের মহৎ জীবনীগুলিও এই 'প্রাচীন ভারতবর্ষের উপাদান'-এর অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত সেগুলি পুরাণের ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষত সম্পৃক্ত ছিল। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির ক্ষেত্রে এহেন প্রাচীন ভারতীয় অথবা বলা ভাল সংস্কৃত অধ্যুষিত প্রেক্ষিতটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তার সাহিত্যগুলিকে বিষয় ও প্রেরণাগত দিক থেকে পরস্পরের কাছে আনার জন্য অথবা তাদেরকে একত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষিতটি স্মরণীয়। এরই সূত্রে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলি সম্মিলিতভাবে আশ্চর্য দার্শনিকতা ও মতাদর্শগত ঐক্যের বোধ প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বকলার নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বহুবিধ মধ্যযুগীয় প্রেমগাথা ও বীরগাথার গল্প-আখ্যানবৃত্তের প্রভাব দেখা যায় যা নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশপর্বে অথবা পরবর্তীতে সামনে আসে। এভাবেই বাংলায় আমরা পেয়েছিলাম লাউসেনের অভিযানের কাহিনী (*ধর্মমঙ্গল*) থেকে সওদাগর লখীন্দর ও তার পতিব্রতা স্ত্রী বেহুলার কাহিনী এবং দেবী মনসার কাহিনী (*মনসাপুরাণ* ও *পদ্মাপুরাণ*), সওদাগর ধনপতি তার স্ত্রী খুল্লনা ও লহনা এবং তাদের সন্তান শ্রীমন্ত ছাড়াও ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী (*চণ্ডীমঙ্গল*)। উড়িষ্যাতে রচিত হয়েছিল বিভিন্ন ওড়িয়া রাজার কাহিনী বিশেষত রাজ্য পুরুষোত্তমদেব ও রাজকুমারী পদ্মাবতীর প্রেমোপাখ্যান। আওয়াধী বা কোশলী অঞ্চলে আবার আওয়াধী ও মুসলমান লেখকদের ব্যবহৃত বেশ কিছু প্রেমগাথা পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে। এমনই একটি কাহিনীতে চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে সুফী কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহীয়ানরূপে চিত্রিত করেছেন। রাজস্থান এবং উত্তর ভারতের রাজপুত অনুষঙ্গের বহু মহান রাজপুত প্রেমগাথা ও বীরত্বপূর্ণ আখ্যান

আদি রাজস্থানী, ব্রজভাষা ও বুন্দেলী (পশ্চিমা হিন্দী) ভাষায় রচিত হয় ; যেমন আল্লাহ ও উদাল-এর রোম্যান্সধর্মী আখ্যান। পাঞ্জাব অঞ্চলেরও তার নিজস্ব রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ছিল যেমন : রাজা রিসালু ও ভারথারী সম্পর্কিত প্রেমগাথা। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে মারাঠা বীর শিবাজীর বীরগাথার প্রচলন ছিল মারাঠা অঞ্চলে ; বাংলাদেশেও সপ্তদশ শতাব্দী পরবর্তী সময়কালে কিছু অসাধারণ প্রেমগাথা রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলায়, দক্ষিণী ভাষায় অথবা উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষার গল্প-আখ্যানগুলিতে আরব ও পারসিক মূল উৎস থেকে আগতম ইসলাম-বিশ্বের মিথ ও রূপকথার উপাদান পাওয়া যায়। সেখানে ছিল সন্তদের গল্প ও তাদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কাহিনী, ছিল প্রাচীন প্রাক্-ইসলামীয় আরবদেশের নায়কদের গল্প; যেমন মুসলিম ধ্রুপদী সাহিত্য *শাহনামা*[৭]-তে বর্ণিত প্রাচীন পারস্যের কাহিনী, কিংবা সেকেন্দার অথবা আলেকজান্দারের রূপকথা ও আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত অন্যান্য গ্রীক আখ্যান, প্রাচীন আরবী ও ফারসী গল্প, আরব্য-রজনীর গল্প, এবং সর্বোপরি কারবালার ট্রাজিক যুদ্ধের গল্প—যেখানে পয়গম্বর মহম্মদের পৌত্র নাস্তিক আরব সম্রাট এজিদ্ এর কাছ পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এসব বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত কিছু সম্বলিত ধারা, থিয়োলজি, ইসলামের বৈধ প্রাতিষ্ঠানিকতা ও সামাজিক করণীয় মিলে গঠন করেছিল সাহিত্যের ভর (mass) ; আর এর থেকেই সময়ে সময়ে ভারতীয় মুসলিমগণ সুফী দর্শন ও আধ্যাত্মিক সুফী সংস্কৃতির পাঠ নিয়েছেন এবং তার নির্মাণ ঘটিয়েছেন।

সুফী দর্শন ইসলামী বিশ্বের অংশ হিসেবে ভারতে প্রবেশ করে ফারসী সাহিত্য ও ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে। সুফীদর্শন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কতিপয় হিন্দু ধর্মগোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তীকাল থেকেই সুফীবাদ উদারপন্থী মুসলমান ও হিন্দুদের এক মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

উত্তরভারতীয় ভাষাগুলিতে সুনির্দিষ্ট কিছু সাহিত্য প্রকরণের উদ্ভব ঘটেছিল। এরমধ্যে অন্যতম ছিল *'বড়োমাসিহা'* কাব্য, যাতে প্রেমিক যুগলের সারা বছরের অর্থাৎ বারোমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনি, তাদের বিরহ-বিচ্ছেদ এবং সম্মিলনের আনন্দ ধারাবাহিকভাবে চিত্রায়িত হতো। অপর একটি হল *চৌতিশা* চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ পারম্পর্যের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে কাব্যগুলির পঙ্‌ক্তি রচিত হতো। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন-বিরহ ও সম্মিলনের আনন্দই ছিল সেগুলির বিষয়বস্তু। যেখানে ফারসী বর্ণমালা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যেমন পাঞ্জাবের সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে, সেখানে ভারতীয় *চৌতিশা* পরিবর্তিত হয়েছিল ফারসী *'শীরফি'* রূপে অথবা *ত্রিশ* বর্ণ রূপে। এই কাব্যগুলি ছিল সংস্কৃত-অধমর্ণ গতানুগতিক পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট এবং ঋতুচক্র, যুদ্ধ-প্রেম-ভালবাসা ও নারীর সৌন্দর্য-বিষয়ক কাব্য।

আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রাথমিক পর্বে গদ্যের ব্যবহার ছিল খুবই কম। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চীনা-তিব্বতী (অহোম) ভাষায় রচিত *'বুরুঞ্জী'*[৮] সাহিত্যের প্রেরণায় প্রাচীন অসমীয়া ভাষার গদ্যের রীতি গড়ে উঠতে থাকে। এই সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ব্রজভাষার গদ্যে বৈষ্ণবীয় সন্ত-জীবনী ও জীবনীসাহিত্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রাচীন গুজরাটি ভাষার গদ্যে জৈন লেখকেরা সমৃদ্ধ ও বিচিত্র বিষয়ক আখ্যান সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে প্রাচীন পাঞ্জাবী (হিন্দকী অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবী, এবং তারপর পূর্বী পাঞ্জাবী) ভাষার গদ্যে আমরা পাই শিখ জীবনীসাহিত্য। আসলে গদ্যের ব্যবহার ছিল, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল চিঠিপত্র, আইন-আদালত ও অন্যান্য নথি লিখনের মধ্যে। অন্যদিকে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটে (ষোড়শ শতাব্দীর চিঠিপত্রমূলক রচনাগুলি বাদ দিলে) অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বৃহদার্থে বলা ভাল পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রভাবে।

আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলি কখনোই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে নি। এসময় সাধারণ কোনো নির্দিষ্ট ভাষায় একঘেয়ে অনুবাদের পরিবর্তে আকর সাহিত্যপাঠের ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছিল। ফলত এর কিছু পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। যেমন কিছু ক্ষেত্রে, নব্য ভারতীয়-আর্যের সূচনাপর্বের ভাষায় রচিত কোনো লেখকের রচনা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলে সেই প্রক্রিয়ায় ভাষাটির রূপের পরিবর্তন ঘটে যেত। তখন সেই লেখক নতুন ভাষা-অঞ্চলের লেখক হিসেবে পরিচিত হতেন যেখানে তাঁর রচনা ছড়িয়ে পড়েছে। গোরক্ষনাথ, বিদ্যাপতি, কবীর, মীরাবাঈ এবং অন্যান্যদের রচনা তার উদাহরণ। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এমনকি আধুনিককালে এই সাহিত্যিক রচনা ও আদর্শ প্রবাহের সর্বপেক্ষা উপযুক্ত পরিসর ছিল ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ সমতলভুমি।

আমরা যদি তুলনা করি তাহলে দেখব, আদিপর্বের ইউরোপীয় সাহিত্যের থেকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্বের পরিসর অনেকটাই সীমাবদ্ধ ছিল; বিশেষত রেঁনেসাঁস পরবর্তী সময় থেকে ধরলে। ভারতবর্ষে রেঁনেসাঁর আগমন ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্য ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর। এই সময়কাল থেকেই আমরা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ এক নতুন অভিমুখ দেখতে পাই।

অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দী (যেমন দেখা যায় কবীর ও তার ঘরানায়, তুলনীদাসে, মীরাবাঈতে) মরমী ও ভক্তিকাব্য, পাঞ্জাবী এবং মারাঠী ভাষায় রচিত প্রাচীন হিন্দু ও অন্যান্য ঐতিহ্যের কাব্য, সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত সুফী ঐতিহ্যের কাব্য আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের আদিপর্বের এই সময়ের সাহিত্যকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিষয়ের ওপর রচিত আখ্যানগুলি ছিল সত্যিই অসাধারণ। কিছু দার্শনিক রচনা যেমন বাংলা *চৈতন্যচরিতামৃত*[৯] এবং কতিপয় প্রাচীন তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যেরও স্থায়ী গুরুত্ব ছিল। নাট্যকর্ম ছিল সবিশেষ জনপ্রিয়, উপযুক্ত মঞ্চ ব্যতিরেকেই তা অভিনীত হত। কিন্তু নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষায় সাহিত্য-প্রকরণ হিসেবে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটে নি; এর ব্যতিক্রম ছিল ষোড়শ শতাব্দীতে অসমীয়া ভাষায় রচিত অর্বাচীন ধর্মমূলক নাটক এবং সপ্তদশ শতাব্দীর নেপালে প্রাপ্ত বাঙালি-মৈথিলি ও আওয়াধীর মিশ্রভাষার কথোপকথন সম্বলিত নাটক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের উৎকর্ষ থেকে এই ক্ষেত্রে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় একটি স্পষ্ট অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। ঊংবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে নতুন ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ লক্ষিত হয় তা ছিল প্রধানত ইংরাজি সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়; যদিও সেখানে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবও ক্রিয়াশীল।

যুক্তিশীল গদ্যসাহিত্যের অনুপস্থিতি-এর একটি বড় কারণ ছিল। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কতিপয় সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই পদ্যে রচিত; যে ধারা আজও প্রবহমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা ভাষায় রচিত একখানি আইনের গ্রন্থ *মোক্তার-সুহৃদ* ('The Friend of the Lawyer') এবং অন্য একখানি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের ওপর রচিত *হোমিওপ্যাথি-দর্পণ* ('The Mirror of Homeopathy')। আবার পদ্যে রচিত শব্দকোষ, চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং গণনাশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থও রচিত হয়েছিল ভারতীয় ভাষায়, একদা একসময় হিন্দীতে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও পদ্যে রচিত হয়েছিল। ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রেরণার সংস্পর্শ ভারতবর্ষে নবজাগরণ ডেকে আনে। উন্মুক্ত হয়ে যায় আধুনিক ভারতীয় ভাষার এক নতুন দিগন্ত। ইংরাজি সাহিত্য এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম, ইতালী, ফ্রান্স ও জার্মানি, পরবর্তীতে রুশ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (বিশ-শতক পরবর্তীকালে) সাহিত্য, যার দরজা ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে খুলে গিয়েছিল, তা ভারতীয় সাহিত্যের বর্তমান তথা আধুনিক দশার লক্ষণে (attitude) যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ইউরোপীয় মননের সঙ্গে এই

মোলাকাত প্রথম দেখা গিয়েছিল বাংলায়; এবং এর ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে বাংলা সাহিত্যে মানবায়ন ও আধুনিকায়নের সূত্রপাত ঘটে। সাহিত্য আঙ্গিকের ইউরোপীয় প্রকরণ উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। ভূমিষ্ঠ হয় উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধসাহিত্য; বিকাশ ঘটে গদ্যের। ক্রমশ বিগত শতকের ষাটের দশকে[১০] এক ভীরু ও প্রকাশোন্মুখ বাংলা গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইউরোপীয় ঘরানার মুক্তছন্দ (Blank Verse) এবং পদ্য-আঙ্গিক যেমন ইতালীয় সনেট ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। বাংলা ভাষার সাহিত্যে আমরা এক আশ্চর্য *Floraison* দেখতে পাই, অতঃপর ক্রমে ক্রমে অন্য ভাষার সাহিত্যে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা ক্রমশ বুদ্ধিজীবীদের মানসগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে; এবং ভারতবর্ষ বিজ্ঞানশাখার মতই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাভ করেন নোবেল পুরস্কার; তিনি হয়ে ওঠেন ভারতীয় সাহিত্যের এই নবোদ্ভূত মন্ত্রের স্মারক।

চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতাবোধের কায়ানির্মাণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতায় ভারতীয় মননের পর্বন্তর তার প্রকাশকে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যে; এবং তা ঘটেছিল বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক যুগের (ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী) মহান বাঙালি লেখকদের প্রদর্শিত পথেই ভারতবর্ষ আজও সহর্ষে অগ্রসরমান। সেই পথের কাণ্ডারী, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা নিজেদের লেখক হিসেবে সর্ব-ভারতীয় গুরুত্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাহিত্য, সে উর্দু অথবা তেলেগু, হিন্দী অথবা কন্নড়, মারাঠী অথবা পাঞ্জাবী, তামিল অথবা ওড়িয়া, গুজরাটি অথবা অসমীয়া, কিংবা মালয়ালম অথবা কাশ্মীরী যে ভাষাই হোক না কেন তারাও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ, সমালোচনা ও বাস্তববাদের আধুনিক লক্ষণগুলি আয়ত্ত করে ফেলেছে। আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের কাছে এই সম্পদ মহার্ঘ্য।

অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভারতীয় সংস্কৃতির যে পুনর্জাগরণ তাতে অতীত ভারতবর্ষের সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সংস্কৃতি ছিল ভারতবর্ষের এক মহান ঐতিহ্য যা সে কখনও হারিয়ে ফেলেনি। ভারতীয় জীবনচর্যার নেপথ্যে তার যে স্বকৃত দর্শন ও সাংস্কৃতিক মানসিকতা বর্তমান তা এই আধুনিক যুগের ইউরোপীয় প্রেরণার (যা এসেছিল মূলত ইংরাজি সাহিত্যের হাত ধরে) পরিপূরক হয়ে দেখা দেয় এবং তার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী এনে দেয়। পাশ্চাত্যের অগ্রগণ্য মানুষদের সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনের (পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের) চর্চা এবং আত্তীকরণ আপামর ভারতবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বর্তমান ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় চিন্তকেরা, দেশের আধুনিক সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে যাঁদের অবদান সংশয়াতীত, তাঁরাও এই প্রেরণার প্রতি ঝুঁকেছিলেন। এর ফলে ইউরোপ ও ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির সংশ্লেষণ ঘটেছিল এবং সামগ্রিকভাবে লাভ হয়েছিল দেশের, সর্বোপরি মানবতার। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, অতীতে যে ভারতবর্ষ বলিষ্ঠভাবে তার দর্শনকে ঊর্ধে তুলে ধরেছে, একই সঙ্গে সে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞান, কলা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ সাফল্যগুলি গ্রহণ করুক এবং বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সামনে স্বকৃত অখণ্ডতার আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক যাকে অস্বীকারের ভ্রান্তি সারা বিশ্ব কখনো করবে না।

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি :

১. খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর গ্রীক মহাকবি। ইলিয়ড ও ওডিসি তাঁর দুটি মহাকাব্য।

২. চাণক্য (খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৩ খ্রীঃ ৩৫০) যিনি কৌটিল্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর একটি প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও যুদ্ধ-বিষয়ক আকর।

৩. বাৎস্যায়ন গুপ্তযুগের (৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক) প্রখ্যাত হিন্দু দার্শনিক। তাঁর বিরচিত *কামসূত্র* প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আকর গ্রন্থ। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থটি মানবজীবনের যৌন আচরণবিধি বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ।

৪. শার্লেমন (৭৪২-৮১৪ খ্রীঃ) ছিলেন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন সম্রাট। তিনি চার্লস দ্য গ্রেট অথবা প্রথম চার্লস নামেও পরিচিত ছিলেন।

৫. প্রাচীন তামিল সঙ্গম সাহিত্যের একটি প্রকরণ বিশেষ যার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম।

৬. প্রাচীন তামিল কাব্যের প্রকরণ বিশেষ যার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য রচিত হত।

৭. পার্সী কবি ফেরদৌসি রচিত দীর্ঘকায় মহাকাব্য; রচিত হয়েছিল ৯৭৭-১০১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। কাব্যটিতে ৫০,০০০ স্তবক আছে। ইরান ও অন্যান্য পার্সীভাষীদের কাছে এটি জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

৮. বুরুঞ্জী একটি ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক সাহিত্য প্রকরণ যা অহোম রাজত্বের সমসাময়িক উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যিক আকর হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। প্রাচীন অহোম ভাষায় রচিত।

৯. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ যা বংলা ভাষায় রচিত এবং মধ্যযুগের জীবনীসাহিত্যের আকর।

১০. এখানে বিগত শতাব্দী বলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক বোঝানো হয়েছে।

টীকা ও ভাষান্তর : মননকুমার মণ্ডল

১০৩.৮ সমগ্র আলোচনার সারাংশ

পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ কথা বলেন, এমন ভাষার সংখ্যাই এদেশে আড়াইশোর বেশি। এছাড়াও আরও অসংখ্য ভাষা এখানে প্রচলিত। কিন্তু 'ভারতীয়-ত্ব'—এই বোধটা খুবই আধুনিক। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ছোট-বড় রাষ্ট্রে এই উপমহাদেশ বিভক্ত ছিল। কখনও কোনও প্রতাপশালী সম্রাট একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়েছেন, পরে সেটা আবার ভেঙে গেছে নানা খণ্ডে। মধ্যযুগেও মুঘল সাম্রাজ্যের মোটামুটি গ্রন্থিত চেহারা ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ঐক্যবোধ ছিল না—শাসনগত ও অর্থনীতিগত ফারাকও ছিল এবং সাম্রাজ্য বহির্ভূত বহু রাজ্যই ছিল। ব্রিটিশ আমলে প্রথম দৃঢ়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা এল। সুসংহত অর্থনীতি এবং শিক্ষার পদ্ধতি, যোগাযোগের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে দেশচেতনা ধীরে-ধীরে তৈরি হতে লাগল। ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির ফারাক সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে 'ভারতীয়-ত্ব'-এর বোধটা গড়ে উঠল।

কিন্তু বহুতর পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা প্রবহমানতা ছিলই। রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্য স্থানীয় বহুবিধ রূপে রচিত হলেও সবটা মিলিয়ে ভাবনার ঐক্যসূত্র গড়ে তুলেছিল। এগুলোকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য না করে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, নীতিবোধ ইত্যাদির এক-একটা সাধারণী উত্তরাধিকারসূচক বই হিসেবে দেখাই বাঞ্ছনীয়। এদের পাশাপাশি উপনিষদ-প্রভৃতি তাত্ত্বিক ভাবনা-ভূয়িষ্ঠ গ্রন্থগুলির প্রজ্ঞাভাবনা চুঁইয়ে নেমেছে সর্বত্রই, সমাজের তৃণশষ্প স্তরেও। বিভিন্ন দার্শনিক 'স্কুল' সাধারণ মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিঘাত না ফেললেও, তাদের অনুষঙ্গে সমাজ-বিধাতারা একই ধরনের বিধি-বিধান সর্বত্রই কায়েম রাখেন। এগুলির সূত্রে সামাজিক-অনুশাসন বা সামাজিক-শোষণ-উৎপীড়নের সাদৃশ্যও মোটামুটি সর্বত্রই অভিন্ন ছিল, এখনও আছে।

আবার সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যগ্রন্থগুলিও গোটা দেশেরই উৎস-সঞ্জাত ভাবধারাগুলিকে আত্মস্থ করে তৈরি হয়েছে। বাইরের দিকে হেরাফেরি কিছু থাকলেও, মূলগত ঐক্যভাবনা তাদের ভিতরে ছিলই।

মধ্যযুগে বিভিন্ন অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষায় যে সন্তসাধকরা এসেছিলেন, তাঁরাও প্রত্যেকেই মানবতাবাদী একটি আদর্শকে প্রচার করেছিলেন। ভক্তিসাহিত্য বলে যা পরিচিত, নানা ভাষায় রচিত হলেও মধ্যযুগে সর্বত্রই তা ঐ একই আদর্শে প্রবুদ্ধ করেছে মানুষকে। ফলে একটা ঐক্যবোধও গড়ে উঠেছে অলক্ষ্যে।

ব্রিটিশ আমলে এই ঐক্যচেতনার অলক্ষ্যে ভিত্তিভূমির উপর একটা সামগ্রিক দেশচেতনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তার ব্যবহারিক কারণগুলি এখনই বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নিষ্পেষণ সারা দেশের মানুষকে সহমর্মী করে তোলে। এখন সেই সহমর্মী ঐক্যবোধকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থিত রাখা বাঞ্ছনীয়। পারস্পরিক সংহতিবোধ জাগানোর জন্য তাই এখন আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্তভাবেই দরকার।

১০৩.৯ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) কোন্ পরিচয়টি ঠিক—ভারতীয় সাহিত্য, না ভারতের সাহিত্য? যুক্তিসহ বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলুন।

(২) প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ঐক্য কীভাবে ছিল, আলোচনা করুন।

(৩) 'ভারতীয়' সাহিত্যের ভিত কেমনভাবে গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দী ধরে, আলোচনা করে দেখান।

(৪) শাস্ত্রবিধানের নামে কীভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের আমজনতাকে একইভাবে অবদমিত করে রাখা হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, বিশ্লেষণ করে দেখান।

(৫) মধ্যযুগে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেমনভাবে ঐক্যবোধের উপযুক্ত পটভূমি গড়ে উঠেছিল, আলোচনা করুন।

(৬) ভারতবর্ষের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঐক্যবোধ কেমন করে ব্রিটিশ আমলে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, বিশদভাবে বলুন।

(৭) ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে জানার তাৎপর্য আজকের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি প্রয়োজনীয়, বিচার করে দেখান।

খ) স্বল্পবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) ব্রিটিশ আমলে 'ওয়ান নেশ্যন'-এর ধারণা কীভাবে গড়ে উঠেছিল?

(২) কী-কী উপকরণ নিয়ে একটা জাতির সাহিত্য গড়ে ওঠে?

(৩) বহুবিধ ফারাক থাকা সত্ত্বেও 'কমন হেরিটেজ' কীভাবে এদেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে?

(৪) শাস্ত্রবিধান-নিয়ন্ত্রিত 'সোস্যাল সাইকি' কীভাবে এদেশের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে?

(৫) প্রাকৃত ভাষাগুলির সর্বজনগ্রাহ্যতার কথা কীভাবে বোঝা যায়?

(৬) ভক্তি-সাহিত্য মধ্যযুগে কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল?

(৭) আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্য কেমন করে তৈরী হয়েছিল?

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) পাঁচ হাজারের বেশি লোক কথা বলেন, ভারতে এমন কতগুলি ভাষা আছে?

(২) 'প্যান-এশিয়ান এপিক' কাকে বলে?

(৩) 'বৃহৎকথা'র লেখক কে ছিলেন?

(৪) ক্ষেমেন্দ্র এবং সোমদেবের বইদুটির নাম (যথাক্রমে) কী কী?

(৫) ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত কারা, কখন বলবেন?

(৬) কোন্ ব্রতের মন্ত্রে 'ফার্সি-র উল্লেখ আছে?

(৭) তুকারাম কোন্ অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?

(৮) ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কী বলেছেন?

(৯) উর্দু ভাষার জন্ম কোথায়?

(১০) সুব্রহ্মণ্য ভারতী কোন্ ভাষার লেখক?

১০৩.১০ উত্তর সংকেত

ক) বিস্তৃত প্রশ্নের উত্তরের জন্য এককের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরী করুন।

খ) স্বল্পবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

১। দু'শো বছরের বিদেশি শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষ প্রথম পরস্পরের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করে। এরাই ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নানা ভাষা নানা মত—নানা পরিধানের মানুষেরা, কর্মসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ক্রমান্বয়ে 'ওয়ান নেশান' ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে।

২। একটি জাতির সাহিত্য গড়ে ওঠে, তার সামাজিক বিধি-বিধান, নৈতিক আচার-সংস্কার, ব্যবহারিক রীতি-প্রকরণ, ঔচিত্য—অনৌচিত্যের বিচার, জীবন চর্যার আদর্শ ইত্যাদি বহু কিছুর প্রতিভাসে।

৩। রামায়ণ মহাভারতের অসংখ্য উপাদান, জাতির নৈতিক মূল্যবোধে, বিশ্বাসে সংস্কারে। জীবনাদর্শে মিশে আছে বলেই, সীতার সাধ্বিতা, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের আনুগত্য প্রভৃতি মানুষের মনে গভীর ভাবে প্রোথিত থাকায়, নানান তফাৎ সত্ত্বেও একটি সাধারণ উত্তরাধিকার বা 'কমন হেরিটেজ' সৃষ্টি হয়েছে।

৪। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণে প্রচলিত রামকথার প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মূল ভাব—কাঠামো অভিন্ন। তাই দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিমরা নিজেদের শাস্ত্র বিধান নিয়ন্ত্রিত রামায়ণ রচনা করলেও তার মিল-গড়মিল নিয়েই একটি সামাজিক মানসিকতা বা 'সোসাল সাইকী' তৈরী হয়েছে।

৫। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এ নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ রচনায় যে বিধান ছিল তাতে রাজা—ব্রাহ্মণ সেনাপতি, বণিকরা সংলাপ বলবেন সংস্কৃতে, উচ্চবর্ণীয় নারীর সাধারণ সংলাপ হবে—মঘারাষ্ট্রী প্রাকৃতে, গান ও প্রেমের কথা বলবেন শৌরসেনা প্রাকৃতে আর আমজনতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল মাগধী প্রাকৃত। এ থেকে বোঝা যায় সবগুলি প্রধান আঞ্চলিক ভাষাই সর্বত্র প্রযুক্ত হোত। এ থেকেই প্রাকৃত ভাষাগুলির সর্বজন গ্রাহ্যতার কথা বোঝা যায়।

৬। মধ্যযুগে ভারতের সর্বত্র এক-দেড় শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিবাদী মানবতামুখি কতকগুলি ধর্মধারা বিকশিত হয়। নানক-চৈতন্য-কবীর-তুকারাম প্রভৃতি সন্ত-সাধকদের বাণী জন জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এঁদের প্রভাবে ভক্তি সাহিত্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের পাশাপাশি সুরদাস, তুলসীদাস,

নামদেব, তুকারাম, মীরাবাঈ—প্রভৃতির ভক্তিবাদী সাহিত্য সমগ্র উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমকে শুধু ব্যাপ্তই নয় গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল।

৭। ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নানাবিধ যোগাযোগের মাধ্যমে যে দৃঢ়বদ্ধ রাষ্ট্রীয় চরিত্র তৈরী হয়, তার ফলশ্রুতিতে শিক্ষা সংস্কৃতি জগতেও বিরাট পরিবর্তন আসে। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের নানা জায়গায় বিদ্বান-বুদ্ধিমান বাছাই করা এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় যারা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতি লিখতে শুরু করেন। এঁরাই সেই সৃষ্টিকে এখনো বহমান রেখেছেন। এ সব নিয়েই আধুনিক কালের 'ভারতীয় সাহিত্য' তৈরী হয়েছে।

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ২৫৯টি।

২। রামায়ণ ও মহাভারত শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ার আরও অনেক দেশে ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়ে থাকে বলে, এদের প্যান-এশিয়ান এপিক বলা হয়।

৩। গুণাঢ্য 'বৃহৎকথা' সংকলন করেছিলেন।

৪। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব রচিত বই দুটির নাম যথাক্রমে 'বৃহৎ কথামঞ্জরী' এবং 'কথাসরিৎসাগর'।

৫। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত' উচ্চবর্গীয় নারী—নাটকের সংলাপ উচ্চারণ কালে বলবেন।

৬। সেঁযুতি ব্রতের মন্ত্রে 'ফার্সি' শব্দের উল্লেখ আছে।

৭। 'তুকারাম' পশ্চিম ভারতের মানুষ ছিলেন।

৮। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ান লিটেরেচার ইজ ওয়ান, বাট্ রিটন্ ইন্ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস্।''

৯। উর্দু ভাষার জন্ম মুঘল সৈন্য শিবিরে।

১০। 'সুব্রহ্মণ্য ভারতী', তামিল ভাষার লেখক।

একক ১০৪ ❒ সদ্‌গতি ❒ মুন্সি প্রেমচন্দ্র

গঠন ঃ

১০৪.১ উদ্দেশ্য

১০৪.২ প্রস্তাবনা

১০৪.৩ পটভূমিকা

১০৪.৪ মুন্সি প্রেমচন্দ্র ❑ জীবনকথা

১০৪.৫ সদ্‌গতি ❑ প্রেমচন্দ্র

১০৪.৬ পূর্বকথা

১০৪.৬.১ কাহিনী সংক্ষেপে

১০৪.৭ কাহিনী বিশ্লেষণ

১০৪.৭.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

১০৪.৮ সারাংশ

১০৪.৯ অনুশীলনী

১০৪.১০ উত্তর সংকেত

১০৪.১ উদ্দেশ্য

এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের সমাজে অস্পৃশ্যতার কদর্য রূপটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজের ওপরতলার মানুষেরা যে কীভাবে আর্থ-সামাজিক সোপানের নিচের ধাপের মানুষদের ওপর শোষণ-পীড়ন চালিয়ে থাকে, সেই সম্পর্কে এই গল্পকে ব্যঙ্গমিশ্রিত একটি দলিল বলা চলে। একালের ভারতবর্ষেও এই সমস্যার বিশেষ কোনও সমাধান হয়নি, সেটাও এই গল্প আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব কারণেই এ-গল্পকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০৪.২ প্রস্তাবনা

ভারতের গ্রামজীবনকে অস্পৃশ্যতার সংস্কার এবং দরিদ্রের প্রতি অবিচার-অত্যাচার নিদারুণভাবে ক্লিষ্ট

করে রেখেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। গান্ধিজির অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন কিংবা সমাজতন্ত্রী-সাম্যবাদীদের অস্পৃশ্যতা এবং দরিদ্রদলন-বিরোধী সামাজিক-সংগ্রামও এই অন্যায়গুলিকে দূর করতে পারেনি। প্রেমচাঁদের এই গল্পটি ঐ সামাজিক সংগ্রামেরই অংশস্বরূপ।

১০৪.৩ পটভূমিকা

মুন্সি প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) হলেন হিন্দি কথাসাহিত্যের প্রধান লেখক যাঁরা তাদের মধ্যেও সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর হাতেই হিন্দি উপন্যাস ও ছোটগল্পের বয়োপ্রাপ্তি ঘটেছে এমনই মনে করা হয়। তাঁর জন্ম এবং হিন্দি কথাসাহিত্যের উদ্ভব প্রায় একই সময়ে যে হয়েছিল সেই তথ্যটিও এখানে যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক।

প্রেমচন্দ সাহিত্যজগতে এসে পৌঁছনোর পূর্ববতী সময়ে হিন্দি কথাসাহিত্য একান্তই প্রাথমিক স্তরে আবদ্ধ ছিল। রূপকথাধর্মী কিছু গল্পকাহিনীই একেবারে গোড়ার দিকে তার উপজীব্য ছিল। ধীরে ধীরে সামাজিক সমস্যামূলক গল্প-উপন্যাস খুব দুর্বলভাবে লেখা হতে শুরু করে তারপরে। শ্রীনিবাস দাস (পরীক্ষাগুরু) বালকৃষ্ণ ভট্ট ('সও অজান এক সুজান')-র দুর্বলভাবে রচিত কিছু কাহিনীই হিন্দি কথাসাহিত্যের প্রথম পর্বের ফসল।

দেবকীনন্দন ক্ষত্রি, গোপালরাম গাহ্ম্‌রি, কিশোরীলাল গোস্বামী প্রমুখ আরও কিছু লেখক এরপরে আসেন। রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী, বঙ্কিমী আদর্শে রচিত রোম্যান্স এবং কাব্যিক ভাষায় রচিত (মূলত) প্রণয়কাহিনী ছিল এই সময়ের মুখ্য রচনা-উপজীব্য। এই সমস্ত প্রস্তুতির শিক্ষানবীশী লেখার পাঠ সাঙ্গ হয়ে হিন্দি কথাসাহিত্য প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠল প্রেমচন্দের হাতে—তাঁর গল্পে ও কবিতায়।

১০৪.৪ মুন্সি প্রেমচন্দ ❑ জীবনকথা

প্রেমচন্দের আসল নাম ছিল ধনপৎ রাই শ্রীবাস্তব, ডাক নাম নবাব। বাবা মুন্সি অজায়বলাল ডাক বিভাগের সামান্য বেতনের করণিক ছিলেন। ছোট বয়স থেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার কারণে তাঁর লেখার মধ্যে পারিপার্শ্বিক দুঃখকষ্টের ছবি বরাবরই দেখা গেছে। ভারতের গ্রামীণ সমাজের—বিশেষত, উত্তরপ্রদেশের জাত-পাত-জর্জরিত পরিবেষ্টনী সম্পর্কে আশৈশব অভিজ্ঞতা তাঁকে জনজীবনের এক সুনিপুণ চিত্রকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মাতৃহীন বালক নবাবের দিনগুলো কেটেছে অবিরাম দুরন্তপনা করে। তবে পড়াশুনোয় ফাঁকি পড়েনি। মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেই প্রাইমারি স্কুলে চাকরিও পান তিনি। তারপর সরকারি দপ্তরেও কাজ জুটল। সাহিত্যচর্চাও এই সময় থেকেই শুরু—তবে প্রথম আমলে তিনি উর্দুতেই লিখতেন। কানপুরের 'জমানা' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন ধনপৎ। ১৯০৭ সালে বেরোয় তাঁর দেশপ্রেমাত্মক গল্প সংকলন 'সোজ-এ-ওয়তন' (বিষণ্ণ স্বদেশের গাথা) বইটি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজ সরকার। এর ফলেই তাঁর ছদ্মনাম নিতে হল—সেই নামেই প্রেমচন্দ তারপরে বিখ্যাত হলেন। হিন্দিতে লেখারও সূত্রপাত তখনই।

প্রেমচন্দের প্রথম হিন্দি গল্প 'বড়ে ঘর কি বেটি' বেরোয় ১৯১০ সালে। সারা জীবনে তিনি প্রায় পৌনে তিনশো গল্প লিখেছেন। 'সদ্‌গতি' ছাড়া তাঁর আরও কয়েকটি বিখ্যাত গল্প হল 'কফন', 'সওয়া সের গেঁহু', চৌধুরিয়োঁ কি কুয়া', 'পাউষ কি রাত', 'ইদগাহ্‌' ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাততম উপন্যাস হল 'গোদান'। তাছাড়া, 'নির্মলা', 'রঙ্গভূমি', 'প্রেমাশ্রম', 'সেবাসদন', 'কায়কল্প' প্রভৃতি উপন্যাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গান্ধিজির ভাষণ শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেমচন্দ সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে শুধু সাহিত্যের মাধ্যমে দেশসেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খ্যাতিমান হবার পর ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দিতে চাওয়া হলেও তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেন।

গান্ধিবাদ এবং সাম্যবাদ—দুই মহৎ আদর্শের একত্র সমন্বয় ঘটেছিল প্রেমচন্দের মধ্যে। এরই লব্ধফল তাঁর গল্প-উপন্যাসে দেশপ্রেম-অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া—ইত্যাদি বিষয়।

প্রেমচন্দ প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে (১৯৩৬) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে উদার মানবিকতা এবং সাম্যবাদের প্রতি যে-গভীর আস্থা দেখা যায়, তাতে এটাই খুব স্বাভাবিক বলে প্রতীত হয়েছে। রুশ বিপ্লবের প্রতি তিনি সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন।

উর্দু সাহিত্যেরও অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক রূপে প্রেমচন্দকে গণ্য করা হয়। প্রায় সারাটা সাহিত্যজীবন ধরেই তিনি একই সঙ্গে হিন্দি ও উর্দু—দুই ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উর্দু গল্পসংকলনগুলির মধ্যে 'প্রেম পচিসি', 'প্রেম বাত্তিসি' প্রভৃতি এবং উর্দু উপন্যাস হিসাবে 'গোষা-এ-আফিয়ৎ' ও 'চৌগান-এ হসতি' ইত্যাদি খুবই উল্লেখযোগ্য।

সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও প্রেমচন্দের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর সম্পাদিত 'হংস' এবং 'জাগরণ' পত্রিকাদুটিতে প্রগতিশীল আধুনিক হিন্দি লেখকদের অনেকেই লিখেছেন এবং লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন। সুতরাং সাহিত্য-সংগঠক রূপেও প্রেমচন্দের ভূমিকা মনে রাখবার মতন অবশ্যই।

১০৪.৫ সদ্গতি ❑ প্রেমচন্দ

দুখি চামার বাড়ির দরজায় ঝাড়ু দিচ্ছিল আর তার স্ত্রী ঝুরিয়া গোবর দিয়ে ঘর লেপছিল। দুজনের যার যার কাজ শেষ হলে চামারনি বলল—তুমি গিয়ে পণ্ডিত বাবাকে বলে এস না। পরে আবার কোথাও চলে না যান।

দুখি—হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে উনি বসবেন কীসের ওপর সেটা ভেবে রেখেছিস তো?

ঝুরিয়া—কোথা থেকে একটা খাটিয়া কি পাওয়া যাবে না? মুখিয়ার বউয়ের কাছ থেকে চেয়ে আনব।

দুখি—তুই মাঝে মাঝে এমন কথা বলিস যে গা জ্বলে যায়। ঠাকুরানরা আমাকে খাটিয়া দেবে? ঘর থেকে তো আগুনটাও বের করে না, খাটিয়া দেবে? কুয়োর কাছে গিয়ে এক ঘটি জল চাইলেও পাওয়া যায় না। বলেছিস ভালো, খাটিয়া দেবে! নে, আমাদের খাটিয়া ধুয়ে রেখে দে। গরমের দিন, উনি আসতে আসতে শুকিয়ে যাবে।

ঝুরিয়া—উনি আমাদের খাটিয়ায় বসবেনই না। দ্যাখো না কত আচারবিচার মেনে চলেন।

দুখি কিছুটা চিন্তিতভাবে বলল—হ্যাঁ, এটাও একটা কথা। মহুয়া গাছের পাতা ছিঁড়ে একটা পাত্র করে নিলেই হয়ে যাবে। এরকম মহুয়ার পাত্রে বড়ো বড়ো লোকেরাও খাবার খান। মহুয়ার পাতা পবিত্র। দে, একটা লাঠি দে, পাতা পেড়ে আনি।

ঝুরিয়া—পাত্র আমি বানিয়ে নেব। তুমি যাও। তবে একটা কথা, পণ্ডিত বাবাকে একটা সিধাও তো দিতে হবে। আমাদের থালাতে রাখব?

দুখি—খবরদার একাজ করবি না। তা হলে সিধাও যাবে থালারও বারোটা বাজবে। বাবা থালা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি ওঁর মাথা গরম হয়ে যায়। মাথা গরম হলে স্ত্রীকে পর্যন্ত ছাড়েন না। ছেলেকে একবার এত পিটিয়ে ছিলেন যে, এখনও সে ভাঙা হাত নিয়ে চলাফেরা করছে। মহুয়ার পাত্রে সিধাও দিবি, বুঝলি? তবে তুই ছুঁবি না। ঝুরি গোন্ডের মেয়েকে নিয়ে মুদির দোকান থেকে সব জিনিস কিনে নিয়ে আসবি। সিধা যেন পুরো সিঁধা হয়। সেরখানেক আটা, আধা সের চাল, পোয়াখানেক ডাল, আধ পোয়া ঘি, হলুদ লবণ, আর পাত্রের এক ধারে চার আনা পয়সা রেখে দিবি। গোন্ডের মেয়েকে না পেলে ওই যে ভাজাভুজি করে তাকে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে যাবি। তুই কিছু ছুঁবি না, তা হলেই অশান্তি হয়ে যাবে।

এই সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে দুখি লাঠি হাতে নিয়ে ঘাসের বেশ বড়ো একটা বোঝা তুলে পণ্ডিতজির কাছে তার প্রার্থনা জানাতে চলল। খালি হাতে পণ্ডিতজির কাছে সে কী করে যায়? আর, ভেট দেবার মতো ঘাস ছাড়া আর কিই বা তার ছিল। খালি হাতে দেখলে দূর থেকেই তো বাবাজি তাকে গালমন্দ করবেন।

দুই

পণ্ডিত ঘাসিরাম ছিলেন ঈশ্বরের পরম ভক্ত। ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের উপাসনায় লেগে পড়তেন। মুখহাত ধুতে আটটা বাজত, তখন শুরু হত আসল পুজো। এই পুজোর প্রথম অংশ ছিল ভাঙ তৈরি করা। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে চন্দন পিষতেন। তারপর আয়নার সামনে বসে একটা কাঠির সাহায্যে তিলক লাগাতেন। চন্দনের দুটি রেখার মাঝখানে কুমকুমের লাল টিপ আঁকা হত। তারপর বুকের উপর, হাতের উপর আঁকা হত চন্দনের গোল গোল মুদ্রা। এসবের পর ঠাকুরের মূর্তি বের করে তাকে স্নান করাতেন, তাতে চন্দন লাগাতেন, তার উপর ফুল দিতেন, ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে আরতি করতেন। দশটা বাজতে বাজতে উনি পুজো সেরে উঠতেন ও ভাঙ ছেনে বেরিয়ে আসতেন। এরই মধ্যে দু-চারজন যজমানও এসে অপেক্ষা করতেন। ঈশ্বরোপাসনার তাৎক্ষণিক ফল পেয়ে যেতেন।

আজ পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন দুখি চামার ঘাসের এক বোঝা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দুখি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে জোর হাত করে দাঁড়াল। পণ্ডিতজির তেজস্বী মূর্তি দেখে তার মন শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কী দিব্য মূর্তি। ছোট গোল-গাল মানুষটি, চকচকে টাক, ভরা গাল, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত চোখ। কুমকুম আর চন্দন পণ্ডিতজিকে দেবতাদের দীপ্তি প্রদান করেছিল।

দুখিকে দেখে শ্রীমুখে বললেন—কী রে, দুখিয়া, আজ কী মনে করে?

দুখি মস্তক অবনত করে বলল—মেয়ের শাদি হবে মহারাজ। দিন-তারিখ বিচার করে দিতে হবে। কখন আপনার সময় হবে?

ঘাসি—আজ আমার সময় হবে না। তবে সন্ধ্যা নাগাদ যেতে পারি।

দুখি—না, মহারাজ, দয়া করে যদি আগে যান। সব জিনিস ঠিক করে রেখে এসেছি। এই ঘাস কোথায় রাখব?

ঘাসি—এই গোরুটার সামনে দিয়ে দে আর একটা ঝাড়ু নিয়ে দরজার সামনেটা সাফ করে দে। এই বৈঠকখানাও কতদিন লেপা হয় না। একেও গোবর দিয়ে লেপে দে। ততক্ষণে আমি ভোজন করে নিই। তারপর একটু বিশ্রাম করে রওনা হব। আর শোন, এই কাঠটাও চিরে দিবি। গোলাবাড়ির ওখানে ভুসি পড়ে আছে। ওগুলোকে তুলে নিয়ে গোয়ালঘরে রেখে দিবি।

দুখি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করতে লেগে গেল। দরজার সামনেটা ঝাড়ু দিয়ে দিল, বৈঠকখানা গোবর দিয়ে লেপে ফেলল। ততক্ষণে বারোটা বেজে গেছে। পণ্ডিতজি ভোজন করতে চলে গিয়েছিলেন। দুখি সকাল থেকে কিছুই খায়নি। তারও খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু এখানে খাবার কোনো ব্যবস্থা তো ছিল না! তার বাড়িও ছিল মাইল খানেক দূর। সেখানে খেতে চলে গেলে পণ্ডিতজি বিরক্ত হবেন। বেচারা খিদে চেপে রেখে লকড়ি চিরতে শুরু করে দিল। কাঠটার একটা মোটা গাঁট ছিল। তার উপর এর আগে অনেক ভক্ত তাদের শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কাঠ যেন সব কিছু মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়েছিল। দুখি ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। লকড়ি চেরার অভ্যাস তার ছিল না। তার খুরপির সামনে ঘাস মাথা নুইয়ে দিত, কিন্তু ওখানে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শক্তি দিয়ে ধরা কুড়ুল সেই গাঁটের উপর পড়ছিল না। কুড়ুল উলটে যেতে লাগল। ঘেমে সে নেয়ে উঠল হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। হাত তুলতে গিয়ে তুলতে পারল না। পা কাঁপতে লাগল, কোমরও সোজা করতে পারছিল না। দুখির চোখে অন্ধকার নেমে এল। তার মাথা ঘুরতে লাগল, সে চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। তবু সে তার কাজ করে যেতে থাকল। যদি এক ছিলিম তামাক খেতে পারত তাহলে হয় তো কিছু

জোর পাওয়া যেত। সে ভাবল, এখানে কলকে, তামাক এসব কোথায় পাওয়া যাবে? ব্রাহ্মণের বাড়ি। ব্রাহ্মণরা আমাদের নীচ জাতির লোকের মতো এত তামাক খায়ও না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, গ্রামে এক ঘর গোন্ড তো বাস করে। তার ওখানে গেলে কলকে তামাক পাওয়া যাবে। দুখি দ্রুত দৌড়ে তার বাড়ি গেল। যাই হোক, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হল না। সে তাকে তামাক ও কলকে দুইই দিল। তবে সেখানে আগুন ছিল না, দুখি বলল, আগুনের চিন্তা করতে হবে না, ভাই। আমি যাচ্ছি, পণ্ডিতজির বাড়ি থেকে চেয়ে নেব। সেখানে তো এখনও রান্না হচ্ছে।

এই কথা বলে দুখি তামাক, কলকে নিয়ে চলে এসে পণ্ডিতজির বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলল—মালিক, যদি একটু আগুন দেন, তবে তামাক খেতে পারি।

পণ্ডিতজি ভোজনে রত ছিলেন। পণ্ডিতপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন—এ কে, আগুন চাইছে?

পণ্ডিত—আরে, ওই শালা দুখিয়া চামার। বলেছিলাম, কিছু লকড়ি চিরে দে। আগুন তো রয়েছে, দিয়ে দাও।

পণ্ডিতপত্নী ভ্রূকুটি করে বললেন—তুমি তো পুঁথিপত্রের জালে জড়িয়ে ধর্মকর্ম কোনো কিছুরই আর খেয়াল রাখছ না। চামার হোক, ধোপা হোক, ব্যাধ হোক, মুখ তুলে ঘরে এসে ঢুকছে। হিন্দুর বাড়ি তো নয়, সরাইখানা হয়ে গেছে। বলে দাও, দাওয়া থেকে চলে যাক, নয়তো এই জ্বলন্ত চেলা দিয়ে মুখ ঝলসে দেব। আগুন চাইতে এসেছে।

পণ্ডিতজি স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন—ভিতরে এসেছে তো কী হয়েছে। তোমার কোনো জিনিস তো ছোঁয়নি। মাটি পবিত্র। একটু আগুন দিচ্ছ না কেন? আমাদের কাজই তো করে দিচ্ছে। কোনো কাঠ চেরার লোককে দিয়ে লকড়ি করালে কম করে হলেও চার আনা নিত।

পণ্ডিতপত্নী গর্জে উঠে বললেন—ও ঘরের মধ্যে এল কেন?

পণ্ডিত হার স্বীকার করে বললেন—ব্যাটার কপাল খারাপ তাই।

পণ্ডিতপত্নী—ঠিক আছে, এবারের মতো আগুন দিয়ে দিচ্ছি। তবে আবার যদি কেউ এভাবে ঘরে এসে ঢোকে তবে তার মুখই জ্বালিয়ে দেব।

এই সব কথার টুকরো দুখির কানে প্রবেশ করেছিল। সে মনে মনে পস্তাতে লাগল, নাহক এলাম। সত্যিই তো বলছেন, ব্রাহ্মণের ঘরে চামার কী করে আসে? বড়ো পবিত্র হয় এই সব লোক। তাই তো সংসারে এদের এত আদর, তাই তো এত সম্মান। আমাদের মতো চামার তো নয়। এই গ্রামে থেকে বুড়ো হলাম অথচ এই কথাটা মাথায় এল না।

এই জন্য পণ্ডিতপত্নী যখন আগুন নিয়ে বেরুলেন দুখির মনে হল, স্বর্গের দেবী বর দিতে এসেছেন। হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বলল—পণ্ডিত-মা, বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি। তা, চামারের আক্কেল তো। এত মূর্খ না হলে লাথি খেতে হবে কেন?

পণ্ডিতপত্নী চিমটে দিয়ে ধরে আগুন নিয়ে এসেছিলেন। হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে তিনি দুখির দিকে আগুন ছুঁড়ে দিলেন। আগুনের একটা বড় ফুলকি দুখির মাথায় গিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তার মন বলল—এক পবিত্র ব্রাহ্মণের ঘর অপবিত্র করার এই হল ফল। ভগবান কত তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে দিলেন। এই জন্যই তো সবাই ব্রাহ্মণদের ভয় করে। আর সকলের টাকা মারা যেতে পারে, ব্রাহ্মণের টাকা কেউ মারুক দেখি। সর্বনাশ হয়ে যাবে, গা খসে খসে পড়তে শুরু করবে।

বাইরে এসে তামাক খেয়ে দুখি কুড়ুল নিয়ে কাজে লেগে পড়ল। খটখট আওয়াজ উঠতে লাগল।

দুখির মাথায় আগুন পড়েছিল বলে তার উপর পণ্ডিতপত্নীর কিছু দয়ার সঞ্চার হল। পণ্ডিতজি ভোজন সেরে উঠলে তিনি বললেন—এই চামারকেও কিছু খেতে দিয়ে দি, বেচারা কখন থেকে কাজ করছে। হয়তো না খেয়েই আছে।

পণ্ডিতজি এই প্রস্তাব ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করে বললেন—রুটি আছে?

পণ্ডিতপত্নী—দু-চারটে বেঁচে যাবে।

পণ্ডিত—দু-চারটে রুটিতে কী হবে? চামার তো, অন্তত সেরখানেক আটা টেনে নেবে।

পণ্ডিতপত্নী কানে হাত রেখে বললেন—আরে, বাপরে, সেরখানেক? তাহলে থাকগে।

পণ্ডিতজি এবার খুব আস্থার সঙ্গে বললেন—কিছু ভুসি-টুসি থাকে তো আটার সঙ্গে মিশিয়ে দুটো দলা বানিয়ে দাও। শালার পেট ভরে যাবে। পাতলা রুটিতে এইসব নিচু জাতের লোকের পেট ভরে না। এদের জোয়ারের মোটা রুটি দরকার।

পণ্ডিতপত্নী বললেন—রেখে দাও তো, এই রোদে কে মরতে যাবে?

তিন

দুখি তামাক খেয়ে আবার কুড়ুল ধরল। দম নেওয়ায় হাতে জোরও এসেছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আবার কুড়ুল চালাল। তারপর আবার দম ফুরিয়ে গেলে মাথায় হাত দিয়ে ওখানেই বসে পড়ল।

এরই মধ্যে গোন্ড এসে হাজির হল। সে বলল—কেন জান দিয়ে দিচ্ছ, বুড়ো দাদা? তোমার কোপে এ গাঁট কাটবে না। মিছামিছি তুমি হয়রান হচ্ছ।

দুখি মাথার ঘাম মুছে নিয়ে বলল—এখনও এক গাড়ি ভুসি আনতে হবে, ভাই।

গোন্ড—কিছু খেতে দিয়েছে না খালি কাজই করাচ্ছে? গিয়ে খাবার চাইছ না কেন?

দুখি—কী যে বল না, চিখুরি। ব্রাহ্মণের রুটি আমার হজম হবে?

গোন্ড— হজম ঠিকই হবে, আগে পাও তবে তো। ভোজন শেষ করে এখন গোঁফে তা দিয়ে শুয়ে আছে, তোমাকে লকড়ি চিরে দিতে হুকুম দিয়েই খালাস। জমিদাররাও কিছু খেতে দেয়, হাকিমও বেগার খাটালে কিছু না কিছু দেয়। এই লোক তাদের চেয়েও বড়ো হয়ে গেল। তবু একে বলে ধর্মাত্মা!

দুখি—আস্তে বলো ভাই, কেউ শুনে ফেললে বিপদ হবে।

এই কথা বলে দুখি আবার কুড়ুল দিয়ে কোপাতে শুরু করল। দুখিকে দেখে চিখুরির মায়া হল। সে এসে দুখির হাত থেকে কুড়ুল ছিনিয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে খুব জোরে জোরে কোপ চালাল। তবু সেই গাঁটে একটু চিড়ও ধরল না। তখন সে কুড়ুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'তোমার কোপে এ কাটবে না, মাঝখান থেকে প্রাণটা যাবে'—এই কথা বলে চলে গেল।

দুখি চিন্তা করতে লাগল—পণ্ডিতবাবা এই গাঁট কোথায় ফেলে রেখেছিলেন যে কাটছে না। কোনো চিড় পর্যন্ত ধরছে না। আমি আর কতক্ষণ এ কাঠ কাটতে থাকব? বাড়িতে এখনও কত কাজ পড়ে আছে। আমাদের মতো লোকের বাড়িতে একটা-না একটা কিছু লেগেই আছে, কিন্তু এদের আর কী চিন্তা? এখন কী বরং ভুসিটা তুলে নিয়ে আসি। বলে দেব, বাবা, আজ তো কাঠ কাটতে পারলাম না, কাল এসে চিরে দেব।

দুখি ঝোড়া তুলে নিয়ে ভুসি আনতে গেল।

যদি খুব চেপে চেপে ঝোড়া ভরতে পারত তাহলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তাহলে ঝোড়া মাথায় তুলে দেবে কে? ঠেসে ভর্তি করে ঝোড়া তার একার পক্ষে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই সে অল্প অল্প করে আনতে লাগল। চারটে নাগাদ ভুসি আনা শেষ হল। পণ্ডিতজির ঘুমও তখন ভাঙল। মুখহাত ধুয়ে, পান খেয়ে বাইরে এসে দেখেন— ঝোড়ায় মাথা রেখে দুখি ঘুমিয়ে আছে। খুব জোরে বললেন—কিরে দুখিয়া, তুই ঘুমিয়ে আছিস? কাঠতো এখনও যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। তুই কেন এত দেরি করছিস। এক মুঠো ভুসি আনতেই সন্ধ্যা করে ফেললি। তারপর আবার ঘুমিয়ে আছিস। ওঠ,

কুড়ুল নে, লকড়ি চিরে দে। তোর দ্বারা এই লকড়িটুকু চেরা হল না? তাহলে তোর মেয়ের দিনও কিন্তু সেরকমই হবে, আমাকে দোষ দিতে পারবি না। এই জন্যই, বলে, ছোটলোকের ঘরে খাওয়া থাকলে তাদের চালচলনই বদলে যায়।

দুখি আবার কুড়ুল তুলল। যে সব কথা আগে সে ভেবে রেখেছিল তা সব ভুলে গেল। তার পেট পিঠ এক হয়ে গিয়েছিল। সকালে মুখে কিছু দিতে পারেনি। সময়ই পায়নি। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছিল। সাহস হচ্ছিল না তবু মনকে প্রবোধ দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। পণ্ডিতমানুষ, যদি দিনক্ষণ সঠিক বিচার না করে দেন সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই জন্যই তো সংসারে এঁদের এত সম্মান। দিন-ক্ষণেরই তো সব খেলা। যাকে খুশি সর্বনাশ করে দিতে পারেন।

পণ্ডিতজি সেই কাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, মার্ কোপ জোরে—আরও মার্—জোরে মার্—আরও জোরে মার্—তোর হাতে তো দেখছি জোর নেই—লাগা জোরে—দাঁড়িয়ে ভাবছিস কী! হ্যাঁ, ঠিক আছে—ফাটাতে চাইছিস তো। লাগা কোপ ওই ফাটলটায়।

দুখির কোন হুঁশ ছিল না। কে জানে কোন্ গোপন শক্তি তার হাতকে সচল রেখেছিল। সেই ক্লান্তি, সেই ক্ষুধা, সেই দুর্বলতা সবই যেন পালিয়ে গিয়েছিল। তার নিজের বাহুবলে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে ঘিয়েছিল। একেকটা কোপ যেন বাজ পড়ার মতো পড়ছিল। আধ ঘণ্টা ধরে সে এই ভাবে উন্মাদের মতো হাত চালাতে থাকলে হঠাৎ সেই কাঠ মাঝবরাবর ফেটে গেল আর দুখির হাত থেকে কুড়ুলও ছিটকে পড়ল। কুড়ুলের সঙ্গে সঙ্গে দুখিও মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে তার শরীর জবাব দিয়ে দিয়েছিল।

পণ্ডিতজি জোরে বললেন—উঠে আর দু-এক কোপ লাগিয়ে দে। পাতলা পাতলা চেলি কিছু হয়ে যাক।

দুখি উঠল না। পণ্ডিতজিও আর দুখিকে বিরক্ত করা উচিত মনে করলেন না। পণ্ডিতজি বাড়ির ভিতরে গিয়ে ভাঙের শরবৎ খেলেন, শৌচে গেলেন, স্নান করলেন এবং পণ্ডিতদের উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাইরে এলেন। দুখি তখনও সেখানে পড়ে। জোরে ডাকলেন—আরে, তুই কি পড়েই থাকবি, দুখি? চল্, তোর বাড়িতেই যাচ্ছি! সব জিনিসপত্র ঠিক ঠাক আছে তো?

তবু দুখি উঠল না।

এবার পণ্ডিতজির কিছুটা ভয় হল। কাছে গিয়ে দেখলেন দুখি কাঠ হয়ে পড়ে আছে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন—দুখিয়া মনে হয় মরে গেছে।

পণ্ডিতপত্নী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—ও এই মাত্র লকড়ি চিরছিল না?

পণ্ডিত—হ্যাঁ, লকড়ি চিরতে চিরতেই মরে গেছে। এখন কী হবে?

পণ্ডিতপত্নী শান্ত হয়ে বললেন—হবে আবার কী, চামারদের খবর পাঠাও, ওরা এসে মড়া তুলে নিয়ে যাক।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল। কেবল মাত্র এক ঘর গোন্ড ছাড়া পুরো গ্রামটাতেই ছিল ব্রাহ্মণের বাস। লোকজন ও দিকের রাস্তা ছেড়ে চলতে লাগল। কুয়োর রাস্তাও ছিল ওদিক দিয়েই। তা হলে কী করে জল ভরতে যাওয়া যাবে। চামারের মড়া পড়ে থাকলে জল আনতে কে যাবে। এক বুড়ি পণ্ডিতজিকে বলল—এখনও মড়া সরিয়ে দিচ্ছ না কেন? গ্রামের লোকেরা কি কেউ জল খাবে না?

এদিকে গোন্ড গিয়ে সব চামারদের খবর দিয়ে দিয়েছিল খবরদার, মড়া তুলতে কেউ যাবে না। এখনই পুলিশের ঝামেলা হবে। খুশিমতো একটা গরিব লোকের প্রাণ নিয়ে নিল। পণ্ডিত হয়েছে তো কী হয়েছে? মড়া তুলেছ কি তোমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে।

এর একটু বাদেই পণ্ডিতজি গেলেন। কিন্তু চামারদের মধ্যে কেউই মড়া সরাতে রাজি হল না। তবে দুখির স্ত্রী ও তার মেয়ে হায় হায় করতে করতে গিয়ে পণ্ডিতজির দরজায় পড়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল। তার সঙ্গে দশ-বারোজন চামারনি ছিল। তারা কেউ কাঁদছিল, কেউ প্রবোধ দিচ্ছিল, কিন্তু কোনো চামার ছিল না। পণ্ডিতজি চামারদের অনেক ধমকালেন, বোঝালেন, মিনতি করলেন; কিন্তু তাদের মনে পুলিশের ভয় ঢুকে গিয়েছিল। তাদের একজনও রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন।

চার

অর্ধেক রাত পর্যন্ত কান্নাকাটি চলল। ব্রাহ্মণ দেবতারা ঘুমোতে পারছিলেন না। তবু মড়া সরাবার জন্য কোনো চামার এগিয়ে এল না। আর ব্রাহ্মণরাই বা কী করে চামারের মড়া সরান। আচ্ছা, এসব কি শাস্ত্রপুরাণে লেখা থাকে। থাকে তো দেখিয়ে দিলে ভালো হয়।

পণ্ডিতপত্নী বিরক্তি সহকারে বললেন—এই ডাইনিগুলো মিলে চিৎকার করে মাথার পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে। এখনও চেঁচানো বন্ধ হল না।

পণ্ডিতজি বললেন—চেঁচাতে দাও তো এই শাঁখচুন্নিগুলোকে। কতক্ষণ আর কাঁদবে? যখন বেঁচে ছিল তখন কেউ কোনো খবর নিত না। এখন মরে গেছে—হল্লা করবার জন্য সবগুলো এসে জুটেছে।

পণ্ডিতপত্নী—চামারদের কান্না কিন্তু অশুভ।

পণ্ডিত—খুবই অশুভ।

পণ্ডিতপত্নী—এখন থেকেই তো দুর্গন্ধ উঠতে শুরু করেছে।

পণ্ডিত—বেজন্মাটা চামার ছিল না, কী? এদের খাদ্যাখাদ্যের কি কোনো বাছবিচার আছে।

পণ্ডিতপত্নী—এদের তো কোনো ঘেন্নাও নেই।

পণ্ডিত—ব্যাটারা সব পতিত।

রাত কোনোরকমে শেষ হল। কিন্তু ভোরেও কোনো চামার এল না। চামারনিগুলো কেঁদেকেটে চলে গিয়েছিল। কিছু কিছু দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল।

পণ্ডিতজি একটা দড়ি বের করে তাতে একটা ফাঁস লাগিয়ে মড়ার পায়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর ফাঁস টেনে শক্ত করলেন। তখনও কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। পণ্ডিতজি দড়ি ধরে মড়া টানতে শুরু করলেন এবং টানতে টানতেই গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি স্নান করে দুর্গামন্ত্র জপ করে ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন।

ওদিকে শকুন ও শেয়াল আর কুকুর ও কাক মিলে মাঠের মধ্যে দুখির লাশ ছিঁড়ে খেতে লাগল। আজীবন ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার এই পুরস্কার।

(অনুবাদ : অমলকুমার রায়)

১০৪.৬ পূর্বকথা

মুন্সি প্রেমচন্দ্রের এই গল্পটির আবেদন আজও, এটি রচিত হবার সাত দশক পরেও সমানই তীব্র আছে। বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, দরিদ্রকে শোষণ ও লাঞ্ছনা করা ইত্যাদি কুৎসিত সামাজিক ব্যাধিগুলি এখনও এদেশের জনজীবনকে আবিল করে রেখেছে। গান্ধির অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রগতিশীল রাজনৈতিক

আন্দোলনের অভিঘাতেও তখন দেশজুড়ে একটি উদার ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের উন্মীলন ঘটতে শুরু করেছিল। এই গল্পটিও সেই বিশেষ সমাজ-মানসিকতারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এখানে উল্লেখনীয় যে, মুন্সি প্রেমচন্দ নিজেও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপেই স্বীকৃত ছিলেন। তীব্র একটি বিদ্রূপগর্ভ ভঙ্গীতে তিনি অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক শোষণকে বস্তুতপক্ষে আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েই এই গল্পটি লিখেছেন।

১০৪.৬.১ কাহিনী-সংক্ষেপ

দুখি চামার মেয়ের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ; আর সেই জন্য সে পণ্ডিত ঘাসিরামজিকে দিয়ে শুভ দিন-ক্ষণ ইত্যাদি গণনা করিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। 'অচ্ছুত' বলে তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের কাছে নিত্যই অবমানিত এবং ঘৃণিত হওয়া সত্ত্বেও, সেই তাদেরই কাছে এভাবে শরণ নিতে চাওয়াটা আমাদের সামাজিক প্রেক্ষিতে অনিবার্য এক বিড়ম্বনা হয়ে থেকেছে বহু শতাব্দী ধরেই। তাই ঘাসিরাম যদি 'অনুগ্রহ' করে তার বাড়িতে পদার্পণ করে মেয়ের ভাগ্যগণনা করে দেন, এই কুণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে তাঁর 'সম্মানরক্ষা' করার জন্য তার সাধ্যমতো দান দক্ষিণার ও ব্যবস্থা করে নিজেদের 'অস্পৃশ্যতা-দোষ' কে মনে রেখেই।

ঘাসিরাম পণ্ডিত জ্ঞানী কতখানি, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও ধর্মাচরণের নামে তাঁর ভড়ং ছিল প্রচুর। দ্বিজদর্শনের প্রণামীস্বরূপ ঘাসিরাম ঠাকুরের সমীপে এক বোঝা ঘাসই নিয়ে এসে বসেছিল দুখি। তার নিবেদনটুকু পণ্ডিতজির কাছে পেশ করার জবাবে, তিনি হুকুম দিলেন উঠোনে পড়ে থাকা বিশাল একখানা গাছের গুঁড়িকে চিরে চ্যালাকাঠ বানাতে, গোয়াল ঘরের সামনেটা ঝাঁটা দিয়ে সাফ করতে এবং বৈঠকখানার সামনেটা গোবর লেপতে। তারপরে তিনি সন্ধে নাগাদ দুখির ঝোপ্‌ড়িতে গিয়ে দয়া করে তার মেয়ের বিয়ের দিন-ক্ষণ গণনা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

পণ্ডিতজি খাওয়া-দাওয়া সেরে দিবানিদ্রায় মগ্ন হলেন। আর অভুক্ত, ক্লান্ত দুখিয়া গন্‌গনে রৌদ্রের মধ্যে তাঁর হুকুমগুলো একের পর এক তামিল করতে লাগল পণ্ডিতজির একটু অনুগ্রহের দুরাশায়। আর সব কাজগুলো ঝট্‌পট্ সারা হলেও, লোহার মতো শক্ত গাছের গুঁড়িটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না দুখি। সে ভাবল, যদি তামাক টেনে চাঙ্গা হওয়া যায়, তাহলে হয়ত গায়ে তাকৎ বাড়বে, গাছের বেয়াড়া গুঁড়িটাকেও বাগে আনা যাবে। একটু আগুনের প্রার্থনা নিয়ে দুখিয়া পণ্ডিতের বাড়ির দাওয়ায় উঠে দাঁড়াতেই ''পণ্ডিতাইন'' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন : 'অচ্ছুত' চামারের ছোঁয়া লেগে তাঁর ভদ্রাসন 'অপবিত্র' হয়ে গেল বুঝি! পণ্ডিতজি তাঁকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় বোঝাতে লাগলেন, অন্য কারুকে দিয়ে ঐ লক্‌ড়ি-বানানো করাতে হলে অন্তত চার গণ্ডা পয়সা তো মজুরি দিতে হতো—আর এটা তো ফোকটেই হয়ে যাচ্ছে! তাছাড়া মাটি তো অপবিত্র হয় না....ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে পণ্ডিতগিন্নি হাতপাঁচেক দূর থেকে দুখিয়ার উদ্দেশে চিম্‌টের আগুনটা ছুঁড়ে দিলেন এবং বিরাট একটা জ্বলন্ত ফুল্‌কি তার মাথায় গিয়ে পড়ল। দুখি ক্রুদ্ধ হল না—তার পুরুষার্জিত অন্ধ সংস্কারের বেড়ি-বাঁধা বুদ্ধি তাকে ভাবাল—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর ছুঁয়ে ফেলার 'পাপে' স্বয়ং ভগবানই তাকে এমন শাস্তি দিলেন। করুণা করে দুখির মাথায় আগুন পড়েছিল তাঁরই কারণে, এজন্যে পণ্ডিতাইন তাকে কিছু খেতে দেবার কথা ভাবলেন বটে, কিন্তু সেরখানেক আটার রুটি লাগবে তাহলে—স্বামীর কাছে এমন হুঁশিয়ারি শুনে সে-হেন দয়াধর্ম দেখানো থেকে অচিরে নিরস্তও হলেন তিনি।

বেলা চারটে নাগাদ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করে ঘাসি পণ্ডিত ঘরের বাইরে এসে দেখলেন আর সব কামকাজ সারা হলেও, গাছের গুঁড়িটা যেমনকে তেমনই রয়েছে। আর তার পাশে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত-অবসন্ন দুখিয়া চামার মাথা

গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। পণ্ডিতের ডাকে তার ঘুম ভাঙে; পণ্ডিতজি বলেন, এই আলসেমির জন্য কাজ বাকি থাকলে তার মেয়ের বিয়ের তিথি-নক্ষত্র গণনাও বাকি থাকবে।

সচকিত, সন্ত্রস্ত দুখিয়া প্রাণপণে কুড়ুলের অবিরাম কোপ মারতে লাগল লোহার মতো কঠিন গুঁড়িটার গায়ে। অবশেষে কাঠটা মাঝ-বরাবর ফেটে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে দুখিও মাথা ঘুরে পড়ে গেল জমির ওপরে; "ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে তার শরীর জবাব দিয়ে দিয়েছিল।" ..... কিন্তু ঘাসি পণ্ডিত তাকে আবার উঠে কাজ শুরু করার জন্য উৎসাহ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন।

দুখি চামার কিন্তু আর ওঠেনি।

খানিক পরে পণ্ডিতজি বাইরে বেরিয়ে তাকে সেই একই রকমভাবে পড়ে থাকতে দেখে; ব্যাপারটা কী ঘটে গেছে বুঝতে পারলেন। মুহূর্তের মধ্যে সারা গ্রামে দুখিয়ার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গেল। চামারের মড়া পথের ওপর পড়ে আছে—তাহলে বামুনেরা কী করে তাকে ডিঙিয়ে "নিজেদের" কুয়ো থেকে জল আনতে যাবে—এই নিয়ে মহা সোরগোল পড়ে গেল।

আর অন্যদিকে, এক ঘর গোন্ড আর কয়েকঘর চামার মিলে গ্রামের যারা অচ্ছ্যুত অন্ত্যেবাসী—তারাও একটা প্রতিবাদের মুখপাত করল। ঐ আদিবাসী গোন্ড পরিবারের কর্তা চামারদের বোঝাল : "খবরদার মড়া তুলতে কেউ যাবে না। এখনই পুলিশের ঝামেলা হবে। খুশিমতো একটা গরিব লোকের প্রাণ নিয়ে নিল। পণ্ডিত হয়েছে তো কী হয়েছে? মড়া তুলেছ কি তোমাদেরও ধরে নিয়ে যাবে।"

দুখিয়ার মৃতদেহ কাজেকাজেই সরানো হল না। দুখির মেয়ে-বউ আর চামারপট্টির অন্যান্য "আওরোতলোগ" ঘাসিরাম পণ্ডিতের বাড়ির সামনে কপাল চাপ্‌ড়ে কাঁদাকাটা করতেই লাগল অর্ধেক রাত্রি অবধি, গাঁয়ের বামুন-পণ্ডিতরা ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হলেন। ঘাসিরাম গিন্নির মনে হল "চামারদের কান্না কিন্তু অশুভ।" পণ্ডিতজি সায় দিলেন। ওদিকে মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ উঠতে শুরু করায় তাঁরা আরও বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হতে শুরু করলেন।

অবশেষে এই 'বিপদ' থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দুখিয়ার মৃতদেহের পায়ে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে টানতে টানতে সেটা নিয়ে গেলেন ঘাসিরাম পণ্ডিত গাঁয়ের বাইরে একটেরেয়। ঘরে ফিরে স্নান করে মন্ত্রজপ করতে করতে চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন তিনি। আর এদিকে মাঠের মাঝে পড়ে-থাকা লাশটাকে শেয়াল-কুকুর শকুন-কাকের দল ছিঁড়ে কামড়ে খেতে লাগল।

আজীবন দেব-দ্বিজে-ধর্মে ভক্তি, মতি রাখার সদ্‌গতি লাভ করল দুখিয়া চামার এইভাবেই।

১০৪.৭ কাহিনী-বিশ্লেষণ

এই কাহিনীর গতিপথ মূলত সরলরৈখিক; তবে দুখিয়ার মৃত্যুর পর, গোন্ড পরিবারের কর্তার সাহস দেবার সূত্রে চামার গোষ্ঠীর নীরবে প্রতিবাদ জানানোর (পুলিশের ভয়—যদিও সেটা অলীক—সেটাও অবশ্য এর পিছনে ছিল) ঘটনাটা কাহিনীরেখায় একটা মোচড়ের সৃষ্টি করেছে;

(১) দুখিয়ার ঘাসিরামকে তোয়াজ করার প্রয়াস পাওয়া

(২) ঘাসিরামের বাড়িতে দুখির বেগার খাটা

(৩) পণ্ডিতের স্ত্রীর কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েও, সেটাকেই দুখির সঙ্গত বলে ভাবা

(৪) পণ্ডিতের কথায় দুখির খেটে একটানা, অভুক্ত অবস্থায় রৌদ্রের মধ্যে চলা

(৫) দুখির মৃত্যু

(৬) চামারদের নীরবে প্রতিবাদ জানানো

(৭) দুখির 'সদ্‌গতি' হওয়া

এই সাতটি ঘটনাকে অবলম্বন করেই 'সদ্‌গতি' গল্পের পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে। কাহিনী-বিশ্লেষণের জন্য এই সাতটি ঘটনাকেই প্রেক্ষিতে রাখতে হবে।

(১) দুখিয়া যে ঘাসিরামকে তুষ্ট করতে এতখানি ইচ্ছুক, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে, আজন্মলালিত সংস্কারের বশে যে এই রকমই জেনে এসেছে যে, (তথাকথিত) বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ঐভাবেই তোয়াজ করতে হয়, কেন না সেটাই (না-কি) তাদের প্রাপ্য। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে (যথা, মনুসংহিতা এবং বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি) অবশ্য এইরকম বিধানই (!) দেওয়া হয়েছে। 'অন্‌পড়্' দুখিয়া চামার শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েনি অবশ্যই; গীতায় প্রথিত ''কর্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন''—ইত্যাদি মর্মের 'ধর্ম'-জ্ঞানও তাকে কেউ দেয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের জনজীবনে—বিশেষত গ্রামীণ সমাজে—বর্ণভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দের কাছে তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় বা অন্ত্যজদের এভাবেই অবনত হয়ে থাকার বিধানটা সুপ্রাচীনকাল থেকে চাপিয়ে রাখা হয়েছে। ''কর্মফল'' ইত্যাদি কথার মাধ্যমে সামাজিকভাবে নিচের তলার মানুষদের শোষণ করার কুটিল অভিসন্ধিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চাওয়া হয়েছে এইভাবেই। শিক্ষাবিবর্জিত অবরবর্গীয় এই দলিতরা বরাবর এটাকে জেনে এসেছে (বা তাদের জানানো হয়েছে) ঈশ্বরের বিধান বলেই। দুখিয়া চামারও সেই দলিতদেরই বর্গভুক্ত। তাই তার পক্ষে ঘাসিরাম পণ্ডিত সম্পর্কে অত বিনমিত মনোভাব পোষণ করা কিছু বিস্ময়ের নয়। তার মতো 'হীন' আদ্‌মির বাড়িতে পণ্ডিতজি নিজে এসে মেয়ের বিয়ের শুভদিন গুণে দেবেন এতবড় 'সৌভাগ্যের' দাম হিসাবে সে তার সাধ্যমতন প্রণামীরও আয়োজন করেছে ঐ জন্যেই এবং সেখানেও তার 'অস্পৃশ্যতা' যাতে কোনও প্রতিবন্ধক-না-সৃষ্টি করে, তার জন্যে সচেষ্ট থেকেছে। (২) এবং (৩) এর ক্ষেত্রেও মূল সামাজিক মানসিকতাটা (১) এরই মতো। তবে এখানে বিপরীত দিক থেকেও সমস্ত বিষয়টা বিচার করার কিছু অবকাশ আছে। ঘাসিরামের বাড়িতে দুখিয়ার নির্বিবাদে এবং নির্দ্বিধায় বেগার খাটতে লেগে যাওয়া এবং 'পণ্ডিতাইন'-এর অপমান ও লাঞ্ছনা পেয়ে সেগুলোকে তার (কল্পিত) অপরাধের সঙ্গত 'শাস্তি' হিসেবে অম্লানবদনে মেনে নেওয়ার পিছনে যে মানসিকতা আছে, সেটার ব্যাখ্যা (১)-এর মধ্যেই মিলবে। নতুন কথা যা, তা হল ঘাসিরাম পণ্ডিত এবং পণ্ডিতগিন্নির মানসিক-রূপটি উদ্‌ঘাটিত হওয়া। ঘাসি পণ্ডিত কতখানি শাস্ত্রজ্ঞ তা অবশ্য এই কাহিনী থেকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে গৃহিণীর মেয়েলি কুসংস্কারগ্রস্ত কথায় সায় দিয়ে যেভাবে তাঁকে ''চামারদের কান্না অশুভ'' বলতে শোনা যাচ্ছে, তাতে খুব একটা জ্ঞানী শাস্ত্রবেত্তা যে তিনি নন, সেটাই ব্যঞ্জিত হচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে বর্ণভেদ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার ইত্যাদি সম্পর্কে যে সমস্ত কুসংস্কার যুগ-যুগ ধরে এদেশের সমাজে চালু আছে, তার দ্বারা তিনি ও তাঁর গৃহিণী স্বভাবতই গ্রস্ত। এরই সঙ্গে হীন স্বার্থবুদ্ধিও তাঁদেরকে প্ররোচিত করেছে দুখিরামকে বেগার খাটাতে (চার আনা পয়সা মজুরি বাঁচানোর লোভে) এবং একটু খেতেও না দিতে। অচ্ছুতের প্রতি ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য দেখানোর প্রতীকী মনোভাব হিসাবে দুখি চামারের মাথায় চিম্‌টের আগুন ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনাটাকেও প্রসঙ্গক্রমে গণ্য করা যেতেই পারে।

(৪) এবং (৫) বস্তুত (১)-(২)-(৩)-এরই ধারানুষঙ্গে হাজির আছে কাহিনীতে। (৫)-কে এর চূড়ান্ত পরিণামের দিকে ঝুঁকি নেওয়া বলেই বুঝতে হবে। নাটক হলে এটাকেই শীর্ষবিন্দু বা ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারত নিশ্চিন্তভাবে।

(৬)-এ কাহিনীর মধ্যে নূতন প্রবণতা সূচিত হয়েছে। গোন্ড পরিবারের লোকটি আদিবাসী জনজাতি হলেও, স্থানীয় বিচারে ব্রাহ্মণদের কাছে অস্পৃশ্য নয় (দুখিয়া তার হাত দিয়েই ঘাসিরামকে 'সিধে' তুলে দেবার

জন্য স্ত্রীকে বলেছিল, তবু সে কিন্তু নিজেকে দলিতবর্গীয় বলে সঠিকভাবেই বুঝেছে এবং ‘অস্পৃশ্য’ চামারদের সঙ্গেই যে তার সামাজিক সঙ্গতি এটাও সে জানে। সে-ই চামারদের প্ররোচিত করে দুখিয়ার ‘মড়া’ না সরাতে, যাতে ব্রাহ্মণরা বিপন্ন এবং বিব্রত বোধ করে—পুলিশের ভয়ে এবং মৃতদেহের থেকে নির্গত পচা গন্ধে! যেভাবেই হোক, নীরব এক প্রতিবাদ (হয়ত, দুর্বল একটা প্রতিরোধও) সংগঠিত হয়েছে এখানে তার নেতৃত্বে, যা (১) এ আলোচিত সমাজ-মানসিকতার বিপ্রতীপ একটি অবস্থানে স্থিত রয়েছে।

(৭)-এর মধ্যে কাহিনীর চূড়ান্ত পরিণাম—যা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বেদনাজর্জর এবং প্রচ্ছন্নে বিদ্রূপ-ধিক্কারে সোচ্চার। প্রেমচন্দ তাঁর সৃষ্টিশীলতা এবং সমাজ-সচেতনতাকে এখানে একটি সূক্ষ্ম-অবিচ্ছেদ্যতায় বেঁধেছেন। গল্পটির নামকরণের মধ্যে সেই বিদ্রুপ আতীব্র হয়ে উঠেছে। তথাকথিত ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে এতখানি শ্রদ্ধাভক্তিশীল ছিল যে দুখিয়া চামার, জীবনে তো সে সমাজের ওপরতলার মানুষদের কাছে কোনও সুবিচার পায়নি—মৃত্যুর পরেও যে তা পেলনা। পক্ষান্তরে, এক চরম অবমাননা এবং উপেক্ষার শিকার হয়ে জঞ্জালের মতো ভাগাড়ে পড়ে রইল সে। পায়ে দড়ি বেঁধে তার মৃতদেহকে কুকুর-বেড়ালের মতো টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে অবমাননা এবং হৃদয়হীনতা দেখানো হয়েছে, সেই নির্মম বাস্তবতাকে প্রেমচন্দ কুশলী আলোকচিত্রীর দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। এতবড় অমানবিকতাকে ‘সদ্‌গতি’ বলে অভিহিত করে তিনি সুকঠিন বিদ্রুপের সাহায্যে যেন সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাকেই ফালা-ফালা করে দিয়েছেন। এমন কথা বললে কিছু ভুল হবে না।

১০৪.৭.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি কদর্য দিককে উন্মোচিত করেছেন প্রেমচন্দ এই গল্পে। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর এই তীব্র ধিক্কার এখনও সমান প্রাসঙ্গিক বলে বুঝতে হবে। মৃত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সারা বিশ্বেই সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি। বর্ণভেদ-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে যে সেটাও মানা হয় না, সমাজের মাথা যাঁরা, তাঁরা মানেন না—এই নির্মম সত্যটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। মৃতদেহকে উপলক্ষ করে অস্পৃশ্যতার সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে, এমন কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে আরও মেলে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প, কিংবা কানাড়া সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক ইউ. আর. অনন্তমূর্তির ‘সংস্কার’ উপন্যাসের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘সদ্‌গতি’ গল্পটির সামগ্রিক আবেদন, ঐ দুটি কাহিনীর মতোই, সমস্ত মুক্তিবুদ্ধি উদারমনা মানুষকে এই ঘৃণ্য ও কদাচার কলুষমাখা সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে উচ্চবিত্ত করে তোলে নিঃসন্দেহে। এই ধরনের শিল্পসৃষ্টি শুধু রসের আবেদনই সঞ্জীবিত করে না সামাজিক দায়বদ্ধতাও সূচিত করে সুনিশ্চিতভাবে।

১০৪.৮ সারাংশ

‘সদ্‌গতি’ গল্পটির উপস্থাপনা সহজ সরল হলেও, দুখিয়ার মৃত্যুর পর গোন্ড পরিবারের কর্তার উদ্যোগে পরিকল্পনায় চামার গোষ্ঠীর নীরব প্রতিবাদ গল্পে নতুন বাঁক নিয়েছে।

এ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে ঘটনা পরম্পরার সাতটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে দুখিয়ারা আজন্ম জেগেছে। ব্রাহ্মণরা বর্ণশ্রেষ্ঠ। আর বর্ণভেদ। স্পৃশ্য—অস্পৃশ্য বিচার মেনেই অন্ত্যজদের চলতে হয়। ব্রাহ্মণদের এ সুবাদে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজদের শোষণ করবার অধিকার আছে। দলিত সমাজ এটা মেনেও নিয়েছে। তাই এহেন অন্ত্যজ-র বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ গণনার জন্য পণ্ডিতজী তার বাড়িতে আসবেন, এতেই দুখিয়া কৃতার্থ। দুখিয়া এরপর নির্দ্বিধায় পণ্ডিত ঘাসিরামের বাড়ি বেগার খাটতে গিয়ে পণ্ডিতাইন-এর কাছে অপমান—লাঞ্ছনা পেয়েও অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে। ওদিকে হীন স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার

অচ্ছুতের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের কারণেই দুখির মাথায় চিম্‌টের আগুন ছুঁড়ে দিয়েছে।

'সদ্‌গতি' গল্পে প্রেমচন্দ যে নূতন মাত্রা সংযোজন করেছেন, তা হোল আদিবাসী জনজাতির গোন্ড পরিবারের লোকটি অন্ত্যজ শ্রেণীর না হলেও, নিজে জনজাতির একজন হিসেবে—অস্পৃশ্য চামারের সঙ্গে তার সামাজিক সঙ্গতি জেনে, চামারদের প্ররোচিত করেছে দুখিয়ার 'মড়া' না সরাতে, যাতে ব্রাহ্মণরা বিপন্ন ও বিব্রত বোধ করে। এও তা নীরব প্রতিবাদ।

দুখিয়া যে ব্রাহ্মণদের এতকাল ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে, তথাপি কোন দিনই সেই ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কোন সুবিচার পায়নি। পরিবর্তে, পেয়েছে অবমাননা, লাঞ্ছনা। ব্রাহ্মণ পরিবারে বেগার খাটতে গিয়ে মৃত্যুর পরও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তার মৃতদেহ কুকুর বেড়ালের মতো টেনে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। লেখক সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আঘাত হানতেই দুখিয়ার প্রতি এহেন অমানবিক আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গল্পের নাম তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে 'সদ্‌গতি' রেখেছেন।

১০৪.৯ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) 'সদ্‌গতি' গল্পে অস্পৃশ্যতার যে-কুৎসিত চিত্রায়ণ করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করুন।

(২) 'সদ্‌গতি' গল্পের কাহিনী-কাঠামোটি বিশ্লেষণ করে দেখান।

(৩) এই কাহিনীর প্রধান ক'টি চরিত্র—দুখিয়া চামার, ঘাসিরাম পণ্ডিত, পণ্ডিতগিন্নি এবং আদিবাসী গোন্ড গোষ্ঠীর মানুষটি—এঁদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

খ) স্বল্পবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) 'সদ্‌গতি' গল্পের নাম তাৎপর্য কী?

(২) প্রেমচন্দ এই নির্মম-কাহিনীর মধ্যেও বিদ্রুপের ব্যঞ্জনা কীভাবে সৃষ্টি করেছেন।

(৩) দুখিয়া চামার 'শাস্ত্র' পাঠ না-করেও বর্ণভেদের নির্মম বিধানগুলি অলঙঘ্য বলে মানতো কেন?

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) আদিবাসী গোন্ড-এর নাম কী?

(২) ঘাসিরাম পণ্ডিত "ঈশ্বরোপাসনার তাৎক্ষণিক ফল" কীভাবে পেতেন?

(৩) দুখিয়ার খাওয়া সম্পর্কে ঘাসিরাম কী মন্তব্য করেছিলেন?

(৪) "চামারদের মধ্যে কেউই মড়া সরাতে রাজি হল না" কেন?

(৫) দুখিয়া কী "পুরস্কার" পেয়েছিল?

(৬) দুখিয়া পণ্ডিতজির কাছে একবোঝা ঘাস নিয়ে গিয়েছিল কেন?

১০৪.১০ উত্তর সংকেত

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) 'সদ্‌গতি' গল্পটি ভাল করে পড়ে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি ব্রাহ্মণ পরিবারের আচরণগুলির মধ্যে যে ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা তুলে ধরুন।

(২) গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণ (২৭) প্রসঙ্গে যে সাতটি ভাগ করে দেখান হয়েছে সেটি এবং তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে 'উত্তর' তৈরী করুন।

(৩) গল্প ও কাহিনী বিশ্লেষণ অংশ পড়ে চরিত্রগুলি সম্পর্কে আপনার অনুভূতিই চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক হবে। একটু চেষ্টা করে দেখুন।

খ) স্বল্প বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) তথাকথিত ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ভক্তিশীল দুখিয়া চামার সমাজের 'ওপর তলার' মানুষদের কাছে জীবনে সুবিচার পায়নি। মৃত্যুর পরেও তা পেল না। অবমাননা ও উপেক্ষার শিকার হয়ে কুকুর বেড়ালের মতো তার মৃতদেহ টেনে নিয়ে ভাগাড়ে স্থান পেল। 'সদ্‌গতি' গল্পে অমানবিকতা, অবমাননা ও হৃদয়হীনতার এই নির্মম রূপটি প্রেমচন্দ সুকঠিন বিদ্রুপের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য গল্পটি একদিকে যেমন সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে পরোক্ষে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে, অপরদিকে শিল্প সৃষ্টি হিসাবে লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় তুলে ধরেছে। এদিক থেকে গল্পটির 'সদ্‌গতি' নামকরণ যথার্থই সার্থক।

(২) ১০৪.৭ এবং ১০৪.৭.১ অংশটি পড়ে উত্তর করুন।

(৩) ১০৪.৭ অংশের প্রথম দিকে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে ভাল করে পড়ে উত্তর লিখুন।

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) গোন্ড ব্যক্তিটির নাম 'চিখুরি'।

(২) ঘাসিরাম পণ্ডিত 'ঈশ্বরোপাসনার শেষে' তাৎক্ষণিক ফল' হিসেবে পেতো দু'চারজন যজমান।

(৩) পণ্ডিতজি বলেছিলেন দুচারটে রুটিতে কী হবে? চামার তো, অন্তত সের খানেক আটা টেনে নেবে। বরং কিছু ভুসি টুসি থাকে তো আটার সঙ্গে মিশিয়ে দুটো দলা বানিয়ে দাও। শালার পেট ভরে যাবে। পাতলা রুটিতে এই সব নিচু জাতের লোকের পেট ভরে না। এদের জোয়ারের মোটা রুটি দরকার।

(৪) দুখির প্রতি পণ্ডিতজির নির্মম আচরণে আদিবাসী গোন্ড চিখুরি তার প্রতি সহানুভূতি পরবশ হয়ে, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে। অবশেষে পণ্ডিতের নির্মম আচরণে, দুখিয়ার মৃত্যু হলে গোন্ড স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে চামারদের পরামর্শ দেয় তারা কেউ যেন মড়া তুলতে না যায়—পুলিশের ঝামেলা হবে। মড়া তুলেছে কি পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

(৫) দুখিয়ার মৃতদেহের পায়ে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে টেনে পণ্ডিতজি গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেলে দেয়। সেখানে শকুন ও শেয়াল আর কুকুর ও কাক মিলে তার লাশ ছিঁড়ে খেতে লাগে। দুখিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি আজীবন ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার এই পুরস্কার পেয়েছিল।

একক ১০৫ ❒ বাচ্চা ❒ ইসমত চুগতাই

গঠন ঃ

১০৫.১ উদ্দেশ্য

১০৫.২ প্রস্তাবনা

১০৫.৩ পটভূমিকা

১০৫.৪ ইসমত চুগতাই ❑ জীবনকথা

১০৫.৫ বাচ্চা ❑ ইসমত চুগতাই

১০৫.৬ কাহিনী-সংক্ষেপে

১০৫.৭ কাহিনী-বিশ্লেষণ

১০৫.৭.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

১০৫.৮ সারাংশ

১০৫.৯ অনুশীলনী

১০৫.১০ উত্তর সংকেত

১০৫.১ উদ্দেশ্য

সাম্প্রদায়িক হানাহানির কলুষকে যে দূর করতে পারে মানবিক আবেগগুলিই—যেমন বাৎসল্য, প্রেম ইত্যাদি, সেইটিই এই গল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে। ধর্মের চেয়ে মানবতা বড়, হিংসার চেয়ে যে প্রেমের শক্তি বেশি—এই চিরন্তন সত্যকে নতুন করে প্রমাণ করেছে এ-গল্প। এখন আমাদের দেশে যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত উত্তরোত্তর ব্যাপ্তি লাভ করছে, তার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধির জাগরণ বিশেষভাবেই প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই গল্প (এবং এর মতো আরও অনেক গল্প-উপন্যাস) চর্চা-চর্যার প্রয়োজন আছে।

১০৫.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তাঁদের লেখার মাধ্যমে। এঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলেন ইসমত চুগতাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, সুব্রহ্মণ্য ভারতী, প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ অগ্রণী লেখকরা এই প্রয়াসে যোগ দিয়েছেন। পরবর্তীদের মধ্যে

এস. ওয়াজেদ আলি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী (বাংলা), ইসমত চুগতাই, সাদাত হাসান মান্টো, কৃষন্‌চন্দর, রাজিন্দার সিং বেদী (উর্দু), ভীষ্ম সাহনী, অজ্ঞেয়, যশপাল (হিন্দি), টি. শিবশঙ্কর পিল্লাই, ভৈকম মুহম্মদ বশির (মালয়ালম), কুলবন্ত সিং বির্ক, কর্তার সিং দুগগাল (পাঞ্জাবি), রাঙ্গেয় রাঘো (সিন্ধী) এবং আরও অনেকেই এই তালিকায় আছেন। ইসমত চুগতাইয়ের 'কাফের', 'আসলি ফর্জ', 'পড়োসন' প্রভৃতি গল্প সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা অত্যন্ত শক্তিশালী গল্প।

১০৫.৩ পটভূমিকা

ইসমত চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১) আধুনিক উর্দু কথাসাহিত্যের অতি-জনপ্রিয় এবং অতি-বিতর্কিত লেখিকা। তিনি, সাদাত হাসান মান্টো, রাজিন্দার সিং বেদী, কৃষন্‌চন্দর ও খাজা আহমেদ আব্বাস গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে উর্দু সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক হিসেবে গণ্য হতেন।

প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে উর্দুই নবীনতম। মুঘল আমলে বাদশাহী সৈন্যশিবিরে দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষরা একত্রে এসে থাকতেন জীবিকার সন্ধানে। উর্দিধারী সৈন্যদের মধ্যে পাস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য ফার্সি, হিন্দি ও কিছু-কিছু অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে গড়ে-ওঠা ভাষার নাম স্বাভাবিক ভাবেই উর্দু হয়েছে। আরবী কিছু শব্দ ও এতে আছে। প্রথম আমলে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই শুধু এই ভাষার চলন ছিল। পরে কবিতা, শায়েরী ইত্যাদি রচিত হতে শুরু করে।

উর্দু কথাসাহিত্য আরও তরুণ। ১৮শ শতক নাগাদ ফার্সি 'দাস্তান' (কাহিনী)-এর মতো কিছু-কিছু গল্প লেখা শুরু হয়েছিল। এগুলি মধ্যযুগীয় রোম্যান্সের ঢঙেই রচিত হতো। যথা-অর্থে আধুনিক গল্প-সাহিত্য লেখার পত্তন হয় ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। নাজির আহমেদ, আবদুল হালিম শরর, রতননাথ সারসার, মির্জা রুশোয়া এবং প্রেমচন্দ-প্রমুখ ছিলেন এককালীন উর্দু কথাসাহিত্যের প্রধান শিল্পী। এঁদের বিভিন্ন রচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা-সম্পৃক্ত বহু সমস্যা চিত্রায়িত হয়েছে।

উর্দু নবীনতম ভারতীয় ভাষা হলেও, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ উর্দুতে কথা বলেন। দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্র করে বিরাট একটি উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী আছে। উত্তর ভারতীয় উর্দুর সঙ্গে তার সামান্য কিছু ফারাকও আছে। ভাষার লালিত্য উর্দুতে অত্যন্ত বেশি—যা বাংলা, মৈথিলি, গুজরাতি, অসমিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সমানভাবে তুলনাযোগ্য। প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই উর্দুকে বিশেষ একটি ধর্মাবলম্বীদের মুখের ভাষা বলেন যদিও হিন্দু-মুসলিম শিখ নির্বিশেষে উত্তর ভারতের বহু মানুষই উর্দুকেই তাঁদের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা (সর্বজনীন ভাষা) হিসেবে মানেন।

১০৫.৪ ইসমত চুগতাই ❑ জীবনকথা

উত্তরপ্রদেশের বদাউনের এক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে ইসমত চুগতাইয়ের জন্ম। দশ ভাইবোনের মধ্যে নবম—এই মেয়ে পরিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই স্কুলে ভর্তি হন এবং স্নাতক উপাধি অর্জন করে শিক্ষকতা শুরু করেন প্রথমে আলিগড়ে এবং পরে মুম্বাইতে। এরপরে অধ্যক্ষতাও করেন তিনি একটি মহিলা শিক্ষায়তনের। স্কুল পরিদর্শকের পদেও নিযুক্ত ছিলেন ইসমত।

উর্দু কথাশিল্পী শহিদ লতিফের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী এবং বড়ভাই মির্জা আজিম বেগ চুগতাই—এই দুজনের সাহচর্যে ইসমত শেকসপীয়র লেখিকা হিসেবেও ধীরে-ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। ছাত্রাবস্থাতেই

তিনি ডস্টয়ভস্কি, মম, চেকভ ও হেনরি-প্রমুখের লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তবে সাহিত্যিক হিসেবে যখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর এক নিজস্ব ভঙ্গীই মুখ্য হয়েছে। কারুর দ্বারা প্রভাবিত হননি তিনি।

গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে যখন ইসমত প্রথম লিখতে শুরু করলেন, তখন মুসলিম অন্তঃপুরের কথা সাহিত্যে প্রায় বর্ণিতই হতো না। তার হাতেই এই বিষয়টি প্রথম দেখা গেল। মেয়েদের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, পুরুষ প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের অসহায়তাকে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি বহুলাংশেই আমাদের আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তুলনীয়।

আদর্শগতভাবে ইসমত বামপন্থী ছিলেন, যদিও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সরাসরি কোনও যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু মেয়েদের মনের কথা, তাদের শোষণ-বঞ্চনার কথা ঐভাবে বলার জন্য অনেকেই ইসমতের প্রতি বিরূপ ছিলেন। যার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে বারংবার অশ্লীলতার অভিযোগ আনার মধ্যে। নারীমুক্তি-আন্দোলন তাঁর সময়ে অশ্রুতপূর্ব ছিল; কিন্তু ভাগবত ক্ষেত্রে সেটারই তিনি প্রসার ও প্রচার করতে চান। অথচ, তাঁর লেখা আদৌ প্রচারধর্মী লিফলেট জাতীয় নয়। শিল্পশৈলী সেখানে কম নেই কিছু। ঝরঝরে ভাষায় এবং সুস্পষ্ট রেখায় চিত্রায়ণ—এটাই ছিল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী। পরিহাস-ব্যঙ্গ-রসিকতা, বিদ্রুপের মশলায় তাঁর লেখাগুলি সুগন্ধী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে উর্দু কথাসাহিত্যে তিনি এক নূতন স্টাইলের পত্তনই করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কোনও ধর্মীয় অন্ধতা তাঁর ছিল না। তাঁর প্রতি অনেকের বিরূপতার সেটাও অন্যতম কারণ ছিল। অশ্লীলতার অভিযোগে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েও, তাঁকে শাস্তি দেওয়া যায়নি। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামিসম্পন্ন মানুষজন তাঁর জীবনাবসানের পর তাঁর ইচ্ছামতো মরদেহ সৎকার করতেও বাধা দেয়, তবে তাও সফল হয়নি। জীবনের মতো মৃত্যুতেও ইসমত ছিলেন অপরাজেয়।

ইসমত মূলত খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের জন্যই। তাঁর বিখ্যাত কিছু গল্পের বই হল ঃ কলিয়াঁ/কুঁড়িগুলি, 'ছুই মুই'/ভঙ্গুর; 'দো হাত'/ দুটি হাত, চোটে/ আঘাতগুলি ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে 'টেড়হি লকির'/বঙ্কিমরেখা, 'মাসুমা'/নিরপরাধ, 'দিল কি দুনিয়া'/হৃদয়বিশ্ব ইত্যাদি খুব পরিচিত। এছাড়াও ভ্রমণকথা, নকশাজাতীয় লেখা, বেতার নাট্য, ছোটদের গল্পও তিনি অজস্র পরিমাণে লিখেছেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল। দেশভাগের ব্যাপারটাও তিনি মন থেকে মানতে পারেননি, এটাও বিশেষ উল্লেখনীয়।

১০৫.৫ বাচ্চা ❑ ইসমত চুগতাই

দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। সরকার দুই দলের লোকজনকে বিনা তদন্তে জেলে পুরতে শুরু করে। অর্থাৎ মারপিটকারী এবং মার খেয়েছে দু'দলকেই। এই গোলযোগের সময় মায়ের অসুস্থতার জন্য রশীদকে আরেকবার বাইরে যেতে হয়। শহরের অলিগলি দেখে মনে হয় যেন পর্দায় সিনেমার ছবি দেখানো হচ্ছে। হঠাৎ লোকজনের ভিড়, আবার গলি একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই গোলযোগের সময় রশীদ একটি উলঙ্গ শিশুকে দাঙ্গাকারী লোকেদের পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা করে আর অতি কষ্টে বাড়িতে নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু বিপদ হল মাকে নিয়ে। মা অসুস্থ তার উপর শিশু প্রতিপালন কি কষ্টকর তা সহজেই অনুমান করা যায়। চাকরটাও গোলযোগের জন্য কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে। বাড়ীতে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। বাড়ী ঝাড়ু দেয়া, রান্না আর মায়ের সেবাযত্ন করতেই রশীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর এই শিশুটাকে, নিয়ে আসার পর থেকে সে যেন সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। শিশুটাকে গোসল আর খাবার দিতে তার দারুণ মুশকিলে পড়তে হয়। দৈনিক চার দফা শিশুকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে তবুও যেন ময়লা থেকে যায়।

গোসলের সময় কয়বার সাবান পিছলে পড়ে গেছে হাত থেকে, শিশু কয়বার বদনা উল্টে দিয়েছে আবার শিশুটি হাত থেকে মাটিতে পড়েছে কয়বার—এর হিসাব কে রাখে।

আর তাকে কাপড় পরানো আর এক ঝক্কির ব্যাপার। রশীদ তার সব বগলকাটা গেঞ্জি পরিয়ে দেয়। আবার সোফার গদির কভারের পালা আর সব শেষে ছেঁড়া কম্বল শার্টের আকারে তার দেহে জড়িয়ে দেয়। তার কামরায় ময়লা আর ভেজা কাপড়ের স্তূপ আর এর মাঝে শিশুটা খেলা করে। গোলযোগ শেষ হলে ছেলেটাকে তার মা বাবার কাছে পৌঁছে দিতেই উদ্‌গ্রীব ছিল সে। কিন্তু তার রুটিনবাঁধা জীবনে ছেলেটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাই তার কাজে মন বসে না। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেটার সাথে খেলা করে কাটায় অর ছেলেটাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠে মানুষ হিসাবে। মাঝে মাঝে রান্নার সময় ছেলেটার সম্পর্কে সে চিন্তা করে আর রাতের ঘটনা সম্পর্কে মনে মনে বিড় বিড় করে নানা কথা বলে।

গোলযোগ শেষ হয়েছে এবং রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাফেরা শুরু হয়েছে যথারীতি। ইতিমধ্যে বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে আর এতিমের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে।

রশীদ শিশুটাকে কোন এতিমখানায় দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ ছেলেটাকে নিয়ে সে রাস্তায় রাস্তায় কার ছেলে কার ছেলে বলে চিৎকার করতে পারে না। একদিন শিশুটাকে যখন তোয়ালেতে জড়িয়ে সে এতিমখানায় নিয়ে যায় তখন তার মনে সত্যি কষ্ট হয়। মনে মনে ভাবে ছেলেটার মা-বাবা কে? এতিমখানা কর্তৃপক্ষ জানতে চায় ছেলের পরিচয়। কিন্তু সে কোন জবাব দিতে পারে না। এতিমখানা থেকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া হয়, যতদিন ছেলের আসল পরিচয় জানা যাবে না ততদিন তাকে এতিমখানায় ভর্তি করা যাবে না। কারণ হিন্দু এতিমখানায় একমাত্র হিন্দুর সন্তান ছাড়া কাউকে নেয়া অসম্ভব। তাছাড়া শহরে কয়েকদিন আগে দাঙ্গা হয়েছে এবং হিন্দু-মুসলমান একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট নয়।

কিন্তু মুসলমান এতিমখানায় গিয়েও তার কোন সুরাহা হল না। এতিমখানার লোকজন তাকে দাঙ্গাকারীদের অন্যতম প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করে বলে, ওরা কোন ফন্দির জালে ফাঁসতে রাজী নয়। এতিমখানার ব্যাপার। আবার গোলযোগ বাধলে নিরপরাধ শিশুটাও আটকা পড়বে এখানে। একথা শুনে রশীদের রাগে গা জ্বলে উঠে। রশীদ নীরবে বেরিয়ে এসে আর একদিকে হাঁটতে থাকে।

ছেলেটাকে একটা পুলের রেলিং এ বসিয়ে বলে, ‘‘আচ্ছা বাবা, বলতো তুমি কে?’’

ছেলেটা তাকে হাসতে হাসতে চড় মেরে বসে।

‘‘হায়.... আমি বলছিলাম কি এখন ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় নয় জনাব। আপনিও সমস্যার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও জাতের ঠিকানা বলুন।’’ সে কথা বলে একটু দূরে সরে দাঁড়ায় যেন ছেলের চড় আবার না পড়ে তার গালে।

ছেলেটা ‘‘উঃ গোঃ’’ বলে মুচকি হাসে আর শার্টের বোতাম দাঁতে কামড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে।

‘‘হায়....এখনও বুঝলেন না।’’ শিশুটাকে কোলে নিয়ে সে আবার চলতে থাকে। শিশু প্রতিপালন তার পক্ষে সম্ভব নয়, অবশ্য চাকরটা বাড়ীতে ফিরে এসেছে। অনেকক্ষণ সে হেঁটেছে। আবার ভাবে, ‘‘যার মাল তাকেই ফেরত দেয়া উচিত।’’ আর ছেলেটাকে রাস্তার পাশে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ছেলেটা কোল থেকে নামতে চায় না।

রশীদের ধারণা ছেলেটাকে রাস্তার ধারে রেখে গেলে কেউ না কেউ তুলে বাড়ীতে নিয়ে যাবে আর সে অন্তত নিষ্কৃতি পাবে। তাকে অনেক ভুলিয়ে বুঝিয়ে সিগারেটের প্যাকেট, কাগজ হাতে দিয়ে একটি জনমানবহীন রাস্তার পাশে বসিয়ে দিয়ে সে ধীরপদে চলতে থাকে।

“ডাঃ ডা” ছেলেটা ডাক দেয়। সে থেমে যায় আবার চলতে শুরু করে। শিশুটা কাঁদতে শুরু করে।

সে মনে মনে বলে, “আমি তোমাকে ডরাই না।” আবার সে দু’ কদম এগিয়ে যায়। ছেলেটা তারস্বরে কান্না জুড়ে দেয়। রশীদ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় কিন্তু আবার এগিয়ে যায়। শিশুর কান্না যাতে তার কানে প্রবেশ না করে তাই দু’হাতে কান চেপে ধরে আর লম্বা কদমে হাঁটতে শুরু করে। শিশুটার কান্না তখনও তার কানে ভেসে আসে। সে থেমে যায়—পিছনে ফিরে তাকায় আবার কিছুদূর এগিয়ে যায়। আবার পেছনে ফিরে আবার হাঁটতে থাকে। অবশ্য সে ছেলেটার দিকেই ফিরে চলছিল।

সে রেগে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় আর কিছুক্ষণ যাবৎ, তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটা আবার কান্নার ভাব করে। রশীদ নীরবে হাঁটতে শুরু করে। ছেলেটা কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন অভিমানী মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আবার তার ছোট নাজুক হাতে সে সজোরে তার গালে চড় কষে দেয়।

“তুমি সত্যি বেরসিক।” রশীদ হাসি চেপে রেখে বলে। শিশুটা আবার দ্বিতীয় বার চড় মারে।

এবার সে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, “আমাকে ক্ষমা করো....জী আচ্ছা।”

আবার সেই কামরা, শিশু আর রোগ নিয়েই তার জীবন। একটি শিশুর কথাকলি আর কান্না। রশীদ শিশুটাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে মনস্থ করে। কিন্তু পুলিশকেই যখন দেয়া প্রয়োজন তখন দুই বা চারদিনের অপেক্ষায় কিই বা যায় আসে? তাছাড়া ছেলেটাকে হস্তান্তরের উপযুক্ত সময়ও পাচ্ছিলনা সে।

❑

একদিন বিজু মায়ের সাথে এসে হাজির হয়। শিশুটাকে দেখে তার পছন্দ হয়। অবশ্য প্রথমে রশীদের বাচ্চা প্রতিপালন নিয়ে অনেক ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে। বিজু শিশুর নোংরা ময়লা কাপড়চোপড় নিয়ে রশীদকে ক্ষ্যাপাতে থাকে।

রশীদ গর্বভরে জবাব দেয় “শিশু পালন অত সহজ কাজ নয়। আমি পনের দিন ধরে একে পালন করছি।” পনের দিন ধরে একে প্রতিপালন করছেন? একি কথা বলছেন?” বিজু হেসে কুটিকুটি। তারপর শিশুর ইতস্তত জড়ানো কাপড়-কাঁথা হাতে তুলে নিয়ে বলে “এই দেখুন....বাহ।” তারপর সবকিছু গোছাতে থাকে।

“আপনি কষ্ট করবেন না। আমি ওকে গোসল করিয়ে সব ঠিক করে ফেলব।” অতঃপর সে শিশুটাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে গোসল করাতে শুরু করে।

বিজুর তির্যক্ দৃষ্টির সামনে রশীদ সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। কয়েকবার গোসলের সময় শিশুটা হাত থেকে পিছলে পড়ে যায়। আর রশীদের পরনের জামাকাপড় ভিজিয়ে দেয় হাত পা নেড়ে। বিজু হেসে কুটিকুটি। বিজুর হাসি দেখে রশীদের অবস্থা আরও কাহিল। শিশুটার চোখেমুখে সাবান লাগিয়ে দিলে বিজু আর বসে থাকতে পারে না ছুটে গিয়ে শিশুটাকে কোলে তুলে নেয়। তারপর বলে, “সরুন তো, বাচ্চাটাকে আপনি মেরেই ফেলবেন।”

“উহ্। তাহলে এতদিন যাবৎ....।” “ছেলেটাকে আধমরা করে ফেলেছেন।” একথা বলে বিজু ছেলেটাকে যথারীতি কোলে তুলে নেয়।

রশীদ ভিজা কাপড় নিঙড়ে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে বলে, “তাহলে আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। দেখা যাক আপনি কি কেরামতি দেখান।”

বিজু শিশুটার গোসল শেষ করে চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। রশীদ ঘাবড়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি আলনা থেকে তার শার্টটা তুলে এনে দেয়। কারণ তার সব চাদর আর তোয়ালে শিশুর পাইখানায় ভর্তি আর ঘরের এক কোনায় সেগুলো স্তূপাকারে পড়েছিল।

“শার্ট দিয়ে মুছব,” বিজু বলে আর রশীদ মাথা চুলকাতে থাকে।

“টেবিল ক্লথের কাপড়টা আনুন।” বিজু অবস্থা আঁচ করতে পেরে মুচকি হেসে বলে।

রশীদ গেঞ্জি এনে হাজির করে, গেঞ্জিটা ধোলাই-করা। বিজু গেঞ্জিটা দূরে ছুঁড়ে মারে আর শিশুটাকে সেই ভিজে তোয়ালেতেই মুছিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। “আজই আমি একে ফেরত দিয়ে আসব” রশীদের কণ্ঠে পরাজয়ের সুর ধ্বনিত হয়।

“আপনি একে আমাকেই দিয়ে দিন।” “আপনি একে নিয়ে কি করবেন। আমি তো একে পুলিশের কাছে দিয়ে দেব। পুলিশই ও কে ওর মা-বাবার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে।” ....“আচ্ছা তা হলে ঠিক আছে—যতদিন শিশুটার মা বাবার খোঁজ পাওয়া না যায় ততদিন পুলিশের অনুমতি নিয়ে আমার কাছেই রাখব।” “আপনি কেন অযথা এই ঝামেলা মাথায় তুলে নেবেন?”

“শিশুটা ঝামেলা হতে যাবে কেন?” শিশুটাকে আদরের সাথে বুকে জড়িয়ে ধরে বিজু বলে।

পুলিশ ছেলেটার মা-বাবার কোন হদিস করতে পারেনি, হয়তো দাঙ্গায় মারা গেছে। বিজু সারাক্ষণ শিশুর দেখাশুনাতেই কাটায়। রশীদ মাঝে-মাঝে ছেলেটাকে দেখতে আসে আর দু’জনার মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। বিজুর হাতে শিশু এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, রশীদ যতই তোষামোদ করুক ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে।

শিশুর লালন-পালন নিয়েও রশীদ আর বিজুর মাঝে ঝগড়া বেধে যায় আর বেশ মজা হয়। রশীদ বলে, মেয়েরা বাচ্চাদের ফ্রক পরিয়ে পুরুষজাতির অবমাননা করে থাকে। আর বিজু তাকে চেয়ারের গদির কভার ও গেঞ্জি পরানোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লজ্জায় ফেলে।

রশীদ শিশুটাকে বিরক্ত করে আর কাঁদায় ফলে বিজু রেগে যায়। সে ছেলেটাকে আজেবাজে নাম ধরে ডাকে। কিন্তু বিজুর ফরমায়েশ ছিল চলচ্চিত্রের নায়কদের নামে তার নামকরণ করার। সে শিশুটাকে সুন্দর-সুন্দর ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শুনায়। অন্যদিকে রশীদ এই সব গানের প্যারোডি করে বিজুকে ক্ষেপায়। বিজু রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে বলে, “আপনি ওর কে। আমার মন যা চায় তাই করব বাচ্চা আমার....।”

“বাহ্। তাহলে সে কি আমার ছেলে নয়? আপনি রাগ করেন কেন?”

বিজু সরল মনে জবাব দেয়, “আমি কখন বললাম আপনার কেউ নয়? বাচ্চা দু’জনেরই।”

রশীদ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, “দুজনারই ছেলে।” বিজুর মাথা অবনত হয়ে আসে আর সে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে পাশের কামরায় চলে যায়।

সাম্প্রদায়িক চেতনা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জানতে পারে যে, একটি মুসলমান শিশুকে হিন্দুর বাড়ীতে লালন পালন করা হচ্ছে। হিন্দুরাও ছেলেটার পক্ষে উঠে পড়ে লাগে তাদের বিশ্বাস শিশুটা কোন উঁচু জাতের হিন্দু সন্তান।

দু’সম্প্রদায়ের ভীতি আর আশঙ্কা পায় আর ইসলাম বিপন্ন হওয়ার অভিমত প্রকাশ করে মুসলমানরা। জাতি কাণ্ডারী ও লেখক পত্রিকার সম্পাদকদের গলাবাজির শেষ ছিল না। তারপর জনসভা হয় আর সভায় শিশুটার ধর্মীয় বিষয়টা অমীমাংসিত থাকায় সকলে ভারতের ধ্বংস সন্নিকট বলে অভিমত প্রকাশ করে। এই শিশুকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বিতাড়িত করে দিয়েছে। যদি চরম পরিণতি স্বরূপ সে সড়কে কুকুরের সাথে উচ্ছিষ্টের জন্য লড়াই করে একদিন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতো, তা হলে কিছু হতো না। অথচ এখন তার ধর্ম, সম্প্রদায় তথা ভারতের সমগ্র জাতির ধর্মের সঙ্গে জড়িত। এই অবস্থা কি কেউ সহ্য করতে পারে না? মামলা অনেকদূর গড়িয়ে যায়। দুই পক্ষই ছেলের জাত-ধর্ম প্রকাশ করার জন্য অনেক সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করে। কিন্তু টানা-হেঁচড়ার অবসান হয় না। দুইপক্ষই জোরে-সোরে চাঁদাসংগ্রহ অভিযান চালায়। ফলে মোটা অঙ্কের তহবিলই সংগৃহীত হয়। কোন ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত

শহরে দুর্গত মানুষের জন্যও এত চাঁদা সংগ্রহের নজির দেখা যায়নি। অথচ গরিব লোকজন যারা ধর্মের কোন অর্থই বোঝেনা তারাও উকিল আর সাক্ষীদের পকেটে হাজারো টাকা ঢেলে দিচ্ছে পানির মতো কারণ দেশের একটি ধর্মের খাতিরে এটা অপরিহার্য।

কখনও মামলার রায় হিন্দুদের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ইসলামি ঝাণ্ডা বাতাসে উড়তে শুরু করে। ''আল্লা হো আকবর'' ধ্বনিতে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলা হয়। টাকাপয়সার খেলা চলে, আর শিশুটা অন্য সম্প্রদায়ের হাতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তক্ষুনি তিলকধারী পণ্ডিত ও জাতের অন্যান্য মোটা-মোটা নেতারা আকাশের সকল দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকে আর শিশুটা পোলো খেলার গুটির মত একবার একদিকে আবার অন্যদিকে ঝুলতে থাকে। মানুষের জীবন নিয়ে এই মনোরম খেলা বেশ জমে উঠে।

মামলা অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়। বিজু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে যে, সত্য প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সে তার শিশুকে ছাড়বেনা। মা-বাবা দারুণ উদ্বিগ্ন। তারা অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু কিছুতে সে মানতে রাজি নয়। সে গোঁ ধরে বসে থাকে। একদিকে শিশুর প্রতি স্নেহ। অন্যদিকে লোকজনের বাড়াবাড়ি আর মামলার লড়াই, তদুপরি তার জেদ, সবকিছু মিলিয়ে তার মানসিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। অবশেষে রশীদও তাকে বোঝাতে শুরু করলে তার মেজাজ আরো বিগড়ে যায়।

মামলায় আদালতের রায় হিন্দুর পক্ষে হোক বা মুসলমানের পক্ষে যাক তাতে তার কি-ই বা আসে যায়। সে শুধু শিশুটাকেই চায়। অবশেষে মামলার রায় হওয়ায় শিশুটাকে অবিলম্বে একটি দলের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এতে বিজুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়।

সে তখন পাগলের ন্যায় চিৎকার করে উঠে ''কখনও দেবনা! এই ছেলে আমার।''

উকিল জেরা শুরু করেন, ''এই শিশু কি সত্যিই তোমার?''

সে পাগলের ন্যায় আবার বলে, ''আমি তাকে দেব না।''

উকিল বলেন, ''এ ছেলে যে তোমার, তার প্রমাণ দিতে হবে।''

বিজু একথা শুনে মাথা নত করে। তাই অবস্থা নতুন সমস্যার উদ্ভব করে।

''কোন মা কি কখনও প্রমাণ করতে পারে যে, তারই গর্ভের সন্তান তার নিজের।''

অপর একজন উকিল বলেন, ''তার প্রমাণ এই যে, সে একটি শিশুর মা আর সে তারই সন্তান।''

আদালতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। জাতের সম্মান আর দুর্নামের প্রশ্ন দেখা দেয়। লালাজী তাকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে যেতে মনস্থ করেন, কিন্তু বিজু কিছুতেই মানতে রাজি নয়।

''নাঃ, আমি বাচ্চাকে ফেরত দেবনা।'' সে শিশুকে বুকে লেপটে ধরে।

''আপনারা কি দেখতে পাননা, শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার কথা শুনতেই মেয়েটার কি করুণ অবস্থা হয়েছে। এরপরও কি আপনাদের কাছে প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে? একটু ভেবে দেখুন। এর পরও কি আপনাদের সন্দেহ আছে?'' উকিল জোর দিয়ে বলেন। মমতার এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য সকলের মনে নাড়া দেয়। অনেকেরই চোখে অশ্রু দেখা দেয়।

কিন্তু জজ ভারি গলায় বলেন, ''তোমাকে প্রমাণ দিতেই হবে। ছেলেটার বাবা কে?''

বিজু ভীত কণ্ঠে বললে ''বাবা?''

''হ্যাঁ ছেলের বাবার নাম বলতেই হবে।''

বিজু পরাজিত। সে জবাব দেয়, ''আমি জানিনা।'' বিজুর চোখে অশ্রু দেখা দেয় আর মাথা নত হয়ে আসে।

‘‘এটা দারুণ অন্যায়। আপনি ভদ্রঘরের এক তরুণীর কাছে তার অবৈধ সন্তানের পিতার নাম জানতে চাচ্ছেন।’’ একজন অ্যাডভোকেট বলেন।

লালাজি ছটফট করে উঠেন, ‘‘এটা ডাহা মিথ্যা।’’ উকিল এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘‘প্রত্যেক মেয়ের বাবার এমনি পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার অধিকার আছে।’’

মামলার বিচিত্র গতি দেখে বিজু বিচলিত হয়ে পড়ে এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ‘‘এটা আমার বাচ্চা নয়।’’

উকিল আঁতকে ওঠেন আর বিষাদভরা কণ্ঠে বলেন, ‘‘হায়, হায় বেচারি গরিব নিঃসহায় মেয়েটা। আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য স্নেহমমতাকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিচ্ছে।’’

বিজু ছেলেটাকে ছাড়তে চাইলে সেটা আরও জোরে তাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে। বিজু আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আবার উকিলের আস্পর্ধা বেড়ে যায়।

‘‘বিংশ শতাব্দীতে এমনি মা-ও রয়েছে। তুমি কি একে এতিমখানায় ছেড়ে আসবে যার ফলে সে বেয়াড়া হয়ে গড়ে উঠবে? তুমি কি সেটা বরদাস্ত করতে পারবে?’’ উকিল বিজুকে জেরা করে বিপাকে ফেলেন। আর তিনি এতিমখানার মারাত্মক অবস্থার করুণ ছবি তুলে ধরলে বিজু হতভম্ব হয়ে পড়ে। সে শিশুটাকে স্নেহের সাথে কাছে টেনে নেয় নিজের মনে বলে, ‘‘আমি ও কে ছাড়তে পারি না।’’

‘‘আর কোনো প্রমাণ, কোনো প্রমাণ? এই শিশু তোমার। তবে শর্ত এই যে তোমাকে তার বাবার নাম বলতে হবে।’’ বিজুর পরিবারের লোকজনের আর্ত চিৎকারের মাঝে জজ রায় ঘোষণা করেন।

বিজুর মাথা নত হয়ে আসে। আবার সে পরাজিত, এক জোড়া আনত চোখ তুলতেই রশীদের চেহারায় গিয়ে পড়ল তার দৃষ্টি। রশীদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া আর ভীতি। উপস্থিত জনতা আকার-ইঙ্গিতে একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকে আর মামলা কি সহজে অনুমান করতে পারে।

রশীদ অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বিজু ছেলেটাকে নিয়ে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে হেঁটে রশীদের কাছে গিয়ে হাজির হয়। ভালবাসার এই করুণ দৃশ্য দেখে সমবেত জনতা অশ্রু সংবরণ করতে পারে না।

এবারে আড়াল থেকে ফেরেশতারা দেখল, দুটি হাত একটি রেজিস্টারে কি যেন লিখছে। এর একটি হাত বিজু অপরটা রশীদের।

❑

এখন দু’জনার মাঝে ছেলেটার ব্যাপারে ঝগড়া হয়। একজন বলে, ‘‘এ আমার ছেলে।’’ অন্যজনও জেদ ধরে বলে ‘‘আমার ছেলে।’’ অবশেষে দু’জনেরই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত আসে ‘‘ছেলে আমাদের দু’জনারই।’’

(অনুবাদ : জাফর আলম)

১০৫.৬ কাহিনী-সংক্ষেপ

ইসমত চুগতাই সারাজীবনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এবং সমন্বয় নিয়ে বহুবারই লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যমননের অন্যতম একটি প্রধান দিকই বলা চলে নির্দ্বিধায়। এই গল্পটিও (মূল উর্দু শিরোনাম : ‘নান্‌হা’) সেই ধারারই অন্তর্গত একটি অত্যন্ত সুন্দর সৃষ্টি। বাৎসল্য, প্রেম, ধর্মীয়-অন্ধতার থেকে মুক্তি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, প্রবল পরিহাস-প্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর যোগফলে এটি গড়ে উঠেছে অত্যন্ত শিল্পসম্মত ভঙ্গীতে। সামগ্রিক আবেদনের বিচারে, এটি কেবলমাত্র উর্দু নয়—সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প বলে গণ্য হয়ে থাকে।

প্রেমচন্দের 'সদ্‌গতি' -র মতোই-এ গল্পের আবেদন এখনও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী; সময়োপযোগী তো বটেই। আজও অস্পৃশ্যতা যেমন, সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধিও ঠিক তেমনই ভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে। এই প্রেক্ষিতে এমন গল্পের চর্চা ও পুনর্মূল্যায়ন একান্তই বাঞ্ছিত।

এই গল্পটিতে ইসমত চুগতাইয়ের পূর্বতন একটি গল্পের ('অন্‌জানে মেহ্‌মান'/অচেনা অতিথি) উত্তরপর্ব বললে ভুল হবে না। এই গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র (বিজু এবং রশীদ) আগের গল্পটিরও মুখ্য কুশীলব)। 'নান্‌হা'/বাচ্চা গল্পটার শিল্পরস এবং এর সামাজিক তাৎপর্যটিকে ভালভাবে বুঝতে হলে আগের কাহিনীটার সঙ্গে একটু পরিচয় থাকা দরকার।

ঐ গল্পে, দাঙ্গা-বিপর্যস্ত শহরের পথে রশীদ মধ্যরাত্রে বাড়ি ফেরার সময় আক্রান্ত হয় একদল খুনি-হাঙ্গামাকারীর দ্বারা। প্রাণের দায়ে সে পাশের গলিতে ঢুকে পাঁচিল টপ্‌কে দোতলার বারান্দা বেয়ে ঢুকে পড়ে আশ্রয় নেয় বিজুর শোবার ঘরে। অবিবাহিতা তরুণী বিজু এমন একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন বোধ করে এবং চেঁচিয়ে বাড়ির সবাইকে ডাকতে যায়। কিন্তু রশীদ কোনওমতে তাকে বোঝাতে সমর্থ হয় ব্যাপারটা কী! বিজুও ততক্ষণে ওকে চিনতে পারে পাড়ার ছেলে বলে এবং আস্তে-আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঠিক এই সময়েই গুণ্ডার দল বিজুদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় : ওরা দূর থেকে দেখেছে যে ওদের ফস্‌কে যাওয়া শিকার বারান্দা বেয়ে সেখানে এসে ঢুকেছে। মমতাপরবশ হয়ে বিজু রশীদকে পরামর্শ দেয় দেয়ালের গায়ে যে-আলমারিটা আছে, তার মধ্যে লুকিয়ে পড়তে, তারপর বাড়ির লোকজন এবং দাঙ্গাবাজদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে বলে। কারুকে না পেয়ে হতাশ হয়ে 'ধর্মপ্রাণ' গুণ্ডারা ফিরে যায়, বিজুও তার মা-কে ভরসা দিয়ে ঘরের বাইরে পাঠায়।

এরপরেই গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়। নিজের একখানা সাদা শাড়ি বার করে রশীদকে সেটা পরায় বিজু। বাঁচার দায়ে সেও ব্যাপারটা মেনে নেয়—যেমন তাকে বাঁচানোর তাগিদে বিজুও সেই বিচিত্র কাণ্ডটি করে বসে! এরপর, আবার বারান্দা থেকে পাঁচিল এবং সেখান থেকে নির্জন গলিতে নেমে রশীদ নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে নিরাপদে হাঁটা দেয়। বিজুও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুস্থির হয়।

এই পূর্বতন কাহিনীর রশীদ, বিজু এখানেও উপস্থিত। এই গল্পেরও পরিপ্রেক্ষিত ঐ দাঙ্গাবিপন্ন শহরটাই। দাঙ্গা স্তিমিত না-হওয়ায় রশীদ পথে বেরোয় না বিশেষ। কিন্তু অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে যেতেই হয় ওকে। ফেরার পথে, ওর চোখে পড়ে একটি পরিত্যক্ত শিশু—কয়েক মাসের বাচ্চা, অসহায় ভাবে শুয়ে আছে ধুলোর ওপর। বেচারি। মায়া পড়ে গেল ওর। বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে আসে ও। সাধ্যমতো ''পরবরিশ'' (লালন-পালন) করার চেষ্টাও করে।

মা অসুস্থ : নিজে অবিবাহিত অল্পবয়সী যুবক। একটা বাচ্চার দেখ্‌ভাল করা কখনও রশীদের সাধ্যগত নয়, তবু সে যেমন পারে—তেমনই পালতে থাকে। ইতিমধ্যে দাঙ্গার সাময়িক বিরতি হয়েছে। নিরুপায় হয়ে রশীদ ভাবে বাচ্চাটাকে কোনও একটা ''এতিমখানায়'' (অনাথ-আশ্রম) জমা করে দেবে। কিন্তু হিন্দু বাচ্চাদের জন্য নির্দিষ্ট অনাথ-আশ্রমে গেলে জানানো হল ওকে যে, ঐ বাচ্চা যে হিন্দু বাপ-মায়েরই সন্তান সেটা না জানলে তাকে সেখানে রাখা যাবে না। আবার অনাথ মুসলিম বাচ্চারা শহরের যে এতিমখানায় থাকে, সেখানে গিয়ে রশিদ প্রত্যাখ্যাত হয়; ওকেই সেখানকার কর্তারা দাঙ্গাবাজ বলে মনে করে।

বেচারা রশীদ বেজার হয়ে বাড়ি ফেরে বাচ্চাসহ। ইতিমধ্যে বিজু একদিন এসে হাজির হয়। রশীদের আনাড়িপনা দেখে মজা পায় ও; হাসতে থাকে। তারপরে, রশীদকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেটার খিদ্‌মতে লেগে যায়। এবং বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যায় নিজের বাড়িতে। কথা দেয় বিজু, পুলিশ ওর মা-বাবার খোঁজ দিলেই তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবে ওকে। কিন্তু সেই খোঁজ আর মেলে না।

দুজনে মিলে পরমানন্দে বাচ্চাটার দেখ্‌ভাল করে। বাচ্চার ''তজ্‌বিজ্‌'' (পরিষেবা) করা নিয়ে দুজনের মধ্যে রাগারাগিও হয়। কিন্তু, ওদিকে শহরে আবার অশান্তি ঘনিয়ে আসে ঐ পরিচয়হীন বাচ্চাটাকে উপলক্ষ

করেই। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ভাবতে থাকেন, হিন্দুর সন্তানকে ‘বিধর্মী’ মুসলমান রশীদের হাতে মানুষ হতে দিলে সনাতন ধর্ম কলুষিত হবে! আবার “পরহেজগার” (ধর্মনিষ্ঠ) মুসলিমরা মনে করতে লাগলেন যে, বাচ্চাটা মুসলমানের “ঔলাদ” (সন্তান), মানুষ হচ্ছে ‘কাফের’ হিন্দু মেয়ে বিজুর হতে, সুতরাং ইসলাম বিপন্ন!

শহরে আবার দাঙ্গা লাগার উপক্রম হয়। একটা মামলাও দায়ের করা হয় আদালতে, শিশুটির মালিকানা কীভাবে সাব্যস্ত হবে তাই নিয়ে। আদালতে প্রচুর টানা-পোড়েন চলে, কিন্তু বিজু অটলভাবে দাবী করে যায়, এ ছেলে তার। হাকিম বলেন, সেটা মানা যেতে পারে যদি বাচ্চার বাবা কে, সেটা জানায় সে আদালতে। অনূঢ়া তরুণী বিজু স্বাভাবিক ভাবেই চূড়ান্তভাবে বিব্রত হয়ে পড়ে এই নির্দেশে। নিরূপায়ভাবে রশীদের দিকে তাকায় ও! রশীদও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

“এবারে আড়াল থেকে ফেরেশতারা (দেবদূতেরা) দেখল দুটি হাত একটি রেজিস্টারে কী যেন লিখছে। এর একটি হাত বিজুর, অপরটা রশীদের।

এখনও দু’জনার মাঝে ছেলেটার ব্যাপারে ঝগড়া হয়। একজন বলে, এ আমার ছেলে। অন্যজনও জেদ ধরে বলে, আমার ছেলে। অবশেষে দুজনেই একমত হয়ে সিদ্ধান্তে আসে, ছেলে আমাদের দুজনেরই।”

....বিয়ের আগেও ওদের দুজনের মধ্যে বাচ্চাটাকে নিয়ে ঠিক এই একই ভাবে-ও-ভাষায় যে ঝগড়া হতো। এখনও সেটাই চলছে।

১০৫.৭ কাহিনী-বিশ্লেষণ

এই গল্পটি গঠনবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খুব উল্লেখযোগ্য। এমনিতে সরলরৈখিক হলেও, যেখানেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে কাহিনীর গতিরেখা বঙ্কিম হবার উপক্রম ঘটেছে। চূড়ান্ত মোড় যেখানে নিয়েছে কাহিনীটি সেখানে গতিরেখা বেঁকে গেছে বটে, কিন্তু তার পরেই আবার আগের মতোই সরলরেখায় রূপান্তরিত হয়েছে।

—(১) বাচ্চাটাকে রশীদের খুঁজে পাওয়া

—(২) হিন্দু অনাথ আশ্রমে রশীদের প্রত্যাখ্যাত হওয়া

—(৩) মুসলিম এতিমখানায় রশীদের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা

—(৪) বিজুর এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে মানুষ করতে শুরু করা

—(৫) বাচ্চার ওপর অধিকার নিয়ে বিজু রশীদের মধ্যে নিয়মিত ঝগড়া হওয়া

—(৬) বাচ্চাটাকে নিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে আবার দাঙ্গার উপক্রম হওয়া

—(৭) আদালতে মামলা ওঠা

—(৮) বাচ্চাটাকে নিজের সন্তান বলে বিজুর দাবী করা

—(৯) বাচ্চার বাবার নাম জানানোর জন্য হাকিমের নির্দেশ দেওয়া

—(১০) বিজু ও রশীদের রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হওয়া

—(১১) সানন্দে দেবদূতদের সেই বিয়ে দেখা

—(১২) বাচ্চাটাকে নিয়ে বিজু আর রশীদের সুখে ঘর-সংসার করা

এই সুনির্দিষ্ট বারোটি গতিবিন্দুকে অবলম্বন করেই এই বিশেষ তাৎপর্যময় এবং সুন্দর গল্পটি বিশ্লেষণ করতে হবে।

(১)-(২)-(৩)-(৪) শহরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ফলে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, একটি অবোধ শিশুরও সেখানে নিরাপদ আশ্রয় দেবার মতো কোনও প্রতিষ্ঠান নেই, সম্ভবত কোনও মানুষও নেই—কেবলমাত্র দুটি তরুণ-তরুণী ছাড়া। সন্দেহ, হিংসা এবং ধর্মান্ধতার ফলে যে-বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সেখানে তারা দুজন ছাড়া বোধহয় আর সকলেই মানবতা, মমতা, স্নেহ, করুণা—সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছে। একটি শিশু—সে তো জাতপাত, ধর্ম, সংস্কার, সম্প্রদায়—সব কিছুরই বাইরে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে তাকে উপলক্ষ করে বলতেই পারি, ''ধরায় উঠেছে ফুটি শুচিশুভ্র প্রাণ (গুলি), নন্দনের এনেছে সংবাদ।'' কিন্তু হায়! ''ইহা (দে)রে করো আশীর্বাদ'' এমন কথা ঐ বিজু আর রশীদ ছাড়া অন্য কারুকে বলার মতো মানুষ সারা শহরে আর কেউই নেই বোধহয়। (৫)-এর মধ্যে দুজনের অগোচরেই ঐ বাচ্চাটিকে অলক্ষ্যসেতু করে নিয়ে বিজু এবং রশীদের ভবিষ্যতের দিনগুলোর পূর্ব-প্রতিভাস ব্যঞ্জিত হতে শুরু করেছে। (৬)-এর মধ্যে আবার তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে (১)-(২)-(৩)-এর পরিবেশই। আসলে বাচ্চাটার 'ধর্ম' কী—এই নিয়ে সংশয় তোলাটা নিছক অজুহাত মাত্র—দুই সম্প্রদায়ের উগ্র-ক্ষিপ্ত মুখিয়ারা সব সময়েই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিরোধ-দাঙ্গা বাধানোর জন্যে লুকিয়ে আছে! বাচ্চাটা নেহাতই একটা উপলক্ষ মাত্র!

(৭) বস্তুতপক্ষে (৬) এরই কিঞ্চিৎ সংযত একটা পরিমণ্ডলকে সূচিত করছে। খুনোখুনির মতো প্রত্যক্ষ হিংস্রতায় না গিয়ে, মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে 'শত্রু'-পক্ষকে (অর্থাৎ, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে) পরাস্ত করার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হচ্ছে নিঃসন্দেহে। তার মানে, পার্থক্যটা শুধুমাত্র মাত্রাগত; ভাবগত নয়।

(৮) থেকে এ-কাহিনী চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোতে শুরু করেছে। এই পর্যায়টি আবার (৪) এবং (৫) -এর স্বাভাবিক ঘটনা-বিবর্তন বলেই বুঝে নিতে হবে। বিজুর অন্তরের মধ্যে নিহিত থাকা সহজাত মাতৃত্ববোধ তাকে স্থান, কাল-পাত্র ভুলিয়ে দিয়েছে। সে ভুলে গেছে যে, সে সম্ভ্রান্ত বংশের অবিবাহিতা মেয়ে! প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে সে যে ঐ শিশুকে নিজের আত্মজ বলে ঘোষণা করেছে—কথাটার সামগ্রিক অর্থ কী দাঁড়াল সেটা না ভেবেই কিন্তু! যখন একরূঢ় সত্যের সম্মুখীন হল সে উকিলি জেরার প্যাঁচে পা-দিয়ে, তখন মুহূর্তের জন্যে লোকলজ্জা তাকে গ্রাস করলেও, প্রায় তৎক্ষণাৎই আবার নিজের ঘোষিত অবস্থানে ফিরে গেল বিজু। সর্বসমক্ষে এভাবে বিব্রত, বিপর্যস্ত হয়েও সে তার দাবীতেই দাঁড়িয়ে রইল। লোকলজ্জাকে ছাপিয়ে গেল হঠাৎ-অর্জিত মাতৃত্বের মহিমময়ী বোধ!

(৯) এখানে স্বভাবতই রশীদেরও একটা ভূমিকা থাকে, থাকতে বাধ্য। তা নইলে শৈল্পিক ন্যায় (পোয়েটিক জাস্টিস) ব্যাহত হয়। বিজুর এই বিপন্নতার মুহূর্তে একমাত্র রশীদই তার পাশে দাঁড়াতে পারে, আর তাই দাঁড়িয়েছেও সে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বিধ্বস্ত বিজু তার পাশে ছাড়া আর কোথায় বা দাঁড়াতে পারে! এবং সেই দাঁড়ানোর মধ্যেই তাদের জীবনের পথসংকেতও সূচিত হয়ে গেল সবার কাছেই, তাদের কাছে তো বটেই। হাকিমের হুকুম তাদের সচেতন করে দিল ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে।

(১০) যে-অন্তরগ্রন্থিতে তারা বাঁধা পড়েছে দুজনে, ঐ কুড়িয়ে-পাওয়া বাচ্চাটাই সেটা ধরে রেখেছে অলক্ষ্যে। কিন্তু অন্তরের সম্পর্কেরও তো একটা সামাজিক অভিজ্ঞান প্রয়োজন হয়। তাই ''দুটি হাত'' সই করে বিয়ের রেজিস্টারে। বাচ্চাটাকে ভালবাসতে-ভালবাসতে তারা দুজনেই তো একই নৌকার যাত্রী হয়ে গেছে কখন অজান্তে। এরপরে তাহলে আর জীবনতরী একই সঙ্গে না-বেয়ে তারা আর থাকে কেমন করে! আলাদা-আলাদাভাবে তারা এতদিন বাচ্চাটার মা এবং বাবার ভূমিকা পালন করছিল। এর পরেও সেই ভূমিকাই বজায় থাকবে তাদের শুধু আলাদাভাবে নয়, একত্রে। একসঙ্গে।

(১১) অন্তরীক্ষ থেকে দেবদূতদের সানন্দে তাদের এই মিলনের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার ব্যাপারটা একটা

রূপক, একটা প্রতীক-ব্যঞ্জনা। দাঙ্গা-কলুষিত ঐ শহরের মানুষদের ক্লিন্ন অন্তরের মধ্যেও, সমস্ত পাপের এবং গ্লানির তমসাচ্ছন্নতায় আবিল আড়ালেও লুকিয়েছিল মানবতা। তাই আলাদতে বিজু-রশীদের মিলন মুহূর্তে মামলাবাজ ধর্মধ্বজীদেরও ‘‘চোখে জল’’ আসে। সেই অশ্রুতে ধুয়ে যায় ‘মনের কোণের সব দীনতা, মলিনতা’, ‘পশু’-র পোশাকের আবডাল থেকে আবির্ভূত হয় ‘মানুষ’—আর এই উদ্‌ভাসনই তাদেরকে পংক্তিভুক্ত করে ফেরেশতাদের সঙ্গে। সন্দেহ নেই, একটি আদ্যন্ত বাস্তবতায় গড়ে তোলা গল্পের মধ্যে এই অলক্ষিত দেবদূতদের উল্লেখ এর মধ্যে রূপকথার স্পর্শ নিয়ে এসেছে!

(১২) এই রূপকথার ছোঁয়া লাগার পরে আর এর ‘ফেয়ারি টেল ফিনিশ’ না-ঘটার উপায় আছে কি! রূপকথায় যে-রকম বলা হয় গল্পের শেষে : ‘‘দেয়ার-আফটার দে লিভ্‌ড হ্যাপিলি ফর এভার!’’—এখানেও তাই-ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। বাচ্চাটাকে নিয়ে সুখের সাগরে ভেসে-ভেসে এরপর থেকে দিন কাটাতে থাকে বিজু আর রশীদ।

১০৫.৭.১ সামগ্রিক মূল্যায়ন

‘অন্‌জানে মেহ্‌মান’ (ইসমত চুগতাই-এর একটি গল্প)-এ রশীদ আর বিজুর মধ্যে যে-পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল, ‘নান্‌হা’-তে তারই পরিপূর্ণ পরিণতি দেখা গেল। প্রথমে বিরক্তি এবং ভয় বিজুকে গ্রাস করলেও, ঐ গল্পে ধীরে-ধীরে তার মনে করুণা, মমতা এবং উৎকণ্ঠা সঞ্জাত হয়েছিল রশীদের জন্যে। ‘নান্‌হা’ গল্পে বিজু-রশীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যে বন্ধুত্ব চিত্রিত হয়েছে, সেটা অসম্ভব বলেই প্রতীত হতো যদি না ‘অন্‌জানে মেহ্‌মান’-এর কাহিনীসূত্র সেখানে অনুসৃত হতো। উত্তর ভারতের যে সাম্প্রদায়িকতাক্লিষ্ট শহরের বাসিন্দা তারা, সেখানে হিন্দু যুবতী এবং মুসলিম যুবকের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়। বিজু, রশীদের বাড়িতে পর্যন্ত যায়টায়, এমনটা তো প্রায় অকল্পনীয় ঐ সামাজিক পরিবেশে, যেখানে অনাথ-আশ্রম অবধি ধর্মের বেড়ায় বিভক্ত!

এই পটভূমিকায়, ইসমত যে-কাহিনী রচনা করেছেন, সেখানে দুই ধর্মাবলম্বী দুজন তরুণ-তরুণী পরস্পরের জীবনসঙ্গী হয়েছে স্বেচ্ছায়। স্বভাবতই এমন একটি সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিমিত। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যের একটি প্রিয় উপজীব্য। এ রকম আরও বেশ কয়েকটি গল্পই লিখেছেন তিনি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে বলতে পারি এই দুটির কথা : ‘কাফের’ (হিন্দু ছেলে পুষ্কর আর মুসলিম মেয়ে মুন্নির বাল্যপ্রণয় যৌবনে পরিণতি পেল বিয়েতে) ; ‘অস্‌লি ফর্জ’/আসলে যা করণীয় (সামিনা বেগম আর তশর ত্রিপাঠি কলেজের বন্ধু : বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, তারপরে বিয়ে; দু-তরফের বাবা-মায়ের গোঁড়ামি এবং হিন্দুয়ানি এবং মুসলমানির পাল্লাপাল্লিকে এড়িয়ে দুজনে বিদেশে পালাল সংসার পাততে)। হিন্দু-মুসলিম ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেম-ভালবাসার কাহিনী ভারতীয় লেখকদের সৃষ্টি অন্যত্রও এসেছে (‘দুর্গেশনন্দিনী’/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; আয়েষা ও জগৎসিংহ; ‘‘বন্দী আমার প্রাণেশ্বর’’—স্মরণযোগ্য আয়েষার সেই বিখ্যাত উক্তি। ‘মুসলমানীর গল্প’/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কমলা ও করীম। ‘চেম্মীন’/চিংড়ি/ টি. শিবশঙ্কর পিল্লাই, মালয়ালম ভাষায় প্রখ্যাত কথাশিল্পী, কারুতাম্মা ও পারিকুট্টি। ‘শেখ আন্দু’/শৈলবালা ঘোষজায়া; লতিকা ও আন্দু। তবে বিবাহ অবধি যাওয়া রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই দেখাননি (বা, দেখানোর মতো করে পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি, নয়ত চাননি)!

এদিক থেকে দেখলে ইসমত চুগতাইয়ের ‘সাহস’ এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধা করবার মতো। প্রসঙ্গত বলি যে তাঁর কন্যা, হিন্দু ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সানন্দে এবং সাগ্রহে সেই বিবাহ দেন। নিজের জীবন আর নিজের সৃষ্টিকে এভাবে পরস্পরের প্রতিকল্প করে তোলার নজির খুবই বিরলপ্রাপ্য যে, সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই গল্পের মধ্যে ইসমতের স্বভাবসিদ্ধ রচনাবৈশিষ্ট্য—পরিহাস-বিজল্পনাও আদৌ গরহাজির নয়। তাঁর

গল্প-উপন্যাসের আর একটি খুব উল্লেখযোগ্য প্রবণতা—মেয়েদের মনের কথার উন্মোচন, সেটিও এখানে অত্যন্ত নিপুণ শৈলীতে করা হয়েছে।

পরিহাস-দক্ষতার কথাটুকুই একটু বলি আগে। বাচ্চা পালনে রশীদের অপারগতা স্বাভাবিক, এবং বিজুর সে-ব্যাপারে মেয়েলি দক্ষতা থাকাটাও সমান পরিমাণে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বাবদে দুজনের অধিকারের লড়াইটা কিন্তু নিতান্তই মজাদার একটা ব্যাপার হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষত প্রথমদিকে যখন আসলে 'ছেলেটো কার' এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া বাধত, তখন ''আমার ছেলে'' বলে দু-জনেই বোঝাতে চাইত নিজের অধিকারের সীমানাটার ব্যাপ্তি। কিন্তু কথার তোড়ে সেটুকু আর বুঝিয়ে বলা হতো না, ফলে মানেটা দাঁড়াত অন্যরকমের। আর ঝগড়া মেটানোর জন্যে যখন দুজনেই একমত হতো ''দুজনেরই ছেলে'' বলে, তখন সেই অন্য রকমের মানেটা আর বেশি দৃঢ়প্রোথিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করত তাদের অজান্তেই! এই রকম একটা পরিস্থিতি গড়ে তোলা—সন্দেহ নেই—বিশেষ ধরনের পরিহাস-দক্ষতা না-থাকলে সম্ভবপর নয়। ''দুজনেরই ছেলে'' এই অসতর্ক, অথচ আবেগ-মথিত উক্তিটা সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় ড্রামাটিক আয়রনি তথা নাটকীয় পূর্বাভাস হিসেবেও গণ্য হবে অবশ্যই।

আবার স্যাটায়ার বা বিদ্রুপ-প্রবণতাও এ গল্পে দেখা যায়—শুধু পরিহাস-তথা-হিউমার নয়। অনাথ শিশুরও জ্ঞাতপাত জেনে তবেই তাকে আশ্রয় দেওয়ার কথা যারা বলে, তাদের সেবাধর্মনিষ্ঠা কতখানি প্রত্যয়যোগ্য সেটা নিয়েও তো সঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠে যায়। অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গীতে ইসমত এই বিবরণগুলি দিলেও একটা সূক্ষ্ম ধিক্কার তার মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর সেই সূক্ষ্ম খোঁচা দিতে পারাটাই তাঁর স্যাটায়ার-দক্ষতার চূড়ান্ত প্রমাণ।

আদালতের দৃশ্য, উকিল-হাকিম-দর্শক—সবাইকে মিলিয়ে যে এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে তো ইসমত স্যাটায়ার-হিউমার মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন। তার আগে যেখানে বড়-বড় জনসভায় ''শিশুটার ধর্মীয় বিষয়টা অমীমাংসিত থাকায় সকলে ভারতের ধ্বংস সন্নিকট বলে অভিমত প্রকাশ করে''—সেখানে বিদ্রুপে শানিত করেই কলমকে চালিয়েছেন তিনি। এই আক্‌চা-আক্‌চির পরিণামেই যখন আদালতে মামলাটা উঠল, তখন মোল্লা এবং পণ্ডিতদের হাস্যকর আচরণগুলোর পাশাপাশি উকিলদের বোকাটে প্রশ্ন এবং হাকিমের ততোধিক বোকামিতে ভরা নির্দেশ একই সঙ্গে হিউমার এবং স্যাটায়ারের উদাহরণ। বোকামি এবং শয়তানি—দুটোই মিশে রয়েছে উকিল-হাকিমের আচরণে সুতরাং ইসমত বিদ্রুপের ছপ্‌টি মেরেছেন তাঁর মানসিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই—যদিচ প্রচ্ছন্নই হয়ে আছে সেটা।

এরপরে মেয়েদের মন-সংক্রান্ত ভাবনার প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারের চিত্রায়ণে পরম দক্ষ ইসমত বিজুর ক্ষেত্রেও নিজের সুনামের মর্যাদা রেখেছেন। মেয়েদের জীবনে আগে আসে প্রেম, তারপরে মাতৃত্বের অনুভূতি—এটাই দেখা যায় সচরাচর। কিন্তু বিজুর ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই ঘটেছে—আগে সে মা (যদিও পরের ছেলের!) তারপরে স্ত্রী (বা, প্রেমিকা)। তার ঐ 'জায়া-ত্ব' বা 'দয়িতা-ত্ব' (যাই বলিনা কেন!) —তাও কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে 'জননী-ত্ব' থেকেই উৎসারিত। এই সুজটিল মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনকে ইসমত গাদাগুচ্ছের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত করে রূপায়িত করেন নি। সূক্ষ্ম বাক্যসংকেতের সাহায্যেই কিংবা অল্প একটু ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাবনার দ্বারাই তা করেছেন তিনি : যথা, আচম্‌কা ''দুজনেরই ছেলে'' বলে-ফেলে বিজুর লজ্জিত হয়ে পড়ার ঘটনাটা কিংবা, আদালতে, ছেলের বাবা কে—এই কুটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বিপর্যস্তভাবে রশীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোটার মধ্যে ঐ মনস্তাত্ত্বিক চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলার পথনির্দেশ মেলে। ঐ একই উক্তি করে ফেলেছিল রশীদও ; তার কিন্তু কোনও ভাবান্তর ঘটেনি। বিজুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, সে মেয়ে বলেই। সেইটেই ইসমত সুকুশল শৈলীতে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন।

সহজাত মেয়েলি সঙ্কোচটা বিজুর চরিত্রে ভিন্নতর কোণ থেকেও দেখিয়েছেন তিনি। আদালতের জেরায় জেরবার হয়ে সে যে একবার নিরুপায়ভাবে বলে ফেলে ''এটা আমার বাচ্চা নয়''—সেটা লজ্জা থেকে বাঁচার

প্রয়াসেও বটে, আবার দিশেহারা হয়েও বটে। অসহায় একটি মেয়ে এই পুরুষশাসিত সমাজে কীভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে— সেটা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছেন ইসমত। বিজু ঐ কথাটা বলে ফেলেছে বটে, কিন্তু সেটা তো ''মুখের বাক্য''—''জননীর অন্তরের কথা'' নয়। মুখের কথা আর মনের কথার এই দ্বন্দ্ব, তার চরিত্রকে আরও 'মাটির কাছাকাছি' নিয়ে এসেছে নিঃসন্দেহে। এই কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে বাচ্চাটাই আছে অবশ্য, রশীদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—বস্তুত সেই কাহিনীকে চালাতে শুরু করেছে সর্বাগ্রে; কিন্তু বিজুর আবির্ভাবের পর থেকে ধীরে-ধীরে সে-ই হয়ে উঠেছে প্রধান। ইসমতও সেটাই চেয়েছেন। বাচ্চাটা এবং রশীদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিজুই পরিণামে অনেক বেশি আন্তরিক হয়ে প্রতিভাত হয় এই গল্পের পাঠকের কাছে।

দেবদূতদের অলক্ষ্য-আবির্ভাব কল্পনা করে ইসমত একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব রসেরও সৃষ্টি করেছেন এই গল্পে। বাস্তবে-কল্পনায় মেশামিশি হয়ে এ যেন 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' সৃষ্টি করেছে। এটা ইসমতের লেখাতেও অন্যত্র দেখিনা কিন্তু, পরিশেযে সে-কথাও বলতে হবে। কাহিনীর শিল্পমর্জি এর ফলে বহুগুণে বেড়ে গেছে।

১০৫.৮ সারাংশ

'বাচ্চা' গল্পটির কাহিনীর বিবর্তন অনুকরণ করে বিশ্লেষণ করলে মোট ১২টি বিন্দুর পরিচয় পাওয়া যাবে। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটির গতি সরলরৈখিক মনে হলেও তার কয়েকটি বাঁক আছে। বস্তুত গল্পটি ১২টি সুনির্দিষ্ট গতি বিন্দুকে অবলম্বন করেই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

চুঘতাই তাঁর আনজানে মেহমানের মত 'নান্‌হা' (বাচ্চা) গল্পের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পরিবেশ থেকে। কেন্দ্রবিন্দুতে একটি 'বাচ্চা'—অবোধ শিশু, যার জাতপাত, ধর্ম, সংস্কার, সম্প্রদায় কিছুই নেই। তাঁর নিরাপদ আশ্রয় দেবার মতো, দুটি সামান্য তরুণ-তরুণী ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

কাহিনী চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ক্রম অগ্রসর হয়েছে তরুণী বিজুর অন্তরে নিহিত সহজাত মাতৃত্ববোধ জাগরণে। সে যে সম্ভ্রান্ত বংশের অবিবাহিত মেয়ে তা ভুলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে আত্মজ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেনি। উকিলি জেরার প্যাঁচে মুহূর্তের জন্য লোকলজ্জা তাকে গ্রাস করলেও পরমুহূর্তে ছাপিয়ে উঠেছে তার হঠাৎ অর্জিত মাতৃত্বের মহিমময়ী বোধ।

বিজুর ক্ষণিক বিপন্নতার মুহূর্তে রশীদ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সেই দাড়ানোর মধ্যেই তাদের দুজনের জীবনের পথ সংকেত সূচিত হয়ে যায়। কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাই অলক্ষ্যে ধরে রেখেছে দুজনকে। সামাজিক অভিজ্ঞানের প্রয়োজনে দুটি হাত সই করে বিয়ের রেজিস্টারে। বাচ্চাটিকে ভালবাসতে বাসতে তারা দুজনে একই নৌকার যাত্রী হয়ে গেছে। নিজেদের অজান্তে। উপসংহারে আড়াল থেকে ফেরেস্তাদের দেখার প্রসঙ্গ উল্লেখে গল্পের শেষটা হয়েছে—অনেকটা রূপকধর্মী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইস্‌মত চুঘতাই-এর একাধিক গল্পের কাহিনীতে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে প্রেম-প্রণয় ও বিবাহ একটি প্রিয় উপজীব্য। সেকুলার ভারতীয় জনজীবনের মত তার সাহিত্যে এটি নানাভাবে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হোল, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্যান্য লেখকেরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে দিতে সাহস করেন নি। এদিক থেকে ইস্‌মত চুঘতাই-এর সাহস ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাই।

ইস্‌মতের গল্প বলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল পরিহাসভ্রষ্টতা। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'বাচ্চা'-র পালন ও লালনে রশীদ ও বিজুর অদক্ষতা ও দক্ষতার বিচিত্র ছবি গল্পে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। শিশুটিকে নিয়ে অধিকারের লড়াইয়ে যে সব মজাদার ঘটনা ঘটেছে, তা সবিশেষ তাৎপর্যবহ। ছেলেটির ওপর দাবী প্রতিষ্ঠার যে ঝগড়া তার অবসান ঘটতো ''দুজনেরই ছেলে'' এই অসতর্ক অথচ আবেগমথিত উক্তিতে—যার সাহিত্যিক তাৎপর্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সীমাহীন।

হিন্দু মুসলিম অনাথ আশ্রমের কর্মকর্তারা যখন শিশুটির জাতপাত নিয়ে ভাবেন, তখন বুঝতে হবে সেবাধর্মের প্রতি প্রত্যয় তাদের প্রধান বিষয় নয়। এক্ষেত্রে সেই আশ্রমকর্তাদের প্রতি সূক্ষ্ম ধিক্কারটাই বোধ করি একালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে লেখক স্যাটায়ার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আর আদালত দৃশ্যে উকিল-হাকিমের বোকামি-শয়তানি নিদ্রিত আবরণ হিউমার—স্যাটায়ারের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ইস্‌মত নারীর মনোবিশ্লেষণে দক্ষ। বিজুর মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। নারী জীবনে প্রেমের আবির্ভাবের পরেই আসে মাতৃত্বের অনুভূতি। কিন্তু বিজুর ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপরীতটাই। আগে সে মা, তার পরে স্ত্রী। তার জায়াত্ব বা দয়িতাত্বর উৎস তার জননীত্ব থেকেই। ইস্‌মত এই জটিল বিষয়টি খুব সংক্ষেপে ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। বিজু যখন আবেগের বশে ‘‘দুজনেরই ছেলে’’ বলে ফেলে লজ্জিত হয়ে পড়ে বা ছেলের পিতৃপরিচয়ের সম্পর্কে বিপন্নবোধ করে সে রশীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের—তার ও রশীদের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইস্‌মত দেখিয়েছেন, ‘দুজনেরই ছেলে’ বলায় বিজু নারী বলেই তার যে ধরনের প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তেমনটি রশীদের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

ইস্‌মত সুকৌশলে, অনেকটা আলতো ভাবে নারী মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম রূপটি দক্ষ শিল্পীর মত ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলত গল্পের সূচনায় ‘বাচ্চা’-কেন্দ্রিক ভাবনায় রশীদ—গতি সঞ্চার করলেও বিজুর অবির্ভাবের পর থেকে সে-ই ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে প্রধান। বোধ করি লেখকের সেটাই ছিল অভীষ্ট।

১০৫.৯ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) ‘বাচ্চা’ গল্পটির মধ্যে সমাজবোধ ও শিল্প-শৈলী কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে, দেখান।

(২) ইস্‌মত চুগতাইয়ের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি-বিরোধী মনটি কীভাবে ‘বাচ্চা’ গল্পে উদ্‌ভাসিত হয়েছে দেখান।

(৩) ‘বাচ্চা’ গল্পে বিজু কীভাবে সত্যি-সত্যিই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির ‘মা’ হয়ে উঠল, বিশ্লেষণ করে দেখান।

(৪) ইসমত চুগতাই ব্যঙ্গ ও পরিহাসে সুনিপুণা লেখিকা ছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি আছে; ‘বাচ্চা’ গল্পে তাঁর সেই দক্ষতা কতখানি দেখা যায়, বিচার করুন।

(৫) রশীদ এই ‘বাচ্চা’ নামে কাহিনীতে ঠিক কোন্ ভূমিকা পালন করেছে বলুন।

(৬) মানবচরিত্র সম্পর্কে ইসমতের যে গভীর অভিজ্ঞতা ছিল, ‘বাচ্চা’ গল্পে তা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে বলুন।

খ) স্বল্পবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) ফেরেস্তাদের প্রসঙ্গ এ-গল্পে কেন, কীভাবে এসেছে?

(২) ‘‘দুজনারই ছেলে’’ এই উক্তির ভাবব্যঞ্জনা কাহিনীকে কতটা প্রভাবিত করেছে?

(৩) বিজু যে হিন্দু পরিবারের মেয়ে, কাহিনীতে প্রথম কখন সেটি বোঝা গেল?

(৪) অনাথ আশ্রম এবং এতিমখানার পরিচালকদের মনোভাব কী ছিল?

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) এই কাহিনীতে তিনজন ‘মায়ের’ কথা আছে; কে কে?

(২) বিজুর বাবার নাম কী?

(৩) রশীদ বাচ্চাটাকে কী পরিয়ে রাখত?

(৪) বিজুর সঙ্গে রশীদের ঝগড়া কী নিয়ে হতো?

(৫) পত্রিকা-সম্পাদকদের ইসমত কী বলে বিদ্রুপ করেছেন?

(৬) ‘‘ভারতের ধ্বংস সন্নিকট’’ কোথায় বলা হয়েছিল?

১০৫.১০ উত্তর সংকেত

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) এ পর্যায়ের প্রশ্নগুলির উত্তর মূল গল্প, প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন অংশগুলি ভাল করে পড়ে তৈরি করুন।

খ) স্বল্প বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) আদ্যন্ত বাস্তবতায় গড়ে তোলা গল্পের শেষে ‘‘ফেরেশতার’ (দেবদূত) উল্লেখ রূপকথার স্পর্শ নিয়ে এসেছে। দেবদূতের অলক্ষ্য আকস্মিক আবির্ভাব কল্পনা এক অনাস্বাদিত পূর্ব রসের সৃষ্টি করেছে। ফলতঃ বাস্তবে কল্পনায় মেশামেশি হয়ে গল্পটিতে ‘ম্যাজিক-রিয়ালিজম’-এর ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এর ফলে কাহিনীর শিল্পগুণ বহুগুণ বেড়ে গেছে।

(২) দুজনারই ছেলে এই উক্তিকে রশীদ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করলেও বিজুর নারীমনে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি সৃষ্টি করে—সহসা তাঁর মনে মাতৃত্ববোধের জাগরণ ঘটে। তাই দেখা যায় বিজুই গল্পের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এক উন্নত শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছে। ইস্‌মত হয়ে উঠেছেন সূক্ষ্মতর নারী মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা; একজন যথার্থ শিল্পী।

(৩) পুলিশের অনুমতি নিয়ে বিজু শিশুটিকে তাঁর কাছে রেখেছিল। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক চেতনা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জানতে পারে যে, একটি মুসলমান শিশুকে হিন্দু বাড়ীতে লালন পালন করা হচ্ছে। তখন হিন্দুরাও সন্দেহ করে সম্ভবত শিশুটি কোন উঁচু জাতের হিন্দু সন্তান। এই বিতর্ক চলাকালে প্রথম বোঝা গেল যে বিজু হিন্দু পরিবারের মেয়ে।

(৪) হিন্দু অনাথ আশ্রমে শিশুটির পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে, রশীদ কোন জবাব দিতে পারে না। অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যতদিন ছেলের আসল পরিচয় জানা না যাবে, ততদিন তাকে সেখানে ভর্তি করা যাবে না। কারণ হিন্দু সন্তান ছাড়া কাউকে সেখানে নেওয়া অসম্ভব।

মুসলমান এতিমখানার লোকজন রশীদকে দাঙ্গাকারী একজন ভেবে, তাঁকে বলে ওরা কোন ফন্দির কালে ফাঁসতে রাজী নয়। আবার গোলযোগ বাধলে নিরপরাধ শিশুটা আটকা পড়বে সেখানে। এই মনোভাবের দরুন সেখানেও শিশুটিকে ভর্তি করা গেল না।

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) রশীদের মা, বিজুর মা, শিশুর মা (বিজু)

(২) বিজুর বাবার নাম লালাজী।

(৩) রশীদ শিশুটিকে তার বগলকাটা গেঞ্জী, সোফার গদির কভার, ছেঁড়া কম্বল শার্টের আকারে দেহে জড়িয়ে পরিয়ে রাখত।

(৪) পত্রিকা সম্পাদকদের ইস্‌মত ব্যঙ্গ করে বলেছেন ‘‘জাতির কাণ্ডারী’’।

(৫) শিশুটির ধর্মীয় বিষয়টি অমীমাংসিত থাকায় ‘‘জাতির কাণ্ডারী লেখক পত্রিকা সম্পাদকরা ভারতের ধ্বংস সন্নিকট বলে অভিহিত প্রকাশ করেছিল।

একক ১০৬ ❑ কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা ❑ জয়কান্তন

গঠন ঃ

১০৬.১ উদ্দেশ্য

১০৬.২ প্রস্তাবনা

১০৬.৩ পটভূমিকা

১০৬.৪ লেখক-পরিচিতি ❑ দণ্ডপানি জয়কান্তন

১০৬.৫ কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা ❑ জয়কান্তন

১০৬.৬ কাহিনী-সংক্ষেপ

১০৬.৭ কাহিনী-বিশ্লেষণ

১০৬.৭.১ গান এবং স্বপ্নের প্রতীক-তাৎপর্য

১০৬.৭.২ ক্ষ্যাপার 'হ্যালুসিনেশ্যন' এবং জাদু-বাস্তবতা

১০৬.৭.৩ তুলনীয় আর কয়েকটি লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

১০৬.৭.৪ শৈলীবিচার ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

১০৬.৮ সারাংশ

১০৬.৯ অনুশীলনী

১০৬.১০ উত্তর সংকেত

১০৬.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১০৬.১. উদ্দেশ্য

মানুষের মনোগহনে যে কত বিচিত্র ধরনের অনুভব-উপলব্ধি ঘটতে পারে, তাই নিয়ে আধুনিক লেখকরা বিশ্বজুড়েই নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই গল্পটিও সেই অন্বেষণকেই একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যঞ্জিত করেছে। মনোবিশ্লেষণ করার সঙ্গে একালের কথাসাহিত্যিকদের কেউ-কেউ (বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায়) কল্পনা এবং বাস্তবে মেশামিশি করিয়ে এক বিচিত্র অভিব্যঞ্জনায় কাহিনীর রূপায়িত করে থাকেন। এই দুই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এ-গল্পটির মাধ্যমে পাঠকেরা আধুনিক কথাসাহিত্যের নূতন দুটি প্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পারবেন, এটিই হল পাঠ্যসূচীতে একে অন্তর্ভুক্ত করার তাৎপর্য।

১০৬.২ প্রস্তাবনা

মানুষের মনে কোন্ কারণে যে কেমন করে কোনও বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি হয়, তা ধরতে পারেন মনোবিজ্ঞানীরা; আর পারেন অন্তর্দর্শী কথাসাহিত্যিকরা। একটি মানুষ—লোকের কাছে যে প্রতিভাত হতো

অস্বাভাবিক বলে—সে কীভাবে স্বাভাবিক মানবীয় অনুভবের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে পারে এবং তার সূত্রেই যে তার জীবনে ট্র্যাজেডিরও অনুভব সর্বব্যাপী হয়ে উঠতে পারে সেই জটিল ওঠা-পড়াই এই গল্পের ভিতকে গড়েছে। এই প্রেক্ষিতে গল্পটি পড়তে হবে আমাদের।

১০৬.৩ পটভূমিকা

তামিল ভারতবর্ষে প্রচলিত জাতীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। সংস্কৃত ভাষায় দৈনন্দিন কথাবার্তা বলেন এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে এবং তামিল যেহেতু প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের মাতৃভাষা—সেজন্যেই তাকে 'প্রচলিত প্রাচীনতম ভাষা' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তামিলনাডু রাজ্য ছাড়াও, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের বড় শহরগুলিতে কর্মসূত্রে স্থায়ীভাবে থাকেন এমন তামিলদের সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ। শ্রীলঙ্কাতে এই ভাষা দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যক মানুষ বলে থাকেন। এ ছাড়াও মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মরিশাসেও তামিলভাষীদের সংখ্যা প্রচুর।

দ্রাবিড় ভাষাবর্গের অন্তর্ভুক্ত এই ভাষায় লিখিত সাহিত্যের বয়সও খুবই প্রাচীন। তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম পর্যায়ের ('সঙ্গম'-যুগ) সময়কাল মোটামুটিভাবে খ্রি. পূ. ৩০০—খ্রি. ৩০০—এই রকমই ধরা হয়। মাদুরাই নগরীকে কেন্দ্র করে পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের সময়ে এই সঙ্গম-পর্বের কাব্য বিকশিত হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে 'তিরুক্কুরল' বা, 'কুরল' (খ্রি. পূ. ২য় শতক) নামে সুবিশাল নীতিকাব্য এবং 'শিলপ্পাদিকরণ' ও 'মণিমেখলাই' (খ্রি. ৯ম শতাব্দী) নামে দুটি মহাকাব্য এই সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ। 'তিরুক্কুরল'-এর রচয়িতা তিরুবল্লুবর এবং মহাকাব্যদ্বয়ের রচয়িতা ইলাঙ্গো আদিগল ভারতবর্ষের সর্বকালের বরেণ্য মহান সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য হন।

এরপরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মহাকবি কম্বন-রচিত 'কম্বারামায়ণ (খ্রি. ১১ শতক)। রামকথার এক ভিন্নতর দার্শনিক তাৎপর্য এই মহাকাব্যে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। 'কম্বনযুগ' প্রায় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭শ শতক থেকে তামিল গদ্যরচনা শুরু হয়, মূলত জনৈক স্পেনীয় যাজক গনসালভেস মাদ্রাজে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে। প্রথম তামিল গদ্যলেখকের নাম তত্ত্ববোধস্বামী (যদিও ইনি আসলে স্পেনীয় ধর্মযাজক রেভা: রবার্ত দ্য রোসিলি)। ইংরেজ আমলে, বেদনায়কম পিল্লাই, গোপালকৃষ্ণ ভারতী, সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী, রাজম আয়ার প্রমুখ লেখকরা গদ্য-পদ্য-নাটক ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটান তামিল সাহিত্যে। বেদনায়কম এবং রাজম যথাক্রমে 'প্রতাপ মুদালিয়র চরিত্রম' এবং 'কমলম্বল চরিত্রম' নামে যে কাহিনীদুটি রচনা করেন, তামিলে সেই দুটি প্রথম উপন্যাস। বিংশ শতকের শুরুতে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর হাতে আধুনিক তামিল সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল। তাঁর 'পাঞ্চালী শপথম', 'কুয়িলপাট্টু', 'কান্ননপাট্টু' প্রভৃতি কাব্য একই সঙ্গে শিল্পগুণে এবং ভাবতাৎপর্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রবল আবেগ তাঁর লেখা থেকে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতীদাসন, কম্বদাসন, রামলিঙ্গম প্রমুখও বিংশ শতাব্দীর তামিল সাহিত্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আসনের অধিকারী। কথাসাহিত্যে এযুগে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিমান, তাঁদের মধ্যে নটেশ শাস্ত্রী, এস. বেঙ্কটরামণী, জে. আর. রঙ্গরাজু, বি. ডি. আয়েঙ্গার, কোদা নায়েকী প্রমুখ। এঁদের কয়েকটি সুপরিচিত উপন্যাসের নাম (যথাক্রমে) : 'জটাবল্লভর', 'মুরুগন', 'চন্দ্রকান্ত', 'কুম্বকনম বকিল', 'ওরে উরুবার্তই' ইত্যাদি। শংকররাম (আসল নাম, টি. এল. নটেশন), পুদুমৈপেত্তন (আসল নাম, এস. বৃদ্ধাচলম), কে. পি. রাজাগোপালন, কল্কি (আসল নাম, আর. কৃষ্ণমূর্তি), দণ্ডপানি জয়কান্তন প্রমুখ আমাদের প্রায় সমকালীন লেখক। গল্প-উপন্যাস রচনায় এঁরা আধুনিক জীবনের বহু বিচিত্র ও জটিল সমস্যাকে সুদক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলছেন। পুদুমৈপেত্তনের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'কডবুল্লুম কন্দস্বামী পিল্লাইয়ুম' কল্কির 'সোলাই মালাই ইল্লবরসী' ইত্যাদি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

১০৬.৪ লেখক-পরিচিতি ❑ দণ্ডপানি জয়কান্তন

দণ্ডপানি জয়কান্ত (১৯৩৪-২০১৫) আধুনিক তামিল কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। মূলত ব্যতিক্রমী ধারার লেখক বলেই তিনি পরিচিত। সমাজের দ্বারা অবহেলিত, উৎপীড়িত মানুষের মনোবিশ্লেষণাত্মক কাহিনী রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর হাতেই একালের তামিল গল্প-উপন্যাস এক নূতন পথের সংকেত পেয়েছে বলে মনে করেন সমালোচক ও পাঠকরা।

জয়কান্তন জন্মেছিলেন দক্ষিণ আর্কট জেলার কুদ্দালোরে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়া তিনি করেননি পারিবারিকভাবেও শিক্ষাসংস্কৃতির পরিবেশ পাননি তিনি। প্রথম বয়সে তিনি দারিদ্র্য এবং সামাজিক বিভিন্ন অবিচারের শিকারও হন। হয়ত এর ফলেই তিনি সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চারও শুরু হয়। তামিলোলি নামে তাঁর একটি পার্টি-সহকর্মীর প্রেরণায় বই পড়া এবং গল্প লেখার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন—যার ফলশ্রুতি, উত্তরকালে তামিল কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। তামিলোলি ছাড়াও, প্রখ্যাত লেখক বিন্দৌ-ও তাঁকে প্রথম আমলে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন গড়ে উঠতে।

গ্রামে থাকার সময়ে, বাল্যকাল থেকেই কুথু' (পথনাটিকা) দেখতে বিশেষভাবে ভালবাসতেন জয়কান্তন। সম্ভবত, সেই বাল্যস্মৃতির অনুষঙ্গেই প্রথম দিকে তিনি নাটক এবং সিনেমার চিত্রনাট্য লিখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের বাজারি-চাহিদা মেটাতে গিয়ে পরিচালক-প্রযোজকরা হামেশাই তাঁর লেখার ওপরে কাঁচি-কলম চালাতে থাকলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জয়কান্তন নাটক-চিত্রনাট্যের পরিবর্তে গল্প-উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য নিজেও চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগ নিয়ে একবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। অল্পদিন পরে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শেরও বদল ঘটল এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি। জয়কান্তন কয়েকটি সংবাদপত্রেরও সম্পাদনা করেছিলেন। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব প্রগ্রেসিভ রাইটার্স-এর তামিলনাডু রাজ্যশাখার সভাপতিও ছিলেন তিনি। সাহিত্য আকাদেমির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন তিনি অনেকদিন ধরে। 'সিলা নেরাঙ্গালিন সিলা মানির্থাগল' (কখনও কোনও মানুষ, ১৯৭০) উপন্যাসের জন্য ১৯৭২ সালে তিনি আকাদেমি-পুরস্কারেও সম্মানিত হন। এছাড়াও 'সোভিয়েট ল্যান্ড' এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সম্মান তিনি অর্জন করেছেন। জয়কান্তন বেশ কয়েকটি উপন্যাস এবং প্রায় ২০০-রও বেশি ছোটগল্প লিখেছেন। এখনও লিখে চলছেন তিনি। তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত বইটি ছাড়াও, বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো হল এইগুলি : 'প্যারিসিক্কুপা' (প্যারিস যাওয়া, ১৯৬৬), 'ওরু নাডিগাই নাটকম পার্ককিরাল' (এক অভিনেত্রীর দেখা নাটক, ১৯৭৩), 'ওরু মাসিজন, ওরু ভীডু, ওরু উল্‌গান' (একটি মানুষ, একটি বাড়ি এবং একটি পৃথিবী, ১৯৭০)। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনগুলির মধ্যে 'যুগসন্ধি' (১৯৬৩), 'জয়কান্তন সিরুকথাইকাল' (জয়কান্তনের গল্পসংগ্রহ, ১৯৭৩) খুবই পরিচিত পাঠক সমাজে। 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পটি এই বইতেই আছে।

জয়কান্তনের ছোটগল্প এবং উপন্যাস তামিল কথাসাহিত্যে, এমন কিছু সামাজিক এবং মানবীয় সমস্যার উপর আলোকপাত করেছে, যা বস্তুত অভাবিতপূর্ব ছিল তাঁর আগে। তামিল কথাসাহিত্যে এক ধরনের সুস্পষ্ট রক্ষণশীলতা ছিল, জয়কান্তনের লেখায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। এমন মানুষেরা তাঁর লেখার প্রধান-সব চরিত্র হয়ে আসতে লাগল, যারা উপেক্ষিত ছিল। রক্ষণশীল সমাজে যে-ধরনের সমস্যায়-পড়া মানুষকে ঠেলে সরিয়ে-দেওয়া হতো বা এখনও হয় এক প্রত্যন্তে, তাদের মানসিক বিপর্যয় এবং পারিপার্শ্বিকগত সমস্যাকে মানবিক মমতা এবং সহানুভূতির সঙ্গে তিনি দেখেছেন এবং তাদেরকে নিজের নিজের অবস্থানে থেকেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার ছবিও এঁকেছেন। এই সব কারণে তিনি পাঠকসমাজে অত্যন্তই জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, একটা মহলে তাঁর সম্পর্কে বিরূপতার ভাবটা কিন্তু থেকেই গেছে, যার অনেকটাই রাজনৈতিক কারণবশত।

জয়কান্তন বহুসময়েই গল্প-উপন্যাসে জটিল প্লটের অবতারণা করেছেন। তাঁর ভাষায়—বিশেষত বাক্যের অন্বয়গত গঠনেও একটা জটিল শৈলী লক্ষ্য করেছেন তামিল সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরা, যেটাকে ওঁরা মনে করেছেন ঐ সব জটিল প্লটের বিন্যাসকে সাজাতে সহায়তাই করেছে। যেমন, তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'কখনও কোনও মানুষ'-এর নায়িকা গঙ্গা, তার জীবনে এক ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে যাবার পর যে-প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা এবং নৈরাশ্যের শিকার হয়েছিল, সেটাকে জয়কান্তন বিচিত্র অথচ জটিল কিছু স্বাগতবাচন এবং একক সংলাপের অনুষঙ্গে এমনভাবেই সাজিয়েছেন যাতে করে ঐ ধর্ষিতা মেয়েটির সামাজিক, পারিবারিক, এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ের দুর্জ্ঞেয় টানাপোড়েনগুলি সুদক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এই মানসিক জটিলতার রূপচিত্রণ আমাদের আলোচ্য গল্পটির মধ্যেও ঘটেছে। 'ক্ষ্যাপা' বলে পরিচিত, অনুল্লেখিত নামা অন্‌পড় শ্মশানকর্মীর মনের মধ্যে আবেগ-জনিত জটিল ওঠা-পড়ার যে চিত্রায়ণ এখানে ঘটেছে, তার ভাষাগত প্রেক্ষিতটা অনুবাদে না মিললেও, ভাবগত পটভূমিটি কিন্তু দুরূহবোধ্য নয়।

১০৬.৫ কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা ❑ জয়কান্তন

দূর থেকে দেখলে মনে হবে—কুঞ্জবন। কিন্তু আসলে ওটা কুঞ্জবন নয়, শ্মশান। শ্মশানের চারিদিকটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সবুজ লতাপাতা বেয়ে বেয়ে পাঁচিলটাকে ছেয়ে ফেলেছে। সেই পাঁচিল-ঘেরা শ্মশানভূমির পশ্চিম কোণে তালপাতায় ছাওয়া একখানি কুঁড়েঘর।

এখানেই ক্ষ্যাপার আস্তানা। কুঁড়েঘরের সামনে নিমগাছের ডালে বাঁধা দোলনায় সুখে নিদ্রা যাচ্ছে তার একমাত্র আদরের ছেলে ইরুল। ওদিকে পাঁচিলের ধারে শুকনো কাঠখড় কুড়োচ্ছে স্ত্রী মুরুগায়ি।

ক্ষ্যাপা হলেও তার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে। আসলে ও স্বভাবে ক্ষ্যাপা নয়, ওর নামটা শুধু ক্ষ্যাপা। ক্ষ্যাপার সেই বাসস্থানটি দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঠিক যেন কুঞ্জবন।

ক্ষ্যাপা থাকে শ্মশানে, পেশায় ডোম। শ্মশানভূমিতে যেসব মৃতদেহ আসে, তাদের কবর খোঁড়াই ওর কাজ। এই কাজের জন্য ম্যুনিসিপালিটি ওকে মাইনে দেয় মাসে সাত টাকা, আর দিয়েছে শ্মাশানে মাথা গোঁজার মতো একটি কুঁড়ে।

ক্ষ্যাপা যেন কেমন ধারার লোক। না, ঠিক পাগল নয়। ও যখন মনের খুশীতে গান গায়, তখন শোকতাপক্লিষ্ট সংসারী মানুষের পক্ষে মনে করাই স্বাভাবিক যে লোকটার ধরণ-ধারণ একটু আলাদা। ওর দেহে না আছে অবসাদ, মনে না আছে বিষাদ। বছর চল্লিশেক বয়স, অথচ কাজকর্মে এত চটপটে, যেন কুড়ি বছরের যুবক।

অর্থ বুঝুক, আর না-ই বুঝুক, তারস্বরে সর্বদাই সে গান করে একখানি গান—পুরো গান নয়, গানের কয়েকটি কলি—

কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে,
দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি।
অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসী,
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।

যখন গর্ত খোঁড়ার কাজ থাকে না, তখন ও ব্যস্ত থাকে কুঞ্জবনের কাজে। ওরই কঠোর পরিশ্রমে শ্মশানের মতো একটা রুক্ষ জায়গা পরিণত হয়েছে ছায়ানিবিড় কুঞ্জে।

শোক যে কী বড় তা ও জানে না। ছোট ছোট ছায়া গাছে জল দেয় অথবা মৃতদেহের জন্য গর্ত খোঁড়ে— সর্বদাই কর্কশ কণ্ঠে সেই গান। সংসারে যেন দুঃখকষ্ট বলে কিছু নেই এমনি নির্বিকার চিত্তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওর গলার শিরাগুলো পর্যন্ত ফুলে ওঠে।

ক্ষ্যাপার কথাই যদি বলেন, তার কাছে এ গানের কোনো মানে নেই। সে গেয়ে চলে কেবল অভ্যাসের বশে।

মৃতদেহ এখানে দাহ করা হয়না, মাটিতে পোঁতা হয়। তাই বেশির ভাগ আসে শিশুদের শব। তিন ফুট লম্বা এবং তিন ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া ক্ষ্যাপার কাছে কোনো কাজই নয়। ধুতিটা মালকোঁচার মতো পরে, মাথায় শক্ত করে পাগড়িটা বেঁধে নিয়ে সে যখন পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়ায়, তখন তার হাতের কোদালখানা অতি অনায়াসে শূন্যে ও মাটিতে ওঠানামা করে। আর কোপের পর কোপে নরম মাটির বড় বড় চাঙর এ পাশে উল্টে উল্টে পড়ে।

'অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসী,
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।....'

ওই 'তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া' কথাগুলোর উপর জোর দিয়ে গাইতে গাইতে সে যখন মাটির বুক বিদীর্ণ করে, তখন তাকে দেখলে মনে হবে যে অর্থ বুঝেই সে গান গাইছে। আসলে কিন্তু গানের প্রকৃত অর্থ সে কিছুই জানে না।

আচ্ছা, ও গানখানি শিখল কীভাবে? কোথায়? আমরাও কি বলতে পারি আমাদের জানা প্রত্যেকটি শব্দ কবে ও কোথায় শিখে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলাম? কিন্তু বিশেষ একটি শব্দ নিয়ে যদি খুঁটিয়ে ভেবে দেখা যায়, তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তার উৎস বলে দিতে পারবেন। ক্ষ্যাপাও যে কবে ও কোথায় এই গানটা প্রথম শেখে, একটু ভেবে দেখলে তা সে বলে দিতে পারে।

❑

একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর চোখ দুটো ডলতে ডলতে খাটিয়ায় উঠে বসে ক্ষ্যাপা যে দৃশ্য দেখল, তাতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। কুঁড়েঘরের দুয়ারে 'কোরেই' ঘাসের বোনা মাদুরে তখনও অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছে স্ত্রী মুরুগায়ি। তখনও তার ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু এমনটি তো কোনোদিন হয়নি। তাদের বিয়ে হয়েছে আজ পনের বছর। এই পনেরো বছরে একদিনও ক্ষ্যাপা এমন ব্যাপার দেখেনি যে সে ঘুম থেকে উঠেছে অথচ মুরুগায়ি, শুয়ে আছে।

ক্ষ্যাপা হাঁক দিল—'অ্যাই....মুরুগায়ি...'

মুরুগায়ি উঠল না, পাশ ফিরে শুলো। খাটিয়া ছেড়ে ক্ষ্যাপা উঠে গিয়ে স্ত্রীর কাছে বসল। 'গা-টা গরম হয়েছে নাকি?' —এই ভেবে সে স্ত্রীর কপালে হাত দিয়ে দেখল। না, সে সব কিছু নয়। 'মুরুগায়ি' এই বলে সে আবার নাড়া দিল।

আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে মুরুগায়ি একবার চোখ মেলে তাকাল। স্বামীকে সামনে বসে থাকতে দেখেই সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। চোখেমুখে কেমন একটা হতবুদ্ধির ভাব। ক্ষ্যাপা উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞাসা করল—'কী মুরুগায়ি, কী হয়েছে?

'কিছু নয়... হাতে পায়ে কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা....সারা শরীরটা কে যেন পিটিয়ে দিয়েছে...বোঁ বোঁ করে মাথাটা ঘুরছে.... বলতে বলতে তার কালো চোখের পাতা মিট মিট করে খুলে গেল।

'একটা স্বপ্ন দেখলাম।'

'কী স্বপ্ন গো?'

মুরুগায়ি চোখ ডলতে ডলতে হাই তুলল।

'স্বপ্নে দেখলাম....একটা পোকা....কালো....ছোট মতো....' বলতে বলতে তার শরীরটা কেঁপে উঠল।

'হুঁ, তারপর?'

'বলতে গিয়ে, দ্যাখো, শরীরটা কেমন শিউরে উঠছে গা।....সেই কালো পোকাটা এগুতে এগুতে আমার হাতে এসে উঠল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হল্‌দে রঙের হয়ে গেল....উঁহু, হলুদ রঙ নয়, সোনালী রঙ, সোনার মতো চক্‌চকে....সেটা আমার হাতে বসে যেন বলল—'আমাকে খাও, আমাকে খাও'....।

'হুঁ, তারপর?'

'খাও খাও' বলতে বলতে আমার হাতটাকে চিবোতে শুরু করল। আমার কেমন যেন বুদ্ধি-সুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়ে একটা আচ্ছন্নের ভাব দেখা দিল। ....ছি, ছি, সামান্য একটা পোকা আমার কাছে এসে বলে কি না—'আমাকে খাও, আমাকে খাও?' কীরকম সাহসটা দেখলে? আমরা তো আর ওকে খাব না, তাই ওর এতটা সাহস, কী বলো?...

বলতে বলতে মুরুগায়ির চোখ মুখ লাল হয়ে এল।

'হ্যা গা, সারাটা শরীর কেমন যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। দু আঙুলে ওই পোকাটাকে ধরে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে কচ্‌মচ্ করে....ওয়াক্....ও....।'

কথাটা শেষ করতে পারল না মুরুগায়ি। গা-টা ঘুলিয়ে উঠল। একটা বমি বমি ভাব নাড়ি-ভুঁড়িতে মোচড় দিতেই ঘাড় ও গলার শিরাগুলি ফুলে উঠল—মাথাটা ভার-ভার, চোখ দুটো লাল। শ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

'ওয়াক্....ও...। ওগো, সেই পোকাটা আমার পেটের মধ্যে ছুটোছুটি করছে গো....'।

আবার একটা ওয়াক শব্দ। তল-পেটটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মাথাটা নীচু করে বসে রইল মুরুগায়ি। সমস্ত নাক-মুখ বমিতে ভেসে যাচ্ছে।

'ওগো, সেই পোকাটা পেটের মধ্যে....'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল ক্ষ্যাপা। একটা চাপা উল্লাসে তার সমস্ত শরীর ছেয়ে গেল।

পনেরো বছর ধরে যে ঘটনা ঘটেনি....

কতকাল ভেবেছে, ভেবে ভেবে নিরাশ হয়েছে, নিরাশ হয়ে এইটুকু সার বুঝেছে—'নাঃ হবার নয়।' অবশেষে যখন ভুলেই গিয়েছে সে কথা....

এমনি একদিনে শরীর কাঁপিয়ে, নাড়ি-ভুঁড়িতে মোচড় লাগিয়ে মুরুগায়ির বমি দেখা দিল।

ক্ষ্যাপা হেসে উঠল—'অ্যাঁ?....তাই নাকি? হা-হা-হা....মুরুগায়ি, তাই নাকি?....হা-হা-হা....'

'ওয়াক্....ও....'

মাথা নীচু করে উবু হয়ে বসে আছে মুরুগায়ি। তাকে জড়িয়ে ধরে ক্ষ্যাপাটা হেসে ওঠে।

'হা-হা--হা....তাই নাকি গো, তাই নাকি?...'

প্রবল বমির সঙ্গে একটা চাপা আনন্দের হাসিও দেখা দেয় মুরুগায়ির চোখে। 'শুনছ গো, পেটের মধ্যে কেমন ওলট পালট হচ্ছে....আর সহ্য হয় না। ও।' এই বলে বেশ নির্জীব হয়ে পড়ে মুরুগায়ি।

'চুপ করে শুয়ে থাক গো, অমি চট্ করে আমাদের বডিবেলু হাকিমের কাছ থেকে একটা কিছু ওষুধ নিয়ে আসি।' এই বলে ময়লা চাদরটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁধের উপর চাপিয়ে ক্ষ্যাপা রওনা হল।

মুরুগায়ি হাসল।

'অ্যাই। একটু চুপ করে বসো না তুমি। লোকে শুনে হাসবে যে।'

'তোমার অবস্থাও তো চোখে দেখে বসে থাকা যায় না, গো।'

'তুমি দেখ কেন?....এখান থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াও না কেন?'

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ক্ষ্যাপা গিয়ে শ্মশানভুমির প্রবেশ পথে দাঁড়াল।

ঠিক সেই সময়ে সেই পথে যাচ্ছিল এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী—আত্মভোলা সুরে এই গানটি গাইতে গাইতে—

'কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে,
দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি।
অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসি,
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।....'

এতদিনের অভিজ্ঞতায় জানতে পারে নি, এমন একটা নতুন অনুভূতির আনন্দে তন্ময় হয়ে ক্ষ্যাপা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আর তার মনের মধ্যে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল নির্ভুল তাল-লয় সমন্বিত সেই গান। আর সেই সন্ন্যাসীও যেন ক্ষ্যাপার মনে গেঁথে দেবার জন্য গানের ওই চারটি পংক্তিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে থাকল। সেদিন থেকে ক্ষ্যাপাও নিজের অজানিতে সেই গানটা গেয়ে গেয়ে আনন্দে নৃত্য শুরু করে—

'কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে...'

❑

হাজার হাজার মানুষের মরদেহ যেখানে এসে পুঁতে ফেলা হয়, সেই শ্মশানভূমিতে জন্ম হল একটি মানুষের।

ক্ষ্যাপার একটি ছেলে হয়েছে।

যেদিন মাতৃগর্ভ হতে শিশু জন্মলাভ করে, সেদিন ক্ষ্যাপার আনন্দ দেখে কে?

সর্বক্ষণ শিশুকে কোলে নিয়ে সে আদর করে।

শত শত শিশুর মৃতদেহের জন্য যে হাত দু'খানি গর্ত খোঁড়ে, সেই হাতেই সে প্রিয় পুত্রকে বুকের কাছে নিয়ে খুশী হয়।

নিজের শিশুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে যে ক্ষ্যাপার আনন্দ ধরে না, তারই হাত দুটো গর্ত খোঁড়ার কাজে এগিয়ে আসে শহরের মৃত শিশুদের জন্য।

মানুষের পুত্রশোকের বেদনা তার বুদ্ধির অতীত।

ছোট ছেলে যেমন গোলাপ গাছের ডাল দিয়ে কলমের চারা করবার জন্য মাটি খোঁড়ে, ক্ষ্যাপাও তেমনি নিশ্চিন্ত মনে গান গাইতে গাইতে কবর খুঁড়তে থাকে।

একবার সে ফিরে তাকায় তারই পাশে মাটিতে শোয়ানো কচি শিশুর মৃতদেহের দিকে, একবার সে ফিরে তাকায় অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই শিশুর পিতার দিকে— হৃদয়বিদারী শোকেও যিনি আত্মসংবরণ করে রয়েছেন। কিন্তু ক্ষ্যাপার মনে দয়া নেই, মায়া নেই, এতটুকু কোমলতা নেই। তার গান সমানেই চলতে থাকে।....

ছি ছি! এও কি একটা মানুষ।....সকলেই তাই ক্ষ্যাপার বিষয়ে বলতে শুরু করে—'ওই এক ধারার লোক।'

গর্ত খোঁড়া শেষ হলে সোজা সে ছুটে যায় তার কুঁড়েঘরের দিকে। দোলনায় ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে। খুশীতে মন ভরে ওঠে।

সেই খুশী, সেই আনন্দ, সেই গান, সেই মত্ততা—সব কিছুর মূলে একটিমাত্র কারণ : সন্তান ইরুল....

দুটি বছর পরে....

কত পিতা-মাতার—কত আনন্দ স্বপ্নের সমাধি-স্থল সেই শ্মশানভূমিতে থেকেও ক্ষ্যাপা মৃত্যুরূপী অমানুষিক শক্তিকে বিস্মৃত হয়ে, কেবল জন্মরূপী রহস্যের মধ্যেই লীন হয়ে আছে। সেই ক্ষ্যাপার একদিন....কী আর বলব?.... ছেলেটি মারা গেল।

একটি শিশুপুত্র লাভের জন্য বিষণ্ণ অন্তরে কত প্রার্থনা জানিয়েছিল এই ক্ষ্যাপা-দম্পতি। বছরের পর বছর অপেক্ষা করে এক সময়ে যখন সন্তান-লাভের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তারা ভুলে যেতে বসেছিল, তখন একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আশা চরিতার্থ হওয়ার নিদর্শন দেখা দিল। তারপরে ইরুলের জন্ম। এই নবজাত শিশু নিজের খেলাধুলো দিয়ে বাপ-মায়ের মনে স্নেহ জাগিয়ে, স্বপ্ন বাড়িয়ে, তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ দুদিনের অসুখে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল।

সমস্ত আশা ভরসা মিথ্যা হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে মুরুগায়ির কান্নার আর বিরাম নেই।

শোকের পর শোক জমাট বেঁধে সেখানকার মাটিতে স্তূপাকার করে দিয়েছে সেই শ্মশানভূমি এই সদ্যোমৃত শিশুর মায়ের আর্তনাদে আকুল হয়ে উঠল।

নিমগাছের ডালে বাঁধা শূন্য দোলনাটার কাছে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ক্ষ্যাপা বসে আছে।

কোথায় স্থির হয়ে আছে তার শূন্য উদাস দৃষ্টি কে জানে....সেই দৃষ্টির সামনে কত দিনের কত কী টুকরো ছবি....যা কিছু দেখেছিল সেই সব....যা আর কোনোদিন দেখা যায় না....

ওই তো ইরুলের ছবি।

পাঁচিলের ধারে ধারে তার হামাগুড়ি দিয়ে চলা....ঘুম ভেঙে গেলেই দোলনার উপর থেকে কেবল মাথাটা বাড়িয়ে টোলপড়া হাসিমুখে 'বাবা' বলে ডাক দেওয়া....

গাছপালায় জল দেওয়ার কালে ক্ষ্যাপার অজানিতে পিছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরার আনন্দে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠা....

দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে এসে সমুখে রাখা বাপের ভাতের থালায় হাত ঢুকিয়ে দেওয়া এবং আঙুলগুলির মধ্যে লেগে থাকা দু'একটা ভাতের কণা চিবিয়ে মনের আনন্দে হেসে ওঠা....

দিনে রাতে যখন তখন বাপের বুকের উপর এসে উবু হয়ে ঘুমিয়ে থাকা....সে সবই কি মিথ্যা? মোহ?....স্বপ্ন?....মরীচিকা?

নিঃসাড় হয়ে মাটির পুতুলের মতো বসে আছে ক্ষ্যাপা।

ছেলেটা যে-মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরেছে, যে-সমস্ত খেলনা নিয়ে খেলা করেছে, যে-সব আধো আধো কথা বলেছে—সেই সবই ভেবে ভেবে ক্ষ্যাপার দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ওদিকে কুঁড়েঘরের মধ্যে পড়ে আছে ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণহীন দেহ। মুখেচোখে ভন্ ভন্ করা মাছি। কপালে চন্দনের তিলক কালো হয়ে আসা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, যে মুখ থেকে এখনও দুধের গন্ধ ছাড়েনি সেই মুখের কচি দাঁতগুলি চকচক করছে। শিথিলভাবে হাত-পা ছড়ানো।

—গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন? না, চিরনিদ্রায় নিমগ্ন।

অসহায়ভাবে ছড়ানো শিশুর হাতদুখানিকে মা সন্তর্পণে তুলে বুকের উপর ভাঁজ করে রাখল। মুখে চোখে ভিড় করে আসা মাছিগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে একটুকরো কাপড় দিয়ে শিশুকে আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

অবশেষে....

কর্তব্যের ডাকে তো সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।

❑

ঘরের কোণ থেকে ক্ষ্যাপা কোদালখানা তুলে নিল—বেদনাতুর চোখে গলদশ্রুধারা, তোয়ালেটি মাথায় পাগড়ির মতো জড়ানো। হলুদ রঙে ছোপানো বস্ত্রখণ্ডে ছেলেকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সে পা বাড়াতেই একটা আর্তনাদ এসে ভেঙে পড়ল—'ওগো, আমার রাজাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মাটিতে লুটিয়ে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনে মুরুগায়ি ছটফট করতে লাগল। স্বামীর পা দুটো জাপটে ধরে এমনভাবে আঁকড়ে রইল যে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া ক্ষ্যাপার আর কিছু বোধকরি করবার নেই।

হাতে পুত্রের মৃতদেহ, বুকের মধ্যে শোকাগ্নি, পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়া এক হতভাগিনীর মাতৃহৃদয়। কাঁধের ওই কোদাল দিয়ে সে কি এমন কবর খুঁড়তে পারবে যাতে এই সমস্ত শোক চাপা পড়ে যায়?

এক হাতে মৃত সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আর একহাতে শক্ত করে কোদালের হাতলটাকে চেপে 'মুরুগায়ি—কেঁদোনা তুমি' এই কথা বলতে গিয়ে ক্ষ্যাপা নিজেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। পরক্ষণেই স্ত্রীর মুঠি থেকে পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

—এতদিন ধরে সে কেবল মানুষের মরা দেহটাই দেখে এসেছে। সেই দেহের পশ্চাতে যে কী গভীর শোক তা জানা ছিলনা তার।

সেদিন সেই কুঞ্জবনের প্রকৃতিলোকে কি আনন্দ উচ্ছ্বাস। গাছপালা থেকে গুচ্ছগুচ্ছ নতুন ফোটা ফুল শ্মশানভূমির চারিদিকে বিছানো। ক্ষ্যাপা এগিয়ে যাচ্ছে তার মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে।

ওই 'পন্নীর' গাছের তলায় ছেলের জন্য কবর খুঁড়তে হবে। গাছটা যে চিরকাল ধরে এই শিশুর উপর সুগন্ধ ফুল বর্ষণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছেলের দেহটিকে মাটির উপর শুইয়ে দিল ক্ষ্যাপা। কাঁধের কোদালখানা হাতে নিয়ে শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটো শূন্য আকাশের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জল ছাপিয়ে এল সেই উদ্‌ভ্রান্ত চোখে। দুঃসহ শোকে নাক ও ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। কোথায় কী যেন একটা আটকে রয়েছে বুকের মধ্যে।

হৃদয়কে লোহার মতো কঠিন করে কোদালটা তুলে নেয় ক্ষ্যাপা। হাত দুটো কাঁপছে। মাটির উপর দাঁড়াতে পারছে না, পা দুটো কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। উঁচিয়ে তোলা কোদালটাকে ফেলে দিয়ে 'বাবাগো' বলে চিৎকার করে শিশুর মরদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্ষ্যাপা।

অনেকক্ষণ ধরে তার প্রিয় পুত্রের—যাকে আর কোন দিনই দেখা যাবে না সেই পুত্রের মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমাট বেঁধে রয়েছে যেন।

এক হাত দিয়ে নিজের বুকটাকে শক্ত করে চেপে ধরে, আর এক হাতে কোদাল তুলে নেয় ক্ষ্যাপা। পা দুটো ফাঁক করে চোখ বুজে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে শুরু করে।

সেই গান। কিন্তু সে তো গায় নি।....অন্য মৃতদেহের জন্য গর্ত খুঁড়তে গিয়ে তার দুঃখবোধ শূন্য নির্বিকার চিত্তে স্বতই যে গান, আজ কে গাইল তা?....আবার সে কোদাল তুলে মাটিতে কোপ দেয়।....

'কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে....'

আবার সেই শব্দ।... কার কণ্ঠ ?...সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে আবার সে কোদাল নিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করে। কিন্তু আবার সেই গান :

‘কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে,
দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি....’

আঃ! এতদিনে গানের অর্থ পরিষ্কার হ’ল!....ক্ষ্যাপা কোদালটা ফেলে দিয়ে ফিরে তাকায়—স্তম্ভ বিদীর্ণ করে যেমন নৃসিংহ অবতার আবির্ভূত হয়েছিল, কবরের উঁচু ঢিপি ভেদ করে মাটির বুক থেকে তেমনি বেরিয়ে এল একটি সুন্দর শিশু। তাল দেওয়ার ভঙ্গীতে হাততালি দিতে দিতে ক্ষ্যাপার দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে গান করছে :

কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে,
দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি,
অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসী,
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।’

কথাগুলি এক হয়ে, আবার পৃথক হয়ে, পুনরায় মিশে গিয়ে এক প্রবল ঐকতানে জেগে উঠল। সেই শ্মশানভূমিতে কতকাল আগে সমাহিত প্রথম শিশু থেকে কাল পর্যন্ত কবর দেওয়া হয়েছে—তারা সকলেই জীবন্ত শরীরী হয়ে একযোগে শিশুকণ্ঠের কান্নার সুরে হাততালিসহ গাইতে গাইতে চারিদিকে নৃত্য শুরু করে দিল।

আত্মবিস্মৃত ক্ষ্যাপা উচ্চস্বরে হেসে উঠল। ওই যে তার ছেলে ইরুল—সেও দেখছি, ওই বালকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নৃত্য করছে, তাল দিচ্ছে। গানও গাইছে। সেই গানখানি—

‘কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে....’

দলবদ্ধ হয়ে ধাবমান শিশুদের মহাসমুদ্র থেকে তার সন্তান ইরুলকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ক্ষ্যাপা ছুটল।....ইরুলকে দেখা গেল না....অনেক খুঁজল, কিন্তু দেখা গেল না....কেবল ইরুলকেই দেখা গেল না। সমস্ত শিশুরা একই রকম দেখতে। যে মহাসমুদ্রে আমার, তোমার, তার—সমস্ত ভেদরেখা মুখে গেছে, সেখানে কেবল ইরুলকেই কীভাবে খুঁজে বার করবে? হতাশায় মনমরা হল ক্ষ্যাপা।....গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

❑

‘পন্নীর’ গাছের তলায় ছেলের শবদেহের পাশে ক্ষ্যাপা মুখ গুঁজে পড়ে আছে দেখে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল মুরুগায়ি। স্বামীকে কোলের উপর তুলে নিয়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগল। ধীরে ধীরে ক্ষ্যাপা চোখ মেলে তাকাল। ভাগ্য। সে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে।

❑

এখনও ক্ষ্যাপা সেই কুঞ্জবনেই থাকে। কিন্তু আগের মতো আর গান গায় না।

শ্মশান ভূমিতে নিয়ে আসা মৃতদেহের উপর চোখ পড়তেই তার বুকটা হুহু করে উঠে। এখন সে প্রত্যেকের শোকেই কাতর বোধ করে। কিন্তু এখনও ওই অঞ্চলে সকলেই বলে থাকে—‘ক্ষ্যাপা যেন কেমন ধারার লোক।’

(অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

১০৬.৬ কাহিনী-সংক্ষেপ

এই গল্পের অন্তর্নিহিত করুণসুরটিই এর শিল্পমর্জির আধার। শ্মশান এবং শ্মশানকর্মীর সুখশোককে অবলম্বন করে ভারতীয় কথাসাহিত্যে খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। বাংলা সাহিত্যের তিনটি বিখ্যাত রচনা এর ব্যতিক্রম অবশ্য ঃ কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা', রমেশচন্দ্র সেন এবং সুবোধ ঘোষের দুটি ছোট গল্প 'ডোমের চিতা' আর 'শ্মশানচাঁপা'-র কথা এই সূত্রে মনে করা যেতে পারে।

এই গল্পটি আবর্তিত ও পরিণত হয়েছে এক শ্মশানকর্মীকে কেন্দ্র করে। তার আসল নাম সকলে ভুলে গেছে। সাতটাকা মাস মাইনে পাওয়া পৌরসভার নিযুক্ত এই ডোমের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষ্যাপা। শ্মশানেই তার মাথা গোঁজার কুঁড়েঘর। লোকটা ''ঠিক পাগল নয়....মনের খুশীতে গান গায়....দেহে না আছে অবসাদ, মনে না আছে বিষাদ।'' তার অহোরাত্রের কর্মস্থল—তথা—আবাসভূমি এই শ্মশানে মৃতদেহ ''দাহ করা হয় না, মাটিতে পোঁতা হয়। তাই বেশির ভাগ আসে শিশুদের শব।'' ছোট-ছোট গর্ত খুঁড়ে ও সেগুলিকে নিজেই নিজেই সমাধিস্থ করে এবং অবিরাম গান গেয়ে চলে, যার মর্মার্থ হল :

> ''কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপনমনে,
> দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি।
> অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসী,
> তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।''

এ গান সে কোথায় শিখেছে এখন আর তা কেউ জানে না। শিশুদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা, আর শ্মশানের ধারের পুষ্পবনটির পরিচর্যা করা—এই নিয়েই তার দিন কেটে যায় ঐ গানটি অবিরতভাবে গাইতে গাইতেই। এই সবটুকুই হল, তার বর্তমানের ভাবরূপ। তার আগের কথাটুকু এইবারে বলব।

এই ক্ষ্যাপার স্ত্রী মুরুগায়ি একদা সন্তান-সম্ভাবিতা হল। ক্ষ্যাপা ব্যাপারটা বুঝতে পারল স্ত্রীর স্বপ্নে-দেখা একটা বিচিত্র বিবরণ শুনে এবং তারপরে তার শারীরিক কিছু উপসর্গ দেখে। দিন যায়, স্ত্রীর একদিন প্রসববেদনা ওঠে। ক্ষ্যাপা ছোটে বডিবেলু হাকিমের বাড়িতে; পথে দেখা এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে—তিনি গান গাইতে গাইতে পথে চলছিলেন : সেই গান—সেই 'কুঞ্জবনে-থাকা-ক্ষ্যাপা'-র গান। এ-গল্পের নায়ক (পরে যে, 'ক্ষ্যাপা' বলেই পরিচিত হয়েছে) সেই প্রথম শুনল ঐ গান এবং নিখুঁতভাবে গানটা আয়ত্তও করে ফেলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

অসংখ্য শিশুর মরদেহ যেখানে সমাধিস্থ হয়ে আছে, সেখানেই জন্ম নিল একটি ছেলে—ক্ষ্যাপা আর মুরুগায়ির সন্তান। যে-দুটি হাতে ক্ষ্যাপা অজস্র শিশুকে কবর দিয়েছে এত বছর ধরে, সেই দুটি হাতেই সে আদর করে সন্তানকে, তার পরম স্নেহের ইরুলকে। আবার খানিক পরেই গান গাইতে-গাইতে হয়ত কবর খোঁড়ে সে, আর কারুর সদ্যোমৃত সন্তানকে সমাধিস্থ করতে হবে বলে।

দু-বছর পরে আকস্মিকভাবে একদিন ইরুলেরও জীবনাবসান ঘটে গেল। মুরুগায়ি কান্নায় ভেঙে পড়লেও, ইরুলকে মাটির তলায় সমাধিস্থ করল ক্ষ্যাপা। তখন তার গলায় আর সেই গান নেই, সন্তানের শোক যে কী, তা সে এতদিনে অনুভব করেছে। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে হাতের কোদালটা ফেলে দিয়ে একবার ডুক্‌রে উঠল সে, ঝুঁকে পড়ল নিজের সন্তানের মৃতদেহের উপর।

হঠাৎ তার কানে আসে সেই গান। সে তো গায় নি! কে গাইল? হঠাৎ, তার কাছে গানটার অন্তর্লীন গভীর, গম্ভীর অর্থটুকু পরিষ্কার হয়ে উঠল! এতদিন ধরে সে ঐ গানটা অজস্রবার গেয়ে এসেছে, কিন্তু কোনও দিনই মানে বোঝাবার চেষ্টাও করেনি, মানেটা বোঝেও না! কিন্তু এখন কে গেয়ে উঠল ঐ গান?

হঠাৎ (যেন) তার চোখের সামনে মাটির সমাধি ভেদ করে উঠে এল একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর বাচ্চা! 'হাততালি দিতে দিতে ক্ষ্যাপার দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে গান করছে।'' সে-ই গান! যা এতকাল ক্ষ্যাপাই গেয়ে এসেছে।

ক্ষ্যাপার মনে হতে লাগল, ‘‘সমাহিত প্রথম শিশু থেকে কাল পর্যন্ত যে শিশুর কবর দেওয়া হয়েছে—তারা সকলেই’’ (যেন) বেঁচে উঠেছে, আর সবাই মিলে হাততালি দিয়ে নাচছে ক্ষ্যাপার চারদিকে, ঐ গানটাই গাইতে গাইতে। তার ছেলে ইরুলও (যেন) তাদের দলে মিশে গেছে! ক্ষ্যাপা তাকে ধরবার জন্য দু-হাত বাড়াল ব্যাকুল হয়ে—কিন্তু আর তাকে দেখা গেল না। সব শিশুগুলিই (যেন) একই রকম দেখতে—কারুরকেই আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছেনা! ক্ষ্যাপা ধীরে ধীরে ‘‘গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।’’

ছেলের মৃতদেহের পাশে স্বামী মুখ গুঁজে শুয়ে আছে দেখে ছুটে এল মুরুগায়ি—তার হাহাকার আরও তীব্র হয়ে উঠল। ‘‘ধীরে ধীরে ক্ষ্যাপা চোখ মেলে তাকাল।’’....তার মৃত্যু হয়নি।

এখনও সে ঐ শ্মশানধারের কুঞ্জবনের কুঁড়েতে থাকে। কিন্তু আর সে গান গায় না। যত শিশুর মৃতদেহ আসে সেখানে, সবকটিকে দেখেই সে কাতর হয়ে উঠে (হয়ত, প্রত্যেকের মুখেই সে ইরুলেরই মুখ দেখে)। কিন্তু সকলে তাতেও তার সম্পর্কে বলে, ‘‘ক্ষ্যাপা যেন কেমন ধারার লোক।’’

১০৬.৭ কাহিনী-বিশ্লেষণ

ঘটনাগতভাবে এই গল্পে বিশেষ-কিছু বৈচিত্র্য বা ওঠা-পড়া দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, এর মধ্যে ভাবগত রূপান্তর খুব ব্যাপক। একটা প্রতীকধর্মী গান সেই রূপান্তরের সংকেত বহন করে। আবার কাহিনীর শেষ দিকে, ক্ষ্যাপার একটা আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাবার ব্যাপারও ঘটে গেছে। সবটুকু মিলিয়ে এই কাহিনীর মধ্যে এক ধরণের দার্শনিক প্রতীতিও সঞ্জাত হয়েছে যে, সে ব্যাপারে সংশয়ের অবসর নেই।

ক্ষ্যাপা নামে যে মানুষটি এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার মধ্যে প্রথম দিকে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। ফুলের মতো যত ফুট্‌ফুটে বাচ্চাদেরও কবর দেবার সময়ে তার মনে কোনও বেদনার অনুভব হয় না, গান গাইতে-গাইতে সে মাটি খোঁড়ে। মানবিক-আবেগ তার মধ্যে প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা গেল, যখন স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনার কথা সে জানল। একটা লৌকিক সংস্কারও তার মনে সক্রিয় ছিল, সেটাও তার চরিত্রের না-জানা একটা দিককে এই সূত্রে ব্যক্ত করেছিল। সেটা হল সমাজের আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে একরকম করে ভাবা—যাকে মনোবিজ্ঞানে ‘সোস্যাল সাইকি’ বলে।

সন্তান-বাৎসল্য ক্ষ্যাপাকে অনেকখানি স্বভাবিক করে তুলল। তারপর হঠাৎ সেই সন্তানের মৃত্যু তাকে একটা ঘোরের মধ্যে ঠেলে দিল যেন। তার গান গাওয়া তখন স্তব্ধ; অথচ চতুর্দিক থেকে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে-গাইতে অসংখ্য মৃত শিশু মাটির তলার কবর থেকে উঠে এসেছে বলে তার মনে হচ্ছে। তার নিজের সদ্যোমৃত সন্তানও যেন সেই সমস্ত মৃত শিশুদের সমবেত সঙ্গীতে অংশ নিয়েছে!

এই ‘হ্যালুসিনেশ্যন’ (কল্পনায় অনুভব-করা কোনও-কিছুকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করা; এটাও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি সুপরিচিত শব্দ) গল্পটার মধ্যে একটা নূতন মাত্রাও সংযোজন করেছে। বাস্তবে-কল্পনায় মেশামিশি হয়ে এক ধরনের ‘জাদু-বাস্তব’ (ম্যাজিক-রিয়্যালিজ্‌ম; লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যে এই ব্যাপারটি বহুলভাবে দেখা যায়। গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজ, আলেহো কার্পেন্তিয়ের, হুয়ান রুলফো প্রমুখ দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অগ্রগণ্য উপন্যাসিক-গল্পকারই এই ব্যাপারটিকে নিজেদের সৃষ্টিশৈলীর অন্তর্গত করেছেন)-এর সৃষ্টি করেছে। এরপর থেকে ক্ষ্যাপার গলায় আর কখনওই কেউ কোনও গান শোনেনি বলে, সেটাই আবার তার ক্ষ্যাপামি হিসেবে অন্যদের কাছে মনে হয়েছে।

কাহিনীর ক্রমান্বিত গতিটি নিচের সারণির মাধ্যমে বোঝানো হল :

—(১) শ্মশানের ডোম ‘ক্ষ্যাপা’ শিশুদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে নির্বিকারভাবে গান গেয়ে-গেয়ে।

—(২) গানটা সে শিখেছিল এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনে, অনেক আগে।

—(৩) স্ত্রী-র মুখে বিচিত্র এক স্বপ্নের কথা শুনে তার সংস্কারবন্দী-মন উল্লসিত হল।

—(৪) মুরুগায়ির কোলে ছেলে এল—ইরুল।

—(৫) দু-বছর কেটে গেল তারপরে।

—(৬) ইরুলের মৃত্যুর পর, ক্ষ্যাপা তাকে সমাধিস্থ করতে গেল—গান না গেয়ে, এই প্রথমবার।

—(৭) ক্ষ্যাপার মনে হল শতশত মৃত শিশু যেন সমাধি থেকে উঠে এসে তাকে ঘিরে নাচছে, গাইছে—তার সেই গানটাই।

—(৮) ঐ গানের দলে যেন ইরুলকেও দেখল সে।

—(৯) গানটার অন্তর্বিলীন অর্থটা ক্ষ্যাপা এবারে বুঝতে পারল।

—(১০) ক্ষ্যাপার মুখে আর গানটা শোনা যায় না।

১০৬.৭.১ গান এবং স্বপ্নের প্রতীক-তাৎপর্য

ক্ষ্যাপার মুখের গানটিকে অর্থহীন বলে মনে হয় বটে প্রাথমিকভাবে, কিন্তু সমস্ত গল্পটুকু পড়ার পরে এর আসল তাৎপর্য যে কী, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে জীবনের সাদা-সাপ্টা সরল সত্য, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা ‘শাস্ত্রীয়’ আধ্যাত্মিকতা, লৌকিক-সংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয় বিমিশ্র রূপকের মাধ্যমে প্রতিবেদিত করা হয়েছে। গানটির প্রথম চরণটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাময় হলেও, লোকে এটাকে ‘ক্ষ্যাপা’-রই আত্মকথন বলে ধরে নিয়েছে। তার ‘ক্ষ্যাপা’ নামটাও তো তৈরি হয়ে গেছে এই সূত্রেই। কিন্তু এই ব্যবহারিক অর্থের আড়ালে যেটা লুকিয়ে আছে, তা হল এই ‘‘কুঞ্জবন’’ আসলে, বিশ্বদুনিয়া; এবং ‘‘ক্ষ্যাপা’’-এর প্রকৃত অর্থ, মানুষ। ‘‘দশটি মাস’’ তার গর্ভস্থ অবস্থাটার সূচক; ‘‘কুমোর ভাই’’ তার নির্মাতা, অর্থাৎ ঈশ্বর। ‘‘মাটির কলসি’’ তার মরদেহের রূপক। আর সেটাকে ‘‘ভাঙা’’ হল, নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তি।

এই কলসি-ভাঙার ব্যাপারটার মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মোড়কে জড়ানো একটা লৌকিক সংস্কারও নিহিত রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারটাই আগে বলি বরং; হিন্দুশাস্ত্রীয়-প্রতীতি অনুযায়ী, এই দেহের মধ্যেই যে-ব্রহ্মাণ্ড—তার ‘খ’ অর্থাৎ আকাশ হল ঘটবন্দী জলের মতো; ঘটাকাশ। আর বৃহত্তর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে গগন, তা হল পটাকাশ। শাস্ত্রীয় সংস্কার-অনুসারে সেই জন্য শবদাহক্রিয়া সাঙ্গ হয়ে গেলে, একটি মাটির কলসি ভর্তি জল চিতার ওপরে ঢেলে দিয়ে, লাঠির বাড়ি মেরে ঘটটি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়ে থাকে। ধারণাটা এই—ঘটাকাশ, পটাকাশে মিশে গেল বা, আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেল এর ফলে। কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস ‘অন্তর্জলি যাত্রা’-তে যে বৈজুনাথ ডোমের দেখা মেলে ঐ কাহিনীর প্রধান পুরুষচরিত্র হিসেবে, তার মুখে সরাসরিভাবেই এই ‘ঘটাকাশ-পটাকাশ’ তত্ত্বটি সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তিনি। কিন্তু এখানে জয়কান্তন ক্ষ্যাপার মুখের গানটিতে পরোক্ষ এক সংকেতের সাহায্যে ব্যাপারটা ব্যঞ্জিত করেছেন। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই মূলভাবনাটুকু অভিন্ন।

(এই ‘কলসিভাঙা’-র ব্যাপারটার অন্তরালে যে একটা লৌকিক-সংস্কারও আছে, সেটাও এই সূত্রে বিচারযোগ্য। আদিম প্রেতবিশ্বাসকে উপজীব্য করে এই আচারটির সৃষ্টি হয়েছে। মড়ার খুলির প্রতীক-স্বরূপ

কলসিটি চুরমার করে দিয়ে—এবং তারপরে আর পিছনে না তাকিয়ে—চলে যাওয়াটা বস্তুত সদ্যোমৃত মানুষটির প্রেতকে প্রতিহত করার আদিম প্রত্যয়কে—অবশ্যই ভিত্তিহীন—বহন করছে)।

প্রকৃতপক্ষে, এই গানটিকে এ-গল্পের থিম-বা-ভাবসত্য বলেই গণ্য করতে হয়। অপরিচিত সেই সন্ন্যাসীর মুখে এ গানটি শুনে ক্ষ্যাপা তো সেটাকে বীজমন্ত্রের মতো অহরহ জপতেই শুরু করছিল যেন! এর ভাব-তাৎপর্য সম্পর্কে সে অনবহিত; কিন্তু নিজের ছেলের মৃত্যুর পর সে যে হ্যালুসিনেশ্যন দেখল (বা, অনুভব করল), তারই ফলে গানটার অন্তর্নিহিত গভীর অর্থটি ক্ষ্যাপার কাছে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল। এর আগে, যতদিন তার স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা না হয়েছিল, ক্ষ্যাপাকে অনেকটা স্বল্পবোধ-যান্ত্রিক স্বভাবের মানুষ বলেই মনে হতো; ফুট্‌ফুটে সব বাচ্চাগুলোকে তাদের অকালমৃত্যুর পর সমাধিস্থ করার সময়ও তার কোনও ভাববৈকল্য ঘটত না, দিব্যি ঐ গানটাই গাইতে-গাইতে সে নিজের কাজ করত! তার মধ্যে মানবিক কিছু আবেগের উন্মেষ ঘটল সন্তানের আগমন সূচিত হলে। পুরোপুরিভাবে সে স্নেহপ্রবণ পিতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ছেলে ইরুলের জন্মের পরে; এবং সন্তানের অকালবিয়োগ ঘটল যখন, তখন সেই শোকের মধ্যে তার পরিপূর্ণ ভাবরূপান্তর দেখতে পাওয়া গেল।

মানবীয় অনুভূতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শোক-ও-সুখের চক্রাবর্তনে; ক্ষ্যাপার জীবনে সন্তানকে উপলক্ষ করে সেই বিকাশ ঘটেছে। গানটির অনুষঙ্গ যেখানে ক্রমে-ক্রমে পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আনন্দ থেকে বেদনায় উপনীত হবার যে-বিবর্তন, ক্ষ্যাপার চরিত্রের পূর্ণায়ত রূপ তার মধ্যেই উদ্‌ভাসিত হয়েছে। গানটির প্রতীকী তাৎপর্য সেখানেই সব চেয়ে বেশি।

মুরুগায়ির স্বপ্ন দেখার মধ্যেও বিচিত্র ক-টি প্রতীকসংকেত ব্যঞ্জিত হয়েছে, সেগুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। চক্‌চকে সোনালি রঙের একটা পোকা—কালো ছিল যার আগের রং—মুরুগায়ি তাকে চিবিয়ে খেয়ে নিল, আর তার পেটের মধ্যে গিয়ে সেটা মোচড়াতে লাগল, স্বপ্নটা ছিল এমনই।

তামিলনাড়ুতেই শুধু নয়, অন্যান্য অনেক সংস্কৃতিবলয়েই এই সোনালি রঙের পোকাকে শুভ সংঘটনের পূর্বসংকেত বলে মনে করা হয়। পোকাটা মুরুগায়ির পেটের ভেতরে ঢুকে গিয়ে মোচড়াচ্ছে, এটাকে তার গর্ভসঞ্চারের ইঙ্গিত বলে সূচিত করা হয়েছে। এই ধরনের সংস্কারও লোকজীবনে অপ্রতুল নয়। ফলত বিয়ের পনের বছর পেরিয়ে যাবার পরে, সন্তান আসছে তার ঘরে, এমন একটা বোধ ক্ষ্যাপাকে অনেক পরিমাণে 'স্বাভাবিক' করে তুলল। তার চরিত্রের ক্রমউদ্বর্তনে তাই এই স্বপ্নকে উপলক্ষ করে একটা লৌকিক সংস্কার ও তাকে মেটামর্ফোসিসের (আমূল রূপান্তরণের) পথে ঠেলে দিয়েছে, সেকথা বললে অত্যুক্তি হবে না। ঐ গান এবং এই স্বপ্ন তাদের নানান প্রতীকী তাৎপর্যের কারণে এই গল্পে বিশেষ কিছু গুরুত্বের অধিকারী হয়েছে।

১০৬.৭.২ ক্ষ্যাপার 'হ্যালুসিনেশ্যন' এবং জাদু-বাস্তবতা

বড় সাধের একমাত্র সন্তান ইরুলকে হারিয়ে ক্ষ্যাপা একটা প্রবল মানসিক আঘাত যে পেয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। এর ফলে তার চেতন-অবচেতন অনুভূতির মধ্যে যে-উথালপাথাল ঘটেছিল, তারই ফলে হয়ত তার মনে হয়েছিল শত-শত সমাধিস্থ শিশু পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাকে ঘিরে-ঘিরে নেচে চলেছে আর সঙ্গে গাইছে 'মাটির কলসির গান'। ঐ শিশুদের দলে সে তার সদ্যোমৃত সন্তানকেও 'প্রত্যক্ষ' করেছে যে, সেটা প্রকৃতপ্রস্তাবে তার মনের গহনে লুকিয়ে থাকা অলীক-প্রত্যাশারই আত্মপ্রকাশ। নিজের মৃত সন্তানকে শত-শত শিশুর সঙ্গে (যারা সবাই মৃত) পুনর্জীবিত দেখার এই অ-সম্ভাব্য বাসনাকেই 'সত্য' বলে কল্পনা করেছে সে। আর ঐ কল্পনাই তখন তার কাছে একান্ত 'বাস্তব' রূপে প্রতীতি পেয়েছে। বাস্তব এবং কল্পনার এমন বিমিশ্রণই জাদু-বাস্তবতা বা

ম্যাজিক রিয়ালিজম বলে পরিচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালের সমালোচনার পরিভাষায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক কলাম্বিয়া-র গ্যাব্রিয়েল তাঁর 'এক শতাব্দীর স্তব্ধতা' উপন্যাসটিকে এই ম্যাজিক-রিয়্যালিজমের একটি অনন্য উদাহরণ হিসাবেই গণ্য করেন বিশ্বের সমালোচকরা। ঘটনা যা ঘটেছে, তার মধ্যে কতটা কল্পনায় অনুভব করা আর কতটাই বা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা—তার সীমারেখা যখন টানা সম্ভব হয় না—দুয়ে মিলেমিশে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য অনুভূতির সৃষ্টি করে, তখনই উদ্‌ভাস ঘটে ম্যাজিক-রিয়্যালিজ্‌মের : যেমনটা, এই গল্পের শেষে ঘটেছে।

এই ম্যাজিক-রিয়্যালিজম এবং/কিংবা হ্যালুসিনেশ্যনের সূত্রে ক্ষ্যাপার জীবনের চূড়ান্ত উত্তরণ ঘটেছে। যে-গান, সে এতদিন ধরে প্রায় অর্থ না বুঝেই গেয়ে আসছে, সেটির নিহিত ব্যঞ্জনা হঠাৎই তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তারপরই তার জ্ঞান হারানো—যা তার নতুন পরিণতিতে উত্তরণের পূর্বক্ষণ। জ্ঞান ফিরে-আসার পর থেকে সে অন্য মানুষ। শোক তাকে এক বেদনার্ত পিতায় পরিণত করেছে। তখন সে একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও সে অন্যদের কাছে ''কেমন যেন'' লোক! জাদু-বাস্তবের কুহক-স্পর্শ এইটাই।

১০৬.৭.৩ তুলনীয় আর কয়েকটি লেখা

'অন্তর্জলি যাত্রা' (কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস), 'ডোমের চিতা' (রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্প), 'শ্মশানচাঁপা' (সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প)—এই তিনটি কাহিনীরও মুখ্য চরিত্র একজন করে শ্মশানকর্মী; 'অন্তর্জলি যাত্রা'-র প্রসঙ্গ কিছুটা আগেই আলোচিত হয়েছে। বৈজু এবং ক্ষ্যাপার মধ্যে অবশ্য অনেক ফারাক। বৈজু শ্মশানের ডোম হলেও এক সহজাত দার্শনিকতায় প্রবুদ্ধ; আর ক্ষ্যাপা যেন ভালমন্দের বোধহীন বালকসুলভ এক মানুষ গল্পের প্রথমে; ধীরে ধীরে তার উত্তরণ ঘটেছে স্বাভাবিকতায়। কিন্তু জীবন-মৃত্যুর অনন্বয়কে সে উপলব্ধি করেছে তখন, আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ক্ষ্যাপা ঐ বৈজুর সঙ্গে তুলনাযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ক্ষ্যাপা যেমন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও নির্বিকার এক অবস্থানে সুস্থিত হয়ে থাকত, এবং পরে পুত্রশোকের অভিঘাতে তার মধ্যে মানবীয় আবেগের সঞ্চার হয়েছিল, ঠিক তেমনই 'ডোমের চিতা'-র নায়ক হারুও ছিল মৃত্যুর শোক সম্পর্কে একান্ত-নির্লিপ্ত—কিন্তু সর্পদংশনে মৃত সহকর্মী-র চিতার (তার নিজেরই হাতে সাজানো) আগুনে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে দেবার পর তার চোখ দিয়ে টস্‌টসিয়ে জল ঝরে পড়ল। তারও মানবীয়-উত্তরণ ঘটল সহসা, বন্ধুশোকের আঘাতে।

'শ্মশানচাঁপা'-র নায়ক ঘাটবাবুর (শ্মশানঘাটে নিযুক্ত পৌরসভার করণিক) বউকে ফুস্‌লে নিয়ে গিয়েছিল এক ধনী লম্পট। সেই খোয়ানো বউয়েরই মৃতদেহ একদিন শ্মশানে দাহ করার জন্যে শ্মশানে নিয়ে আসা হলে, ঘাটবাবু পুলকের সঙ্গে অপেক্ষা করে কবে তার অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা সন্তানের (চলে যাবার সময়ে বউটি সন্তান--সম্ভাবিতা ছিল) শবও সেখানে আনা হবে—সেই দিনের জন্য! তার মনের বিচিত্র অসংলগ্নতার বশে ঘাটবাবু ভাবে তারপর থেকে সে ছেলে-বউ নিয়ে 'সুখে' সংসার করবে, তার তার ঘর ভাঙবে না কোনও দিন! স্ত্রীকে খুইয়ে সে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল; স্ত্রী মৃতদেহটা দেখার পর সেই অস্বাভাবিকতাই আরেক মাত্রায় উপনীত হল—যার অভিব্যক্তিটুকু কিন্তু স্বাভাবিক না-হওয়া সত্ত্বেও অন্তত তার নিজের কাছে তাই-ই। ক্ষ্যাপার মতোই সে জীবন-মরণের প্রভেদ ভুলে যায় এবং এখানেও সেটার প্রধান উপলক্ষ হয়ে ওঠে নিজের সন্তান।

চারটি কাহিনীর মধ্যে প্রারম্ভিক মিল হল এটাই যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই মুখ্য চরিত্র হল এক শ্মশানকর্মী। তার মানসিক নানা উচ্চাবচ আরোহণ-অবরোহণের মাধ্যমে জীবন-মৃত্যুর অভিঘাত তাকে কখনও স্বাভাবিক, কখনও অস্বাভাবিক করে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কাহিনীগুলি পারস্পরিকভাবে তুলনাযোগ্য অবশ্যই।

১০৬.৭.৪ শৈলীবিচার ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

খুব সাদামাটাভাবে গল্পটা শুরু করা হলেও জয়কান্তন ধীরে-ধীরে এর মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রয়োগশৈলীর সমাবেশ করেছেন। ক্ষ্যাপার মুখের গানটিকে প্রথম দিকে শুনিয়ে দিলেও, কিছু পরেই 'ফ্ল্যাশব্যাক' (অতীত ঘটনার চকিত চিত্রায়ণ) পদ্ধতির ব্যবহার করে, সেই গানটি যে কীভাবে, কোথায় শিখেছে, সেটার প্রতিবেদন করেছেন।

গল্পের তৃতীয় পর্যায়ে মুরুগায়ির স্বপ্নের সূত্রে মৃদু অলৌকিকতার কল্পনাকে উপজীব্য করেছেন জয়কান্তন। বিচিত্র দুটি লোকসংস্কারও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবটুকু মিলিয়ে, এখান থেকেই ক্ষ্যাপারও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটতে লাগল, যার অভিব্যক্তি দেখা গেল তার সন্তান ইরুলের জন্মের পর বেশ কিছু দিন সময় জুড়ে।

ইরুলের মৃত্যুর অনুসূত্রে ক্ষ্যাপার চরিত্রে ঐ শোকের অভিঘাতে পরিপূর্ণ বিবর্তন ঘটার ব্যাপারটা জয়কান্তন খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যঞ্জিত করেছেন। শোকের ঘোরে তার 'হ্যালুসিনেশ্যন'-কে চমৎকারভাবে তিনি 'ম্যাজিক-রিয়্যালিটি'-তে রূপান্তরিত করেছেন, 'থিম সং'-এর অন্তর্লীন তাৎপর্যটা ক্ষ্যাপার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে এবং তার চরিত্রের মধ্যে একটা গভীর গম্ভীরতা সর্বব্যাপ্ত হয়ে গেছে। সে 'স্বাভাবিক' মানুষের পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু তার সেই স্বাভাবিকতাও, লোকের কাছে প্রতিভাত হয় 'পাগলামি' বলেই। ক্ষ্যাপার জীবনের সেটাও একটা ট্র্যাজেডি। এই সবটাই জয়কান্তন তাঁর গল্প গাথার দক্ষতায় সাজিয়েছেন সুন্দরভাবে, যার ফলে এর কারুণ্য পাঠকের মনকে সমবেদনায় দ্রব করে তোলে। সেই ট্র্যাজিক অনুভূতিই এই গল্পের চূড়ান্ত সীমানা।

১০৬.৮ সারাংশ

গল্পে ঘটনাগত বৈচিত্র না থাকলেও, ভাবগত রূপান্তর খুব ব্যাপক। রূপান্তরের সঙ্কেত হিসেবে একটি প্রতীক ধর্মী গান ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্ষ্যাপা পরিচয়ের মানুষটি এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়— সে নির্বিকার চিত্তে মৃত শিশুদের কবর গান গাইতে গাইতে খুঁড়ে দেয়। এমন মানুষটির মধ্যেও সহজাত আবেগ সঞ্চারিত হোল, যখন সে জানল তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সন্তান বাৎসল্য ক্ষ্যাপাকে অনেকটা স্বাভাবিক করে যখন তুলেছে এমনি সময় সেই সন্তানের মৃত্যু তার মনকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আচ্ছন্ন অবস্থায় তার মনে হয় কবর থেকে অসংখ্য মৃত শিশু উঠে এসে সমবেত গান গাইছে। এদের মধ্যে তাঁর সদ্যোমৃত সন্তানটিও আছে।

কল্পনাপ্রসূত ঘটনা সংস্থাপন আলোচ্য গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাস্তব ও কল্পনার এই মিশ্রণ গল্পে এক ধরণের মোহ সঞ্চার করেছে। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ক্ষ্যাপার মন থেকে গান হারিয়ে গেছে। গল্পের পরিণতি কার্যত ক্রমসমন্বিত দশটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে।

কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা গল্পে গান ও স্বপ্নের প্রতীকি ব্যবহার লক্ষণীয়। আপাতদৃষ্টিতে গানের কথাগুলি মনে হতে পারে সংগতিবিহীন। কিন্তু এর মধ্যে যে জীবনমৃত্যু লৌকিক, আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় উপাদানের মিশ্রণ আছে তা গভীর অভিনিবেশ সাপেক্ষ। গানের কথায় কথায় ব্যবহৃত কুঞ্জবন (বিশ্বভুবন), ক্ষ্যাপা (মানুষ), দশমাস (গর্ভকাল) কুমোর (সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর) মাটির কলসী (মরদেহ), ভাঙা (জীবনাবসান) প্রভৃতি অর্থবহ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

গান এ গল্পের থিম (Theme) বা ভাবসত্যের ভূমিকা পালন করেছে। ক্ষ্যাপা না বুঝেই সন্ন্যাসী কণ্ঠের এই গানকে নিজের করে লিখেছিল। কিন্তু গানের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝেছে ছেলের মৃত্যুর পর। বস্তুত মানুষের জীবনে মানবীয় বোধের, সুখ-দুঃখের চক্রাবর্তনে। ক্ষ্যাপার জীবনে সন্তানকে অবলম্বন করে মানবীয় অনুভূতির বিকাশ ঘটেছে। অপরদিকে ক্ষ্যাপার স্ত্রী মুরুগায়ির স্বপ্ন—চক্‌চকে সোনালি রঙের পোকা—তার পেটের মধ্যে গিয়ে মোচড়ান গর্ভ সঞ্চারের প্রতিটি ব্যঞ্জনাও তাৎপর্যবহ।

বিয়ের পনের বছর পর তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসছে এ ঘটনা যেমন ক্ষ্যাপাকে আনন্দ বিহ্বল করেছিল। সেই সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু তার মনেপ্রাণে প্রবল আঘাত দিয়েছে। এর ফলে তার চেতন-অবচেতনে যে উথাল-পাতাল ঘটেছিল তার ফলেই ক্ষ্যাপার মনে হয়েছিল শত-শত সমাধিস্থ শিশু পুনরুজ্জীবিত হয়ে তাকে ঘিরে নাচছে, গাইছে—'মাটির কলসীর গান'।

এদের সঙ্গে তার ছেলেটিও আছে। এই ঘোর বা কল্পনার মধ্য দিয়ে ক্ষ্যাপার শিশু সন্তানটিকে পুনরুজ্জীবিত দেখার বাসনাও প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের মধ্যে একাধারে বাস্তব জীবন, অলীক কল্পনা, জাদু ও বাস্তবতার মিশ্রণে, এক অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতি সৃষ্টি সাম্প্রতিককালের গল্পে নতুন মাত্রা সঞ্চার করেছে।

কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপার মুখ্য চরিত্র শ্মশানধর্মী। বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ চরিত্র বিন্যাস ঘটেছে কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলিযাত্রা' উপন্যাসে। রমেশ সেনের 'ডোমের চিতা' এবং সুবোধ ঘোষের 'শ্মশানচাঁপা' ছোটগল্পদ্বয়ে। তিনটি রচনার মুখ্য চরিত্রের বৃত্তিগত সমতা থাকলেও লেখকত্রয়ীর জীবনদর্শন ও উপস্থাপনা বৈগুণ্যে মিল-গড়মিলের ক্ষেত্রও কম নয়। চরিত্রগুলির মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, জীবন মৃত্যুর টানাপোড়েন ক্বচিৎ স্বাভাবিক, কখনো অস্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও রচনা চতুষ্টয়ীর তুলনীয়তা বিবেচ্য হতেই পারে।

শৈলী বিচারে কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা সাদামাটা মনে হলেও জয়কান্তন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশল যথা,—ক্ষ্যাপার গানের উৎস বুঝাতে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে মুরুগায়ির স্বপ্নদর্শন সূত্রে লেখক অলৌকিক কল্পনার সাহায্য নিলেও, পাশাপাশি লোকসংস্কারকে জড়িয়ে দিয়েছেন যার প্রভাব দেখা গেল ইরুলের জন্মের পর।

পুত্র ইরুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষ্যাপার যে ক্ষোভ অভিঘাত, জয়কান্তন তা সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন। পরিশেষে ক্ষ্যাপা স্বাভাবিক মানুষের রূপান্তরিত হলেও লোকের কাছে তা-ও পাগলামি বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই ট্র্যাজিক অনুভূতিই এই গল্পের সূক্ষ্ম প্রতিপাদ্য।

১০৬.৯ অনুশীলনী

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) ''সমাজের কাছে উপেক্ষিত মানুষেরা জয়কান্তনের লেখায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছেন, এটাই তাঁর লেখার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই মানুষগুলির মনস্তাত্ত্বিক ওঠাপড়ার চিত্রায়ণও তিনি করেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে।''—'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পটির পরিপেক্ষিতে এই কথার যৌক্তিকতা যাচাই করুন।

(২) প্রতীক-ও-সংকেতের ব্যঞ্জনা 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পকে কীভাবে শিল্পবৃদ্ধি দান করেছে, আলোচনা করে দেখান।

(৩) 'হ্যালুসিনেশ্যন'-কে কীভাবে 'ম্যাজিক রিয়্যালিজম'-এ পরিণত করে 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পটির ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনাকে চূড়ান্ত পরিণতি দিয়েছেন জয়কান্তন, বিশ্লেষণ করুন।

(৪) 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পটির সঙ্গে কয়েকটি বাংলা গল্প-উপন্যাস কীভাবে তুলনীয় হতে পারে, আলোচনা করুন।

(৫) 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পে ব্যবহৃত গানটির ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে দেখান।

খ) স্বল্প বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) মুরুগায়ি স্বপ্নে কী কী দেখেছিল?

(২) ক্ষ্যাপা বলে এই কাহিনীর নায়ক কেন পরিচিত হয়েছে?

(৩) শ্মশানে কলসিভাঙার বিষয়ে লৌকিক সংস্কার কী?

(৪) শ্মশান কলসিভাঙার বিষয়ে শাস্ত্রীয় সংস্কার কী?

(৫) ক্ষ্যাপা কীভাবে গান শিখেছিল?

(৬) 'ম্যাজিক রিয়্যালিজ্‌ম' কাকে বলে?

(৭) 'হ্যালুসিনেশান' কী?

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) কাহিনীর শুরুতে ক্ষ্যাপার বয়স কত বলা হয়েছে?

(২) ইরুল কতদিন বেঁচে ছিল?

(৩) ইরুলের দোলনা কোথায় বাঁধা থাকত?

(৪) মুরুগায়ির স্বপ্নে দেখা পোকাটার রং কী ছিল?

(৫) ইরুলকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়?

(৬) ম্যাজিক-রিয়্যালিজমের ''অনন্য উদাহরণ'' স্বরূপ বলে কার লেখা, কোন্ বইটিকে গণ্য করা হয়।

(৭) 'সিলা নেরঙ্গালিন সিলা মানিথার্গল' নামটির অর্থ কী?

(৮) 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পটি জয়কান্তনের কোন্ বইতে আছে?

১০৬.১০ উত্তর সংকেত

ক) বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা গল্পের মুখ্য চরিত্র ক্ষ্যাপা শ্মশান ডোম। তার ব্যক্তিত্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত এ গল্পের বিষয়বস্তু। এ বিষয়টির জন্য গল্প ও কাহিনী বিশ্লেষণ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

(২) ১০৬.৭.১, ১০৬.৭.২ এবং ১০৬.৭.৪ অংশ ত্রয়ী ভাল করে পড়ে উত্তর দিন।

(৩) ১০৬.৭.২ অংশ এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক যে আলোচনা আছে, তার সাহায্যে উত্তর প্রস্তুত করুন।

(৪) ১০৬.৬ সূচনা এবং ১০৬.৭.৩ অংশ পড়ে প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

(৫) ১০৬.৭.১-এ প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

খ) স্বল্প বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

(১) মুরুগায়ি স্বপ্নে দেখেছিল—একটা পোকা—কালো-ছোট মতো—পোকাটা এগুতে এগুতে মুরুগায়ির হাতে এসে উঠল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হল্‌দে রঙের হয়ে গেল। অনুভব করল তার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে। অবশেষে দু' আঙুলের পোকাটা মুখের মধ্যে ফেলে খচ্‌মচ্ করে খায়—বমি করতে শুরু করে। পরে বলে পোকাটা তার পেটের মধ্যে ছুটোছুটি করছে।

(২) কাহিনীর নায়কের নাম ক্ষ্যাপা হলেও আসলে ও স্বভাবে সে ক্ষ্যাপা নয়। সে থাকে শ্মশানে, পেশায় শ্মশান ডোম। কবর খোঁড়াই ওর কাজ। ও যেন কেমন ধারার লোক ঠিক পাগল নয়। ও যখন মনের খুশীতে গান গায়, তখন শোকতাপ ক্লিষ্ট সংসারী মানুষদের মনে স্বাভাবিক যে লোকটার ধরন-ধারণ একটু আলাদা। অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক, তারস্বরে সর্বদাই সে গান করে—পুরো গান নয়। কয়েকটি

কলি। তার যখন গর্ত খোঁড়ার কাজ থাকে না, ব্যস্ত থাকে কুঞ্জবনে। অথচ মৃতদেহের জন্য যখন গর্ত খোঁড়ে—সর্বদাই কর্কশ কণ্ঠে গান গায়।

এই আলাদা, অস্বাভাবিক আচরণের জন্যই কাহিনীর নায়ক ক্ষ্যাপা বলে পরিচিত।

(৩) শ্মশানে কলসি ভাঙার ব্যাপারে যে লৌকিক সংস্কার আছে তার নেপথ্যে আছে একটি আদিম বিশ্বাস। মড়ার খুলির প্রতীক স্বরূপ মাটির কলসিটি চুরমার করে দিয়ে এবং তারপর আর পিছনে না তাকিয়ে চলে যাওয়া। বস্তুত সদ্যোমৃত মানুষটির প্রজ্ঞা প্রতিহত করার আদিম প্রত্যয়কে বহন করে চলার উদাহরণ।

(৪) শ্মশানে কলসি ভাঙার ব্যাপারটার মধ্যে একটি আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার আছে। হিন্দু শাস্ত্রীয় প্রতীতি অনুযায়ী এই দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড—তার 'খ' অর্থাৎ আকাশ হ'ল ঘটবন্দীকালের মতো; ঘটাকাশ। আর বৃহত্তর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে আকাশ তা হল পটাকাশ। শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুসারে সেই জন্য শবদাহ ক্রিয়া সাঙ্গ হয়ে গেলে, একটি মাটির কলসি ভর্তি জল চিতার ওপরে ঢেলে দিয়ে লাঠির বাড়ি মেরে ঘটটি ভেঙে ফেলা হয়। বিশ্বাস—ঘটাকাশ, পটাকাশ মিশে গেলে বা আত্ম পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেল এর ফলে।

(৫) ক্ষ্যাপার প্রসব বেদনা কাতর স্ত্রী মুরুগায়ির প্রসব যখন আসন্ন সে ক্ষ্যাপাকে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াতে পরামর্শ দেয়। আনন্দে উৎফুল্ল ক্ষ্যাপা শ্মশানভূমির প্রবেশ পথে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় সেই পথে এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী—আত্মভোলা সুরে সে ''কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপন মনে'' গানটি গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। গানটি তার মনে গভীর ভাবে মুণ্ডিত হয়ে গেল। সে-ও নিজের অজানিতে সেই গানটি গেয়ে আনন্দে নৃত্য শুরু করে।

এভাবেই ক্ষ্যাপার গান গাওয়ার সূচনা।

(৬) বাস্তব ও কল্পনার বিমিশ্রণের ফলে ঘটনা যা ঘটেছে তার মধ্যে কতটা কল্পনায় অনুভব করা আর কতটাই বা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা—তার সীমারেখা যখন টানা যায় না—অথচ দুয়ে মিলে মিশে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য অনুভূতি সৃষ্টি করে, তখনই উদভাস ঘটে। বাস্তবে কল্পনায় মেশামেশি হয়ে এক ধরনের জাদু-বাস্তব বোধ বা ম্যাজিক-রিয়ালিজম্। নোবেল বিজয়ী লেখক লাতিন আমেরিকার কথা সাহিত্যিক তথা কলাম্বিয়ার গ্যাব্রিয়েল গারমিয়া মার্কেজ-এর ''এক শতাব্দীর স্তব্ধতা'' উপন্যাসটিকে এক অনন্য উদাহরণ হিসাবে গণ্য করেন, সমালোচকেরা।

(৭) কোন প্রবল মানসিক আঘাত যখন মানুষের চেতন-অবচেতন অনুভূতির মধ্যে উথাল-পাথাল ঘটায় তার ফলে মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কোন অলীক প্রত্যাশা কল্পনা আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজিতে। একেই বলা হয় হ্যালুসিনেশান।

আলোচ্য গল্পে ক্ষ্যাপা নিজের মৃত সন্তানকে শত-শত শিশুর সঙ্গে, যারা সকলেই মৃত, পুনর্জীবিত, দেখার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাকে ''সত্য'' বলে কল্পনা করেছে। আর ঐ কল্পনাই তখন ক্ষ্যাপার কাছে একান্ত বাস্তব রূপে জন্মেছে মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় একেই বলা হয়েছে 'হ্যালুসিনেশন।'

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) কাহিনীর শুরুতে ক্ষ্যাপার বয়স বলা হয়েছে বছর চল্লিশেক।

(২) ইরুল্ বেঁচে ছিল দু'টি বছর মাত্র।

(৩) ইরুলের দোলনা বাঁধা থাকত নিম গাছের ডালে।

(৪) মুরুগায়ির স্বপ্নে দেখা পোকাটার রঙ ছিল—প্রথমে কালো, পরে হল্‌দে নয় সোনালি রঙ, সোনার মতো চক্‌চকে।

(৫) ইরুলকে সমাধিস্থ করা হয় ‘পন্নীর’ গাছের তলায়, যে গাছটা চিরকাল ঐ শিশুর উপর সুগন্ধ ফুল বর্ষণ করবে।

(৬) ‘ম্যাজিক রিয়ালিজমের’ অনন্য উদাহরণ হিসাবে যে বইটিকে গণ্য করা হয় তার নাম ‘‘এক শতাব্দীর স্তব্ধতা’’—রচয়িতা নোবেল বিজয়ী উপন্যাসিক নোবেল বিজয়ী উপন্যাসিক কলাম্বিয়ার গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্বেজ।

(৭) ‘সিলা নেরাঙ্গালিন মিলা মানিথার্নল’ নামটির অর্থ হল ‘‘কখনও কোনও মানুষ।’’

(৮) ‘কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা’ গল্পটি আছে জয়কান্তনের ‘‘সিরুকথাইকাল’’ অর্থ জয়কান্তনের ‘‘গল্পসংগ্রহ’’ বইতে।

১০৬.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১। ‘Comparative Indian Literature’ (Vol. I.) : (Ed.) K.M. George ❑ Keral Sahitya Akademi : Trichur (1984)

২। ‘The Idea of Indian Literature’ : Umashankar Joshi ❑ Sahitya Akademi : New Delhi (1990)

৩। ‘Towards the Concept of Indian Literature’ (Ed.) K. A. Koshy ❑ Aligarh Muslim University ; Aligarh (1998)

৪। **‘ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস’** সুকুমার সেন ❑ গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা (১৯৬১)

৫। ‘Encyclopeadia of Indian Literature’ (Vol. I-VI) : (Ed.) Amaresh Datta ❑ Sahitya Akademi : New Delhi (1987-94)

৬। ‘Who's Who of Indian Writers’ (Vols. I-II) : (Ed.) K.C. Dutt ❑ Sahitya Akademi : New Delhi (1999)

৭। ‘Masterpieces of Indian Literature’ (Vols. I-III) : (Chief Ed.) K. M. George ❑ National Book Trust. India : New Delhi (1997)

৮। **‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য’** শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ দীপায়ন, কলকাতা (১৯৫৪)

৯। **‘হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস’** ব্রহ্মনন্দন সিংহ ❑ অথার্স কর্নার ; কলকাতা (১৯৫৭)

১০। **‘প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ’** (সম্পা) পবিত্র সরকার ও অন্যান্যরা ❑ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কলকাতা ; (২০০১)

১১। **‘প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ’** (অনু.) প্রসূন মিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া : নিউ দিল্লী (১৯৯৯)

১২। ‘Prem Chand’ : Prakash Chandra Gupta ❑ Sahitya Akademi : New Delhi (1998)

১৩। **‘নারী’**/ইসমত চুগতাই (অনু) জাফর আলম ❑ মুক্তধারা ; ঢাকা (১৯৮২)

১৪। ‘Ismat Chugtai’ M. Asaduddin ❑ Sahitya Akademi; New Delhi (1999)

১৫। **‘জয়কান্তনের গল্পগুচ্ছ’** (অনু.) বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ❑ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া ; নিউ দিল্লী (১৯৮০)

১৬। **‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে’** : সম্পাদনা : ড. মননকুমার মণ্ডল, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ; নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

একক ১০৭ ❒ নাটক—চোপ্, আদালত চলছে

গঠন ঃ

১০৭.১ উদ্দেশ্য

১০৭.২ প্রস্তাবনা

১০৭.৩ লেখক-পরিচিতি ❑ বিজয় তেণ্ডুলকার

১০৭.৪ মূলপাঠ প্রথম অঙ্ক

১০৭.৫ প্রথম অঙ্কের সারাংশ

১০৭.৬ মূলপাঠ দ্বিতীয় অঙ্ক

১০৭.৭ দ্বিতীয় অঙ্কের সারাংশ

১০৭.৮ মূলপাঠ তৃতীয় অঙ্ক

১০৭.৯ তৃতীয় অঙ্কের সারাংশ

১০৭.১০ নাটকের গঠন-বৈশিষ্ট্য

১০৭.১১ নাটকের সংলাপ বিচার

১০৭.১২ কেন্দ্রীয় চরিত্র লীলা বেনারে

১০৭.১৩ বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্র এবং নাটকে তাদের গুরুত্ব

১০৭.১৪ সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয়

১০৭.১৫ অনুশীলনী

১০৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১০৭.১ উদ্দেশ্য

'চোপ্, আদালত চলছে' (মূল মারাঠি নাম : 'শান্ততা, কোর্ট চালু আহে) নাটকের মধ্যে আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে একটি মেয়ের অসহায়তা যে কতখানি তীব্র হতে পারে, তার চিত্রায়ণ করেছেন বিজয় তেণ্ডুলকার। একজন উচ্চশিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মানিত মহিলাও যে, পুরুষপ্রাধান্য-কেন্দ্রিক সমাজে বস্তুতপক্ষে কতখানি অসহায়—এ-নাটকের নায়িকা বেনারে বাই তারই প্রতীকী চরিত্র। সামাজিক এই বিপন্নতার সম্পর্কেই নাট্যকার এখানে সচেতন করতে চেয়েছেন। এই নাটকটিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করারও উদ্দেশ্য সেইটিই।

১০৭.২ প্রস্তাবনা

একটি নাটকের মহলা দেবার সময়ে, একজন বিপন্না নারীর জীবনের গভীর এক যন্ত্রণা ও অনিশ্চিয়তার সত্য পরিপ্রেক্ষিতটিকে উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা গেছে ‘চোপ্‌, আদালত চলছে’-র মধ্যে। আপাতদর্শনে এই মহিলাকে বরং লঘু স্বভাবের—কিছুটা চটুলও—বলা যেতে পারে; কিন্তু তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে এক শঙ্কিত উৎকণ্ঠা। বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থানসম্পন্ন এই নারীর জীবনের নিঃসঙ্গতা এবং ট্র্যাজিক অসহায়তা অন্যের কাছে (নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই) তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করার মতো একটি মনোরোচক বিষয়রূপেই এখানে চিত্রিত করা হয়েছে যেভাবে, তাতে মানুষের চরিত্রের একটা ঋণাত্মক দিকেরও উদ্‌ঘাটন হয়ে গেছে। জীবনের নানান সূক্ষ্ম ও জটিল টানাপোরেনের মাধ্যমে রূপায়িত এই নাটকের সাহিত্যমূল্যও যথেষ্টই আছে।

১০৭.৩ লেখক-পরিচিতি ❑ বিজয় তেণ্ডুলকার

বিজয় ধোন্দো তেণ্ডুলকরের জন্ম ১৯২৮ সালে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদ্যার্জন বেশিদিন না করলেও তাঁর বাবার অনুপ্রেরণায় অল্পবয়স থেকেই তিনি বই পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইটাই উত্তরকালে তাঁকে সাহিত্যচর্চার পথে এগিয়ে দেয়। কালক্রমে, তিনি আধুনিক মারাঠি নাটকের অন্যতম প্রধান লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যা প্রায় ২০টি। এছাড়া, উপন্যাস এবং ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি সুখ্যাত। বেশ কিছুদিন ধরে সাংবাদিকতাও করেছেন তেণ্ডুলকর।

তাঁর প্রথম নাটক ‘শ্রীমন্ত’ (১৯৫৫)। এরপরের এক দশকে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের জন্য তিনি অনেকগুলি একাঙ্কিকা এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ‘মানুষ নানাবাচে বেট’ (১৯৬২); ‘মী জিংকালো, মী হারালো’ (১৯৬৩), ‘অজাগর অনি গন্ধর্ব’ (১৯৬৬), ‘কবাল্যাচি শালা’ (১৯৬৪) ইত্যাদি। এইসব নাটকে পরবর্তীকালে মারাঠি রঙ্গমঞ্চের অগ্রগণ্য প্রায় সমস্ত শিল্পীই অভিনয় করেছেন।

১৯৬৮ সালে ‘শান্ততা, কোর্ট চালু আহে’ লেখা হবার পর থেকেই তাঁর লেখায় এক নতুন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ‘গিধাড়ে’ (১৯৭১), ‘সখারাম বাইন্ডার’ (১৯৭২) এবং ‘ঘাসিরাম কোতোয়াল’ (ঐ) প্রভৃতি নাটক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং বল্‌গাহীন নিন্দা একই সঙ্গে বর্ষিত হয়ে তাঁকে সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ‘শান্ততা’-র জন্য ১৯৭১ সালে তিনি জাতীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পুরস্কার পান; ঐ নাটকের জন্য কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় পুরস্কারও তাঁকে দেওয়া হয়।

‘শান্ততা’-র পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে মধ্যবিত্ত সমাজের আবেগপ্রবণ রোম্যান্টিক মূল্যবোধের বিচিত্র রূপায়ণই ছিল মুখ্য উপজীব্য। দৈনন্দিন কিছু আর্থ-সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলি লেখেন তেণ্ডুলকর। কিন্তু এখন থেকে এসবের পরিবর্তে, আপাত-সম্ভ্রান্ত মানুষদের ঝাঁ-চক্‌চকে বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে তীব্র, উদ্দাম, হিংস্র চরিত্রগুলি যেভাবে লুকিয়ে থাকে বহুসময়ে—তারই উদ্‌ঘাটন করেন তিনি। স্বভাবতই, এই প্রেক্ষিতে যৌনতারও একটি বিশাল অভিঘাত পড়েছে এ-সব নাটকের মধ্যে। এই কারণে ‘সখারাম বাইন্ডার’ নিয়ে আদালতে মামলা-মোকদ্দমা অবধি হয়েছে, যার সূত্রে মহারাষ্ট্র সরকারের মঞ্চাভিনয়-আইন পর্যন্ত বদলাতে হয়।

'সখারাম' এবং 'ঘাসিরাম' নাটকদুটি জাতপাত-সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তেণ্ডুলকরের তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিবাদও সূচিত করে। সমাজের মাথা যাঁরা, তাঁদের অনেকের নাটকদুটি সম্পর্কে বীতরাগ এবং প্রতিরোধের কারণ ছিল এইটাও। এমনকি, 'ঘাসিরাম' যাতে বিদেশে অভিনীত না হতে পারে, তার জন্যেও সচেষ্ট ছিল একটি মহল।

তেণ্ডুলকর অবশ্য এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাকে পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়া হয় ১৯৮৪ সালে। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার সহ-সভাপতি পদেও তিনি আসীন ছিলেন বেশ কিছুদিন। সমাজে হিংস্রতার পরিবৃদ্ধি এবং সমকালের নাটকে তার অভিঘাত সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য তিনি জওহরলাল নেহরু বৃত্তিও পেয়েছিলেন। এই সমীক্ষার অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে তাঁকে 'নিশান্ত', 'আক্রোশ' প্রভৃতি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের পট-কথা রচনার উপকরণ জুগিয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের পুরস্কারও তিনি বহুবারই পেয়েছেন।

তেণ্ডুলকরের পরবর্তী যেসব নাটক—'মিত্রাচি গোষ্ঠ' (১৯৮২), 'কমলা' (১৯৮২), 'কন্যাদান' (১৯৮৩)—সেগুলির মধ্যে নিষ্ঠুর সামাজিক কিছু অবস্থান রূপায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে 'কমলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র একটি মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছিল। জনৈক সাংবাদিক তাকে 'কিনে' এনে সাংবাদিক বৈঠকে তাকে দেখান এবং এই প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে তেণ্ডুলকার নাটকটি লেখেন। কিন্তু তিনি আর একটি জটিল প্রশ্নও উত্থাপিত করেছেন। বৈঠক না হয় হল, তারপরে ঐ অভাগিনীর কি হবে? ....এর কোনও উত্তর কি আছে সমাজের কাছে? আসলে যে কোনও ধরনের শোষণই হোক না কেন, বিজয় তেণ্ডুলকর তার বিরুদ্ধে এক অনমনীয় সংগ্রামী হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি না করলেও, তাঁর প্রগতিশীল ভাবনার জন্য এবং তার প্রচারের কারণে তিনি ভাবগত ক্ষেত্রে বামপন্থারই শরিক। সমাজচেতনা, ঐতিহ্যের বোধ এবং লোকসংস্কৃতির অভিজ্ঞান তাঁর নাটকগুলিকে এমনই এক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে যে, এখন তিনি সমগ্র ভারতবর্ষেরই অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব রূপে সম্মানিত হন।

১০৭.৪ মূল পাঠ ❑ প্রথম অঙ্ক

চোপ্, আদালত চলছে

চরিত্রলিপি

(মঞ্চে প্রবেশানুসারে)

সামন্ত

মিস লীলা বেনারে

বালু রোকড়ে

পোংশে

সুখাৎমে

কার্ণিক

মিঃ কাশিকার

মিসেস কাশিকার

২।৩টি মূর্তি

প্রথম অঙ্ক

(মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হচ্ছে। একটা প্রায়-ফাঁকা হলঘরের এক অংশ। বাকি অংশটুকু বাঁদিকের উইংয়ের আড়ালে চলে গেছে। দুটো দরজা। একটা দরজা দিয়ে বাইরে থেকে ঢুকতে হয়—প্রবেশদ্বার। অপরটি পাশের ঘরের যাবার। হলের মাঝখানে ডেস্কের সঙ্গে লাগান একটা চেয়ার—অনেকটা স্কুল ডেস্কের মত। কয়েকটা পুরোনো চেয়ার, বাক্স, একটা টুল—এইসব জিনিস ইতস্তত সারা ঘর জুড়ে ছড়ানো। দেয়ালে টাঙানো বন্ধ ঘড়ি; দেশনেতাদের পুরোনো মলিন ছবি : দাতাদের নাম-লেখা কাঠের বোর্ড। প্রবেশদ্বারের মাথায় গণেশের ছবি। প্রবেশদ্বারটি বন্ধ। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। তারপর বাইরে থেকে সজোরে কড়া খোলার শব্দ হয়। একটি লোক প্রবেশ করে এমনভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে যেন প্রথম এসেছে। তারপর কোণে এসে দাঁড়ায়। নাম—সামন্ত। এক হাতে তালাচাবি, অন্য হাতে কাপড়ের তৈরি সবুজ রঙের টিয়াপাখি, আর একটা বই)।

সামন্ত।। (পিছনের দিকে তাকিয়ে)—এটাই সেই হলঘরটা। আসুন! বাঃ, বেশ পরিষ্কার তো। সকাল বেলায় কেউ বোধহয় পরিষ্কার করিয়ে রেখেছে। আজ বিকেলে ফাংশন আছে তো। (মিস বেনোরে একটা আঙ্গুল ঠোঁটের মধ্যে পুরে প্রবেশ করে—) বেনারে-আইয়া! দরজা খুলতে গিয়ে ছিটকিনিতে আঙ্গুল চেপটে গেছে কি? হ্যাঁ, চুষুন, চুষুন, তাহলেই আরাম দেবে। ছিটকিনি পুরনো হয়ে গেলে এমনি হয়। সহজে খুলতে চায় না। ছিটকিনিটা যদি পুরোপুরি না খোলে তাহলে কড়া টানলেই—ব্যস্। বলুন তো কি হয়? দরজাটা যদি ভিতর থেকে বন্ধ করেন, বাইরে থেকে ছিটকিনিটা আটকে যাবে। মানে—একেবারে locked— হ্যাঁ— হ্যাঁ, চুষুন—একটু, চুষুন—তাহলেই আরাম দেবে।

একবার আমার এই ডান হাতের আঙ্গুলটা ছিটকিনিতে আটকে গিয়েছিল। এই আঙ্গুলটা আর বুড়ো আঙ্গুলটার কোন তফাত রইল না। নিজেই বুঝতে পারতাম না কোনটা আঙ্গুল আর কোনটা বুড়ো আঙ্গুল। পাঁচ ছয় দিন এমন ফুলে ছিল। সারা সপ্তাহ বাকি চারটে আঙ্গুল দিয়ে কাজকর্ম করতে হ'ত।

বেনারে।। আইয়া! না-না এটা বলা আমার অভ্যাস। জানেন, এখানে এসে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। স্টেশনে সবার সঙ্গে যখন নামলাম, অনেকদিন পর, হঠাৎ খুব ভাল লাগতে শুরু করল।—

সামন্ত।। কেন বলুন তো?

বেনারে।। কেন জানিনা। আর আপনার সঙ্গে এখানে আসতে আরো ভাল লাগল। সবাই যে পিছনে পড়ে গেছে—ভালই হ'ল। আমরা কত তাড়াতাড়ি চলে এলাম, তাই না?

সামন্ত।। হ্যাঁ। মানে এত তাড়াতাড়ি হেঁটে আসতে কষ্ট হ'ল। অভ্যাস নেই তো। আপনি তো বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটেন?

বেনারে।। সব সময় নয়। তবে আজ হেঁটেছি। ভাবলাম ওদের সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাই। আর আপনার সঙ্গে অনেকদূর কোথাও হেঁটে চলে যাই।

সামন্ত।। (ঘাব্‌ড়ে গিয়ে)—আমার সঙ্গে?

বেনারে।। Yes. আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

সামন্ত।। (লজ্জায় লাল হয়ে সসঙ্কোচে)—কি যে বলেন। আমি তো—

বেনারে।। খুব ভাল—আপনি সত্যিই খুব ভাল। আরও বলব—আপনি খুব সরল। মনে কোনও পাপ নেই—আপনি খুব-উ-ব ভাল!

সামন্ত।। (এবার অবিশ্বাসের সঙ্গে)—আমি?

বেনারে।। হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি। এই হলঘরটাও আমার খুব ভাল লাগছে।

(চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে)

সামন্ত।। হলঘরটাও?—পুরনো বাড়ি। যত ফাংশন অনুষ্ঠান—সব এখানে হয়। প্রোগ্রাম-টোগ্রাম করার জন্যই রাখা হয়েছে। এই অঞ্চলে এটাই একমাত্র হলঘর। নেতাদের ভাষণ-টাষণ, বিয়ে-টিয়ের নেমন্তন্ন....দুপুর বেলা মেয়েদের ভজন-টজন এখানেই practice করা হয়। আজ রাত্রে ফাংশন আছে তো তাই আজকে হয়ত ভজন বন্ধ। রাত্রে প্রোগ্রাম থাকলে মহিলা-ভজনের ছুটি। কেন বলুন তো? রাত্তিরের রান্না-বান্না সেরে ফাংশনে আসতে দেরি হয়ে যায়। ঠিক বলেছি তো?

বেনারে।। (সতর্ক কৌতূহলে)—আপনার স্ত্রী বুঝি এই ভজন পার্টির মধ্যে আছেন?

সামন্ত।। না, না, আপনি ভুল করলেন। স্ত্রী নয়, বৌদি। আমার স্ত্রী নেই।

বেনারে।। (সবুজ টিয়াপাখি খেলনাটার দিকে ইঙ্গিত করে)—তবে ওটা কার জন্য?

সামন্ত।। এটা আমার ভাইপোর জন্য। (গিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে। খেলনাটা লুকোয় বাঁ পাশে) ভারি মিষ্টি ছেলে। খেলনাটা ভাল লাগছে আপনার?

বেনারে।। হ্যাঁ।

সামন্ত।। আমার এখনও বিয়ে হয়নি। কোন কারণ-টারণ নেই। পেট চালাবার মত চাকরি একটা আছে। কিন্তু বিয়ে-থা-হয়নি। কয়েকদিন আগে এখানে ম্যাজিক দেখান হয়েছিল। ভোজবাজি, হিপনোটিজ্‌ম্—এইসব আর কি।

বেনারে।। আপনি দেখেছেন?

সামন্ত।। দেখব না? প্রত্যেকটা ফাংশন দেখি।

বেনারে।। প্রত্যেকটা?

সামন্ত।। নিশ্চয়। কোন ফাংশন বাদ যায় না। আর তো কিছু নেই এই জায়গায় যা নিয়ে একটু হৈ-চৈ করা যায়—ফুর্তি করা যায়।

বেনারে।। ও! (কাছে এগিয়ে আন্তরিকতার সুরে)—কখনও কাছ থেকে ম্যাজিক দেখেছেন?

সামন্ত।। হ্যাঁ দেখেছি—মানে একেবারে কাছে ছিলাম না। তবে কাছাকাছি। কেন?

বেনারে।। (আরও নিকটবর্তী হ’য়ে)—জিব্ কেটে কি করে জোড়া লাগায় বলুন না।

সামন্ত।। (একটু সরে গিয়ে)—জিব্? জিব্—মানে—সে সব বলা বেশ শক্ত।

বেনারে।। হ’ক শক্ত। একটু বুঝিয়ে দিন না আমাকে।

সামন্ত ।। অ্যাঁ—কিন্তু (বেনারে খুব কাছে এগিয়ে আসার সঙ্কোচে, দূরে সরে যায়।) —অসুবিধা হবে কেন। দেখি একবার চেষ্টা করে। পারব তো, তবু, ধরুন আপনার জিব্ এটা, জিব্।

(আঙ্গুল তুলে দেখাল)

বেনারে।। দেখি। (দেখবার অছিলায় আরও ঘন হ’য়ে আসে। মুহূর্তের জন্য স্পর্শ-সুখ অনুভব করে। কিন্তু সামন্তের সে খেয়াল নেই)।

সামন্ত।। (মনোযোগ সহকারে)—এই হ’ল গিয়ে জিব্—কেটে দুটুকরো করা হ’ল। তারপর কি হয়—রক্ত বেরোয়। কিন্তু কোথায় রক্ত? রক্ত নেই। কারণ ম্যাজিকে এমন একটা কিছু আছে—মানে সে-

রকম কিছু করা হয় যাতে রক্ত বেরোয় না, কিচ্ছু হয় না—ব্যথাও করে না। অতএব—[সামন্তের অবিচল সরল আচরণে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে না পারার প্রতিক্রিয়ায় বেনারে সরে আসে।)

বেনারে।। ওরা এখনও এসে পৌঁছল না কেন? নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে হাঁটছে। মানুষ কি একটু চট্‌পটেও হ'তে পারে না!

সামন্ত।। ঠিক বলেছেন। আমি বলছিলাম এই জিব্‌টা। ম্যাজিক—

বেনারে।। স্কুলে জানেন, প্রথম বেল্ পড়বার আগেই আমি স্কুল কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ি। আট বছর ধরে এই ব্যাপারে কোনও কথা শুনতে হয়নি। পড়া দেখিয়ে দেবার ব্যাপারেও তাই আমার portion কক্‌খনও বাকি থাকে না। খাতাটাতা সব সময়মত দেখে রাখি। এইসব নিয়ে কেউ কোনও দিনও কিছু বলতে পারেনি আমাকে।

সামন্ত।। আপনি কি মাস্টারনি?

বেনারে।। না। আমি শিক্ষিকা। আমি কি মাস্টারনির মত দেখতে?

সামন্ত।। না, না, আমি তা বলিনি।

বেনারে।। বলতে পারতেন।

সামন্ত।। বলিনি তো। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি কি পড়ান?

বেনারে।। ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের চেয়ে অনেক ভাল। ওদের মাথায় অন্তত বেশি বেশি চালাকি আর আজেবাজে কুসংস্কার, উল্টোপাল্টা কথা, এসব খেলে-টেলে না। খাম্‌চি দিয়ে রক্ত বার করে দেয়, কিন্তু কাপুরুষের মতো পরে পালিয়ে যায় না।

(খুশিমনে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে)

সামন্ত।। জিব্ নিয়ে তখন যা বলছিলাম এবার শেষ করি—হিপনোটিজ্‌ম—এইসব আর কি।—(আবার আঙ্গুল তুলে ধরে)—এই যে—এই ধরুন আপনার জিব্। এই কেটে দিলাম।

বেনারে।। এখন থাক।

সামন্ত।। (সঙ্গে সঙ্গে)—আচ্ছা থাক।—(হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ার তুলে বেনারের সামনে রাখে)।—কিন্তু আপনি এমনভাবে চরকি খাচ্ছেন কেন? বসুন তো ভাল করে। পা ব্যথা করবে যে।

বেনারে।। ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়াবার অভ্যাস আছে আমার। আমি কক্‌খনও বসে পড়াই না। গোটা ক্লাসটাই আমার চোখের—সামনে থাকে। কেউ mischief করতে পারে না। পুরো ক্লাস আমায় ভয় ক'রে চলে। ওরা আমাকে ভীষণ মানে। ছেলেমেয়েগুলো আমার জন্যে সব কিছু করতে পারে। কারণ আমি যে রক্ত জল করে পড়াই। (কণ্ঠস্বর সামান্য নামিয়ে)—এই জন্যই তো অনেকে আমাকে হিংসা করে। বিশেষ করে যারা আমার সঙ্গে পড়ায়। আর ওই গভর্নিং বডি। কিন্তু করবেটা কি? করে তো আর কি করব? তদন্ত করবে শুনেছি। আমি তো ভালই পড়াই। রক্ত জল ক'রে চাকরি করি। শুধুমাত্র একটাই অভিযোগ। সেটা প্রমাণ হলেও—কি করতে পারে? তাড়িয়ে দেবে? দিক তাড়িয়ে। আমি তো কারোর ক্ষতি করিনি। কারোরই ক্ষতি করিনি। যদি করে থাকি—নিজের করেছি। আর সেই অভিযোগটা চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবার মত নাকি? আমি আমার জীবন দিয়ে কি করব না করব ওদের কোন্ অধিকার আছে সে কথা বলবার? আমার জীবন আমার নিজের। চাকরি করছি বলে তো নিজেকে বেচে দিইনি। আমার মতামত আমার—আমার নিজের।

আমার ইচ্ছেও আমার নিজের। কেউ তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। কেউ না। আমার এই প্রাণটা নিয়ে—আমার জীবন নিয়ে যা খুশি তাই করব—আমি যা মনে করব তাই করব—(অজান্তে নিজের পেটের ওপর হাত রাখে। হঠাৎ চুপ করে যায়। সামন্তর দিকে চোখ পড়ে। অবাক হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্রমশ নিজের মধ্যে ফিরে আসে। সামন্ত এতক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে ছিল।)

সামন্ত।। (শঙ্কিত কণ্ঠে)—ওরা কোথাও আটকে গেছে। আমি দেখে আসব?

বেনারে।। (অকস্মাৎ)—না। (স্বাভাবিক কণ্ঠে)—একলা থাকতে আমার—আমার ভয় করে।

সামন্ত।। তাহলে যাব না। এখানেই থাকছি। আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?

বেনারে।। (সতর্ক হয়ে) Humbug আমার কিছু হয় নি। I am fine—fine. মৃদু হাততালি দিয়ে তাল দিতে দিতে একটা ইংরেজি গান গুনগুন করতে থাকে।)

Oh! I have got a sweetheart
Who carries all my books.
He plays in my doll's house
He says—he likes my looks.
I'll tell you a secret,
He wants to marry me—
But mummy says, I am too little
To have such that's in me....

(গান থামিয়ে)

আমরা আজকে কি ফাংশন করব জানেন মিস্টার—কি যেন আপনার নাম?

সামন্ত।। আজ্ঞে—সামন্ত।

বেনারে।। ও হ্যাঁ। সামন্ত—সামন্ত।

সামন্ত।। আজ্ঞে হ্যাঁ। মন্দিরের সামনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। সোনামতি বিল্ডিং—বোম্বাইয়ের জাগৃতি সঙ্ঘের—কি যেন—অভিরূপ বিচারালয়। নকল আদালত—mock-court— ঠিক রাত আটটায়।

বেনারে।। জিনিসটা কি জানেন তো?

সামন্ত।। আজ্ঞে না। কোর্টের ব্যাপার-ট্যাপার হবে হয় তো।

বেনারে।। ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সত্যিকারের কোর্ট নয়—এই সাজান-টাজান আর কি।

সামন্ত।। মানে কোর্ট-কোর্ট খেলা?

বেনারে।। তা বলতে পারেন। কিন্তু সামন্ত মশাই, ফাংশনের পিছনে একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটি হচ্ছে গিয়ে উদ্বোধনী বক্তৃতা। 'উদ্বোধনটাই হ'ল আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ কারণ।' আমাদের সভাপতি কাশিকার আপনাকে এটাই বুঝিয়ে দেবেন। এবং বিশেষ কারণ না থাকলে কাশিকার কোথাও এক পাও যান না। আর একজন হচ্ছেন মিসেস্ দে-দোল—মানে মিসেস কাশিকার—যাকে বলে গিয়ে আদর্শ গৃহিণী। লোকে বলে না যে—দোলনার দড়ি যার হাতে, সেই জন দুনিয়ার উন্নতি সাধে।—যেন মিসেস কাশিকারকে দেখেই লেখা। কিন্তু মুশকিলটা এই যে মিস্টার 'বিশেষ কারণ' সেজে দুনিয়ার উপকার করছেন, তাই মিসেস দে-দোলের ভাগ্যে আর দোলনা জুটছে না।

সামন্ত।। (কোলে ছেলে নিয়ে দোলা দেবার ভঙ্গী করে) মানে—নেই বুঝি?

রেনারে।। Roght. মনে হচ্ছে আপনার বেশ মাথা আছে। মিঃ কাশিকার আর দে-দোল দুজনে মিলে একা-একা একটা বিরাট বাড়িতে থাকেন। পাছে একটা কিছু অঘটন ঘটে যায়—কিম্বা একঘেয়ে জীবনে তো কি বলে একটা ক্লান্তি আসতে পারে তাই ওঁরা দুজনে মিলে একটা ছেলেকে মানুষ করেছেন। ছেলেটাকে ধরে বেঁধে এমন পড়াশোনা শেখালেন, এমন খাটাতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়লেন। ছেলেটির নাম বালু রোকড়ে। তারপর আমাদের জাগৃতি সঙেঘ একজন আছেন যিনি বিখ্যাত আইন-বিশারদ। উকিল-মহলে উনি এত নাম করেছেন যে বিপদে পড়েও কোনও হতভাগা ওঁর কাছে যায়না। বিরাট অভিজ্ঞতা নিয়ে উনি বার লাইব্রেরিতে একা একা মাছি তাড়ান আর নিজের বাড়িতেও একা এসে মাছি মারেন। আজ অভিরূপ বিচারালয়ে উনি মস্ত এক উকিল সাজবেন। হ্যাঁ। ওর বিক্রম নিজের চোখেই দেখবেন। আর একজন—উনি হচ্ছেন—হুঁ (ঠোঁটে পাইপ ধরার ভঙ্গী করে) Scientist—intermediate fail.

সামন্ত।। বাঃ! খুব মজার ব্যাপার হবে তো?

বেনারে।। আমাদের দলে একজন Intellectual-ও আছেন। Intellectual মানে গ্রন্থকীট, মানে one who takes pride in his bookish learning— বিরাট পাণ্ডিত্য। কেবল আমি—আমি—আমি। কিন্তু কাজের বেলায় ঘোমটা টেনে দৌড়ে পালান। আজ অবশ্য উনি আসেন নি—আসবেন না। আসবার সাহস আছে?

সামন্ত।। আচ্ছা, এই যে বিচার হবে আজকে। অভিযোগটা কিসের?

বেনারে।। আজকের অভিযোগ প্রেসিডেন্ট জনসনের বিরুদ্ধে। এটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি অস্ত্র নির্মাণের অভিযোগ।

সামন্ত।। বাপরে—

বেনারে।। এই-এই চুপ! ওঁরা সবাই এসে গেলেন বোধ হয়—(হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় আসে) আপনি এদিকে আসুন—এই জায়গাটায় লুকিয়ে থাকুন। আমি এখানে লুকোই। ভাল করে ঘাপটি মেরে থাকবেন। ওদের আসতে দিন—(সামন্ত আর বেনারে প্রবেশদ্বারের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, পরস্পর গা ছুঁয়ে থাকে। "Here it is, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল"—ইত্যাদি বলতে-বলতে উকিল সুখাৎমে, বিজ্ঞানের ছাত্র পোংশে, এবং পিওন যে সাজবে সেই রোকড়ে প্রবেশ করে। রোকড়ের দুহাতে দু-তিনটে বাক্স, কয়েকটি কাপড়ের থলি, মাইক্রোফোনের ব্যাটারি সেট ইত্যাদি লটবহর। তিনজনেই প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢোকে। সুখাৎমের মুখে জ্বলন্ত বিবি, পোংশের ঠোঁটে পাইপ। ওদের পিছনে একটা কুলি কোর্টরুমের দুটো কাঠগড়া হাতে নিয়ে ঢোকে। সবাই ঢোকা মাত্র বেনারে ভোঁ আওয়াজ করে সামন্তকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। সবাই প্রথমটা ভীষণ চমকে ওঠে। তারপর একে-একে সামলে নেয়। বেনারে হাসতে-হাসতে যেন গড়িয়ে পড়ে। সামন্ত সকৌতূহলে ও সবিস্ময়ে দেখে।)

রোকড়ে।। (মালপত্র এক জায়গায় রেখে দিয়ে)—ইঃ! কি হাসিরে বাবা! বেনারে বাঈ আর কত জোরে হাসবেন? এই সব লটবহর পড়ে যেত যে। মিসেস কাশিকার চিৎকার করে গালি পাড়তেন। যা কিছু হোকনা কেন, আমাকেই বকাবকি করেন। আমি যে ওঁর বাড়িতে মানুষ হয়েছি। তা মেনে নিতেই হবে—কোনও উপায় তো নেই। ভাগ্যে যা আছে মানতেই হয়। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কুলিটা বাঁ দিকের উইংসে কাঠগড়া দুটো রেখে বেরিয়ে আসে। পোংশের কাছে থেকে পয়সা নিয়ে চলে যায়।)

পোংশে। (কায়দা ক'রে মোটা ফ্রেমের চশমা খুলতে-খুলতে) Oh Gosh! কোথায়—(বিড়ি-বিড় করতে করতে ভিতরে চলে যায়।)

সুখাৎমে।। (এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে) ছোট্টো মেয়েটা লুকিয়ে আছে আমার মনে।—বেনারে বাঈ আর যাই হোক না কেন, আপনি বুড়ি হ’তে রাজি নন—কি বলেন?

বেনারে।। কেন মশাই ক্লাসে তো বেশ গম্ভীর হয়ে থাকি। কিন্তু আমি বলি গিয়ে সব সময় মুখটা লম্বা কিম্বা হাঁড়ির মত করে বেঁচে থেকে কি হবে ওই পোংশের মত? হেসে নাও গান গাও হৈ-চৈ কর আর জানা থাকলে এবং যদি পার তবে নেচেও নাও। ভয় পেয়ে কিংবা লজ্জা করছে বলে মনটাকে চেপে রাখার কোনও মানেই হয় না। সত্যি বলতে মরবার সময় কেউ এসে কি আমাকে আয়ু দান করে যাবে? বলুন তো সামন্ত। আসবে কেউ?

সামন্ত।। ঠিক বলেছেন। তুকারাম মহারাজ বলেছেন—মানে বোধহয় উনিই বলেছেন—

বেনারে।। ধ্যাত্তোর, তুকারাম মহারাজ—আমি লীলা বেনারে, জনৈকা, জ্যান্ত ভদ্রমহিলা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই জীবন অন্য কারো জন্যে নয়—শুধু নিজের জন্য, অন্তত তাই হওয়া উচিত। জীবন অতি মহার্ঘ। এর প্রতি মুহূর্ত, প্রতিটি অণু-পরমাণু অত্যন্তই মূল্যবান।

সুখাৎমে।। (হাততালি দিয়ে)—Hear! Hear!

(পোংশে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে)

বেনারে।। Here নয়, There (মুখ টিপে হাসে)

পোংশে।। (বুঝতে না পেরে) কি, হয়েছে কি?

বেনারে।। পোংশে, শপথ নিয়ে বলতো ফাংশনের আগে তুমি ভীষণ নার্ভাস হ’য়ে গেছ এবং সেটা কাটাবার জন্য যা করা দরকার তাই করবার জন্য ভিতরে গিয়েছিলে? Correct ?

সুখাৎমে।। যাই বলুন না কেন বাঈ, আমাদের আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় বৈজ্ঞানিক হিসাবে পোংশেকে খুব—Impressive দেখায়—টাইপ-টাইপ—আমাদের Scientist মশায় Intermediate পরীক্ষায় Once more পেয়েছিলেন এবং এখন যে তিনি C.T.O. তে কেরানিগিরি করেন সেটা কেউ বিশ্বাসই করবে না।

(রোকড়ে হাসি চাপতে না পেরে একটু হাসে)

পোংশে।। (নার্ভাস হয়ে)—হেসো না রোকড়ে। কাশিকারগিন্নির ভাত খেয়ে মানুষ হইনি। Inter failed হ’তে পারি, কিন্তু বাপের টাকায়। Nonsense!

বেনারে।। (সঙ্গে সঙ্গে নকল করে)—Nonsense! (হাসতে-হাসতে) ও, হ্যাঁ, লেখাপড়ার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল—ছোটবেলায় যখন প্রত্যেক বছর নতুন বই কেনা হ’ত—আপনাদের একটা মজার গল্প বলব—ছেলেবেলায় আমি খুব চাপা প্রকৃতির ছিলাম। মনে-মনে কত কি ভাবতাম। কতো কি করব ভাবতাম। কিন্তু কাউকে বলতাম না। কিন্তু মনের মত কিছু না হ’লে জোর কান্না জুড়ে দিতাম।

পোংশে।। মানে এখন যা করেন, ঠিক তার উল্টোটা?—

বেনারে।। হ্যাঁ।—ও সামন্ত, জানেন—(সামন্তের সঙ্গে কথা শুরু করে।)

সামন্ত।। (ঘাবড়ে)—নিশ্চয়! মানে জানি না তো!

বেনারে।। স্কুলে প্রথম দিন প্রত্যেকটি বই ভাল করে কভার দিয়ে প্রথম পাতায় সুন্দর করে ছোট্ট-ছোট্ট

অক্ষরে ফুল-টুল এঁকে লিখতাম—The grass is green : The rose is red. This book is mine : Till I am dead.' Till I am dead. তারপর কি হ'ল?

সামন্ত।। কি হ'ল—

বেনারে।। প্রত্যেকটি বই ছিঁড়ে গেল। জানিনা একে-একে কোথায় সব হারিয়ে গেল। আমি কিন্তু রয়ে গেলাম। I am not dead, not dead. The grass is still green, the rose is still red, but I am not dead. (হাসতে থাকে।)

রোকড়ে।। (একটা থলি থেকে তৎপরতার সঙ্গে একটা খাতা বার করে লিখতে থাকে।)—বাঃ! ভারি সুন্দর কথা তো। the grass is green, rose is red— তারপর কি—বেনারে বাঈ?—

বেনারে।। (বিরক্তি প্রকাশ করে)—রোকড়ে, এটা খুব খারাপ অভ্যেস। আমি ক্লাসে সব সময় মেয়েদের বলি ভাল করে না শুনে তাড়াতাড়ি লিখতে যেও না। প্রথমে শোন। মন দিয়ে শুনে মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে নাও। তাহলেই মনে থাকে। রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়া চাই। যেটা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, সেটাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। কেউ মুছে ফেলতে পারে না।

(রোকড়ে প্রাণপণে লিখতে থাকে।)

সামন্ত।। পণ্ডিতমশাইও তাই বলতেন। রামদাস স্বামীর শ্লোক শেখাবার সময়। অবশ্য রক্ত-টক্ত বলতেন না।

সুখাৎমে।। বেনারে বাই, বলে যান, আপনি বলে যান।

বেনারে।। (মহা উৎসাহে) আচ্ছা, একটা গল্প বলি।

(যেন ক্লাস রুমে)—সবাই বসে পড়। একটা নেকড়ে ছিল।—

রোকড়ে।। (হঠাৎ বসে পড়ে)।—হ্যাঁ, বেনারে বাঈ, গল্পই হোক। বসুন সুখাৎমে সাহেব। পোংশে বসে পড়। (পোংশের পছন্দ হয় না। বিরক্তি সহকারে বেরিয়ে যায়।)

বেনারে।। গল্প থাক। একটা কবিতা শোনাই।

—অজানা বিপদের পথে—
আমাদের পা দুটো এগিয়ে চলে পায়ে-পায়ে।
ঢেউয়ের উপর ভেঙে পড়ে অন্ধ ঢেউ—
জ্বলে আর নেভে—
মিশে যায় নিঃসীম আলোয় আঁধারে।
পুড়ে যায় মাটির হাত।
অবিরাম ঝরে নিষ্ঠা ভরে
স্নাতনির্ঝর
সে ক্ষতের সৃষ্টি শুধু ঝরিবার তরে।।
এমন এক বিচিত্র যুদ্ধ
শেষ যার শুধু পরাজয়ে।
এমন কয়েকটি তিক্ত অভিজ্ঞতা
জন্ম যার বিফলতার তরে—

(কবিতা অসমাপ্ত রেখে)—এটাও থাক। আমি কিন্তু এবার একটা গান গাইব।

—ঝগাওয়ের বুড়ো আসে বনভোজনে

ঝগাওয়ের বুড়ো—বুড়োটার বৌ

বৌটির ছেলে—দাইমার কোলে,

দাইমার সই—বকুল ফুল—

(সুখাৎমে চেয়ারে বসে। সামন্ত সকৌতূহলে উপভোগ করতে থাকে। বেনারে গান গাইতে শুরু করে। সুখাৎমে যেন ভজন গাইবার সময় বুকের ওপর দুহাত তুলে তাল দিচ্ছে। প্রবেশ করে সৃজনশীল নাটকওয়ালা, নাট্যশিল্পী কার্ণিক—পান চিবোতে চিবোতে।)

কার্ণিক।। (প্রবেশ করেই)—এসে গেছি। মনে হচ্ছিল হারিয়ে ফেললাম। (সবাইকে দেখে)।—কি হচ্ছে এসব?

রোকড়ে।। এঃ! সব মাটি হয়ে গেল।

সুখাৎমে।। বেনারে গান গাইছিলেন। (কৃত্রিম কণ্ঠে)—ভারি সুন্দর, ভারি মিষ্টি, বেনারে বাঈ।

(বেনারে জিব্ বার করে জানায় ঠাট্টা বুঝতে পেরেছে। তারপর হাসতে থাকে। রোকড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে—কার্ণিক হলঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে।

সুখাৎমে।। (কার্ণিককে, উকিলি কণ্ঠে)—মিস্টার কার্ণিক, one minute! আপনার মনে কি ভাব উদয় হচ্ছে সে কথাটা কি আমায় বলতে দেবেন? intimate theatre— অর্থাৎ ঠিক মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, এমন সব নাটকের যে অল্পসংখ্যক বুদ্ধু— থুড়ি—বোদ্ধা দর্শক আছেন তাঁদের জন্য উপযুক্ত হলঘর। বলুন, সত্যি কিনা বলুন?

কার্ণিক।। (শান্তভাবে পান চিবোতে-চিবোতে—)—না, আমি ভাবছিলাম এই ঘরটা সত্যিকারের কোর্ট-কেও হার মানাবে, এমনি বটে।

বেনারে।। আইয়া! তার মানে ভালই হ'ল। আজকে অভিরূপ বিচারালয়ে বেশ জমাটি ফাংশন হবে— যেন সত্যি-সত্যি।

রোকড়ে।। (চিন্তিত ভাবে)—কাশিকারগিন্নি আবার কোথায় পিছিয়ে পড়ে রইলেন।—

কার্ণিক।। (পান চিবোতে চিবোতে)—আসছেন, আসছেন। রাস্তায় মিঃ কাশিকার ফুলের বেণী কিনছেন—তাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি পান কিনে তাই চলে আসলাম। রোকড়ে, মাইকের ব্যাটারি সেট চালু আছে তো? যদি চাও এখনই test করে নাও। নইলে রাত্তিরে ঠিক কাজের সময় গন্‌ফট্। যখন যেটা হওয়ার কথা নয় তখনই সেটা হবে। গতমাসে আমাদের show-এর মধ্যে বাতি ফিউজ হয়ে গেল। আমি তখন আবার স্টেজে। আমার পার্টটা অবশ্য বড় ছিল না। বড় ছোট পার্টে কি আসে যায়—ম্যানেজ করে নিলাম।

রোকড়ে।। ওতো গণেশ পুজোর বারোয়ারি থিয়েটার হচ্ছিল—

কার্ণিক।। কিন্তু mood টা তো নষ্ট হয়ে গেল।

বেনারে।। (সশব্দে হাই তুলেই খেপাবার সুরে)—না-না মিঃ কার্ণিক, আপনার কথা শুনে হাই তুলছি না। হয়েছে কি জানেন? আমাকে রোজ ভোরে উঠতে হয় তো, —morning shift, তারপর afternoon shift তারপর বিকেলে একটা টুইশানি! আচ্ছা, মিস্টার আর মিসেস কাশিকারের একটা জিনিস কেউ লক্ষ্য করেছেন?

রোকড়ে।। (নিজেকে সামলাতে পারে না)—কি—কি জিনিস? (ঠিক সেই মুহূর্তে পোংশে প্রবেশ করে)

পোংশে।। Yes, what?

সুখাৎমে।। আমি বলতে পারি। থাকগে, আপনিই আগে বলুন বাঈ। হ্যাঁ, let me see, come on, out with it.

বেনারে।। সুখাৎমে, আপনি কিস্‌সু বোঝেননি। দয়া করে আর সবজান্তা উকিলি চাল মারবেন না। আমাদের কাশিকার যদি বিখ্যাত social worker আর মিসেস্ কাশিকার যদিও একেবারে ইয়ে—মানে কম পড়াশুনো করেছেন, এই আর কি। তবে আমি বিশ্বাস করি না পড়াশুনা ইত্যাদি-ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের বিচার-বুদ্ধির খুব একটা সম্পর্ক আছে। তবুও—মিসেস্ কাশিকার কম শিক্ষিত হলেও—দুজনেই খুব মজার—মানে খুব আমুদে—মানে মিস্টার কাশিকার মিসেসের জন্য ফুলের বেণী কেনেন, আর মিসেস কাশিকার মিস্টারের জন্য readymade বুশশার্ট কিনে আনেন। দেখতে খুব ভাল লাগে, না? (কার্ণিক পিছন দিকের জানালা খুলে মুখভর্তি পানের পিক ফেলে)

কার্ণিক।। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন এই সব formalities দেখি তখন ওর পেছনে অন্য কিছু আছে—এই রকম একটা suspense হয় আমার।

রোকড়ে।। নবনাট্যের পরিণাম!

কার্ণিক।। যা বুঝিস্ না তা নিয়ে ফর্‌ফর্ করিস না রোকড়ে। তুই এখনও ছেলেমানুষ আছিস, কলেজে পড়াশুনো করছিস—তাই কর, ব্যাস!—নিজের কথা বলি,—আমি কোনদিনও গিন্নিকে ফুলের বেণী-টেণী কিনে দিইনি। ইচ্ছে হলেও চেপে গেছি।

(বেনারে চুক্ চুক্ শব্দ করে)—কি হ’ল?

বেনারে।। আমি যদি তুমি হ’তাম, রোজ রোজ গিন্নির জন্য ফুলের বেণী কিনে নিয়ে যেতাম।

সুখাৎমে।। তাহলে স্বামীর জন্য বুশশার্ট নিয়ে যাবার একটা কিছু ব্যবস্থা কর—মিস্ বেনারে। I wonder, ভদ্রলোকটি কেমন দেখতে হবেন। আপনার মতন যদি রগুড়ে হন তাহলে তো ভাবনাই নেই।

বেনারে।। ওসব কথা থাক—(সামন্তকে)—শুনছেন কি যেন আপনার নাম—এখানে কয়েকটা চেয়ার পাওয়া যাবে তো?

সামন্ত।। চেয়ার?—আমার নাম সামন্ত। (উঠে এখানে ওখানে খুঁজতে আরম্ভ করে।) দেখি—আমি তো সব জানি না। (খুঁজতে খুঁজতে ভিতরে চলে যায়।)

পোংশে।। ভিতরে—folding chair— চায়ের বন্দোবস্ত হলে ভাল হ’ত।

সুখাৎমে।। স্টেশনে যখন খাচ্ছিলাম তুমি তো ‘না’ করলে। (হাত নেড়ে বোঝায়)—এখন ঠেলা সামলাও!

পোংশে।। Gosh! তখন খাইনি কারণ—তখন খেতে চাইনি। তোমরা যে আগে থেকেই খাওয়া-দাওয়া সব সেরে রাখো! ও আমার ভাল লাগে না। এটা কি একটা life! এই science age-এ যখন যেমনটি চাইব তেমনটিই পাব। (তুড়ি দিয়ে) Like this, তাতেই তো মজা!

(সামন্ত যতগুলো সম্ভব folding chair নিয়ে দেখা দেয়।)

সামন্ত।। (চেয়ার রেখে) যদি আরও চান, আছে। ভেতরে। (সবাই পটাপট চেয়ার খুলে যে যেখানে পারে বসে নিজেদের কথা বলতে থাকে। মুখে পাইপ গুঁজে পোংশে দাঁড়িয়ে থাকে। পোংশের সাহেবি ভঙ্গিমায় বিনীত হয়ে—)—আপনি বসুন না, স্যার!

পোংশে।। হ্যাঁ! (‘স্যার’ সম্বোধনে খুশি হ’য়ে) No. Thank you. ট্রেনে বসেইছিলাম। আপনার নাম কি?

সামন্ত।। সামন্ত। আমি এখানকারই লোক স্যার।

পোংশে।। Good! চায়ের কিছু বন্দোবস্ত করা সম্ভব?

সামন্ত।। চায়ের? হবে স্যার। কিন্তু মুশকিল হবে চিনি নিয়ে। চিনি তো এখন পাওয়া যায় না। তবে যদি গুড়ের চা—

পোংশে।। No. চায়েতে গুড় poisonous হয় এটা বুঝি আপনার জানা নেই, মিঃ সামন্ত?

সামন্ত।। বাড়িতে আমরা বড়রা সব সময় গুড়ের চা খাই। র‍্যাশনে যে চিনি পাওয়া যায় তাতে ভাইপোদেরই কুলোয় না। ওরা চিনি ছাড়া চা খেতে চায় না। উপায় কি বলুন?

পোংশে।। (মুখে পাইপ চেপে scientist-এর মত) হুঁঃ!

বেনারে।। (বসে বসে নকল করে খেপায়) হু! আর একটা মেয়ে ছিল উঁহুঃ।

পোংশে।। থাক না বাঈ। আর কত ছেলেমানুষী করবেন!

(সামন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। মিঃ ও মিসেস কাশিকার উপস্থিত হন)।

মিসেস কাঃ।। (অন্যমনে বেণী ঠিক করতে করতে)—এই দেখ, সবাই এখানে আছে।

সুখাৎমে।। আসুন, মিঃ কাশিকার। বেণী Programme কেমন হল?

(বেনারে সামন্তকে ওদের ইঙ্গিত করে চিনিয়ে দেয়)

রোকড়ে।। আজ্ঞে হ্যাঁ। সবাই।

মিসেস কাঃ।। বালু, জিনিসপত্র এনেছিস তো?

রোকড়ে।। হ্যাঁ।

মিঃ কাশিকার।।সব সময় বলিস ঠিকমত এনেছিস, কিন্তু সব সময় কিছু না কিছু ভুলে যাস। কোর্ট-পিওনের ন্যায়দণ্ডটা আছে তো? অত জোরে মাথা নাড়িস না। খুব তো আছে বলছিস। আগে দেখা।

রোকড়ে।। (বের করে দেখায়)—এই যে (করুণভাবে)—পিওনের ড্রেসও আছে। মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। তাই বলে সব সময়—

মিঃ কাশিকার।।সব সময়ের কথা হচ্ছে না। আজ সব ঠিক আছে তো? না থাকলেই তো যতসব গোলমাল। আমার wig—জজের—এনেছ?

রোকড়ে।। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব চেয়ে আগে নিয়েছি।

(বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে করুণ দেখায়)

মিঃ কাশিকার।।আপনি, মিঃ সুখাৎমে—উকিলের গাউনটা এনেছেন?

সুখাৎমে।। (কোর্টে যেন জজকে bow করছে)—Yes, Your Honour! স্বপ্নেও ভুল হবে না। পোংশে! আপনার কি ব্যাপার?

পোংশে।। Well, আমি সব পরেই চলে আসি—কিছু যাতে বাদ না যায়। তার ওপর আমার একটু নার্ভাস temperament আছে তো। যদি পাইপটা না থাকে witness-box-এ কিছুই মনে পড়ে না।

মিসেস কাঃ।। আজকে আপনার পার্টটা আমি আগেই একবার বলিয়ে নেব।

পোংশে।। দরকার নেই—দরকার নেই।

মিসেস কাঃ।। কি গো বেনারে? (হঠাৎ বেণী ঠিক করতে করতে)—তোমার জন্যও একটা বেণী কিনব ভাবছিলাম।

বেনারে।। (পোংশের কণ্ঠস্বর নকল করে)—হুঁঃ!

(পোংশে রেগে পাইপ কামড়ে ধরে।)

মিসেস কাঃ।। (কাশিকারকে)—তাই না গো? কিন্তু হ'ল কী?

বেনারে।। (জোরে হেসে ওঠে)—বেণী উড়ে গেল—শোঁ—শোঁ—শোঁ। না, কাকে নিয়ে গেল। আমার ওসব দরকার নেই। নইলে কি কিনতে পারি না? নিজেই তো রোজগার করি। ওই ফুলের বেণী-টেনী কিনবার ইচ্ছে কোনদিন হয় না।

(বেনারে মিসেস কাশিকারের আনা বড়া সবাইকে দেয়)

মিসেস কাঃ।। আচ্ছা, তোমার স্কুল কি বলে?

বেনারে।। (হঠাৎ সতর্ক হ'য়ে)—কিছু বলে না।

মিঃ কাশিকার।। আমি বলি জজের সিট আমার দিকে রাখব না ওদিকে রাখব?

কার্ণিক।। নিঃসন্দেহে ওদিকে। Entrance ওদিকে হয়েছে তো। পাশের ঘরটি জজের রুম দেখান হবে। You can enter from there. President Johnson এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সামন্ত।। (প্রচণ্ড বিস্ময়ে)—President Johnson!

মিঃ কাশিকার।। না, না। জনসনের কাঠগড়া ওখানে রাখা উচিত। তবেই জজ হিসাবে আমাকে কিছু বরতে গেলে—

কার্ণিক।। ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না। দর্শকের ভাল লাগার দিক থেকে দেখতে গেলে এখানেই থাকা উচিত।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক, কেবল দর্শকের ভাল লাগার দিক থেকে দেখার জন্য আমি আপনাকে prosecute করবো। আপনি নবনাট্য গোষ্ঠীর লোক। (উকিলি হাসি)।

কার্ণিক।। এক কথা—সেই এক কথা। কেউ আমাকে একটু বুঝিয়ে দিতে পারে নবনাট্য বস্তুটি কি? কিছু না বুঝেই কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করলেই হ'ল—যেমন এখানে। আমরা যা বিশ্বাস করি, তাই করি। তা প্রাচীনই হ'ক আর নবই হ'ক।

(সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে থাকে)

সামন্ত।। (রোকড়ের কাছে গিয়ে)—President Johnson-এর কারবারটা কি মশাই?

রোকড়ে।। (নিজের ভাবনায় মগ্ন থাকায় চমকে ওঠে) কার কারবার?

সামন্ত।। না, ওঁরা যে এক্ষুনি বলছিলেন President Johnson না কি যেন?

রোকড়ে।। ওঃ। তাই বলুন?

সামন্ত।। সত্যিকারের President Johnson-এর পক্ষে তো এখানে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু, মানে আসল ব্যাপারটা কি হবে?

রোকড়ে।। সত্যিকারের কোথায়? অই যে কার্ণিক—ও ব্যাটাই হবে।

(কার্ণিক-তুই-তোকারি করাতে ব্যাটা বলে)

সামন্ত।। President Johnson?

রোকড়ে।। (হঠাৎ মনে পড়ায় মিসেস কাশিকারকে)—বাঈ, কিন্তু প্রফেসর দামলে তো এলেন না।

(বেনারে এতক্ষণ মিসেস কাশিকারের সঙ্গে কথা বলছিল, হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু যেন দ্বিধার সঙ্গে পোংশের কাছে যায় এবং কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। পোংশে পাত্তা দেয় না।)

মিসেস কাঃ।। সব সময় যেমন দেরি করে আসেন। আমাকে ফোন করে বলেছিলেন। আমরা যে ট্রেনটায় আসছি সেটা ওঁর পক্ষে সুবিধা হচ্ছে না। ইউনিভার্সিটিতেও ওনার সিম্‌পসিয়াম না কি একটা আছে। আমি দু'দুবার ওঁকে মনে করিয়ে দিয়েছি। বেনারে, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বেনারে।। (পোংশের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত)—কে?

মিসেস কাঃ।। প্রফেসর দামলে?

বেনারে।। না তো।

(আবার পোংশের সঙ্গে সেধে সেধে কথা বলতে থাকে। পোংশে কিন্তু অবিচলিত। কোন response নেই। সামন্ত কি একটা জিজ্ঞেস করে মিসেস কাশিকারকে)

রোকড়ে। কিন্তু বাঈ। সামন্ত বলছিলেন যে পরের ট্রেনটা পৌঁছবে একেবারে রাত নটায়। তাতে কি চলবে? Late হয়ে যাবে যে!

পোংশে।। (বাধা দিয়ে)—বাঈ, আপনার বান্ধবীর আর কি হ'ল? ওই যে যিনি বিপদে পড়েছিলেন, মানে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য যে ভদ্রমহিলাটিকে আপনি খুঁজে বার করলেন?

(বেনারে বিচলিত হয়ে ওঠে। দ্রুত সামন্তের কাছে যায়।)

মিসেস কাঃ।। একটা গাড়ি ছিল তো। (কাশিকারকে)—ওগো শুনছ? বালু বলছে এর মধ্যে গাড়ি নেই।

কাশিকার।। (কাশিকার কার্ণিকের সঙ্গে তর্ক করছিল)—কিসের মধ্যে?

রোকড়ে।। (কাশিকারকে) ফাংশনের আগে গাড়ি নেই—সামন্ত বললেন এই কথা।

সুখাৎমে।। শেষ হবার পর আছে তো? তাহলেই চলবে।

কাশিকার।। কিন্তু সুখাৎমে, প্রফেসর দামলে পৌঁছবেন কি করে? ওঁর তো late হয়ে যাবে। অবশ্য যদি আসেন। মাঝে তো কোনও গাড়ি নেই।

কার্ণিক।। আমি বলছি—উনি তাহলে আসবেন না। প্রফেসর দামলে হিসেব করে চলেন। যখন বুঝবেনই late হয়ে যাবে প্রোগ্রামগুলি সেরে—তখন বাড়িতে মৌজসে বসে থাকবেন।

রোকড়ে।। (একটু উদ্বিগ্ন)—বাঈ, আমি কিন্তু প্রতিবারের মত এবারেও ওঁকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম।—সবার সঙ্গে। আমার কিন্তু কোন দোষ নেই। আমি ঠিকানাও ঠিক মতো লিখেছিলাম।

কাশিকার।। ভারি গোলমাল হয়ে গেল যে।

সুখাৎমে।। কি আর হবে? কিছু ভাববেন না।

কাশিকার।। না ভাবলে কি চলে? We owe something to the people সুখাৎমে। এই ফাংশনটা তো ইয়ার্কি নয়।

পোংশে।। (এগিয়ে এসে) আবার কি হল?

মিসেস কাঃ।। (সুখাৎমে-কে)—এখন তাহলে প্রতিবাদী উকিল কাকে—

সুখাৎমে।। Don't worry! আজকের মত সরকারি উকিলের পার্টের সঙ্গে ওই কাজটাও চালিয়ে নেব—তাতে কি আছে। আমি হচ্ছি জাত-উকিল। কোনও অভাব বুঝতে দেবনা। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে বলছি কাশিকার, আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিন।

কার্ণিক।। আমিও তাই বলি। ওটা আরও dramatic হবে।

পোংশে।। নিঃসন্দেহে। (জোরে জোরে পাইপে টান দেয়)।

রোকড়ে।। (একটা কাগজ সামনে ধরে দেখতে দেখতে)—হ্যাঁ, তারপর চার নম্বর সাক্ষী।—সুখাৎমে সাহেব, উনিও গায়েব। রাউতে ফ্লু-তে sick হয়ে পড়েছে। আমরা ঠিক করেছিলাম এখানে কাউকে দিয়ে চালিয়ে নেব। (মিসেস কাশিকারকে দেখে সামলে নিয়ে)—আমরা মানে আপনি।

সুখাৎমে।। True! কিন্তু এখানে কেউ—মানে—?

রোকড়ে।। (সাহস সঞ্চয় করে)—আমি আজকের মত কাজটা চালিয়ে নেব। ছোট তো? আমার পার্টটা যে কেউ করে দেবে—চার নম্বর সাক্ষীর সব পার্ট আমার মুখস্থ।

কার্ণিক।। I oppose. Court peon হলেও character-টা অত সহজ নয়—মানে dialogue না থাকলেও কি হয়েছে, situation টা খুব tense। খামোখা শেষ মুহূর্তে অন্য কাউকে ওই পার্টটা দিলে খুব অসুবিধা হবে রোকড়ে, তোমার পার্ট তুমি করবে।

রোকড়ে।। কিন্তু একদিনের জন্য যদি অন্য পার্ট করি—

কাশিকার।। না!

মিসেস কাঃ। বালু, উনি যখন না করছেন তখন থাক। (রোকড়ে পিছন দিকে চলে যায়)—তাহলে চার নম্বর সাক্ষী কে হবে?

সুখাৎমে।। (সামন্তকে লক্ষ্য করতে করতে)—I know, (হঠাৎ) এই দেখুন, চার নম্বর সাক্ষী। (সামন্তকে নির্দেশ করে)

সামন্ত।। (ঘাবড়ে গিয়ে)—অ্যাঁ! কি বললেন?

পোংশে।। (পাইপে টান দিয়ে)—Not bad.

কাশিকার।। (সামন্তকে)—কি মশাই, নাটক-ফাটক করেছেন?

সামন্ত।। আজ্ঞে না। কোনওদিনও না। কেন, কি হয়েছে কি?

মিসেস কাঃ।। বলুন তো, আপনি চার নম্বর সাক্ষী হবেন? এই বেনারে (বেনারে এগিয়ে আসে) একে চার নম্বর সাক্ষী হিসাবে কেমন লাগছে রে?

বেনারে।। ইনি তো? Not bad—ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে। (সামন্ত ঘোরতর অপ্রস্তুত। বেনারে হেসে ওঠে)—মানে সাক্ষী হিসেবে বলছি—চতুর্থ সাক্ষী।

সুখাৎমে।। মিসেস কাশিকার, কার্ণিক, পোংশে—dont' worry, আমি ভার নিলাম। হবেটা আর কি! ওকে তৈরি করে নেব। মিস্টার—কি যেন আপনার নাম।

সামন্ত।।	রঘু সামন্ত।

সুখাৎমে।।	মিঃ সামন্ত, আজ রাত্রে আমাদের অভিরূপ বিচারালয়ে আমরা আপনাকে চার নম্বর সাক্ষী মনোনীত করলাম।

সামন্ত।।	(প্রথমে হতভম্ব। তারপরেই উত্তেজিত)—কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।

মিসেস কাঃ।।	কোর্ট দেখেছেন তো?

সামন্ত।।	জীবনে কোর্টে যাই নি।

কার্ণিক।।	অন্তত নাটকে?

সামন্ত।।	ওসব নাটক এখানে হয় না।

সুখাৎমে।।	নাটকের কোর্ট যে দেখেনি এক হিসেবে ভালই হয়েছে। আর যাই হ'ক কোর্ট সম্বন্ধে কোনও ভুল ধারণা হয়নি।

কার্ণিক।।	কিছু-কিছু নাটকের জন্য এই ভুল ধারণা হয়নি এই কথাটা বলুন।

সুখাৎমে।।	মিঃ সামন্ত, ফাংশনের আগে আপনাকে ভাল করে তৈরি করে নেব, সাক্ষী তৈরি করা তো উকিলদের শেখাতে হয় না। (হো হো করে উকিলি হাসি)

সামন্ত।।	কিন্তু আমার একেবারে অভ্যেস নেই যে। তার ওপর কোর্টের নাম শুনে আরও ভয় করছে।

মিসেস কাঃ।।	আমি বলি কি জানেন, ওঁকে দিয়ে একটা রিহার্সাল করিয়ে নি। (কাশিকারকে)—কি বল? (কাশিকার শুনতে পেল না)—কি গো বেনারে, তুমি—?

বেনারে।।	আমার কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই। এমনিতেই রাত্রে ফাংশনের অনেক দেরি, কি যে করব ভাবছিলাম। আজ আবার বেরবার সময় পড়বার জন্য একটা বইও আনতে ভুলে গেছি।

সামন্ত।।	যদি চান সূর্যকান্ত ফাতরফেকারের নতুন উপন্যাসটা—১০৫ নম্বরের—আছে। (বার করে দেয়) উনি বেশ ভাল উপন্যাস লেখেন।

বেনারে।।	দরকার নেই।

সুখাৎমে।।	শপথ নেবার জন্য বাইবেল ও ভাগবদ্‌গীতা দুটোই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনি পড়ার কথা বলছিলেন তাই বললাম। কি হে রোকড়ে, বাইবেল, গীতা এনেছ তো। না ভুলে গেছ?

রোকড়ে।।	(খুবই ব্যথিত)—না, এনেছি। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

(মালপত্রের কাছে যায়, কিন্তু দেখায় না)

বেনারে।।	ওসব পড়ার বয়স এখনও আমার হয়নি উকিল সাহেব।

কাশিকার।।	তাহলে আপনি সিনেমা ম্যাগাজিন ওসব পড়ে থাকেন বুঝি? আমার উনি পড়েন। তাই জিজ্ঞাসা করছি। বেশ মজার কাগজ। আমি আমার social work নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে ছবি-টবি যেগুলো ছাপা হয়, সেগুলো ছাড়া আর কিছু দেখার সময় পাই না।

মিসেস কাঃ।।	ইস্‌-শ্‌ এত—(disapproval) আঃ হা, থাক না—

কাশিকার।।	(রেগে) ইশ্‌-শ ও আহা থাক না করার কি আছে? আমি কি মিথ্যা বলছি।

(মিসেস কাশিকারের মুখ কালো হয়ে যায়।)

কার্ণিক।। রিহার্সালের আইডিয়াটা আমার ভালই লাগছে। কেবল বাইরে গিয়ে যদি কেউ চার-পাঁচটা সিগ্রেটের প্যাকেট নিয়ে আসে তো বেশ হয়। রিহার্সালের মাঝখান থেকে আমাকে উঠে যেতে হয় না।

পোংশে।। (পাইপে টান দিয়ে) I don't mind.

সামন্ত।। (রোকড়েকে) তাহলে আমার আপত্তি নেই। সব কিছু আগে থেকে দেখিয়ে দিলে কোনও ভাবনাই থাকে না। ভয়ও কমে যাবে। কি বল?

(রোকড়ের দিক থেকে কোন response নেই)

বেনারে।। আমার একটা কথা বলার আছে। আণবিক অস্ত্রের অভিযোগটা আমরা গত তিনমাসে সাতবার করেছি, আজ রাতে আটবার হবে। এখন যদি রিহার্সাল করি—আমরা এমনিতে কোন আপত্তি নেই—কিন্তু রাত্রে main function তেমন জমবে না।

সুখাৎমে।। I agree with মিস বেনারে। আমার একটা আইডিয়া এসেছে। দেখুন, আপনাদের পছন্দ হয় কি না। বার লাইব্রেরিতে যখন কাজ থাকে না, তখন আমরা উকিলরা রামি খেলি পেশেন্স্ খেলি কিম্বা মাঝে মাঝে আর একটি অন্য ধরনের খেলা করি just time passing that's all. কারোর বিরুদ্ধে একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাল্পনিক অভিযোগ আনা হয়। কেমন, সেটাই করব, কাল্পনিক অভিযোগ আনব? ইনি মানে সামন্ত কোর্টের আদব কায়দা সব বুঝে নেবেন। আর আমাদের সময়টাও ভাল ভাবে কাটবে। কেমন মিঃ কাশিকার, আপনার sanction আছে তো?

কাশিকার।। ঠিক আছে public life নিয়ে যার কারবার সে তো নিজের খেয়াল খুশিমত সব সময় চলতে পারে না। যা করতে হবে সবাইকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে।

কার্ণিক।। (উত্তেজিত কণ্ঠে) Three cheers for this new idea. আমাদের drama technique-এ একেই তো visual enactment বলা হয়। গত বছর গভর্নমেণ্ট থিয়েটার ওয়ার্কশপে যখন গিয়ে বসতাম তখন এসব কথা শুনতাম।

সুখাৎমে।। এমন সহজ ব্যাপারে অত কঠিন কথা কেন ব্যবহার করছেন কার্ণিক? এটা তো একটা খেলা—কি বলেন মিস বেনারে?

বেনারে।। আমি কানামাছি খেলতেও রাজি। খেলার কথা তুললেন তাই বললাম। স্কুলে মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে খেলা করি। খুব মজা লাগে।

পোংশে।। All right, we play, মিঃ সামন্ত, please গিয়ে মোড় থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট ক'টা নিয়ে আসবেন? আমার জন্য ক্যাপসটান আনবেন। এই নিন। (টাকা বার করে দেয়)

মিসেস কাঃ।। আপনি দিচ্ছেন কেন পোংশে? সামন্ত ওঁকে ফিরিয়ে দিন। আমরা ফাংশনের খরচে দেখিয়ে দেব। হয়ে গেল। ফাংশনটার জন্য সামন্তকে তো কোর্টের দৃশ্য দেখাতেই হবে। হিসেব মিটে যাবে। সামন্ত, (ব্যাগ খুলে একটা নোট বার করে) এর থেকে যে যা চায় আধ ডজন প্যাকেট নিয়ে আসবেন। আর তিনি চারটে পানও নিয়ে আসবেন, মশলা পান।

(সবাই অর্ডার দেয়। সুখাৎমে সবুজ সুতোর ছোট বিড়ি আনতে বলে।)

সামন্ত।। আচ্ছা। (টাকা নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে) শুরু করে দেবেন না। আমি এই এলাম বলে। (প্রস্থান)

বেনারে।। আহা বেচারি। আমিও এলাম বলে।

(বাস্‌কেট্ থেকে ছোট তোয়ালে, সাবান নিয়ে গুন-গুন করতে করতে ভিতরে চলে গেল।)

মিসেস কাঃ।। বালু কোর্টটা একটু সাজিয়ে ফেল।

(বালু কাজ শুরু করে দেয়)

কার্ণিক।। এই পোংশে, একটু এদিকে এস তো! (সুখাৎমে ও বাকি সবাইকে)—cast রাত্রের মতনই তো? মানে জজ, উকিল এই সব?

সুখাৎমে।। Oh yes! By all means. বদলাবে কেন? আমি উকিল সাজব।

মিসেস কাঃ।। আমি বলি প্রতিবাদী অন্তত আর একজন কেউ হ'ক। কি বলেন কার্ণিক?

কার্ণিক।। না, দরকার নেই। (পোংশের কাছে গিয়ে) You know one thing পোংশে?

পোংশে।। What?

কার্ণিক।। (ভিতরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে)—ওর সম্বন্ধে— মিস বেনারে? রোকড়ে told me!

পোংশে।। What?

কার্ণিক।। এখন নয়। রাত্রে ফাংশনের পর মনে করিয়ে দিও।

পোংশে।। আমিও একটা কিছু বলব মিস বেনারে সম্বন্ধে। (অন্য সবাইকে লক্ষ্য করে) আমার মত যদি জানতে চান ভালই হবে—নূতন প্রতিবাদী।

কাশিকার।। আমার মনে হয়, অন্তত মুখটা বদলাবে।

মিসেস কাঃ।। ঠিক তো।

কাশিকার।। কি ঠিক! জিব্‌টাকে একটু সামলে রাখ। কিছু বলার উপায় নেই। অমনি—
(মিসেস কাশিকার চুপ করে যায়।)

সুখাৎমে।। I don't mind, আমার মনে হয় আসামি—why not রোকড়ে?

(রোকড়ে আহ্লাদে আটখানা)

রোকড়ে।। আমি ready.

পোংশে।। ছ্যাঃ (কার্ণিককে) ওর সম্বন্ধে আমিও বলব। (ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে।)

কার্ণিক।। আমি আসামি সাজব।

কাশিকার।। আমি বলি কি, যদি করতেই হয় ঠাট্টাইয়ার্কি করে ছোট-খাট অভিযোগ এনে কি হবে? আমাকে আসামি কর রাজি আছি সুখাৎমে।

কার্ণিক।। অর্থাৎ যা কিছু প্রাধান্য ওঁকেই দাও। উনিই জজ, উনিই আসামি, উনিই—

পোংশে।। (পাইপ টেনে) Consider me then আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। তবে যদি আমাকে দিয়ে চলে তো I am game.

রোকড়ে।। (মিসেস কাশিকারকে) কিন্তু বাঈ, আমি কি খুব খারাপ আসামি হব?

মিসেস কাঃ।। আমি সাজবো? সবাই যদি চান হব বই কি।

কাশিকার।। না, চাই না। (মিসেস কাশিকার চুপ করে যায়।) পাঁচজনের মাঝে আসবার একটু সুযোগ পেয়েছে কি অমনি ধেই-ধেই করে সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। থাক্।

মিসেস কাঃ।। (কুঁক্‌ড়ে গিয়ে) থাক। আমার দরকার নেই। (কাশিকারকে)—হ'ল তো?—(গভীর হতাশা।)

সুখাৎমে।। আপনাদের কারোর দরকার নেই। কাশিকার, আমরা একেবারে আনকোরা নতুন আসামি সাজাব। আমাদের আসামি হবে—মিস বেনারে। কি পোংশে—কেমন choice হোল?

পোংশে।। ভালই হয়েছে।

সুখাৎমে।। এই নিয়ে-আর কথা কাটাকাটি করার দরকার নেই। কি বলেন কাশিকার বাঈ?

মিসেস কাঃ।। আপনি যখন বলছেন—তাই হবে। মেয়েদের বিরুদ্ধে কি ভাবে মামলা চলে—সেটা অন্তত দেখা যাবে। (অভ্যাসবশত কাশিকারকে)—তাই না? দেখা থাকলে ভাল।

কাশিকার।। (ব্যঙ্গভাবে)—হ্যাঁ, তাই। আপনাকে যেন সুপ্রিম কোর্টে জাজ্ করা হবে।

মিসেস কাঃ।। আমি সে কথা বলিনি।

সুখাৎমে।। অবশ্য খুব একটা তফাত হয় না। কিন্তু মেয়েছেলে যখন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তখন মামলাটায় অন্য ধরনের রগড় হয়। একটা মজার চেহারা হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আপনি কি বলেন মিঃ কার্ণিক?

কার্ণিক।। ঠিক আছে। আমি team-এর বাইরে নই। আমি team sprit মানি।

মিসেস কাঃ।। তাহলে এটাই ঠিক হ'ল। মিস্ বেনারে আসামি। কিন্তু অভিযোগটা কি হবে?

কাশিকার।। কোনও একটা সামাজিক সমস্যা নিয়ে হওয়া উচিত।

পোংশে।। সেটাই হবে। (চেয়ার থেকে দাঁড়ায়)—শুনুন, আমরা একটা কাজ করি। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন—come on— আসুন।—(সবাইকে একটা plan বলে যে ঘরে বেনারে গেছে সে দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে— আর কি সব বলতে থাকে।)

কাশিকার।। রোকড়ে! এখনও court arrange করা শেষ হল না?

রোকড়ে।। এই হল বলে। (দ্রুত কাজ করতে থাকে।)

কার্ণিক।। কোথায় কোন্ property থাকবে তার ground plan এঁকে দিয়েছিলাম রোকড়ে, তবুও—

রোকড়ে।। (রেগে)—আপনার ওসব নাটক-ফাটক আমি বুঝতে পারি না। ওসব অভ্যাস নেই আমার।

(সবাই মিলে কোর্টের নকলে ফারনিচার সাজায়। পোংশে দেখতে থাকে। কাশিকার তদারক করে। পোংশের নির্দেশে রোকড়ে বেনারের ভ্যানিটি ব্যাগটা মালপত্র থেকে বার করে বাঁ দিকে একটা টুলের উপর রেখে দেয়। কোর্ট সাজান শেষ হয়। পোংশে আর কাশিকার ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সবাই বাঁ দিকে— উইংয়ের ভিতর চলে যায়।)

কাশিকার।। (যারা চলে যাচ্ছে তাদের)—আমি ইশারা করব।—(সেই মুহূর্তে তোয়ালেতে মুখ মুছতে-মুছতে এবং গুন-গুন করতে-করতে বেনারে বেরিয়ে আসে। খুব fresh দেখাচ্ছে।)

বেনারে।। (নিজের মনে গান গাইতে-গাইতে নিচের বাস্কেটে তোয়ালে সাবান গুছিয়ে রাখতে থাকে।)

—টিয়া শুধায়, চড়ুইরে তোর কেন চোখে জল,
বল না আমায় বল।—
কি আর আমি বলবো তোরে,
মোর বাসা কেউ নিয়েছে কেড়ে,
তাই তো কাঁদি কিচির-মিচির—
চোখে আমার জল।।

পোংশে।। (হঠাৎ ভিতরের দরজা থেকে বেরিয়ে এসে— বেনারের সামনে দাঁড়ায়)—মিস লীলা বেনারে! একটি গুরুতর অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং আসামি হিসাবে এই কোর্টে উপস্থিত করা হচ্ছে।—

(বেনারে নিশ্চল হ'য়ে যায়। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। পোংশেও তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বেনারে চিরুনি রাখার জন্য ভ্যানিটি ব্যাগটা খুঁজতে বাঁ দিকের উইংয়ের কাছে চলে আসে এবং টুলের ওপর থেকে ব্যাগটা তুলে নেয়। কাশিকার ইতিমধ্যে জজের স্টাইলে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে এবং বাঁ দিকের উইংয়ের বাকি সবাইকে ইশারা করে। কার্ণিক ও রোকড়ে গম্ভীর মুখে বেনারের চারিদিকে আসামির কাঠগড়ায় এনে রাখে। সুখাৎমে কালো গাউনটা প'রতে প'রতে বাঁ দিকের উইং থেকে এগিয়ে আসে এবং উকিলের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলের চেয়ারটিতে বসে।—অন্য সবাই নিজ-নিজ নির্দিষ্ট জায়গায়। —প্রবেশ দ্বারে সামন্তকে দেখা যায়।)

কাশিকার।। (গলা খাঁকারি দিয়ে)—আসামি মিস বেনারে! Indian Penal Code-এর ৩০২ ধারা অনুযায়ী সদ্যোজাত শিশুহত্যার অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযোগটি আপনি স্বীকার করেন, কি করেন না?...

(বেনারে স্তম্ভিত—সবাই স্তব্ধ, সমস্ত আবহাওয়াটা থম্‌থমে!)

❑ প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত ❑

১০৭.৫ প্রথম অঙ্কের সারাংশ

নাটকের সূচনা : একশ প্রস্ত হলঘরে একটি নাট্যগোষ্ঠী এসে পৌঁছেছে। এখানে বিশ্রাম নিয়ে তারা সন্ধেবেলায় তাদের নাটককে মঞ্চস্থ করবে। হলের অপর প্রান্তে আর একটি ঘর, তবে সামনের ঘরেই নাটক অভিনীত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় একজন ব্যবস্থাপক, সামন্ত সকলকে নিয়ে এসে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। প্রথমেই দেখা যায় সামন্তের সঙ্গে অভিনয়ে নাটকের প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পী লীলা বেনারে 'মঞ্চে' (বা, হলঘরটিতে) এসে উপস্থিত হয়েছে। জায়গাটি বেনারের বেশ পছন্দ হ'ল। নিজের দলের অন্য সব সদস্যদের পেছনে ফেলে সে একাই এগিয়ে এসেছে সামন্তের সঙ্গে। দুজনের আলাপচারিতায় বেনারের স্পষ্টবাদী এবং উচ্ছল স্বভাবটিও প্রকাশিত হয়। সামন্তের সঙ্গে কথায়-কথায় তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বেনারে ঔৎসুক্য দেখায় এবং ম্যাজিক দেখানোর অছিলায় তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসারও চেষ্টা করে সে। সামন্ত অন্যান্যদের এসে-পড়া সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় বেনারে তাকে আশ্বস্ত ক'রে নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করে। কর্মজীবনে সে শিক্ষিকা, অভিনয় তার সখ। নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সে যথেষ্টই সচেতন; স্কুলে সে কখনও দেরিতে পৌঁছায় না; আর ক্লাশে পড়ানোর কাজটা সে খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে। শিক্ষিকা হিসেবে সে যথেষ্টই সফল। কিন্তু সামন্তের সঙ্গে কথার সূত্রে তার জীবনের এক অনিশ্চয়তা ভরা-অন্ধকার প্রেক্ষিতের আভাস পাওয়া যায় প্রথম অঙ্কের সূচনাতেই; মনে হয়, যেন এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে অবিরাম ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। তার আচার-আচরণ, গান, কবিতা, হাসি-ঠাট্টা সবকিছুর মধ্যেই সেই অনিশ্চয়তা এবং অব্যক্ত বেদনার ইঙ্গিত মেলে। বেনারে এবং সামন্তের মধ্যে সংলাপের সূত্রে জানা গেল সেদিন সন্ধেয় যে নাটকটি অভিনীত হবে, তা 'নকল আদালত'। বেনারে নিজস্ব আমুদে ভঙ্গিতে সামন্তকে সদস্যদের সম্পর্কে সচেতন করেছে। মিঃ কাশিকার এবং মিসেস কাশিকার—যাঁরা ঐ নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান, তাঁদের সন্তানহীনতা নিয়ে ঠাট্টা করেছে। তাঁদের আশ্রিত রোকড়েকেও রেহাই দেয়নি সে। নাটকের দলের অন্যান্য সদস্য যারা পোংশে, সুখাৎমে, এদের সামাজিক ও কর্মজীবনের সাফল্য সামাজিক ও

কর্মজীবনে সাফল্য কতখানি, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ, বেনারে বলতে চাইছে, কিংবা বলা ভালো, নাট্যকার চাইছেন বাস্তব জীবনের হতাশা, ব্যর্থতার জন্যই তারা নাটকের মধ্যে ডুবে গিয়ে কল্পিত সাফল্যের হদিশ খুঁজতে চাইছে। বাস্তবে যে মাছি তাড়ানো উকিল, নাটকে সেই ব্যস্ত মস্ত উকিল। বেনারের কথাবার্তা, আচরণ, সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে জীবন-সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে—বিশেষত, সমাজ-সম্পর্কে এক সুতীব্র অনুভব আমাদেরকে বার-বার ছুঁয়ে যায়। নাট্যগোষ্ঠীর সকলে মিলে হাসি, গল্পে ব্যস্ত হয়। একে অন্যকে বিদ্রুপে বিদ্ধ করতেও পিছপা নয়। এখানেই স্থির হয় সন্ধেবেলার নাটকের অনুরূপে একটা রিহার্সালের আয়োজন করবে তারা, যাতে সামন্ত মঞ্চে মক্‌ট্রায়াল কীভাবে মঞ্চস্থ করা হবে সে সম্পর্কে পরিচিত হতে পারে। এরই মধ্যে জানা যায় যে, নাট্যগোষ্ঠীরই একজন—প্রফেসর দামলে এসে পৌঁছতে পারেননি। সকলে মিলে হল ঘরের মধ্যেই বিচারসভা বসানোর তোড়জোড় শুরু করে। হলঘরটিকে নকল কোর্ট রুমের মতো করে সাজানও হয়। মজার জন্য কয়েকজনই আসামি হতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত বেনারেকেই আসামি সাজান হয়। এবং বিচারক সাজেন মিঃ কাশিকার। এ এক মজার খেলা! হঠাৎ করেই এই হালকা মজার মেজাজ ও চটুল আবহাওয়াটা সরে যায়। সহশিল্পীদের অতর্কিত কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণে বেনারে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে আত্মস্থ হওয়ার সময় পায় না। শ্লথ চরিত্রতার অভিযোগ এবং নকল আদালত দৃশ্যের সূচনাতেই প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি। যা শুরু হয়েছিল চটুল ও তরল আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে, এই অঙ্কের শেষে সেই জায়গায় দেখা গেল এক তুমুল উত্তেজনা, যা হয়ত দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

(হলঘর। পরিস্থিতি প্রথম অঙ্কের শেষে যেমন ছিল।)

কাশিকার।। (টেবিলের সামনে বিচারপতির গাম্ভীর্য নিয়ে বসে) আসামি মিস বেনারে Indian Penal code-এর ৩০২ ধারা অনুযায়ী সদ্যোজাত শিশুহত্যার অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আপনি দোষী কি নির্দোষ? এই অভিযোগ আপনি স্বীকার করেন কি করেন না?

(আবহাওয়া থম্‌থমে। মিস বেনারে চেয়ারে হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সামন্ত বাইরে থেকে প্রবেশ করে)

সামন্ত।। (কার্ণিককে স্বাভাবিক ভাবে) এই নিন মশলা পান আর সিগ্রেট প্যাকেট। (থমথমে ভাবটা হঠাৎ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

মিসেস কাঃ।। মশলাপান আমাকে।

কার্ণিক।। আমাকে উইল্‌স্‌ প্যাকেট।

পোংশে।। সামন্ত, special পান এদিকে।

সুখাৎমে।। একটা পান আর সবুজ-সুতোর ছোট বিড়ি। কাশিকার আপনাকে?

কাশিকার।। মশলাপান।

(রোকড়ে সামন্তের কাছ থেকে পান নিয়ে কাশিকারকে দেয়)

রোকড়ে।। (বিনীত ভাবে) খয়ের বার করে নিয়েছি।

সুখাৎমে।। (বেনারের সামনে একটা পান ধরে) Have it, বাঈ।

বেনারে।। (অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ারে বসেছিল। চম্‌কে) হ্যাঁ-হ্যাঁ। না থাক। Thank you.

সুখাৎমে।। বাঈ, হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? After all—this is just a game. সবাই মজা করছি, ব্যস। এত serious হচ্ছেন কেন?

বেনারে।। (হাসবার চেষ্টা করে) কে হচ্ছে অ্যাঁ? আমি তো একেবারে light আছি। কোর্টের atmosphere আনার জন্য serious ভাব করছি। এই রকম মেকি মামলায় ভয় পাব কেন—অ্যাঁ?

সামন্ত।। (কার্ণিকের দেওয়া একটা সিগ্রেট কার্ণিকের সিগ্রেট থেকে জ্বালিয়ে নিতে নিতে) মজার ব্যাপারটা কী হয়েছিল? আসলে কি হচ্ছিল?

কার্ণিক।। (সিগ্রেটে টান দিয়ে) কিসের মজা?

সামন্ত।। না উনি যে অভিযোগের কথা বলেছিলেন, কাশিকার সাহেব? ঠিক কিছুই বুঝতে পারলাম না তো।

কার্ণিক।। অভিযোগটা তো? ভ্রূণহত্যা!

সামন্ত।। তা তো শুনেছি কিন্তু মানে কি? আমি তো বিশেষ কিছুই জানি না। মানে মফঃস্বলের লোক।

সুখাৎমে।। সদ্যোজাত শিশু হত্যার অভিযোগ।

সামন্ত।। আরে সাবাস কি দারুণ। আমাদের গ্রামে exactly এমনটা হয়েছিল—বছর দেড়েক হয়ে গেল, বেচারি বিধবা ছিল।

সুখাৎমে।। তাই নাকি। উকিল কে ছিল? কাশিকার, অভিযোগটা অভিযোগের মতই হয়েছে। পাক্কা A-one অভিযোগ। Surprise কিছু না থাকলে মামলা মাইরি জমেই না।

কাশিকার।। তাছাড়া সামাজিক দৃষ্টিতেও এই অভিযোগটা খুবই মারাত্মক সেটা লক্ষ্য করেছেন সুখাৎমে? ভ্রূণহত্যার সমস্যা সামাজিক সমস্যা। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এই অভিযোগটি বেছে নিয়েছি। আমার প্রতিটি কাজে সামাজিক মঙ্গলামঙ্গল জড়িয়ে থাকে। বেনারে বাঈ, Now to business, নিন, নিন, সুখাৎমে Start করুন! অধিকস্য অধিকম্ ফলম্। আরে আমার কান-খুস্‌কিটা কোথায় গেল? (পকেট খুঁজে বার করে রাখে)

সুখাৎমে।। (গাউনে কায়দা করে একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে পান চিবোতে-চিবোতে মি লর্ড, কোর্টের এখনকার কাজ সুষ্ঠুভাবে শুরু করার জন্য অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে তাদের মুখের পানের পিক্ ফেলার জন্য প্রারম্ভেই সিকি মিনিটের জন্য কোর্ট মুলতুবি থাকুক—bench-এর নিকট এটাই আমার বিনীত অনুরোধ।

কাশিকার।। (বিচারকের গাম্ভীর্য নিয়ে বলতে গিয়ে হঠাৎ পানের মধ্যে কাঠি-জাতীয় কিছু মুখে থাকায় থু করে ফেলে) এই বিষয়ে প্রতিবাদী উকিলের মত আদালতের সামনে পেশ করা হোক।

সুখাৎমে।। (তৎক্ষণাৎ উঠে প্রতিবাদী উকিলের ভূমিকায়) মি লর্ড, সরকারি উকিলের এই অনুরোধের বিরুদ্ধে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। তাম্বুলের রস মুখ থেকে থু করে ফেলতে মাত্র দশ সেকেন্ডই যথেষ্ট। তবুও সরকার পক্ষের উকিল এই যে সিকি মিনিট চাইছেন তাতে ওনার এই ইচ্ছাকৃত সময়হানি আমার মক্কেলের স্বার্থের পক্ষে প্রতিবন্ধক ও ক্ষতিকর এটা স্পষ্টই বোধগম্য। আর সেই জন্যই আমার মক্কেলের অভিমত এই যে মাত্র দশ সেকেন্ডের জন্য কোর্ট মুলতুবি রাখা হোক।

বেনারে।। (না বলে পারে না) হ্যাঁ—না—সাড়ে নয় সেকেন্ড।

কাশিকার।। বেনারে বাঈ, কোর্ট চলার মাঝে আসামি কথা বলে না। সামন্তের বেলা না হয় বোঝা যায়, কিন্তু আপনাকেও কি কোর্টের এটিকেট্ নতুন করে শেখাতে হবে? (গম্ভীরভাবে কার্ণিককে) Clerk of the Court—এই যে সব প্রশ্ন তোলা হোল—এই বিষয়ে কোর্টের পূর্ববর্তী নজির কি আছে আমাকে বলবেন?

কার্ণিক। (মুখ থেকে সিগ্রেট নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে) পান চিবোতে-চিবোতে কোর্টের কাজ চালানর কোনও সাধারণ নিয়ম চালু না থাকায় বোধহয় এই বিষয়ে কোন পূর্ববর্তী নজির সৃষ্টি হয়নি, তবে যখন মহামান্য বিচারক স্বয়ং কোর্টে পান চিবোতে থাকেন তখন এটাই সর্বপ্রথম এবং একরকম অভূতপূর্ব নজির মি লর্ড।

কাশিকার।। আসামীর উকিল—দশ সেকেন্ডে তাম্বুল রস মুখ থেকে নিক্ষেপ করা যায় এটা কি আপনি কোর্টের সামনে প্রমাণ করতে পারেন?

সুখাৎমে।। By all means (বাইরে থেকে থুতু ফেলে আসে আর দরজাটা বন্ধ করে দেয়) Exactly 10 Seconds, My Lord.

কাশিকার।। We must see for ourselves. (থুতু ফেলার সশব্দ আওয়াজ করতে করতে ভিতরে চলে যায়।)

বেনারে।। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) এটা আদালত না থুতু ফেলার প্রতিযোগিতা। কার্ণিক? (কার্ণিক কর্ণপাত করে না)

সামন্ত।। (কার্ণিককে), সাহেব সত্যিকারের কোর্টেও কি এ সব চলে? ভারি মজার ব্যাপার তো?

কার্ণিক।। (ধোঁয়া ছেড়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যে) শ্ শ্, কোর্টে অবমাননা হবে। শুধু দেখে যান। (পোংশেকে চোখ মারে)

(কাশিকার ফিরে এসে বসে)

কাশিকার।। Clerk of the Court— কত সময় লাগল?

কার্ণিক।। (ঘড়ি দেখে) কে জানে।

মিসেস কাঃ।। আমি বলছি—পনের সেকেন্ড।

সুখাৎমে।। (এবার সরকারি উকিল—জয়ের হাসি মুখে) True! Not ten but full 15 seconds that is ¼ minute, সিকি মিনিট। আমি ঠিক যত সময় বলেছিলাম—ঠিক ততটাই।

¼

কাশিকার।। (গাম্ভীর্য বজায় রেখে) Yes, কোর্টের এটাই সুচিন্তিত নির্দেশ যে পানের পিক্ থু করে ফেলার আলোচনায় ও প্রদর্শনে আধ মিনিটেরও বেশি সময় নষ্ট হওয়ায়, আরও সময় নষ্ট না কোর্টের কাজ অব্যাহত থাকুক। প্রত্যেকে যত্ন সহকারে কোর্টের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে একে-একে থুতু ফেলা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করে আসতে পারেন।

পোংশে।। Har har.

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) Silence. Silence must be observed.

মিসেস কাঃ।। (সামন্তকে) পান-টান নিয়ে মজা করছে আরকি। আপনি শুধু পদ্ধতিটা দেখে রাখুন। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যাপারে কোর্টের permission— না হলে রাত্তিরে ভুল করে বসবেন—

সামন্ত।। (মহা উৎসাহে) না-না, সব দেখে রাখছি কিন্তু—

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে) Silence must be observed when the Court is in session, (হঠাৎ মিসেসকে মুখ ভেঙ্গিয়ে) বাড়িতেও যা—এখানেও সেই?

মিসেস কাঃ।। আমি কেবল সামন্তকে—

সুখাৎমে।। যেতে দিন, যেতে দিন। উনি ঠাট্টা করছেন—খ্যাপাচ্ছেন।

মিসেস কাঃ।। তাতে কি? কিন্তু উঠতে বসতে বকুনি—সব সময় ধমকাবেন। (মলিন হয়ে যায়)।

বেনারে।। (পিয়নের ভূমিকায় ব্যস্ত রোকড়েকে একটু লঘু কণ্ঠে) এই খোকন।

রোকড়ে।। (রাগ চেপে) আমাকে খোকন বলে ডাকবেন না।

কাশিকার।। (গলাখাঁকারি—হাতুড়ি ঠোকা) Now back to ভ্রূণহত্যা। আসামি মিস বেনারে, যে অভিযোগে আপনি অভিযুক্ত আপনি কি তা কবুল করেন, না, করেন না?

বেনারে।। আপনার উপর যদি এই অভিযোগ আনা যায় আপনি কি কবুল করবেন? (সবচেয়ে বেশি হাসে সামন্ত)

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) Order, Order, কোর্টের মর্যাদা যে-কোনও পরিস্থিতিতে বজায় রাখতে হবে, তা না হলে সামন্ত কোর্টের correct কাজ বুঝতে পারবেন না।

বেনারে।। কিম্বা ভ্রূণহত্যার correct কাজ? মাগো। কথাটা কি বিচ্ছিরি। গা গুলিয়ে ওঠে—ভ্রূণহত্যা, ভ্রূণহত্যা....তারচেয়ে আপনি আমার উপর উ-উ-উস....সরকারি সম্পত্তি অপহার এই ধরনের কিছু অভিযোগ আনতে পারেন না? অপহার কথাটা বেশ ভাল। উপহার—উপহার মনে হয়।

মিসেস কাঃ।। আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। যেটা হচ্ছে সেটা তো খারাপ নয়।

বেনারে।। (চেয়ারে হাত ঠুকে) Order, Order— কোর্টের মর্যাদা রাখা হ'ক। বাড়িতেও যা—এখানেও সেই। (উকিলি ভঙ্গিতে) মি লর্ড, কোর্ট-গিন্নিকে পুনরায় এবং উপযুক্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হ'ক—উনি ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী নন এবং মি লর্ডকে বাদ দিলে উনি কোনও সরকারি সম্পত্তি অপহার করেন নি।

মিসেস কাঃ। বেনারে থাম—ঢের হয়েছে।

বেনারে।। ('পিয়ন' রোকড়েকে লঘুকণ্ঠে) এই খোকন (রোকড়ে রেগে ঠোঁট কামড়ায়)।

সামন্ত।। (মহা উৎসাহে মিসেস কাশিকারকে) হেঃ, আরে বেনারে বাঈ একেবারে ফাটিয়ে দিলেন!

পোংশে।। (গম্ভীরভাবে) অনেক বিষয়ে।

কাশিকার।। আসামি মিস বেনারে। কোর্টে উকিলের যে অধিকার সেটা নিজের হাতে নিয়ে আপনি কোর্টের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন সেইজন্য আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হ'ল।

বেনারে।। (নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে এসে একটা পান এগিয়ে ধরে) Thanks—সেইজন্য আপনাকে মশলা-পান দেওয়া হ'ল।

কার্ণিক।। এই—কোনও ব্যাপারই আপনি যদি seriously না নেন তাহলে এখানে শেষ করে দিলেই হয়। বেনারে বাঈ, আপনি যদি কোর্টের নিয়ম-কানুন একটু মেনে চলেন তাহলে মিস্টার সামন্ত সব বুঝতে পারবেন। Be serious.

সুখাৎমে।। তা না হলে খেলাটা ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে। একটু seriousness চাই।

বেনারে।। (নিজের জায়গায় ফিরে এসে) Now back to ভ্রূণহত্যা। মি লর্ড, ভুল করলাম, আসামির পক্ষে কোর্টকে এতটা সম্মান দেখাবার কোনও দরকার নেই। আমি এই অভিযোগ অস্বীকার করি। সামান্য একটা আরশোলা মারতে ভয় পাই তো ভ্রূণের হত্যা কি করে পারব? তবে হ্যাঁ, আজ সকালে মেজাজ খারাপ করে দেওয়ায় একটা বদমাস মেয়েকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছি। কি করবো, পাজি মেয়েগুলো কথাই শোনে না।

কাশিকার।। রোকড়ে—শপথের বইটা। (রোকড়ে তাড়াতাড়ি একটা মোটা বই বের করে পাশের টুলে রাখে।) সাক্ষীর কাঠকড়া। (রোকড়ে কাঠগড়া আনতে যায়)।

মিসেস কাঃ।। (সামন্তকে) এরপর সরকারি ভাষণ—মানে সরকারি উকিলের ভাষণ।

সুখাৎমে।। (এতক্ষণ একটা চেয়ারে বসে সামনে রাখা আর একটা চেয়ারে লম্বা করে পা তুলে মাথার পিছনে দুটো হাত দিয়ে আরাম করছিল। অলস ভাবে উঠে দাঁড়ায়। কার্ণিকের সিগ্রেট থেকে নিজের বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে যন্ত্রচালিত কণ্ঠে) মি লর্ড আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ অতি ভয়ংকর। (ধোঁয়া ছেড়ে) মাতৃত্ব অতি মঙ্গলময়—

বেনারে।। আপনি কি করে জানলেন? (সবার দিকে তাকিয়ে দেখে) Order, Order.

(পোংশে বিরক্ত হয়ে ভিতরে চলে গেল)

কাশিকার।। আসামী মিস বেনারে, কোর্টের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য পুনরায় সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। Attorney of the State, continue করে যান।

সুখাৎমে।। মাতৃত্ব অতি পবিত্র। আর, বলতে গেলে আমাদের মাতৃত্বের সংজ্ঞার পিছনে একটা সমুহার স্বর্গীয় ভাব আছে। স্ত্রীজাতিকে আমরা জগৎমাতা বলে স্বীকার করে আসছি। আমাদের সংস্কৃতিতে নারী সর্বদাই পূজা পেয়ে থাকেন। শৈশব থেকেই আমাদের সন্তানদের আমরা শিক্ষা দিয়ে থাকি—মাতৃ দেবোভব। মায়ের উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়ে আছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মা নিজের জীবন উৎসর্গ করে শিশু সন্তানকে রক্ষা করেন—পালন করেন।

কাশিকার।। একটা কথা ভুলে গেলেন। সংস্কৃতে একটা সুন্দর উক্তি আছে—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

মিসেস কাঃ।। (মহা উৎসাহে) এটাও বলা যায়—মাগো কতবড় তোমার উপকার।

বেনারে।। Order—Order, এসব তো পরীক্ষার খাতা থেকে মুখস্থ ঝাড়ছেন (জিব্ কেটে) আসামি মিস বেনারে, কোর্টের অধিকার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য আপনাকে পুনরায় সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে (হাতুড়ি ঠুকবার নকল করে)।

সুখাৎমে।। I am deeply greatful মি লর্ড, for your addition. উপসংহারে বলা যায়—নারী ক্ষণিকের জন্য পত্নী—চিরকালের জন্য মাতা।

(সামন্ত হাততালি দিয়ে ওঠে)

মিসেস কাঃ।। এখন এসব চলতে পারে, কিন্তু খবরদার রাত্তির বেলা হাততালি দেবেন না।

সামন্ত।। নিশ্চয়—নিশ্চয়—আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। কি দারুণ বলল, তাই না?

সুখাৎমে।। সত্যিই তো, কি বলব—কোন নারী যদি নিজের অপরূপ ফুট্‌ফুটে শিশুসন্তানের গলা টিপে ধরে—তখন আমরা, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকরা কি বলব সেই ব্যাপারে? আমরা এইটুকুই বলব—এর চেয়ে নীচ, পাশবিক কাজ জগতে আর হতে পারে না। আসামি যে এই হীন জঘন্য কাজ করেছে সাক্ষী দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করব।

(রোকড়ে কাঠগড়া নিয়ে বেরিয়ে আসে)

বেনারে।। (খ্যাপাবার জন্য লঘুকণ্ঠে) এই খোকন—

(রোকড়ে রীতিমত বিরক্ত। ভেতরের ঘর থেকে পোংশে বেরিয়ে আসে)।

সুখাৎমে।। আমাদের সাক্ষী বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত গোপাল পোংশে। বলুন পোংশে কেমন লাগল? আপনাকে জগৎবিখ্যাত করে দিলাম! কী—?

কাশিকার।। সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন। (প্রাণপণে কানের মধ্যে কানখুস্‌কি চালাতে থাকে। পোংশে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায়—রোকড়ে শপথের বই ধরে)

পোংশে।। (বইটির প্রথম পাতা খুলে তার উপর হাত রেখে গম্ভীর কণ্ঠে) আমি জি. এন. পোংশে, Oxford English Dictionary-র উপর হাত রেখে শপথবাক্য নিচ্ছি—যা বলব সত্য বলব, সত্য ভিন্ন আর কিছু বলব না (বেনারে হাসতে থাকে)।

মিসেস কাঃ। বালু—ভগবদ্গীতাটা কোথায়?

রোকড়ে।। (করুণভাবে) ভুলে গেছি—ভুল করে dictionary এনেছি। (নালিশের সুরে) কত জিনিস মনে রাখব?

বেনারে।। বেচারা বালু।

রোকড়ে।। (রেগে) আমাকে বেচারা বেচারা করবেন না বলে দিচ্ছি?

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) Examination to start.

মিসেস কাঃ।। (সামন্তকে চুপি চুপি) কিভাবে জেরা করে দেখে রাখুন (সামন্ত মাথা নাড়ে)।

সুখাৎমে।। (স্টাইলের মাথায় পোংশের সামনে এসে) আপনার নাম?

পোংশে।। জি. এন. পোংশে। জেরা শুরু করে দিন—এসব আদব-কায়দা রাত্তিরের জন্য তুলে রাখুন।

সুখাৎমে।। সাক্ষী পোংশে, আপনি আসামিকে চেনেন?

বেনারে।। (হঠাৎ পোংশেকে নকল করে) হুঁঃ।

পোংশে।। (বেনারেকে ভাল করে দেখে নিয়ে) হ্যাঁ, বেশ ভাল করেই চিনি।

সুখাৎমে।। আসামির সামাজিক পরিচয়—আপনি কি ভাবে বর্ণনা করবেন?

পোংশে।। শিক্ষিকা তথা দিদিমণি—স্কুলের দিদিমণি।

বেনারে।। (জিব্ বার করে ভেঙিয়ে) কচি দিদিমণি।

সুখাৎমে।। মিস্টার পোংশে। আসামি বিবাহিতা না অবিবাহিতা?

পোংশে।। আসামিকেই জিজ্ঞাসা করুন।

সুখাৎমে।। যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তো আপনি কি বলবেন?

পোংশে।। লৌকিক মতে অবিবাহিতা।

বেনারে।। আর অলৌকিক মতে?

কাশিকার।। Order, Oder, বেনারে বাঈ, সংযম। সংযমের মাহাত্ম্য ভুলবেন না। (সুখাৎমেকে) You may continue, আমি আসছি।

সুখাৎমে।। (স্বগতোক্তি) এই মিস্টার কাশিকারটা মাঝে-মাঝে যা করা উচিত নয় এমন সব কাণ্ড করে বসেন অথচ তখুনি না করলেও তো চলে—(উচ্চকণ্ঠে) সাক্ষী পোংশে! আসামির নৈতিক আচরণ আপনার ভাষায় কিভাবে ব্যক্ত করবেন? কুমারী মেয়েদের আচরণের মতো কি? আপনি trial-টা seriously নিন। (পোংশেকে অনুরোধ)

বেনারে।। কিন্তু কুমারী মেয়েরা কেমন হয় মানে তাদের নৈতিক আচরণ কি রকম হয় উনি কি করে জানবেন?

পোংশে।। (বেনারেকে গ্রাহ্য না করে) আলাদা।

সুখাৎমে।। উদাহরণস্বরূপ?

পোংশে।। আসামি একটু বাড়াবাড়ি করেন।

সুখাৎমে।। বাড়াবাড়ি মানে?

পোংশে।। মানে ছেলেদের বড্ড জ্বালাতন করেন।

বেনারে।। (সঙ্গে-সঙ্গে খেপায়) চুক্ চুক্ চুক্, বেচারা ছেলের দল।

সুখাৎমে।। মিস বেনারে এতে কোর্টের অবমাননা হ'ল।

বেনারে।। কিন্তু কোর্ট যে ঐ জায়গায় গেছে—এই জায়গায় অবমাননা কি করে হবে? এখন আপনার একথা বলার কোনও কারণ নেই।

(সামন্ত প্রাণ খুলে হেসে ওঠে)

সুখাৎমে।। মুখে-মুখে আপনার সঙ্গে কে পারবে? সাক্ষী পোংশে (পোংশে ইতিমধ্যে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে এসে কার্ণিকের সঙ্গে কথা বলছিল।) Nobody is serious (পোংশে কাঠগড়ায় ফিরে যায়) মিস্টার পোংশে, আপনি কি বলতে পারেন কোন বিবাহিত অথবা অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সাক্ষীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বা আছে? (জোর দিয়ে) বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে।

বেনারে।। (বাধা দিয়ে) হ্যাঁ স্বয়ং সরকারি উকিল সুখাৎমের সঙ্গে, ওই বিচারক মহাশয়ের সঙ্গে, তারপর ওই পোংশের সঙ্গে—ওই কার্ণিকের সঙ্গে—বালুর সঙ্গে।

রোকড়ে।। বেনারে বাঈ, বলে দিচ্ছি এর জন্য পস্তাতে হবে।

পোংশে।। হেঃ, এইসব হতে থাকলে এই মামলাটা ছেলেখেলার মতো চালিয়ে যাওয়ার কোনও sense আছে সুখাৎমে? Nobody is serious, এই কাশিকার ভিতরে চলে গেলেন, এঁরা এইসব করছেন আমাকে তো কিছু বলতেই দেওয়া হচ্ছে না—

কার্ণিক।। আমাদের নাটকের রিহার্সালও এর থেকে অনেক seriously হয়।

মিসেস কাঃ।। এসব চলবে না গো বেনারে। তোমার একার জন্য রাত্তিরে সব গোলমাল হয়ে যাবে সেটা চলবে না একথা বলে রাখলাম ভাই।

বেনারে।। বারে—আমি তো মামলা চলতে সাহায্য করছি।

(কাশিকারের ভিতর থেকে আগমন)

কাশিকার।। What happened ? Continue, মিঃ সুখাৎমে। কানখুস্কিটা আবার কোথায় গেল?

বেনারে।। আমি এই গ্রামটায় একটু ঘুরে আসব ভাবছি। আপনি মামলাটা চালাতে থাকুন—ভ্রূণ-হত্যা। একটু খোলা হাওয়া খেয়ে আসি অন্তত।

কার্ণিক।। তাই যদি হয়, তাহলে এখুনি একদম বন্ধ করে দাও ব্যস্।

মিসেস কাঃ।। না-না মামলাটা অন্তত শেষ করা যাক্। যে কাজটা হাতে নিয়েছেন সেটা তো শেষ করতে হবে।

সামন্ত।। (মিসেস কাশিকারকে উদ্বিগ্ন হয়ে) মানে এখানেই সব শেষ হয়ে গেল নাকি?

কাশিকার।। (কানখুস্কি খুঁজে পেয়ে) পেয়েছি। আসুন, hearing to continue (বেনারেকে থামতে ইঙ্গিত করে) সুখাৎমে, কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছেন?

সুখাৎমে।। আপনার কানখুস্কি খোঁজার অপেক্ষায় মি লর্ড। (উকিলের পোজ নিয়ে) মিস্টার পোংশে! (পোংশে কাঠগড়ার বাইরে চলে এসেছিল, দৌড়ে ফিরে যায়।) আসামির আচরণে কখনও কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়েছে আপনার?

পোংশে।। Yes—প্রচুর।

সুখাৎমে।। কি রকম? (ধোঁয়া ছেড়ে)

পোংশে।। মাথার মধ্যে গণ্ডগোল আছে এরকম আচরণ আসামি কখনও-সখনও করে থাকে। মানে মাঝে-মাঝে ওর আচরণের অর্থ বুঝতে পারা যায় না।

সুখাৎমে।। For example ?

পোংশে।। For example— একবার আমার সঙ্গে বিয়ে করবার—বেশি বলবার দরকার কি, এই মুহূর্তে পাগলা গারদের patient-এর মতো আমাকে জিব্ বার করে ভেঙাচ্ছে। (বেনারে তৎক্ষণাৎ জিব্ টেনে নেয়)

সুখাৎমে।। (সন্তোষজনক তথ্য পেয়েছে এই ভঙ্গিমায়) Good, আপনি এখন ওখানে গিয়ে বসতে পারেন— মিঃ পোংশে, the great scientist. আমাদের next witness মিস্টার কার্ণিক—the great actor. পোংশে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে এসে বেনারের দিকে তাকাতে-তাকাতে একদিকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। কার্ণিক নাটকীয় ভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়।)

কার্ণিক।। Ask.

সুখাৎমে।। শপথ, নাম, কার্য—এসব হয়ে গেছে। এখন বলুন মিস্টার কার্ণিক—আপনি তো actor ?

কার্ণিক।। (নাটকে সাক্ষীর অভিনয় করছে যেন) Yes, তার জন্য আমি খুব গর্ববোধ করি।

সুখাৎমে।। তা করুন, কিন্তু মিঃ কার্ণিক You know this lady (বেনারেকে দেখিয়ে)।

কার্ণিক।। (নাটকীয় ভাবে বেনারেকে দেখে) Yes sir—I think I know this lady.

সুখাৎমে।। Think কথাটার অর্থ কি, মিঃ কার্ণিক ?

কার্ণিক।। Think অর্থ ভাবা মানে মনে করা। যদি দরকার হয় এই dictionary আছে।

সুখাৎমে।। (Dictionary নিতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়) দরকার নেই। মিঃ কার্ণিক আপনি হয় ওঁকে জানেন কিম্বা জানেন না। এর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক সেটাই বলুন।

কার্ণিক।। (Shrug করে) Strange! কখনও-কখনও মনে হয় জানি কিন্তু সত্যি-সত্যি আমি কিছুই জানি না। Truth is stranger than fiction.

সুখাৎমে।। কোথায় আপনাদের পরিচয় হয়েছিল ?

কার্ণিক।। আমাদের পরিচয় এই জাগৃতি সঙেঘ। অভিরূপ বিচারালয়ের function আমরা করে থাকি, উনিও তাতে অংশ গ্রহণ করেন। হ্যাঁ, এটাই আমার স্থির বিশ্বাস (সবই খুবই নাটকীয় পোজ দিয়ে বলে)

সুখাৎমে।। আপনাদের function কি রকম হয়, মিঃ কার্ণিক ?

কার্ণিক।। Top.

সুখৎমে।। (উকিলি কায়দায় কাশিকারকে) মি লর্ড, আমার অনুরোধ এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হ'ক।

কাশিকার।। (কানখুস্‌কি চালাতে-চালাতে) সে ব্যবস্থা হবে'খন। আপনি বলে যান।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক—সত্যের প্রতি আনুগত্য স্মরণ করে আপনি কি বলবেন যে-সমস্ত নাটকে আপনি অংশ গ্রহণ করেছেন, মাতৃমহিমা সে-সব নাটকে কি ভাবে বর্ণিত হয় ?

কার্ণিক।। বর্তমান নবনাট্যে ওসব কিছু থাকেনা। জীবনের অর্থহীনতাই নাটকের বিষয়বস্তু অর্থাৎ সমগ্র মানবজীবন কি রকম....

কাশিকার।। এইসব কথা আমার ভাল লাগে না। মানুষের কোনও না কোনও লক্ষ্য থাকা উচিত। লক্ষ্যের প্রতি আমাদের প্রবল আসক্তি—এই ধরনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। লক্ষ্য একটা চাই-ই।

সুখাৎমে।। থাক এসব আলোচনা। মেয়ের বর্ণনা যদি আপনাকে করতে হয় আপনি কি ভাবে করবেন ?

কার্ণিক।। পোয়াতি হলেই মা হয়।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক, যিনি শিশুকে জন্ম দিয়েছেন এবং শিশুকে যিনি পালন করেছেন তিনি মা, না যিনি ওর গলা টিপে হত্যা করেন তিনি মা—কোন্ ব্যাখ্যাটা আপনার উচিত মনে হয়?

কার্ণিক।। দুজনেই মা কারণ দুজনেই পোয়াতি হয়েছিল।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক, আপনি মাতৃত্ব কাকে বলবেন?

কার্ণিক।। শিশুকে জন্ম দেওয়া।

সুখাৎমে।। কুকুরীও তো বাচ্চার জন্ম দেয়।

কার্ণিক।। হ্যাঁ, সেও মা। না বলবে কে? শুধু মানুষই মা হয় আর কুকুরী হতে পারে না—একথা বলা যায় না।

বেনারে।। (আলস্য ভরে) Buck up. (কার্ণিক ব্যঙ্গটি গ্রাহ্য করে না)।

সুখাৎমে।। কার্ণিক আজ ফর্মে আছে।

কার্ণিক।। কিছু যদি দেখাবার থাকে রাত্রে দেখাবেন। এখন একটু সহজভাবে উত্তর দিন তো।

সুখাৎমে।। সাক্ষী কার্ণিক, এখন একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন। আসামির নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

কার্ণিক।। (যেন গম্ভীর চিন্তা করছে এমন দু-তিনটে pose দিয়ে) মানে এই মামলার ব্যাপারে না সত্যিকারের?

সুখাৎমে।। আলবাৎ সত্যিকারের।

কাশিকার।। (কানখুস্কি চালাতে-চালাতে) আমার মতে মিঃ সুখাৎমে এই সব মামুলি প্রশ্ন ঐ মামলার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখা হ'ক।

কার্ণিক।। ঠিক বলেছেন। তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই। কারণ আসামির নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

সুখাৎমে।। ঠিক বলছেন?

কার্ণিক।। নিশ্চয় অন্তত এই মামলার ব্যাপারে।

(বেনারের মুখ হঠাৎ tense হয়ে ওঠে)

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক (হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হবার ভান করে), আচ্ছা মিঃ কার্ণিক আপনি আসামিকে কোনও সময়ে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছেন কি? হ্যাঁ কি না, উত্তর দিন। Yes or No.

কার্ণিক।। আমি না। ঐ রোকড়ে।

রোকড়ে।। (প্রচণ্ড ঘাবড়ে) আমি কিছু জানি না। আমি বলছি আমি কিছুই জানি না।

সুখাৎমে।। (বুক ফুলিয়ে ব্যারিস্টারি কায়দায়) মিঃ কার্ণিক, thank you so much, you can take your seat now. (কার্ণিক কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসে) রোকড়ে, একবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় চলে আসুন তো?

মিসেস কাঃ।। (সামন্তকে) বুঝতে পারছেন সব?

সামন্ত।। হ্যাঁ।

রোকড়ে।। (নিজের জায়গায়, অস্বস্তির সঙ্গে) আমি না।

সুখাৎমে।। মি লর্ড—এই মামলার ব্যাপারে পিয়ন রোকড়ের সাক্ষ্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তাড়াতাড়ি ডাকা হ'ক।

রোকড়ে।। আমি যাব-টাব না। যদি বলেন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। (বেনারে হো হো করে হেসে ওঠে)

কাশিকার।। রোকড়ে। (রোকড়ে বাধ্য ছেলের মত কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওর সারা দেহ কাঁপছে—nervous)

পোংশে।। (কার্ণিককে) ও কি দেখেছিল রে?

কার্ণিক।। কোথায়—অ্যাঁ কি? মজা পাকাচ্ছেরে। তুই আমাকে টাইট দিলি। আমি দিলাম ওকে। ঝগড়াটা তো চালিয়ে রাখতে হবে। সুখাৎমে?—

সুখাৎমে।। শপথ—নাম—কার্য—হয়ে গেল। বলুন মিঃ রোকড়ে। (রোকড়ের কাঁদো-কাঁদো মুখ) মিস্টার রোকড়ে, মিঃ কার্ণিক, ওঁর সাক্ষী দেবার সময় আপনার নাম উল্লেখ করেছিলেন। সেটা আপনি শুনেছেন। এখন ঐ বিষয়ে আপনি আরও কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি?

মিসেস কাঃ।। বালু আর ইতস্তত না করে ঝটপট সাক্ষী দিয়ে দে। যদি পারিস তো পরের function-এ ভাল চান্স করে দেব। এবারেরে মত এতবড় চান্স আর পাবি না। আপনি দেখে রাখুন সামন্ত, সব দেখে রাখুন। (কাশিকার রক্তচক্ষু দেখায় কিন্তু এবার মিসেস তেমন গ্রাহ্য করে না কিন্তু নীরব হয়ে যায়)

সুখাৎমে।। বলুন, মিঃ রোকড়ে, আপনি কি দেখেছিলেন?

(রোকড়ে রীতিমত নার্ভাস হয়ে ঢোক গিলতে থাকে) মিঃ রোকড়ে, ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলুন আপনি ওখানে কি দেখেছিলেন? (রোকড়ের মুখে শব্দ নেই, সিনেমায় যেমন কোর্ট সিন দেখা যায় সেই কায়দায়) মিঃ রোকড়ে, একটি বিশেষ মুহূর্তে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনি কি দেখেছিলেন? Answer Please.

রোকড়ে।। (কোনও রকমে) ব্রহ্মাণ্ড (রোকড়ে যেন চোখের সামনে দেখতে থাকে। কার্ণিক পোংশেকে চোখ মারে)

কাশিকার।। (দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে) হাঁদা-গঙ্গারাম কোথাকার।

মিসেস কাঃ।। বালু—দ্বিতীয়বার chance পাবি না। জবাব দে। আর কত ন্যাকামি করবি? লোকের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হয়—মন শক্ত করতে হয়। কি বলেন, সামন্ত?

সামন্ত।। নিশ্চয়—কিন্তু বড্ড শক্ত ব্যাপার।

মিসেস কাঃ।। বালু বলে ফেল তাড়াতাড়ি।

বেনারে।। বাপু ব-ল—অয়ে 'অ'—আয়ে 'আ'।

রোকড়ে।। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বেনারেকে) চ্যাপ্ (বার-বার ঘাম মুছতে থাকে)।

সুখাৎমে।। (উকিলি কণ্ঠে) মিস্টার রোকড়ে—

রোকড়ে।। (থামিয়ে) না—আপনি থামুন—(হাস্যরত বেনারেকে ধৈর্য ধরে কয়েক মুহূর্ত দেখে) কিছুদিন আগে আমি ওঁর কাছে গিয়েছিলাম।

সুখাৎমে।। (উকিলি কণ্ঠে) কার কাছে? মিঃ রোকড়ে, কার কাছে গিয়েছিলেন?

রোকড়ে।। থেকে-থেকে আপনি বাধা দেবেন না। আমি গিয়েছিলাম ওই দামলের কাছে। (বেনারে tense)

সুখাৎমে।। Our প্রফেসর দামলে?

কার্ণিক।। মানে ওঁর কলেজ হোস্টেলে—ওঁর ঘরে?

রোকড়ে।। হ্যাঁ, এই সন্ধের সময় গিয়েছিলাম—অন্ধকার হবে-হবে। তা ওখানে ইনি ছিলেন—ইনি, বেনারে বাঈ।

কাশিকার,

মিশেস কাশিকার

সুখাৎমে,

কার্ণিক ও পোংশে।। কে?

রোকড়ে।। (বেনারেকে) হাসুন—এখন মজা করে হাসুন—খুব ঠাট্টা করুন। হ্যাঁ—ইনিই ছিলেন ওখানে। দামলে আর ইনি বেনারে বাঈ (বেনারে শক্ত হয়ে যায়। কার্ণিক পোংশেকে চোখ মারে)

সামন্ত।। (মিসেস কাশিকারকে) এসব সত্যি-সত্যি, না কোর্টের জন্য?

সুখাৎমে।। (নতুন ভাবে সতর্কতার সঙ্গে) মিঃ রোকড়ে— সন্ধ্যার সময়, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, আপনি প্রফেসর দামলের ঘরে গেলেন। সেখানে আপনি কি দেখলেন? (হিস্-হিস্ করে) কি দেখলেন ওখানে?

কাশিকার।। (যদিও সে মজা পাচ্ছিল তবুও) সুখাৎমে, ব্যাপারটা একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—

সুখাৎমে।। না-না একেবারেই না। মামলার মধ্যেই সব থাকবে। হ্যাঁ মিঃ রোকড়ে—

বেনারে।। আমার এসব মোটেই ভাল লাগছে না বলে দিলাম। কি সম্পর্ক এই মামলার সঙ্গে—এই খেলার সঙ্গে?

মিসেস কাঃ।। (বেনারেকে) আরে তুই এত ইয়ে হয়ে যাচ্ছিস কেন রে? চলুক না।

বেনারে।। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলার কোনও কারণ নেই। আমি যে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারি। দামলে তো আমায় গিলে ফেলতেন না।

সুখাৎমে।। আপনি সেখানে কি দেখতে পেলেন রোকড়ে? হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন—বলে ফেলুন। বেনারে বাঈ, মামলার spirits নষ্ট করবেন না। একটু শুনেই নিন না—বেশ মজা আছে এই খেলায়। সামান্য ধৈর্য ধরুন। রোকড়ে, আপনি যা দেখেছিলেন স্পষ্ট ভাষায় নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রোকড়ে।। (একটু চিন্তা করে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) দু-জনে বসে ছিলেন।।

সুখাৎমে।। তারপর?

রোকড়ে।। তারপর আবার কি? দু-জনে সেখানে বসেছিলেন, ঘরের মধ্যে।

সুখাৎমে।। আর কি দেখলেন?

রোকড়ে।। এইটুকুই। (সুখাৎমে নিরাশ হয়ে যায়) আমি কিন্তু হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। দামলের ঘরেতে—

বেনারে।। বালু ছোট্ট ছেলেটা—এখনও বড় হল না—

রোকড়ে।। তাহলে আমাকে দেখে আপনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল কেন? দামলে বাইরে থেকেই

আমাকে কাটিয়ে দিলেন। অন্য সময় উনি আমাকে ভেতরে আসতে দেন—ঘরের ভেতরে।

বেনারে।। (হাসতে-হাসতে) কাটিয়ে দিলেন কেন—সেটা দামলেই জানেন। আর আমার মুখ, ওই যে তুমি যা ভাবলে, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল তার কারণ আমার সামনেই দামলে তোমাকে কাটিয়ে দিলেন তো। আসলে আমার মুখ ফ্যাকাশে কেন হবে, জ্বল্-জ্বল্ করছিল।

সুখাৎমে।। (কাশিকারকে) মি লর্ড—সাক্ষী রোকড়ে যা কিছু দেখেছিলেন এবং ওইটুকু বর্ণনা রেখেই উনি কেন থেমে গেলেন, সেটা উনি জানেন—কিন্তু উনি যা দেখেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হ'ক। এর থেকে এ সত্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে এক তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে আসামির আচরণ নিঃসন্দেহে সংশয়পূর্ণ ছিল।

বেনারে।। ঘোড়ার ডিম বোঝা যাচ্ছে। কালকে আমাকে আমাদের Principal- এর chamber-এ দেখা যাবে, আর অমনি আচরণ সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠবে? হ্যাঁ—৬৫ বছর—আমার Principal-এর বয়স।

সুখাৎমে।। মি লর্ড, আসামির এই উক্তিটি আমার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করবো—এটাও লিপিবদ্ধ করা হোক।

বেনারে।। যাদের সঙ্গে আমার একা-একা দেখা হয়, এমন পঁচিশ জনের নাম, যদি চান ঠিকানাও, আমি দিতে পারি। মামলা চালাচ্ছে! সংশয়পূর্ণ। সামান্য একটা কথার মানে বোঝেন না! (কার্ণিক পোংশেকে চোখ মারে)

সুখাৎমে।। মি লর্ড—আসামির এই উক্তিটিও আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ। এটাও লিপিবদ্ধ হ'ক।

কাশিকার।। (দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে) কোন্ উক্তিটা? কথার মানে বোঝ না—এটা তো?

সুখাৎমে।। আরও পঁচিশ জনের নাম ঠিকানা যাদের সঙ্গে উনি একা থাকেন তাদের—

বেনারে।। একটু আগে এই সামন্তের সঙ্গে যখন এখানে আসছিলাম তখন একাই ছিলাম। নিন ওর নাম লিপিবদ্ধ করুন—

সামন্ত।। (হঠাৎ উঠে আগ্রহের সঙ্গে) না, নানা উনি আমার সঙ্গে খুব ভদ্দরলোকের মতো ব্যবহার করেছিলেন। আমরা শুধু ম্যাজিক হিপনোটিজ্‌ম এই সব নিয়ে কথা বলছিলাম, ব্যস্।

সুখাৎমে।। মি লর্ড—এই হিপনোটিজ্‌মের উল্লেখ খুব গুরুত্বপূর্ণ—লিপিবদ্ধ করা হ'ক।

কাশিকার।। (দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে) কিন্তু সুখাৎমে কোর্টের কাজ চালানর নিয়মকানুনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? কতটুকু আছে?

কার্ণিক।। এটা তো শুধু রিহার্সাল। It is just a rehearsal.

পোংশে।। This is just game, এখানে কে seriously কোর্ট চালাচ্ছে? খেলার মতো। সুখাৎমে, বেশ জমেছে, না? চালিয়ে যান, চালিয়ে যান। (কার্ণিককে) উকিল তো মন্দ নয় তবে পসার জমে না কেন?

সামন্ত।। (মিসেস কাশিকে) কিন্তু হিপনোটিজ্‌ম—টিজ্‌ম।

পোংশে।। (ধরে বসিয়ে) বসে পড়ুন আপনি। এসব রগড় করা হচ্ছে।

কার্ণিক।। সুখাৎমে থামবেন না, চালিয়ে যান। কি, কাশিকার বাঈ কেমন লাগছে?

মিসেস কাঃ।। বেশ জমে উঠেছে। এমন ভাবতেই পারিনি। সুখাৎমে, এখন থামবেন না। যেমন চলছে চলতে থাকুক।

সুখাৎমে।। (এসবে প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে) মিঃ রোকড়ে, আপনি সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে যেতে পারেন। (রোকড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে ও সোজা পাশের ঘরে চলে যায়) Now মিঃ সামন্ত।

সামন্ত।। (উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত অথচ অবিশ্বাসের সাথে) আমি? আমাকে ডাকলেন?

সুখাৎমে।। আসুন। (সাক্ষীর কাঠগড়া নির্দেশ করে। সামন্ত গিয়ে দাঁড়ায়)।

মিসেস কাঃ।। ঘাবড়াবেন না সামন্ত। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো—

সামন্ত।। উত্তর দিতে হবে।

সুখাৎমে।। বেশ চট্‌পটে তো।

মিসেস কাঃ।। হ্যাঁ—তার বেশি কিছু না। এখন practice হচ্ছে। আসল ব্যাপার রাত্তির বেলা হবে।

সামন্ত।। জানি তো, রাত্তির বেলা। আমি একটুও ঘাবড়াইনি। প্রথমে একটু গুলিয়ে যেতে পারে, তারপর ব্যস্‌। (সুখাৎমেকে) শপথ নি, কেমন? মানে অভ্যেস হয়ে যাবে।

সুখাৎমে।। All right. পিয়ন রোকড়ে—(রোকড়েকে দেখতে পায় না)

সামন্ত।। উনি বুঝি ওখানে গেলেন—ভিতরে। আমিই নিচ্ছি (গট গট করে গিয়ে dictionary হাতে নিয়ে) আমি রঘুনাথ ভিকাজি সামন্ত, শপথ নিচ্ছি, সত্য বলব। সত্য ভিন্ন আর কিছু বলব না। মানে মামলার সত্য। মামলার সত্য বলতে গেলে তো মিথ্যাই, কিন্তু শপথ নেবার practice থাকা চাই, তাই নিচ্ছি। (তখনও Dictionary-র উপর হাত) কথা কি জানেন জেনেশুনে মিথ্যা বলে যেন মার্কা-মারা না হয়ে যাই (অনুশোচনার সুরে) আমি আবার ভগবান-টগবান মেনে থাকি। আচ্ছা শপথ তো হ'ল—এবার (গট গট করে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ফিরে আসে। বলুন। (সুখাৎমে ও তারপর কাশিকারকে) দেখেছেন? আমি একটুও ঘাবড়াইনি। তবে একেবারে আনাড়ি তো, একটু-আধটু গুলিয়ে যেতে পারে। (সুখাৎমেকে) এইবার জিজ্ঞাসা করুন।

সুখাৎমে।। নাম, পরিচয়কার্য সব হয়ে গেল—

সামন্ত।। জিজ্ঞাসা করতে চান? তা যদি চান জিজ্ঞাসা করুন।

সুখাৎমে।। না এখন বলুন তো মিস্টার—

সামন্ত।। (সঙ্গে-সঙ্গে) সামন্ত। মাঝে-মাঝে লোকে আমার নাম ভুলে যায় তাই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়।

সুখাৎমে।। It's all right মিঃ সামন্ত। আসামি মিস্‌ বেনারেকে আপনি চেনেন?

সামন্ত।। চিনি না? কিন্তু খুব বেশি না। দু-আড়াই ঘণ্টায় এমন কি জানাশুনো হয়? কিন্তু পরিচয় হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা খুব ভাল।

সুখাৎমে।। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে আপনি যে অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন সেটা তো বিশ্বাসযোগ্য বলে মানা যাচ্ছে না।

সামন্ত।। তা ঠিক। না—না কেন? কেন মানা চলবে না, চলালেই চলবে। আমার মা এক মিনিটেই মানুষের মুখ দেখে চিনে ফেলতেন। এখন বেচারি মা চোখে দেখতে পান না—বয়স হয়ে গেছে যে। (রোকড়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসে। বেনারে আসামির কাঠগড়ায় বসে চোখ বন্ধ করে দুই হাতের মাঝে মুখটা রাখে) উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বেনারে বাঈ।

বেনারে।। (চোখ বন্ধ করেই) জেগে আছি। যখন ঘুমুতে চাই, কক্‌খনও ঘুম আসবে না—কক্‌খনও না।

সামন্ত।। আমার সে ঝামেলা নেই। যখনি চাইব তখনই ঘুমতে পারি। (সুখাৎমেকে) আপনার?

সুখাৎমে।। আমার কাছে ঘুমনোর ব্যাপারটাই গণ্ডগোলের। মানে যখন আসার তক্‌খুনি এসে যাবে আর তা না হলে চার ঘণ্টাতেও আসবার নাম নেই।

কাশিকার।। (একই সঙ্গে কানখুস্‌কি চালাতে-চালাতে ও দাঁত খুঁটুতে-খুঁটতে) ভৃঙ্গরাজ তেল, মাথায় চাপড়াতে থাকবেন সুখাৎমে, যতক্ষণ না ভিতরে ঢুকে যায়। আমি তাই করি। যত কঠিন সামাজিক সমস্যাই হ'ক না কেন ভৃঙ্গরাজ দিলে ভালই ঘুম হয়। আসলে ঘুম ভাল হলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। আর মাথা যদি ঠাণ্ডা না থাকে তাহলে সামাজিক সমস্যার কচু সমাধান হবে। মস্তিষ্ক আর কোষ্ঠ এদুটোই হচ্ছে আসল জিনিস।

সামন্ত।। ঠিক বলেছেন (সুখাৎমেকে) এবার প্রশ্নগুলো সারা হ'ক?

সুখাৎমে।। (আগের সূত্র ধরে), মিস্টার—

সামন্ত।। সামন্ত।

সুখাৎমে।। আসামিকে, মিস্ বেনারেকে প্রফেসার দামলের ঘরে বিকেল বেলা, দিনে আলো যখন অন্ধকার হয়ে আসছে তখন মিঃ রোকড়ে ওঁদের দেখেছিলেন।

সামন্ত।। হ্যাঁ।

সুখাৎমে।। সেই মুহূর্তে প্রফেসর দামলে আর আসামি ছাড়া সেই ঘরে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিল না।

সামন্ত।। Correct. রোকড়ে তো তাই বললে।

সুখাৎমে।। রোকড়ে এও বললে তাকে দেখে আসামির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

সামন্ত।। Correct. কিন্তু আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন না।

সুখাৎমে।। তাই করব। তারপর আধঘণ্টা পর সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন আপনি।

সামন্ত।। কোথায়? না-না-না সে বাড়ি তো বোম্বেতে, আর আমি থাকি এই পাড়াগাঁয়ে। ছ্যাঃ কি যা-তা বলছেন। প্রফেসর দামলে বেঁটে কি লম্বা, রোগা কি মোটা—আমি কিছুই জানি না। ওঁর ঘরে যাওয়ার কথা বাদ দিন—চোখেই দেখিনি, তাই না?—এসব কি যা-তা বলছেন?

সুখাৎমে।। গিয়েছিলেন।

সামন্ত।। উকিল সাহেব, আপনি বুঝতে পারছেন না সব গুলিয়ে ফেলছেন।

সুখাৎমে।। মিঃ সামন্ত, এই মামলা চালাবার জন্য আমার কয়েকটা ব্যাপার ধরে নিয়েছি।

কার্ণিক।। অভিযোগটাই যখন কাল্পনিক তখন বাদবাকি আর রইল কি—সবটাই তো কাল্পনিক—হেঃ।

পোংশে।। শুধু আসামি সত্যি।

সামন্ত।। (মিসেস কাশিকে) এই দেখুন—আমারই গণ্ডগোল হয়ে গেল। (সুখাৎমেকে) ঠিক আছে—আমি আধঘণ্টা পরে দামলের ঘরে গেলাম। তারপর?

সুখাৎমে।। আপনি বলুন?

সামন্ত।। আমি কি করে বলব?

সুখাৎমে।। তবে কে বলবে?

সামন্ত।। হ্যাঁ তা ঠিক, আমাকেই বলতে হবে, কিন্তু ভীষণ শক্ত। আসামি ও প্রফেসর দামলে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার সময়....

পোংশে।। দিনের আলো যখন কমে আসছে—

কার্ণিক।। আরও আধঘণ্টা পরে। মানে বেশ ঘন অন্ধকার night scene–college premises— নিঃশব্দ...

সামন্ত।। (হঠাৎ) জিজ্ঞাসা করুন। তা আমি পৌঁছলাম গিয়ে। পৌঁছেছি—তারপর হল কি—দরজাটা বন্ধ—

সুখাৎমে।। দরজা বন্ধ?

সামন্ত।। হ্যাঁ দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে নয়—ভিতর থেকে। আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। না, না ভুল করছি, বেল টিপলাম। তখন দরজা খুলে গেল। সামনে দেখি একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে—বলুন তো কে? প্রফেসর দামলে। আমি প্রথমবার দেখলাম—অপরিচিত লাগবেই তো।

পোংশে।। সামন্ত, খাসা!

মিসেস কাঃ।। (কার্ণিককে) ভালই সাক্ষী দিচ্ছে তো।

সামন্ত।। (উৎসাহিত হয়ে) আমাকে সামনে দেখে দামলে একটু ত্রস্ত হয়ে বললেন—Yes, কাকে চান?

পোংশে।। (কার্ণিককে) আরে, দামলের বর্ণনা ঠিক দিয়েছে তো।

সামন্ত।। আমি বললাম—প্রফেসর দামলে। উনি বললেন—বাড়িতে নেই। তারপর উনি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম ফিরে যাব, না আবার বেল টিপব। আমার কাজটা তো খুব জরুরি—

সুখাৎমে।। কি কাজ?

সামন্ত।। কি কাজ মানে? ও, ধরুন যে-কোনও একটা কাজ। এই ধরুন প্রফেসর দামলেকে দিয়ে একটা লেকচার দেবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম। উনি তো লেকচার দিয়ে বেড়ান। প্রফেসর মানুষ তো, নিশ্চয় লেকচার দিয়ে থাকেন। তাই আমি আর একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ লেকচারের ব্যবস্থা না করে ফিরে যাই কি করে! সেই সময় ঘর থেকে চাপা কান্নার শব্দ কানে এলো।

মিসেস কাঃ।। কান্নার?

সামন্ত।। হ্যাঁ তাই তো। কান্নার—ভাঙা ভাঙা, মেয়েলি গলা।

সুখাৎমে।। (উত্তেজিত হয়ে) Yes.

সামন্ত।। শব্দ শুনে স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল—সে মানে আমি। ও, মানে আমি, বুঝতে পারলো না কে কাঁদছে। আপনি হয়ত জানতে চাইবেন যে আমি কেন মনে করলাম না প্রফেসর দামলের পরিবারের কোনও মেয়েছেলের কান্নার আওয়াজ। তাতে আমি বলব কান্নার ধরনটাতেই মনে হচ্ছিল ঘরের মেয়েছেলের কান্না নয়। কেন? কান্নার আওয়াজটা গুমরনো—লুকোবার চেষ্টা করছে। নিজের বাড়ির মেয়েছেলে লুকিয়ে কাঁদতে যাবে কেন? একথা মনে হওয়াতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—এমন সময় কথা শোনা গেল।

মিসেস কাঃ।। কথা শোনা গেল?

কার্ণিক,
পোংশে।। কার কথা?

সামন্ত।। না, না। একথা আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন না—এটা উকিল সাহেবের প্রশ্ন।

সুখাৎমে।। জিজ্ঞসা করছি—বলুন মিঃ সামন্ত। কি সেই কথা আপনি শুনতে পেলেন। Time waste করবেন না। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। মিঃ সামন্ত, be quick.

সামন্ত।। কথা হচ্ছিল—আমি কি পুরোটা বলব?

সুখাৎমে।। যা মনে করতে পারেন তাই বলবেন—কিন্তু তাড়াতাড়ি বলবেন।

সামন্ত।। (এবার ঘাবড়ে যায়—তারপর হাতের বইটা খুলে দেখে) "এমন অবস্থায়—আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করেন তাহলে আমি কোথায় যাব?"

(বেনারে tense)

মিসেস কাঃ।। এই কথা ও বলল?

সামন্ত।। সে আমি কি করে বলব?

সুখাৎমে।। (সামান্য ঘাবড়ে) তাহলে কে বলবে?

সামন্ত।। না, না—আমি ওঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। প্রফেসর দামলের।

সুখাৎমে।। তাই বলুন।

সামন্ত।। "কোথায় যাবে, এই সমস্যার সবটাই তোমার। তোমার জন্য আমার অনেক সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। নিজের প্রতিষ্ঠা আমাকে সবার আগে সামলাতে হবে।" এর উত্তরে সে বললে—"আমার এমন অবস্থা করে এখন প্রতিষ্ঠার কথা শোনাচ্ছেন। আপনি নিষ্ঠুর।" তারপর উনি বললেন "প্রকৃতিও নিষ্ঠুর।"

কাশিকার।। (সজোরে কানখুস্‌কি চালায়) I see—I see!

সুখাৎমে।। (উত্তেজিত) কামাল করে দিল—কামাল।

সামন্ত।। "আপনি যদি আমাকে একা ছেড়ে দেন তাহলে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার কোনও উপায় থাকবে না।" "তবে তাই কর। আমি নিরুপায়। তবে যদি কর আমার খুব দুঃখ হবে।"

সুখাৎমে।। Simply thrilling.

সামন্ত।। " তোমার তিরস্কারে আমার দৃঢ় সংকল্প থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হব না।" "মনে রাখবেন দু-জনের—না, না ভুল হল—হ্যাঁ একা—না দু-জন—" দু-জনের হত্যার পাপ আপনার উপরই এসে পড়বে।" এরপর একটা বিকট হাসি "হাঃ হাঃ হাঃ..."

বেনারে।। (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) থামুন, থামুন।

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) Order, Order.

বেনারে।। সব মিথ্যে—আগাগোড়া মিথ্যে—

পোংশে।। মিথ্যে তো বটেই। কিন্তু তারপর?

কার্ণিক।। মিথ্যে হলেও দারুণ লাগসই।

মিসেস কাঃ।। আপনি বলে যান সামন্ত।

বেনারে।। না, এসব বন্ধ করা হ'ক। আর না।

সামন্ত।। (ঘাবড়ে) কিন্তু হয়েছেটা কি?"

বেনারে।। এখানেই শেষ করে দেওয়া উচিত। একটা অক্ষরও সত্যি নয়।

সামন্ত।। ঠিকই তো—সত্যি নয়।

বেনারে।। সব বানানো—সব মিথ্যে।

সামন্ত।। আগাগোড়া মিথ্যে।

বেনারে।। আপনি জঘন্য সব মিথ্যে কথা বলছেন।

সামন্ত।। ঠিক বলেছেন। (বইটা দেখিয়ে) এর থেকেই তো সব বলছি।

সুখাৎমে।। মিঃ সামন্ত—বিকট হাসি। তারপর কি হল?

বেনারে।। এর পর যদি একটা কথাও উচ্চারণ করা হয়, আমি এখান থেকে সোজা চলে যাব।

সুখাৎমে।। মিঃ সামন্ত।

বেনারে।। (ভীষণ রেগে) এ সব কিছু আমি ভেঙে ফেলব, সব চুরমার করে দেব।

মিসেস কাঃ।। এই মেয়েটা, তোমার চেহারাটা যদি সাফ থাকে তাহলে এত নাচুনি-কুঁদুনি কিসের জন্য গো?

বেনারে।। আমার বিরুদ্ধে জেনেশুনেই এই চালটা চেলেছেন। ষড়যন্ত্র করেছেন।

সামন্ত।। না-না বাঈ, সত্যি বলছি এরকম কিছু না।

সুখাৎমে।। মিস্টার সামন্ত, answer। প্রফেসর দামলে বিকট হাসলেন। তারপর ঘরের ভিতরের সেই অজ্ঞাত মহিলাটি কি বললেন?

সামন্ত।। (দ্রুত বইয়ের পাতা উল্টোতে-উল্টোতে) একটু দাঁড়ান। সেই পাতাটা বার করে নিই। তারপর বলব।

বেনারে।। সামন্ত, এরপর একটা কথাও যদি উচ্চারণ করেন তাহলে দেখবেন—আপনি দেখবেন।

সুখাৎমে।। (লঘু অথবা হিংস্র সুরে) মিস্টার সামন্ত—

সামন্ত।। কি মুশকিল, পাতাটাই খুঁজে পাচ্ছি না।

সুখাৎমে।। (কাশিকারকে) মি লর্ড, যেসব ঘটনা আদালতের সামনে পেশ করা হল তা এতই স্পষ্ট ও অর্থবহ যে এর উপর কোনও মন্তব্যই নিষ্প্রয়োজন। আসামির বিরুদ্ধে আমার তরফের প্রমাণ হিসাবে সমস্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হ'ক।

কাশিকার।। Request granted.

বেনারে।। করুন, আরও কিছু লিপিবদ্ধ করুন। যত খুশি লিপিবদ্ধ করুন। (হঠাৎ চোখে জল এসে যায়, গলা বুজে যায়—ছটফট করতে থাকে আর মরিয়া হয়ে অস্বীকার করে যায়)। আপনি আমার কি করবেন? করুন। (চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি উইংসের ভিতর চলে যায়। একটু নিস্তব্ধতা। সামন্ত ব্যতীত সকলের মুখের চেহারা পাল্টে গেছে; তারপর ক্রমশ একটা সতর্ক উত্তেজনা দেখা দেয়)।

সামন্ত।। (সহানুভূতির সঙ্গে) আরে বাঈ-এর হঠাৎ কি হল?

কাশিকার।। (কানখুস্কি চালায়) সব ব্যাপারটাই রহস্যে ঢেকে গেল হে। সমস্ত সামাজিক অস্তিত্বটাই আজকাল কেমন যেন কাদায় ডুবে যাচ্ছে। সুখাৎমে, নির্মল বলে কিছু বাকি রইল না।

সুখাৎমে।। সেই জন্যই তো মিঃ কাশিকার আপনাদের মত বিচক্ষণ মানুষ আরও দায়িত্ব নিয়ে আরও গভীর ভাবে এই সমস্ত ঘটনার প্রতি মনোযোগ দেবেন। This should not be taken lightly.

মিসেস কাঃ।। সত্যি কথাই তো।

সুখাৎমে।। আর শুধুমাত্র মনোযোগ দিলেই হবে না—কাজও করা চাই—action—কি বলেন কার্ণিক?

কার্ণিক।। Yes. action.

পোংশে।। Right.

সুখাৎমে।। শুধুমাত্র উচ্ছ্বাস নিয়ে চললে চলবে না। আমরা সবাই মিলে—we must act.

মিসেস কাঃ।। আচ্ছা, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন তো?

কাশিকার।। তুমি চুপ কর। সুখাৎমে, কি হতে পারে—আন্দাজ আছে?

সুখাৎমে।। (সবজান্তাভাবে) That is the mystery, (সামন্ত সচকিত হয়ে ওঠে) and I think we know the answer to the mystery.

কাশিকার,
মিসেস কাশিকার
কার্ণিক, পোংশে
ও রোকড়ে।। কী?

(বেনারেকে ভেতরের দরজায় দেখা যায়)

সুখাৎমে।। (বেনারের উপস্থিতি না জেনে) আরে ভাই এ তো সোজা ব্যাপার। মিঃ সামন্ত বই দেখে যা বললেন সেটাই সত্যি। It holds water.

মিসেস কাঃ।। মানে মিস্ বেনারে আর প্রফেসর দা—

সুখাৎমে।। Yes, beyond a shade of doubt. কোনও সন্দেহ নেই।

মিসেস কাঃ।। আগো বাঈ।

রোকড়ে।। আমি আগেই জানতাম।

সুখাৎমে।। শ্ শ্ শ্ শ্।

(দরজায় দণ্ডায়মান বেনারেকে দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বেনারে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এসে নিজের বাস্কেট আর ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নেয়। বাইরে যাবার বন্ধ দরজার কাছে যায় ছিটকিনি খোলে—সবাই দেখে। দরজা কিন্তু খোলে না—টানতে থাকে তবুও দরজা খোলে না—আরও জোরে টানে। বাইরে থেকে বন্ধ। মরিয়া হয়ে দরজায় ধাক্কা মারে— জোরে জোরে—বারবার—কিন্তু দরজা বন্ধই থাকে। সামন্ত ব্যতীত সকলের মুখে একটা হিংস্র উল্লাস জাগতে থাকে।)

সামন্ত।। হয়েছে—বাইরে থেকে ছিটকিনি পড়ে গেছে। এই কাণ্ডটা হয়। আপনি থামুন বাঈ। (নিজে এগিয়ে যায় এবং খুলবার চেষ্টা করে) বাইরে থেকে ঢুকবার সময় ছিটকিনিটা ভাল ভাবে টেনে না রাখলে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করলেই ব্যস্, বাইরে থেকে বন্ধ। প্রতিদিনের ব্যাপার। যা কিছু কর, খোলার নাম নেই। এখন তো অফিস বন্ধ, বাইরে কেউ থাকবে না। (বারবার দরজায়

আওয়াজ করে) না। (পাশে দাঁড়ানো বেনারেকে) বাঈ আপনি যখন ছিটকিনিটা খুললেন তখনই ভুলটা হয়ে গেছে—পুরো এদিকে টেনে দেওয়া উচিত। (আবার ধাক্কা মারে) কোনো উপায় নেই (সবার মাঝখানে ফিরে আসে) বন্ধ। (সবার দিকে পিছন ফিরে বেনারে তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে)

কাশিকার।। (একমনে কানখুস্কি চালাতে-চালাতে) আমি ভাবছি সুখাৎমে—এই রকম যখন অবস্থা, মামলাটা চলুক না।

সুখাৎমে।। (একটা বিকৃত উৎসাহে উকিলি ভঙ্গিতে নত হয়ে) Yes মি লর্ড। (জ্বলজ্বলে চোখে। মি লর্ড, আসামিকেই প্রথমে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকা হোক।

।। দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।।

১০১.৭ দ্বিতীয় অঙ্কের সারাংশ

প্রথম অঙ্কের শেষে লীলা বেনারেকে ভ্রূণ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনাতেও পরিস্থিতি থম্‌থমে ও উদ্বেগপূর্ণ, বেনারে অভিযোগ শুনে হতচকিত। সামন্ত এবং মিসেস কাশিকার এরই মধ্যে হালকা আলাপ করে টেনশন মুক্তির চেষ্টা করেছে। এই অংশেই নাট্যকার এ নাটক রচনার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করেছেন; হালকা লঘু চালে এক ভয়ংকর অভিযোগ তথা সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন তিনি। বেনারে বাঈ অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করলেও উপস্থিত থাকা তার সহশিল্পীরা সে কথায় একটুও কর্ণপাত করেনি।

সুখাৎমে উকিল সেজে বেনারেকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার মতে মাতৃত্ব অতি মঙ্গলময়; ভারতীয় সংস্কৃতিতে, নারীই সৃষ্টির আদি উৎস এবং বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লীন শক্তিস্বরূপিনী বলে পূজিতা। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজজীবন ছিল মাতৃতান্ত্রিক, পরবর্তীকালে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্তনে নারী গৃহান্তরালে আশ্রয় নিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী পূজনীয়া, পুরুষ তাকে আপন স্বার্থবুদ্ধির জালে বন্দী করেছে। তাই বেনারের অসহায়তা বা অমর্যাদার চেয়ে এই 'নকল' অভিযোগকে 'সত্যি' বলেই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেতে তারা বেশি আগ্রহী। বেনারেকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি, বরং অভিযোগকে আরো জটিল করে তুলতে একে-একে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসেছে—পোংশে, রোকড়ে এমনকি নাট্যদল বহির্ভূত সামন্তও। সামন্তের 'সাক্ষ্য' এবং জবানবন্দিতে মক্ ট্রায়ালের ছদ্মবেশে বেনারের ব্যক্তিগত জীবনকে স্পর্শ করে তাকে সত্যিকার অপরাধিনী রূপে চিহ্নিত করেছে। সামন্তের 'কাল্পনিক' ঘটনা বর্ণনায় বেনারে এবং প্রফেসর দামলের অন্তরস্থ সম্পর্ক এবং তাদের মানসিক টানাপোড়েনের রূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কেই 'আসল নাটক' এবং 'নকল নাটক' মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। বেনারে প্রতিবাদ করেও শেষ পর্যন্ত নিজের মানসিক নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেনি। বেনারের সঙ্গে প্রফেসর দামলের গোপন সম্পর্ক বেনারের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া এবং সেই ঘটনাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে প্রফেসরের অস্বীকার করা এই সমস্ত কিছুই সামন্তের 'কাল্পনিক' ঘটনার বিবরণে বাস্তবের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। বেনারেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি, এই অঙ্কের শেষে বেনারে হলঘরের বন্ধ দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই বন্ধ দরজা সামাজিক-প্রতিবন্ধকতারই রূপক। নকল কোর্টে উপস্থিত দর্শক তথা বেনারের সহকর্মীদের বিকৃত এক আমেজে মশগুল। তারা আরও বেশি নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতায় উৎসাহী, দ্বিতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে আসামি বেনারেকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এনে তার জবানবন্দি আদায়ের জন্য নকল আদালতের 'হাকিম সাহেব' মিঃ কাশিকারের হুকুমে।

(হলঘর। সন্ধ্যাবেলা। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে চরিত্রগুলি যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়।)

সুখাৎমে।। (একটি কুৎসিত উৎসাহে উকিলি ভঙ্গিমায় নত হ'য়ে) Yes মি লর্ড। (জ্বলজ্বল চোখে)—মি লর্ড, আসামিকেই প্রথম সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকা হ'ক!

কাশিকার।। (কানখুস্‌কি চালিয়ে) আসামি কুমারী বেনারে—সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন! কাঠগড়ায় আসুন মিস বেনারে! (বেনারে নিশ্চল) আশ্চর্য ব্যাপার তো। বিচারকের সামনে ঔদ্ধত্য! পিয়ন রোকড়ে, আসামিকে কাঠগড়ায় নিয়ে যাও।

রোকড়ে।। (ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে একটু কেঁপে ওঠে) আমি?

(বেনারে নিশ্চল)

মিসেস কাঃ।। থাক। আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওর কি দরকার! (বেনারেকে জোর করে নিয়ে যেতে থাকে)—চল গো বেনারে!

(বেনারেকে কাঠগড়ায় নিয়ে আসে। খাঁচার বন্ধ প্রাণীর মতো বেনারের মুখ ত্রস্ত, ভীত)

সুখাৎমে।। (বেনারেকে দেখতে দেখতে কালো গাউনটা মহা আড়ম্বরে গায়ে চাপায়)। মি লর্ড! মামলাটা যে চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে মহামান্য বিচারক যদি তাঁর নিজস্ব কালো গাউনটা পরে নেন, তাহলেই আদালতের ভাবগাম্ভীর্য বজায় থাকে।

কাশিকার।। Exactly। এই রোকড়ে, আমার গাউনটা দে তো।

(রোকড়ে কালো গাউন এনে দেয়। কাশিকার গাউন চাপায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য প্রকট হয়)

সুখাৎমে।। মিস্টার সামন্ত, মিসেস কাশিকার, পোংশে, কার্ণিক আপনারা সবাই নিয়মমাফিক নিজেদের জায়গায় বসে পড়ুন।

সুখাৎমে।। (নিজেকে ঠিকঠাক করে হঠাৎ চোখ বন্ধ করে তারপর দু-হাতে নিজের দুই গালে আস্তে চড় মেরে চারদিকে নমস্কার করে) কাজের আগে কুলদেবতার প্রার্থনা করা আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন কাশিকার, করলে কিরকম পবিত্র-পবিত্র লাগে, মনের মধ্যে জোর বাড়ে। (যেন দেহে নতুন বল পেয়েছে এমনভাবে পালোয়ানের মতো সামান্য পায়চারি)—Good, Now to business. আসামি শপথ গ্রহণ করুক।

(রোকড়ে dictionary নিয়ে বেনারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বেনারে মাটির মত নিশ্চল।)

কাশিকার।। (টুপি সামলাতে সামলাতে) আসামি মিস বেনারে—শপথ নিন।

(বেনারে নিস্তব্ধ)

সামন্ত।। (লঘু কণ্ঠে) নিয়ে নিন না বাঈ। সবই তো সাজান।

(বেনারে নিস্তব্ধ)

মিসেস কাঃ।। (এগিয়ে যায়) থামুন তো। আমি নিয়ে দিচ্ছি। (Dictionary রোকড়ের কাছ থেকে নিয়ে) বেনারে, বল, শপথ নিয়ে বলছি, সত্য বলব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা না। (বেনারে স্তব্ধ।)

কাশিকার।। আশ্চর্য!

মিসেস কাঃ।। (Dictionary রোকড়েকে ফেরত দেয়) ধরে নাও না শপথ নিয়েছে। ওর হাতটা তো dictionary-র ওপর ছিল। যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন সুখাৎমে।

কাশিকার।। আসামি বেনারে, আপনাকে কোর্ট সাবধান করে দিচ্ছে যে অতঃপর কোর্টের মর্যাদা ভঙ্গ হয় এরকম কোনও কিছু করা উচিত নয়। সুখাৎমে—Go.

কার্ণিক।। Fire!

সুখাৎমে।। (বেনারের সামনে বার দুই পায়চারি করে হঠাৎ আঙুল তুলে) আপনার নাম লীলা দামলে?

সামন্ত।। (হঠাৎ) না-না বেনারে। দামলে ওই প্রফেসরটা।

মিসেস কাঃ।। আপনি চুপ করে শুনে যান। ওকে কথা বলতে দিন।

সুখাৎমে।। মিস লীলা বেনারে! (বেনারে না শোনবার, না দেখবার চেষ্টা করছে) আপনার বয়স কত কোর্টকে বলুন। (এমন Pose নিয়ে দাঁড়ায় যে বয়সের কথা বলবে না এটা জানা আছে। বেনারে স্তব্ধ।)

কাশিকার।। আসামি বেনারে, সাক্ষী হিসাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ব আপনার। আসামি বেনারে, কিসের অপেক্ষায় আছেন? Answer the question.

মিসেস কাঃ।। আমি একটা কথা বলছিলাম। বয়স কত হল ওকে কেন বলতে হবে? ও আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারি বত্রিশের ওপর। এক-আধ বছর বয়স বেশি হবে। কম তো নয়ই। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

সুখাৎমে।। Thank you, মিসেস কাশিকার।

কাশিকার।। Wait! কি thank you মিসেস কাশিকার? আসামি এখনো নিজের বয়স বলেনি। আমি সব লক্ষ্য করি। আসামি বেনারে আপনার বয়স?

মিসেস কাঃ।। কিন্তু আমি যে—

কাশিকার।। আসামিকে যা জিজ্ঞেস করা হল তার উত্তর অন্য একজন দিল, কোনও কোর্টেই এই পদ্ধতি মেনে নেওয়ার কোনও রেওয়াজ নেই। আপনি থেকে থেকে বাধা দেবেন না। আসামি প্রশ্নের উত্তর দিন—answer!

(বেনারে স্তব্ধ)

সামন্ত।। কাথাটা কি জানেন, নারী জাতির বয়স জিজ্ঞেস করা আমাদের পৌরুষে...

কাশিকার।। কি অদ্ভুত ধৃষ্টতা! জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নের উত্তর পাই না Is this a court, or what ?
(টেবিলে হাত চাপড়ায় এফেক্টের জন্য)

পোংশে।। ঠিক। কোর্টের অমর্যাদা হচ্ছে।

কাশিকার।। আসামি যদি জবাব না দেয় তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। This is the prestige of the court. জবাব দেবার জন্য আসামিকে দশ সেকেন্ড সময় দেওয়া হল। (ঘড়ি বার করে সামনে রাখে) No ইয়ার্কি now.

সুখাৎমে।। (দশ সেকেন্ড শেষ হওয়ার মাত্রই নাটকীয়ভাবে) মি লর্ড! আসামি মৌন হয়ে থাকায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। বত্রিশ।

কাশিকার।। All right! চৌত্রিশের কম হবে না। যদি চান তো লিখে দিতে পারি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সমাজে

পুনরায় বাল্যবিবাহ চালু হওয়া দরকার। ঋতুমতী হবার আগেই বালিকাদের বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমস্ত অনাচার চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের মহান সমাজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি কেউ যদি করে থাকেন তো, তাঁরা হচ্ছেন আগারকার আর কার্ভে, এটাই স্পষ্ট অভিমত। My frank opinion, সুখাৎমে।

সুখাৎমে।। (উকিলি বিনয়ে) Yes মি লর্ড।

(রোকড়ে নোটবই বার করে দ্রুত হস্তে কাশিকারের উক্তিটি লিখে নেয়। বেনারে কিন্তু স্তব্ধ হয়ে থাকে।)

সুখাৎমে।। (বেনারের পিছনে গিয়ে হঠাৎ) মিস বেনারে! (বেনারে চমকে উঠেই শক্ত হয়ে যায়)—আপনি এত বেশি বয়স অবধি কেন অবিবাহিত রয়ে গেলেন, কোর্টকে কি সে কথা বলতে পারেন? (একটু অপেক্ষা করে)—আমরা প্রশ্নটা একটু অন্য ভাবে জিজ্ঞাসা করছি—আজ পর্যন্ত আপনার জীবনে বিবাহের কতটা সুযোগ এসেছিল এবং কেনই বা সে সুযোগ হারালেন—কোর্টকে বলুন।

কাশিকার।। Answer (ঘড়ি বার করে। নিস্তব্ধতা) This is too much বাবা।

মিসেস কাঃ।। সোজা কথায় জবাব দেবে না ঠিক করেছে।

সুখাৎমে।। মি লর্ড। আসামির জেরা এখনকার মত এখানেই শেষ করা হোক। পরে উপযুক্ত সময়ে আবার শুরু করা যাবে।

(বেনারে কাঠগড়া ছেড়ে দরজার কাছে চলে যায়। দরজা বন্ধ। সামনে পোংশে। তাই অন্যদিকে চলে যেতে চায়। মিসেস কাশিকার হাত ধরে আসামির কাঠগড়ার দাঁড় করিয়ে দেয়।)

কাশিকার।। Next witness ?

সুখাৎমে।। মিসেস কাশিকার।

(মহাখুশি মিসেস কাশিকার শাড়ি ঠিক করতে-করতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়।)

কাশিকার।। (সুখাৎমেকে)—দেখুন, একেই বলে উৎসাহ। মুখের কথা খসতে না খসতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মিসেস কাঃ।। অত ইয়ে করার দরকার (সাক্ষীর সুরে)....একটু আগেই শপথ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমি সত্যি কথাই তো বলবো। আমি তো কাউকে ভয় করি না।

সুখাৎমে।। ঠিক আছে। মিসেস কাশিকার, আপনি একটা কথা বলবেন? এত বয়স অবধি কি করে মিস বেনারে অবিবাহিত রয়ে গেলেন?

মিসেস কাঃ।। তাতে কি? বিয়ে না হলেই বা কি?

সুখাৎমে।। কিন্তু মিসেস কাশিকার, বত্রিশ বছর পর্যন্ত—

কাশিকার।। চৌত্রিশ বলুন সুখাৎমে, চৌত্রিশ।

বেনারে।। এটা ঠিক হচ্ছে না—আমার ভালো লাগছে না—আপনার পক্ষে উচিত হচ্ছে না—আমি এই বললাম।

সুখাৎমে।। তারপর?

সুখাৎমে।। চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত একজন সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণীর—

মিসেস কাঃ।। তরুণী বলছেন কি? মহিলা বলুন। আমি তো তাহলে কিশোরী?

সুখাৎমে।। মহিলাই বলব আমরা। কিন্তু বিয়ে হল না কেন? আপনি এর কি ব্যাখ্যা করবেন?

মিসেস কাঃ। ব্যাখ্যার মাথায় ঝাঁটা মারি। যারা বিয়ে করতে চায়—যেমন করেই হোক—বিয়ে একটা হয়েই যায়।

সুখাৎমে।। তার মানে মিস বেনারে বিয়ে করতে চান নি? এখন—

মিসেস কাঃ।। হ্যাঁ বিয়ে ছাড়া যদি সব কিছু পাওয়া যায়, আজকের দিনে এসব হচ্ছে। মজাটি চাই কিন্তু দায়িত্ব চাই না। আপনাকে বলছি শুনুন—আমাদের সময় কালো, কুঁজো, বোঁচা যা কিছু হ'ক না কেন, মেয়েদের বিয়ে হতই। ভুলটা সেখানেই হয়েছে সুখাৎমে, যখন থেকে মেয়েরা রোজগার করে উড়তে থাকল।

সুখাৎমে।। অন্যের কথা থাক। আসামি বেনারের বিরুদ্ধে—আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে কি? প্রমাণ যদি থাকে তো বলুন!

মিসেস কাঃ।। প্রমাণ আর কি চাই। ওর চালচলনই তো যথেষ্ট। নেহাত আপনজন তাই চুপ করে থাকি। যখন তখন জোরে-জোরে হাসা, থেকে-থেকে গান গেয়ে ওঠা, ধেই-ধেই করে নাচা—ঠাট্টাইয়ার্কি, দিন নেই রাত নেই যার-তার সঙ্গে একা-একা ঘুরে বেড়ান—

সুখাৎমে।। (প্রমাণ শুনে আশাভঙ্গ)—মিসেস কাশিকার, এতে একটা লোকের খোলা মনের পরিচয় পাচ্ছি।

মিসেস কাঃ।। সময় যখন এসেছে—তখন কোর্টের সামনে বলছি। এটা একটু ধরুন না। (উল বোনার জিনিস সুখাৎমের হাতে দেয়।)—রাত্তিরে ফাংশনের পর বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য প্রফেসর দামলেকে কেন দরকার হয়?

(বেনারে অতিকষ্টে নিজেকে মৌন রাখে)

সুখাৎমে।। (মনোযোগ সহকারে).... I see, রাত্রে function -এর পর বাড়ি পৌঁছতে মিস বেনারের প্রফেসর দামলের সঙ্গ লাগে। (পোংশে আর কার্ণিক পরস্পরকে চোখ মারে)

মিসেস কাঃ।। হ্যাঁ একবার আমরা—মানে উনি আর আমি—গত September -এর কথা—তাই না গো? September—

কাশিকার।। সাক্ষীর সাক্ষী দরকার নেই—আপনার যা বলার বলুন।

মিসেস কাঃ।। সেপ্টেম্বর ছিল। রাত্রে একা ফিরবে ভেবে আমার বললুম তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি তা চালাকি করে দামলের সঙ্গে কেটে পড়ল আমরা খোঁজাখুজি করছি আর সে হাওয়া।

সুখাৎমে।। (উকিলি ভঙ্গিতে, খুশি হয়ে)—Peculiar।

মিসেস কাঃ।। একটু আগে মিথ্যে ষড়যন্ত্র মিথ্যে ষড়যন্ত্র করে কতো ন্যাকামিই করল। এখন দেখুন কেমন ভাম মেরে আছে, এটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ। সত্যের মৃত্যু নেই।—উল-টা ফেরত দিন!

সুখাৎমে।। (উল বোনার জিনিস ফেরত দেয়)—মিসেস কাশিকার, প্রফেসর দামলে তো সংসারি মানুষ—

মিসেস কাঃ।। হ্যাঁ। পাঁচ ছেলের বাপ।

সুখাৎমে।। তাহলে মিসেস কাশিকার, বয়োজ্যেষ্ঠ বলে সরল মনেই মিস বেনারে ওর সঙ্গ আশা করে থাকেন এও তো হতে পারে।

মিসেস কাঃ।। ওঃ, তাহলে আমরা মানে উনি আর আমি চ্যাংড়া। আহা, দামলে না হয় বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু বালু কি?

(রোকড়ে ভীষণ ভাবে চমকে ওঠে।)

সুখাৎমে।। (সজাগ হয়ে)—বালু কি মিসেস কাশিকার—রোকড়ে কি মানে?

(বেনারে tense)

মিসেস কাঃ।। সে কথাও বলছি। ওর সঙ্গেও function-এর পর অন্ধকারে ফস্টিনস্টি করা হয়েছে। আমায় নিজের মুখে এসব বলেছে। তাই না রে বালু?

(কার্ণিক ছাড়া সবাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুখাৎমেকে আরও সজাগ দেখায়।)

রোকড়ে (ক্ষীণ কণ্ঠে)—হ্যাঁ—না—না—

সামন্ত।। (কার্ণিককে)—এ হতেই পারে না। আমার সঙ্গে একটু আগে যখন একা ছিলেন তখন তো....

(কার্ণিক চুপ করিয়ে দেয়।)

সুখাৎমে।। মিসেস কাশিকার, আপনি যেতে পারেন। আপনার সাক্ষ্য শেষ। মি লর্ড—রোকড়ের আবার একটু সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা হক। (রোকড়ে পিছু হঠতে থাকে। সুখাৎমে বেনারের অতি নিকটে গিয়ে নিচু গলায় অন্তরঙ্গ ভাবে)—বেনারে বাঈ, খেলা বেশ জমেছে—না? হ্যাঁ, হ্যাঁ just a game!

কাশিকার।। রোকড়ে সাক্ষী দিতে যা। (রোকড়ে বেনারের দিকে না তাকিয়ে চুপি-চুপি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায়)।

মিসেস কাঃ।। (রোকড়ে যখন সামনে দিয়ে যায়)—বালু, ঘাবড়াবি না। যা সত্যি তাই বলিস।

সুখাৎমে।। (কাঠগড়ার কাছে গিয়ে)—মিঃ রোকড়ে, শপথ তো আগেই হয়ে গেছে—মিঃ রোকড়ে, মিস বেনারে ও আপনার সম্পর্কে মিসেস কাশিকার তাঁর সাক্ষ্যতে একটা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছেন।

(রোকড়ে 'না'-সূচক মাথা নাড়ে।)

মিসেস কাঃ।। বালু, তুই বলেছিলি না আমাকে?

সুখাৎমে।। মিঃ রোকড়ে! কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে সেই রাত্রে ফাংশনের পর যা কিছু ঘটেছিল যা কিছু ভাল মন্দ—আনন্দ বেদনা—সব কোর্টে পেশ করুন। এটা আপনার কর্তব্য। Function শেষ হ'ল—তারপর কি হ'ল?

রোকড়ে।। (ক্ষীণ কণ্ঠে)—আমি....আমাকে....

সুখাৎমে।। Function শেষ হবার পর আমরা সবাই সেই জায়গা থেকে বাড়ি যাবার পথে রওয়ানা দিলাম—তারপর?

কার্ণিক।। এরা দুজনে পিছিয়ে পড়ে রইল।

মিসেস কাঃ।। তখন নাকি ও এর হাত ধরল। —বালুর—

পোংশে।। Gosh!

সুখাৎমে।। তারপর? তারপর আপনি কি করলেন রোকড়ে? আর কি কি হ'ল? What next?

মিসেস কাঃ।। আমি বলছি—

কাশিকার।। আপনি না—ওকে বলতে দিন। অকারণে নাক গলান....

সুখাৎমে।। Yes মিঃ রোকড়ে—নির্ভয়ে বলুন—be not afraid.

কাশিকার।। Afraid! আমরা তো আছি এখানে! এটা কি মগের মুলুক? (রোকড়ে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সাহস সঞ্চয় করে—বেনারের বিরুদ্ধে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে)

রোকড়ে।। (সাহস ভরে)—আমার হাতটা উনি ধরলেন।

সুখাৎমে।। Yes?

রোকড়ে।। আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম—তখন উনি দূরে সরে গেলেন। আমাকে বললেন যে যা হয়ে গেল তা কাউকে বলিস না।

বেনারে।। মিথ্যে কথা।

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে)—Order! মধ্যিখানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য আসামিকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, রোকড়ে continue—

রোকড়ে।। (কাশিকারকে)—আপ্পা, আমাকে উনি বললেন,—বলিস যদি তাহলে তোর বিরুদ্ধে এমন একটা কিছু করব—

সুখাৎমে।। এসব কথা কখন হ'ল মিঃ রোকড়ে?

রোকড়ে।। দিন আষ্টেক আগে। আমরা যখন ডোম্বিভিলিতে function করতে গেলাম।

সুখাৎমে।। মিঃ লর্ড, এই রোকড়ে—নিজের বয়সের থেকে ছোট—এত ছোট যে ছোট ভাইয়ের মতো! এমন একটি ছেলের সঙ্গে আসামি আড়ালে ঢলাঢলি করেছে। যা ঘটেছে তা যদি গোপন না করে যায় তাহলে পরিণাম সম্বন্ধে ভয় দেখিয়েছে এবং নিজের পাপাচরণ গোপন রাখার চেষ্টা করেছে। এসব অপরাধ অত্যন্ত স্পষ্ট।

মিসেস কাঃ।। কিন্তু সত্য চেপে যাওয়া যায় না।

সুখাৎমে।। রোকড়ে, আসামি আপনার বিরুদ্ধে কিছু করার ভয় দেখাল। Next? তারপর কি হ'ল?

রোকড়ে।। (অজান্তে নিজের গালে হাত বুলিয়ে)—আমি একটা চড় মারলাম।

পোংশে।। What?

কার্ণিক।। How melodramatic!

রোকড়ে।। হ্যাঁ, আমি বললাম, আমাকে আপনি—আপনি আমাকে ভেবেছেন কি? যা হচ্ছে তাই করতে পারেন? আমি না করে থাকব না। তাই এনাকে, বাঈকে বলে ফেললাম, হ্যাঁ।

কাশিকার।। হ্যাঁ, সব কথা ওকেই তো বলবি, আমাকে তো বলিস নি রোকড়ে?

রোকড়ে।। (অস্ফুটভাবে) ভুল হয়ে গেছে আপ্পা। ভেবেছিলাম যে আপনি তো সব কিছুই জানতে পারবেন বাঈ-এর কাছ থেকে। তাই—আমি—

সুখাৎমে।। তারপর কি হ'ল রোকড়ে? What next, what next?

রোকড়ে।। তারপর? তারপর কিছু নেই। এই পর্যন্ত। আমি এখন যাই।

সুখাৎমে।। Yes মিঃ রোকড়ে। (পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে বিড়বিড় করে লিখতে থাকে)—আটদিন আগে ডোম্বিভিলির function.... (রোকড়ে তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছতে থাকে। তৃপ্তির ভাব।)

মিসেস কাঃ।। পরের ঘটনাটা বলিস নি তো বালু—চড় মারা!

সামন্ত।। (পোংশেকে) না। বিশ্বাসই হচ্ছে না। পরিস্থিতি খুব চাঞ্চল্যকর।

পোংশে।। (জোরে-জোরে পাইপ টানে) সুখাৎমে, my witness. এবার আমার সাক্ষীর পালা। এখন আমাকে ডাকুন। (ম্রিয়মাণ বেনারের দিকে তাকিয়ে অধীর কণ্ঠে) ডাকুন না আমাকে!

কাশিকার।। সুখাৎমে, call পোংশে। Let us hear him—call. একবার শোনাই যাক। ডাকুন।

সুখাৎমে।। মিঃ পোংশেকে সাক্ষীর জন্য ডাকা হোক। (পোংশে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়)

পোংশে।। আবার শপথ নেব? Oxford English Dictionary-র ওপর হাত রেখে শপথ নিচ্ছি—

কাশিকার।। হয়েছে—হয়েছে—সুখাৎমে জিজ্ঞাসা করুন।

সুখাৎমে।। মিঃ পোংশে! আসামি মিস বেনারে সম্বন্ধে—

পোংশে।। (বেনারের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, বলবার মতো জোর খবর একটা কিছু আমার কাছে আছে বই কি। (বেনারে সঙ্গে সঙ্গে যেন শক্ত কাঠ হয়ে ওঠে। ওঁকে শুধু একবারটি জিজ্ঞাসা করা যাক ওঁর ভ্যানিটি ব্যাগে উনি Tik-20 রাখেন কেন?

(বেনারে চমকে ওঠে। যেন শক্ পেয়েছে)

মিসেস কাঃ।। সেটা আবার কি?

পোংশে।। ওটা হচ্ছে ছারপোকা মারার খুব বিষাক্ত ওষুধ। খুব নাম-করা।

সামন্ত।। (কার্ণিককে) হয়তো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

সুখাৎমে।। এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ওষুধ Tik-20 আসামী মিস্ বেনারের ভ্যানিটি ব্যাগে আপনি কখন এবং কেমন করে দেখেছিলেন—সেটা বলবেন কি মিস্টার পোংশে?

(বেনারে প্রস্তরবৎ)

পোংশে।। হ্যাঁ। ওঁর এক ছাত্রী আমাদের পাড়াতেই থাকে। দিন দশেক আগে মেয়েটি আমাকে এসে বলল—আমাদের দিদিমণি এটা আপনাকে দিয়েছে।

কাশিকার।। Tik-20?

পোংশে।। খামে বন্ধ করা একটা চিঠি। খাম খুলে দেখি ভিতরে আরও একটা ছোট্ট খাম। সেটাও বন্ধ। ওতে একটা কাগজের টুকরো ছিল—তাতে লেখা—'আমার সঙ্গে একটু দেখা করবেন—একটু কাজ ছিল। দুপুর সওয়া একটায়—স্কুলের পেছনে কান্নাড়ি হোটেলটায় বসে থাকবেন। আমি সেখানে আসব।' সত্যি বলতে কি আমার মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু ভাবলাম মজাটা দেখাই যাক। মজা হবে ভেবেই আমি গিয়েছিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে মিস বেনারে চোরের মত মুখে তাড়াতাড়ি ঢুকে এলেন।

(বেনারে tense)

সুখাৎমে।। I see!

কাশিকার।। তারপর? তারপর কি হল পোংশে?—

পোংশে।। উনি বললেন—এখানে—বাইরে নয়—কেউ দেখে ফেলবে—family cabin-এ চলুন গিয়ে বসি!

মিসেস কাঃ। ও বাবা! বেশ!

পোংশে।। তাই আমার cabin-এ গিয়ে বসলাম। মিস বেনারে যে কাজে এসেছিলেন সেটা হয়ে যাবার সময় ব্যাগ থেকে একটি শিশি পড়ে গেল।

(মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতা)

সুখাৎমে।। সেটাই Tik-20 র শিশি! Good! কিন্তু মিঃ পোংশে, আপনার ও বেনারের মধ্যে এর আগে কি হয়েছিল— মানে আপনার সঙ্গে কি কাজ ছিল বললেন না তো?

(বেনারে কিছু বলতে না পেরে সজোরে মাথা নাড়ে)

পোংশে।। আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

কার্ণিক,
মিসেস কাঃ।। বলেন কি!

(রোকড়ে ও বাকি সবাই স্তম্ভিত।)

কাশিকার।। খুব interesting লাগছে সুখাৎমে।

সুখাৎমে।। True, My Lord. It is and it will be. (বেনারের প্রতি লোলুপ উকিলি দৃষ্টি রেখে)—আপনার প্রতি ভালবাসা আছে— এইসব কথা কি উনি বলেছিলেন?

পোংশে।। না। কিন্তু আমাকে বললেন—উনি মা হতে চলেছেন।

(ভীষণ চাঞ্চল্য। বেনারের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। কাঠের পুতুলের মত অধোমুখে বসে রইল।)

কার্ণিক।। সত্যি বলছিস রে পোংশে?

পোংশে।। তা কি মিথ্যে বলছি?

কাশিকার।। করলটা কে? Continue পোংশে, continue

সুখাৎমে।। মিঃ পোংশে—

পোংশে।। যার জন্যে হয়েছে তার নাম উনি বলেছিলেন। কিন্তু—কাউকে না বলার দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সেই দিব্যি রেখেছি।

মিসেস কাঃ।। কিন্তু কার থেকে?

কাশিকার।। কি করছ—তুমি একটু চুপ করে থাকবে কিনা বল তো? The cat will be out of the bag. এত উতলা হচ্ছ কেন? কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না পোংশে, অন্য একজনের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা—আপনাকে বলেও মিস বেনারে আপনাকে— মানে আরেকজনকে বিয়ের ইচ্ছে জানালেন?

পোংশে।। Exactly!

সুখাৎমে।। আপনি কি বললেন মিঃ পোংশে? মানবতাবোধে তাড়িত হয়ে এক উদার দৃষ্টি নিয়ে সবৎসা গাভী গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেলেন?

পোংশে।। আমার উত্তর খুবই স্পষ্ট ছিল।

সুখাৎমে।। তার মানে আপনি রাজি হলেন না?

পোংশে।। Yes.

সুখাৎমে।। Mr. পোংশে, এই ঘটনার পরেই তো Tik-20-র শিশিটা ব্যাগ থেকে পড়ে গেল?

পোংশে।। Of course. আমি নিজেই ওঁকে তুলে ফেরত দিলাম। কথাবার্তা যা হয়েছিল পুরোটাই কি বলব? যদি শুনতে চান বলতে পারি।

বেনারে।। (লাফিয়ে উঠে)— না-না-না—

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে)—Silence! মিঃ পোংশে, পুরোটাই বলে ফেলুন। সুখাৎমে, এক্ষুনি নামটা বেরিয়ে পড়বে।

বেনারে।। না। দিব্যি দেওয়া আছে পোংশে।

সুখাৎমে।। মিঃ পোংশে, কি এমন কথাবার্তা হয়েছিল যে যাতে মিস বেনারে ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবেন?

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) আপনি বলে যান পোংশে, একটুও থামবেন না। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। এর সামাজিক গুরুত্ব অনেক।

পোংশে।। কিন্তু ওঁর ভাল লাগবেনা।

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) এখানে জাজ কে পোংশে? আসামির ভাল লাগছে কি লাগছে না এর বিচার কবে থেকে কোর্টে চালু হল, অ্যাঁ? From when? I say, continue.

বেনারে।। (পোংশের সামনে এসে) পোংশে।

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) Order! আসামি কাঠগড়ায়—আসামি কাঠগড়ায়। রোকড়ে আসামিকে কাঠগড়ায় নিয়ে যা!

(রোকড়ে এগিয়ে এসে ইতস্তত করতে থাকে?)

বেনারে।। আপনি একবার বলে দেখুন পোংশে।

কাশিকার।। আসামি কাঠগড়ায় যাও। রোকড়ে, কাঠগড়ায়।

মিসেস কাঃ।। (এগিয়ে বেনারের হাত ধরে) আগে ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। রোকড়ে হাত ধর। (হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। পিছনে যায় রোকড়ে) চল গো চল। (টেনে নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং একপাশে নিজে ও অন্যপাশে রোকড়ে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।)

কাশিকার।। বাধ্যতা মানে বাধ্যতা। আপনি বলুন পোংশে কি কি কথাবর্তা হয়েছিল। আমার কানখুস্‌কি? (খুঁজে পেয়ে) বলুন!

সুখাৎমে।। মিঃ পোংশে, কি কথাবর্তা হল?

পোংশে।। প্রথমে একথা সেকথা। যেমন ধরুন, সুখাৎমে এমনি লোক ভাল, কিন্তু বেচারির কপালটাই খারাপ। পসার জমল না। বার লাইব্রেরিতে তাস খেলে সময় কাটে, ওর এমনি খ্যাতি যে ওর কাছে কেস নিয়ে গেলে জেল অনিবার্য। জাজের সামনে একেবারে হাঁদা গঙ্গারাম।

সুখাৎমে।। (অপমান ও বিরক্তি দমন করে) I see, yes, বলে যান!

পোংশে।। কাশিকার রোকড়ের সঙ্গে বেশ খারাপ ব্যবহার করে, কারণ ও সন্দেহ করে ওর স্ত্রীর সঙ্গে একটা কিছু আছে। ছেলেপুলে নেই তো।

মিসেস কাঃ।। এই কথা বললে? (কট্‌মট্‌ করে বেনারের দিকে তাকায়)

কাশিকার।। (জোরে কানখুস্‌কি চালায়) বলে যান, বলে যান পোংশে।

পোংশে।। এইসব কথাটথা হবার পর আসল বিষয় এসে গেল।

কার্ণিক।। Wait. আমার সম্বন্ধে কি বলল রে পোংশে?

পোংশে।। তোর সম্বন্ধে কিছু না।

কার্ণিক।। হয়তো বলেছে আমি একটা যা-তা অভিনেতা, এইরকম কিছু। ওর মতামত আমার জানা আছে। আমি ওকে ঠিক চিনেছি।

পোংশে।। উনি ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কোথাও মজে গেছি কি না। আমি বললাম আমার মনের মত কাউকে না পেলে আমি বিয়েতে interested নই। উনি বললেন, মনের মতনটা কি? আপনি কি রকম আশা করেন? তারপর আমি বললাম, মেয়েরা সাধারণত হাঁদা ও বোকা— এটাই আমার মোটামুটি ধারণা। I want a mature partner. এরপর উনি বললেন, অভিজ্ঞতা বয়স বাড়লে আসে, একটু অন্যভাবে জীবন কাটালে আসে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা মোটেই সুখের হয় না। নিজে তো কষ্ট পায়ই, অপরের পক্ষেও সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু আপনি কি মেনে নিতে রাজি হবেন? মানে সত্যিকারের mature মেয়ে, যদিও আপনার চেয়ে বয়সে বড়— পড়াশুনায় বেশি। আমি বললাম— এ সম্বন্ধে আমি seriously ভাবছি না। উনি বললেন— তাহলে এখন থেকে ভাবুন। এ কথাটাই বলতে এসেছি। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম— আপনার খোঁজে কোনও উপযুক্ত মেয়ে আছে নাকি? উনি বললেন— হ্যাঁ। আপনি যেমন চান। আমি কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না আমার বিয়ের ব্যাপারে উনি এতসব জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আলাদা ধরনের? সেটা আবার কিরকম? উনি উত্তরে বললেন— মেয়েটা ব্যর্থ প্রেমিক। একটু দাঁড়ান। আমি ভেবে বলছি। হ্যাঁ, ভালবাসার দান— এখানে একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু তারপর বললেন— ভালবাসার দান মেয়েটি দেহের মধ্যে বহন করছে। আসলে ওর কোনও দোষ নেই। ওর সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও মেয়েটি চাইছে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে। এবং সেই জন্যই নাকি বাঁচাবার কথা— বিয়ে করার কথা ভাবছে। এই রকম সব বলতে লাগলেন। মনে তো অনেকক্ষণ ধরেই সন্দেহ জাগছিল। তাই সত্যি কথাটা বের করার জন্য বললাম— বেচারি খুবই বিপদে পড়েছে— রাস্কেলটা কে?

সুখাৎমে।। আর উনি বললেন—প্রফেসর দামলে?

পোংশে।। না। উনি প্রথমে বললেন—দয়া করে রাস্কেল-টাস্কেল বলবেন না। হয়ত তিনি লোক ভাল, মানুষ হিসাবেও বড়, দীক্ষা, বিদ্যা অনেক বেশি। মেয়েটি সেই তুলনায় অনেক ছোট। হয়ত মেয়েটি তাকে বোঝাতে পারেনি—তাঁকে সে কি চোখে দেখে। কিন্তু আসল কথাটা এসব নয়— আসল কথা ওই অজাত শিশু।

সুখাৎমে।। তারপর?

পোংশে।। তারপর বললেন যে মেয়েটি সেই লোকটার বিদ্যেবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়েছিল। ভক্তি করত। কিন্তু তিনি শুধু দেহটাই বুঝেছিলেন। তারপর আরও অনেক কিছু বললেন। মোটামুটি সব এই লাইনে— দামলের সংসারে জায়গা পাবার সম্ভাবনা নেই। তার ওপর....

সামন্ত,

কার্ণিক,

সুখাৎমে।। দামলে?

কাশিকার।। (টেবিল চাপড়ে)— The cat is out of the bag.

পোংশে।। সত্যি বলছি নামটা না বলার দিব্যি নিয়েছিলাম, কিন্তু—

সুখাৎমে।। Does not matter, Mr. পোংশে। Does not matter at all. অসাবধানতাবশত কথার খেলাপ করলে পাপ হয় না—অন্তত কোর্টের মধ্যে হয় না। আসল কথা পেটের বাচ্চাটা প্রফেসর দামলের। তারপর বলুন।

পোংশে।। উনি আমার পায়ে হাত দিলেন।

কাশিকার।। I see! I see!

পোংশে।। হ্যাঁ, উনি আমার পা চেপে ধরলেন। তখন আমি বললাম, এটা আপনাকে মানায় না মিস বেনারে। আপনি যে কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটাই আমি যথেষ্ট অপমানের মনে করি। আপনি আমাকে এত বাজে লোক মনে করলেন কি করে? আমার মুখ দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং ভীষণ হাসতে-হাসতে বললেন—আপনি কি ভেবেছেন আমি এসব সত্যি বলেছি? আমি ফাজলামি— করছিলাম— এই। আরও জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন।

মিসেস কাঃ।। ফাজলামি— অ্যাঁ!

পোংশে।। কিন্তু ওঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তার থেকেই তো সব বোঝা যায়। হঠাৎ দেরি হয়ে গেছে বলতে-বলতে উনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সুখাৎমে।। Thank you Mr. পোংশে for the valuable proof you have given.

(পোংশে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসে। সুখাৎমে কাগজের টুকরো বার করে বিড়বিড় করতে করতে লেখে।

সুখাৎমে।। —দশদিন আগে, রোকড়ের হাত ধরার দু-দিন আগে (লেখা শেষ হয়)— That's fine, মি লর্ড। এই প্রমাণের উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এতো স্পষ্ট, সন্দেহাতীত এবং জোরালো এই প্রমাণ। আসামি প্রথমে মিঃ পোংশেকে পাকড়াবার চেষ্টা করে। সেখানে দাঁত ফোটাতে পারল না দেখে রোকড়ের সঙ্গে গেল ফস্টিনস্টি করতে।— আমাদের পরের সাক্ষী আসামি, মি লর্ড। (বেনারের দিকে ইঙ্গিত করে)

(বেনারে অর্ধমৃতা)

কার্ণিক।। (নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলে) Wait, wait, এই মামলায় আমিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেশ করতে চাই।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক in the box. (কার্ণিক নাটকীয় ভাবে এসে দাঁড়াল। কাশিকার প্রাণপণে খুস্‌কি চালাচ্ছে।) Speak. মিঃ কার্ণিক। Court -কে কি বলতে চান— বলুন।

কার্ণিক।। (নাটকীয় ভঙ্গীতে)— আসামি বেনারে আর রোকড়ে এই দুইজনের সম্বন্ধে যে তথ্য রোকড়ে আদালতের সামনে পেশ করেছে, সেটা ভুল।

রোকড়ে।। (হঠাৎ ভাঙা গলায়)— তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধে?

কার্ণিক।। (নাটকীয় ভাবে)— কারণ, ওই বিষয়ে যা ঘটেছিল তা আকস্মিকভাবে আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

কাশিকার।। (কানখুস্‌কি দিয়ে সাফ করতে-করতে) কোন ঘটনা? বেশি গোলমাল না করে বলে যান।

কার্ণিক।। (একান্ত নাটকীয়)—গোটা জীবনটাই আজকের দিনে গোলমেলে হয়ে গেছে। পশ্চিমে absurd নাট্যকার Ionesco—

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে)— To the point. কথা ঘোরাবেন না। যা বলতে চান বলুন।

কার্ণিক।। গোলমালের কথা বলছিলেন কিনা। তাই বললুম।

সুখাৎমে।। মিঃ কার্ণিক, আসামি বেনারে ও রোকড়ে সম্বন্ধে কোর্টের সামনে যা বলা হয়েছে তা সংশোধন করতে চান কি?

কার্ণিক।। সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হচ্ছে রোকড়ে আসামিকে চড় মারে নি।

রোকড়ে।। (ভাঙা গলায়) মিথ্যে কথা।

কার্ণিক।। যা ঘটেছিল তা মোটামুটি এরকম : আসামি রোকড়ের সঙ্গে দেখা করলেন। আমি সেটা দেখতে পেলাম। এরপর কি situation হতে পারে দেখবার জন্য একপাশে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলাম। আসামি জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর, কি ঠিক করলেন? রোকড়ের গলা শোনা গেল। —বাঈ-এর অনুমতি ছাড়া আমি কিছু করতে পারি না। আমার ওপর জোর খাটাবেন না। আসামি আবার জিজ্ঞাসা করলেন— বাঈ-এর গোলামি করে আর কতদিন কাটাবে? এরপর রোকড়ে বলল, —উপায় নেই। আমি বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। তারপর আসামি বলল, —ভাব, আবার ভাব। কোনও কিছুর অভাব হবে না তোমার। বাঈকে ভয় পাবার কোনও কারণ থাকবে না। স্বাধীন হবে। তা রোকড়ে বললে,— আমার ভয় করে। তার ওপর আপনার এই অবস্থায় আমি যদি বিয়ে করি লোকে আমার মুখে থুথু ফেলবে। আমাদের বংশে কেউ এমন কাজ করেনি। আপনি আমার কাছে কিছু আশা-টাশা করবেন না। নইলে আমি বাঈকে বলে দেব।— এই ভাবে অপমানিত হয়ে আসামি—

রোকড়ে।। (ভাঙা গলায়)— মিথ্যে কথা।

(কার্ণিক রোকড়ের গালে সজোরে এক চড় মারল।

রোকড়ে।। (নিজের গালে হাত দিয়ে) মিথ্যে কথা— সব মিথ্যে কথা। (মিসেস কাশিকার কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থাকে।)

সুখাৎমে।। Thank you মিঃ কার্ণিক। তবে আসামি সাক্ষী রোকড়েকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল সে কথা সত্যি? শুধু কে কাকে চড় মেরেছিল সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য অন্য রকম।

কার্ণিক।। শুধু বক্তব্য নয়—দর্শনও।

সুখাৎমে।। That's so. মিঃ কার্ণিক। (কাঠগড়ার বাইরে যেতে ইঙ্গিত করে।)

কার্ণিক।। আমি আরও কিছু বলতে চাই।

কাশিকার।। যদি কোনও গোলমাল না থাকে—তবেই শোনান। গণ্ডগোল চাই না।

কার্ণিক।। মি লর্ড—

কাশিকার।। (হাতুড়ি ঠুকে) আপনি কি নিজেকে উকিল ভাবতে শুরু করেছেন? সাক্ষীর মত শুধু 'হুজুর' বলুন।

কার্ণিক।। হুজুর—

কাশিকার।। হ্যাঁ, এটাই রেওয়াজ। বলুন, কিন্তু কোন গণ্ডগোল নয়। সহজ সরল।

রোকড়ে।। (খুব কাহিল অবস্থায় মিসেস কাশিকারকে নিচু গলায়) বাঈ—

মিসেস কাঃ।। চুপ। আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

রোকড়ে।। কিন্তু বাঈ আমি....

(বাঈ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রোকড়ে কাঁদ-কাঁদ অবস্থায়)

কার্ণিক।। হুজুর—আসামির এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। মানে হঠাৎ ঘটনাক্রমে দাদার জিমখানায় একটা ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের দুজনেরই এক friend Bachelor's Eleven-এর হয়ে খেলতে নেমেছিল। আমার এই friend-এর সেই friend, যে আসামির মাসতুতো ভাই—আমি আমার friend -এর কাছ থেকে জানতে পারি। আমার friend আসামিকে চেনে মানে যে ভাবে অন্য অনেকেই আসামিকে চেনে, সেইভাবেই চেনে—মানে ও আসামি সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে।

কাশিকার।। I see. কিন্তু এমন আড্ডা মারার ভঙ্গিতে বলছেন কেন? Court-এর সম্মান রেখে বলুন!

কার্ণিক।। (সম্মান রাখার pose নিয়ে) Yes. তা আসামির মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হচ্ছিল এবং তারপর যখন কথায়-কথায় ওঁর কথা উঠল তখন ও আমাকে কিছু মারাত্মক information, মানে খবর দিল।

সুখাৎমে।। যথা?

কার্ণিক।। যথা—আসামি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

সুখাৎমে।। That is the point. Tik-20-এর পিছনে অনেক ঘটনাই আছে।

কার্ণিক।। তা বলতে পারি না, যা ঘটেছিল আমি শুধু তাই বলতে পারি। আমার information হল—এই আত্মহত্যার চেষ্টা, এমনি একটি ঘটনা যা ব্যর্থ প্রেমের— ঘটেছিল আসামির পনেরো বছর বয়সে—নিজের মামার সঙ্গে।

মিসেস কাঃ।। (হতভম্ব) মামা!

সুখাৎমে।। মি লর্ড। মামার সঙ্গে মানে—মায়ের ভাইয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক।

কাশিকার।। অর্থাৎ মাতৃগমনের একটু নিচে। খাসা সুখাৎমে—খাসা!

সুখাৎমে।। মি লর্ড—খাসা কিসের? আসামির বর্তমান সবটাই কলঙ্কিত। অতীত জীবনও পাঁকে ভরা। দিনের আলোর মতো সব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

(বেনারে উঠে হোঁচট খেতে-খেতে দরজার দিকে যেতে থাকে। মিসেস কাশিকার ওকে হিঁচ্ড়ে টেনে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়)

মিসেস কাঃ।। কোথায় যাচ্ছিস? দরজা বন্ধ। ব'স এখানে।

কার্ণিক।। আমার বক্তব্য শেষ। (কাশিকারকে নাটকীয় ভঙ্গিতে অভিবাদন করে কার্ণিক কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জায়গায় চলে যায়।)

কাশিকার।। (হঠাৎ কিছু মনে পড়ার টেবিল চাপড়ায়) সন্দেহ নেই। কোনও সন্দেহ রইল না সুখাৎমে।

সুখাৎমে।। কি ব্যাপার মি লর্ড?

কাশিকার।। সেই কথাটাই বলব। কোর্টের নিয়ম-কানুন সরিয়ে রেখে আমি এই মামলায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী দিতে ইচ্ছুক।

সুখাৎমে।। মি লর্ড।

কাশিকার।। এই মামলাটির একটি বিরাট সামাজিক গুরুত্ব আছে সুখাৎমে। আমি মোটেই ইয়ার্কি করছিনা। Court-এর সবরকম বিধান নাকচ করে আমাকে সাক্ষী দিতেই হবে। সুখাৎমে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিন—ask me— ask.

সুখাৎমে।। মি লর্ড! এই মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে কোর্টের বিধান স্থগিত রেখে বিচারপতি নিজেকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে অনুমতি দিন!

কাশিকার।। Permission granted. (কাঠগড়ায় দাঁড়ায়), Cross me— come on (বলবার জন্য ছটফট্ করতে থাকে। দৃষ্টি— বেনারের প্রতি।) সন্দেহ নেই, আর কোন সন্দেহ নেই।

সুখাৎমে।। (উকিলি ভঙ্গিতে) মিঃ কাশিকার, আপনার পেশা?

কাশিকার।। Social worker তথা সমাজসেবক।

সুখাৎমে।। আসামিকে আপনি চেনেন?

কাশিকার।। চিনি? খুব ভাল করে চিনি। আমি বলে দিতে পারি, যে-সমস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য কীট সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—ইনি তাদের মধ্যে একজন, আইবুড়ো ধাড়ি মেয়েমানুষ।

সুখাৎমে।। (উকিলের বিশেষ ভঙ্গিমায়) জিজ্ঞাসা না করা অবধি কোনও মতামত দেবেন না, মিঃ কাশিকার।

কাশিকার।। মত মতই। আমার মতামত জানাতে আমি কারোর পরোয়া করি না।

পোংশে।। Bravo!

সুখাৎমে।। নাই বা করলেন। আচ্ছা মিঃ কাশিকার, যে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে এই কোর্টে আসামির বিচার হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আপনি কোর্টের সামনে হাজির করতে পারেন কি?

কাশিকার।। আরে সেই জন্যেই তো এখানে এসে দাঁড়ালাম।

সুখাৎমে।। তা হলে বলুন।

কাশিকার।। (বেনারের দিকে তাকিয়ে) বোম্বের নাম করা নেতা নানাসাহেব সিন্ধের ওখানে আমার যাতায়াত আছে। কারণ, সমাজসেবাটা আমাদের যোগসূত্র, উপরন্তু উনি আমাদের শিক্ষা পরিষদের সভাপতি —এসব ছাড়াও তাঁর সাহায্যে অন্যধরনের—আমারটা অন্য রকম, কিন্তু সেকথা এখানে হচ্ছে না। কিছুদিন আগে এমনি একবার ওঁর কাছে রাত নটা নাগাদ কিছু কাজ নিয়ে যখন অপেক্ষা করছিলাম, পাশের ঘর থেকে কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল। (বেনারে কেঁপে ওঠে) একটা কণ্ঠস্বর আমাদের নানা সাহেবের—অপরটিও আমার পরিচিত মনে হ’ল!—

মিসেস কাঃ।। কার গলা ছিল গো?

কাশিকার।। সুখাৎমে, সতর্ক করে দিন—সাক্ষীর কথার মাঝে বাধা দেওয়া উচিত নয়।—চেনা-চেনা কণ্ঠস্বরটি কার ছিল বোঝবার আগেই পাশের ঘরে কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল একটু পরেই। নানাসাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে জানালেন, আমাদের শিক্ষাপরিষদের হাইস্কুলের একজন মাস্টারনি এসেছিলেন। বার-বারই তিনি আসেন। উনি চাইছেন ওঁর সম্বন্ধে যে enquiry চলছে সেটা drop করে দেওয়া হ’ক। মহিলাটি বয়সে তরুণী, একেবারে মুখের

ওপর না বলাটা ঠিক হবে না। তাই আমার অবসর সময়ে আবার আসতে বললাম। আমি কিন্তু উৎসুক হয়েছিলাম। মহিলাটি কে? নানাসাহেব যদিও তখন কিছু বলেননি। এখন আমি জানতে পেরেছি সেই মহিলাটি আর কেউ না—বেনারে বাঈ sure- ওঁরই কণ্ঠস্বর কোনও সন্দেহ নেই।

মিসেস কাঃ।। আগ্‌গো বাঈ।

কাশিকার।। সুখাৎমে—এবার জিজ্ঞাসা করুন আমি কি করে এত নিঃসন্দেহ হলাম। আজ নানাসাহেবের জন্মদিন। সকালবেলায় ফুলের মালাটালা নিয়ে বাড়িতে গেছি। নানাসাহেব রেগেমেগে টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন—বিবাহের পূর্বে গর্ভধারণ নীতিবহির্ভূত। এই অবস্থায় এইরকম একটা মেয়েছেলেকে পড়াতে দেওয়া আরও নীতিহীনতার পরিচায়ক হবে। চাকরি থেকে বরখাস্ত ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। এই রকমই উনি বলছিলেন। শেষে, অর্ডার সই করার জন্য আজই পাঠান— এই রকম হুকুম দিলেন। (বেনারে স্তম্ভিত) বলুন! কার চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে? আমি বলছি—বেনারে।

সামন্ত।। হায়! হায়! ওঁর চাকরি চলে যাবে?

সুখাৎমে।। No উপায় মিঃ সামন্ত। Tit for tat যেমন কর্ম তেমন ফল। এটাই জীবনের নিয়ম। (রোকড়ে নোট বই খুলে লিখে নেয়)—কিন্তু কাশিকার, সেই মহিলাটি যে ইনি—নিঃসন্দেহে বেনারে বাঈ—এটা আপনার কি করে ধারণা হল?

কাশিকার।। এই সোজা জিনিষটা বুঝতে পারলেন না। আমি কি একটা বাচ্চা ছেলে? চল্লিশ বছর ধরে আমি সমাজটাকে দেখে আসছি। আছেন কোথায়? ''দ'' বললেই দইভাত বুঝতে পারি। আমার ধারণাটা যে সত্যি সে সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। উনি বেনারে বাঈ-ই ছিলেন। আপনি দেখবেন, কালই উনি সেই order-টা পাচ্ছেন কিনা—বরখাস্তের ওই order। আমি চেয়েছিলাম এখানকার record-এ এইসব লিপিবদ্ধ হয়ে থাক। (সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নিজের আসনে ফিরে আসে) Prosecution continue! (বেনারের হাতে একটা ছোট্ট শিশি। সেটা মুখের কাছে তুলেছে— কার্ণিক দ্রুত এগিয়ে এসে শিশিটায় হাত দিয়ে আঘাত করে, সেটা ছিটকে এসে পোংশের পায়ের কাছে পড়ে।)

পোংশে।। (তুলে একবার দেখে নিজের টেবিলের উপর রাখে) Tik 20. (সামন্ত স্তম্ভিত। কাশিকার শিশিটা তুলে নেয়। দেখে রেখে দেয়।)

কাশিকার।। Prosecution continue.

সুখাৎমে।। এই শিশির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাতেই আপাতত আমাদের সাক্ষীর পর্ব শেষ। মি লর্ড! The case for the prosecution rests. (অতিশয় ক্লান্তভাব করে চেয়ারে বসে।)

কাশিকার।। (বিচারকের গাম্ভীর্যে)— Atorney for the accused! (সুখাৎমে আসামির উকিলের জন্য নির্দিষ্ট পাশের টুলে বসে মাথা নত করে।) আপনার তরফে যদি কেউ সাক্ষী থাকে তাদের ডাকুন!

সুখাৎমে।। (অতীব ক্লান্ত ভঙ্গীতে উঠে উকিলি অভিবাদন করে) Yes My Lord! আমাদের প্রথম সাক্ষী হলেন প্রফেসর দামলে।

রোকড়ে।। (পিয়নের মত চিৎকার) সাক্ষী দামলে হাজির! সাক্ষী প্রফেসর দামলে হাজির! (কাশিকারকে)। প্রফেসর দামলে অনুপস্থিত।

কাশিকার।। Next witness please.

সুখাৎমে।। Our next witness is নানাসাহেব সিন্ধে।

কাশিকার।। (দাঁত খুঁটতে খুঁটতে) অনুপস্থিত। তিনি কোত্থেকে আসবেন। Next?

সুখাৎমে।। শিক্ষাপরিষদের সদস্য মিঃ রাউতে—

কাশিকার।। তিনিও অনুপস্থিত। আসামি পক্ষে সাক্ষী শেষ হ'ল?

সুখাৎমে।। বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের আমরা জেরা করতে চাই, মি লর্ড।

কাশিকার।। অনুরোধ নামঞ্জুর। Take your seat.

সুখাৎমে।। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে)— Case for the accused rests. (ধপ করে আসামির উকিলের চেয়ারে বসে পড়ে।)

কাশিকার।। (দাঁত খুঁটতে খুঁটতে)— Good. Now, attorney for the prosecution—argue! বেশি সময় নষ্ট করবেন না। সুখাৎমে জায়গা বদলে প্রথম চেয়ারে বসে। তারপর পালোয়ানের মত এগিয়ে আসে।)— সংক্ষেপে বললেই ভাল হবে।

সুখাৎমে।। (এখন পুরোদস্তুর সরকারি উকিল)—আসামি মিস লীলা বেনারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপনা করা হয়েছে তার স্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর। মি লর্ড, দণ্ডায়মানা ঐ মহিলাটি স্বর্গের চেয়ে পবিত্র যে মাতৃত্ব তা মসীলিপ্ত করেছেন এবং সেই জন্যই ওঁকে আইনসঙ্গত যত কঠিন দণ্ড দেওয়া হ'ক না, তা তুলনায় অতি লঘু হবে। আসামির চরিত্র ভয়ংকর! সব নীতিবোধ দেউলে হয়ে গেছে। শুধু তাই-ই নয়—এমন কাজ আসামি করেছে—যাতে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। আসামি প্রথম শ্রেণীর সমাজ-শত্রু। এই রকম সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি যদি প্রশ্রয় পেতে থাকে তাহলে আমাদের মহান সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সর্বনাশ হতে বেশি দেরি নেই। তাই আসামির অপরাধের বিচার অতি ভাবাবেগের বশবর্তী না হয়ে কঠোর কর্তব্যবোধে সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়—এটাই আমার বিনীত নিবেদন। আসামির বিরুদ্ধে ভ্রূণহত্যার অভিযোগ এসেছে। কিন্তু এর চেয়ে আরও গুরুতর অপরাধ আসামি করেছে—সেটা হ'ল প্রাক্-বিবাহ মাতৃত্ব। বিবাহের পূর্বে মাতৃত্ব আমাদের সুমহান ধর্মে আবহমান কাল থেকে ঘোরতর পাপরূপে নিন্দিত হয়ে আসছে। তার উপর মাতৃত্ব থেকে জাত সন্তানকে পালন করার ইচ্ছা আসামি পোষণ করে। এবং এই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবে সমাজের গোটা অস্তিত্বই ধ্বংস হয়ে যায়। নৈতিক মূল্য বলে কিছু থাকবে না—এরকম এক মহা বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে মি লর্ড। ভ্রূণহত্যা সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর কাজ, কিন্তু অবৈধ সম্পর্ক থেকে জাত যে সন্তান, তাকে পালন, এটা নিশ্চয়ই আরও ভয়ঙ্কর কাজ। এটা প্রশ্রয় পেলে সমাজে বিবাহ-সংক্রান্ত কোনও জিনিসই বেঁচে থাকবে না। অনাচার পরিপূর্ণরূপে চালু হয়ে যাবে। এক সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ—আমাদের সেই সুন্দর স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। আমাদের আত্মিক অস্তিত্ব, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং—আমাদের ধর্ম ও ভক্তিবোধ—আসামি চূর্ণ করে দিতে বদ্ধপরিকর। তার এই জঘন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া আমাদের প্রত্যেক সুধী ও ধীমান নাগরিকের অতি পবিত্র ও অবশ্য কর্তব্য। আসামি নারী বলে কোনও অনুকম্পা যেন না দেখান হয়। কারণ সমাজ ধারণ-পোষণের দায়িত্ব নারীর উপরেই বেশি পরিমাণে ন্যস্ত। আবহমান কাল থেকে চলে আসছে মহান বিধান। আমার সুতীব্র দাবী হল মিস বেনারের কঠিনতম

শাস্তি। সামাজিক কোনও-দয়া দাক্ষিণ্য না দেখিয়ে ওর অতি-ভয়ানক অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কোর্টের কঠিনতম দণ্ডের জন্য আমার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ মহামান্য বিচারকের কাছে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কাশিকার।। Good! Attorney for the accused—আসামির উকিল!

—আসামির উকিল!

(সুখাৎমে দ্বিতীয় ভূমিকার জায়গায় বসে নিচু হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে অতি কৃত্রিম গাম্ভীর্যে)

সুখাৎমে।। মি লর্ড, অপরাধ যে অতি গুরুতর সে বিষয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু মানুষেরই স্খলন হয়—এবং তারুণ্যে মানুষ মোহবশে কাজ করে, এ কথাটি স্মরণ রেখে আসামির অতীত এবং বর্তমানের ভয়ঙ্কর সব অপরাধের বিচারে ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। দয়া—মি লর্ড— দয়া, মানবতার প্রতি দয়া—

(চট্ করে বিচারকের টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে। বেনারে মৃতবৎ)।

কাশিকার।। Good. Now আসামি বেনারে। (বেনারে মৃতবৎ) আসামি বেনারে দণ্ড ঘোষণার পূর্বে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাও? (ঘড়ি সামনে ধরে)—আসামিকে দশ সেকেন্ড সময় দেওয়া হচ্ছে।

(বেনারে তখনও মৃতবৎ। কোথায় যেন আবহসঙ্গীত শুরু হয়। আলো বদলাতে থাকে। কোর্ট যে অবস্থায় ছিল ফ্রিজ হয়ে যায়।)

বেনারে।। (আড়ষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়ায়) হ্যাঁ। অনেক কিছু—বলবার আছে। (গা মোড়ামুড়ি দিয়ে) অনেক বছর হ'ল কিছু বলিনি। মুহূর্তের পর মুহূর্ত এসেছিল—এসে চলে গেল। মাথার মধ্যে কত না ঝড় উঠেছিল, বুকের মধ্যে নিদারুণ হাহাকার। কিন্তু প্রতিটি বার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে রেখেছি। ভেবেছিলাম কেউ কিছু বুঝবে না—কেউ সে সব জানবে না। অনুচ্চারিত শব্দের বড়-বড় ঢেউ এসে যখন তটপ্রান্তে আছড়ে পড়তো, চারপাশের মানুষগুলোকে কেমন যেন নির্বোধ, অপরিণতবুদ্ধি—অবোধ মনে হত সবাইকে। এমন কি যাকে আমার একান্ত আপনার মনে হয়েছিল—তাকেও। তখন আবার মনে হত সবার প্রতি শুধু হাসাই যায়—আর কিছু না; মনে করলাম তবে হাসাই যাক। আর কাঁদতে-কাঁদতে বুক ভাসিয়ে দিতাম। মনে হত বুকটা যদি ফেটে যায় ভাল হয়। জীবন যে বড়ই দুর্বিষহ। (একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেলে) প্রাণ যায়নি—তার ভার বোঝা দায়। নিজেকেও নিজের—এক-একটা মুহূর্তে নতুন করে দেখা দেয়। কত অপূর্ব মনে হয়। কত নতুন মনে হয়। আকাশে পাখি—মেঘের ঘনঘটা জীর্ণ গাছের শুকনো ডালের গোপন কটাক্ষ, জানলায় ঝুলন্ত পর্দা, চারিদিকে শান্ত ভাব—দূর থেকে ছোট ছোট অর্থহীন শব্দের বিফলতা—হসপিটালের ওষুধের ঝাঁঝালো গন্ধ—সেটাও কেমন যেন সুন্দর, পরিপূর্ণ। এখনও মনে হয় জীবন যেন আমার একার জন্য চারিদিক থেকে গান গেয়ে উঠেছে। ব্যর্থ আত্মহননের আনন্দ কত তীব্র—বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে তীব্র! (দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে) জীবন যখন প্রচুর ভাবে উপ্‌ছে পড়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়, তখনই তা অস্তিত্বের সৌভাগ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনকে বাজি

রেখে যখন জীবনের যত্ন নেওয়া যায় তখনই তার উজাড় করা প্রাচুর্য বোঝা যায়! কি মজা তাই না! সব যত্নে রাখলেই তবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যায়! নিঃশেষ করে দিলেই তখনই পড়ে-থাকা সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সুখ তো যথেষ্ট নয়। বার-বার সেই একরকণ সুখ। সেই একই রকম তার চেহারা (শিক্ষিকার ভঙ্গিমায়)—জীবন এই রকম, জীবন সেই রকম, জীবন ওই রকম, পড়্ পড়্ ক'রে ছিঁড়ে যায়, এমনি একটা জীর্ণ বই। জীবন নিজেকেই দংশন করে, এমনি ভীষণ বিষাক্ত সর্প। জীবন বিশ্বাসঘাতক। জীবন প্রতারক। জীবন নেশা, জীবন—নিরন্তর অর্থহীন প্রতীক্ষা। জীবন মানে কিছুই নয়। এমন কিছু কিম্বা একটা যা এমন কিছু নয়। (হঠাৎ) (কোর্টের উপযুক্ত পোজ নিয়ে)—জীবন এক মহা ভয়ানক জিনিস, মি লর্ড। মৃত্যুদণ্ড শাস্তি পাওয়া উচিত জীবনের—ন জীবনং জীবনং অর্হতি। জীবনের তদন্ত করে ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত। কিন্তু কেন? কেন? আমি কি আমার কাজের অবহেলার অপরাধ করেছি? প্রাণের সাধ মিটিয়ে আমি আমার ছাত্রীদের মাঝে খুব বেড়িয়েছি, ওদের শিখিয়েছি। আমি বুঝেছিলাম জীবন সহজ নয়, সরল নয়। মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হতে পারে। যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক—তিনিও আপনাকে বুকে টেনে নিতে অনিচ্ছুক। এই জীবনে শুধু একটি মাত্র জিনিস সর্বগ্রাহ্য—দেহ। আপনি স্বীকার না করলেও সেটা সর্বসম্মত। আর, সবাই তো মেনে নিয়েছে মনের ওপর কখনও কঠিন হওয়া যায় না। আমি সব দেখেছিলাম আমি এই ভাবেই বেঁচেছিলাম। আমি দগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু কেউ জানে না। আমি এই ভয়ঙ্কর শিক্ষা দিইনি। সব কিছু আমিই পান করেছিলাম কিন্তু তার এতটুকু স্পর্শ ওদের পেতে দিইনি। আমি ওদের সুন্দর হতে শিখিয়েছিলাম। অন্তরে কাঁদতে কাঁদতে আমি ওদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ছিলাম। নিরাশায় সমস্ত মন যখন ভরে উঠত—ওদের আমি আশাবাদী করে তুলতাম। কোন্ অপরাধে আমার চাকরি আমার একমাত্র আনন্দ—কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? আমার ব্যক্তিগত চরিত্র আমার নিজের ব্যাপার। যেভাবে প্রত্যেকের পারা উচিত নিজেরটা ঠিক করা, সেইভাবে নিজেকে নিয়ে কি করব সেটা আমিই স্থির করব। তাতে কেউ কোনও প্রশ্ন করতে পারে না—বুঝেছেন? প্রত্যেকের সত্তা আলাদা, পথ ভিন্ন এবং চিন্তা আলাদা। কিসের সম্পর্ক? (হঠাৎ লঘু কণ্ঠে যেন স্কুলে)—শ্ শ্ শ্—কোন কথা নয়—Silence! অত চিৎকার কিসের? (কাঠগড়া থেকে নেমে বাইরে এসে পায়চারি করতে থাকে—যেন ক্লাস রুমে) বসে থাকুন সবাই। একচুল নড়বেন না। (প্রত্যেককে স্তব্ধ দেখে) বেচারা! বাচ্চারা, এরা সবাই কে? (এক-এক করে প্রত্যেকের মুখ আলোকিত হতে থাকে। সবাই স্তব্ধ, ভুতুড়ে—প্রেতবৎ) বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের ধ্বংসাবশেষ। দেখুন তো এটা একটা মুখ, কি রকম বর্বর মনে হচ্ছে। ফ্যাকাশে সুন্দর সব কথা ওদের ওষ্ঠপ্রান্তে। বুকে অতৃপ্ত বাসনা। (স্কুলের ঘণ্টা বাজে। ছেলেমেয়েদের অস্পষ্ট কোলাহল শুনতে মুহূর্তকালের জন্যে নিস্তব্ধ, একাগ্রচিত্ত হয়ে যায়। —নীরবতা। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকিয়ে এই কঠিন নীরবতায় ভীত, ত্রস্ত হয়ে ওঠে)—না-না, আমাকে একা ফেলে যাস্ না, রে। এদের আমি বড্ড ভয় করি।

(ভয়ে ভীতা হয়ে হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে—আবেগের সঙ্গে)— স্বীকার করছি আমি পাপ করেছি। মায়ের ভাইকে আমি ভালবেসেছি। ঘরের শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে সেই তো আমার প্রস্ফুটিত দেহবল্লরীর কাছে এসেছিল। আবার শরীরের প্রশংসা করত, আমাকে আদর করত। আমি কি জানতাম হৃদয়ের সব ফুল ফুটিয়ে যার সঙ্গে এক হতে ইচ্ছা হয়, যার উপস্থিতিমাত্র জীবনকে

সার্থক করে তোলে, সে যদি মায়ের ভাই হয়, তাহলে সেটা পাপ। ওরে, তখন আমার মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স রে। পাপ কি তাও জানতাম না মায়ের দিব্যি (ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।) আমি যে বিয়ের জন্যে এত আকুল হয়েছিলাম—কারণ সবার মত আমিও একটা সুন্দর জীবন সহজভাবে চেয়েছিলাম। সবাই বাধা দিল। মা পর্যন্ত। মনের মানুষটি কুকুরের মত লেজ তুলে পালিয়ে গেল। আমার এমন রাগ হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল তাকে আমি রাস্তার মাঝে চাব্‌কে লাল করে মুখে থুথু ফেলি! কিন্তু তখন তো আমি অজ্ঞ অসহায় কিশোরী মাত্র। তাই বাড়ির বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লাম মরণকে আলিঙ্গন করার জন্য। হায়রে! মরতে পারলাম না। দেহে মরিনি কিন্তু ভেবেছিলাম আমার পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে মৃত্যুও হ'ল না। আবার আমি ভালবাসলাম। পরিণত বয়সে। প্রাণ খুলে ভালবেসেছি। মনে করেছি এ ভালবাসার স্বাদ ভিন্ন— এ ভালবাসা স্বয়ং সম্পূর্ণ। এক অলৌকিক প্রতিভার প্রতি তীর্থযাত্রা! এ প্রেম নয়—ভক্তি। কিন্তু এখানেও সেই মারাত্মক ভুল। মন দিয়ে ভক্তি করেছি। দেহ দিয়ে তার নৈবেদ্য হ'ল। আর সেই দান নিয়ে আমার বুদ্ধিমান দেবতা আবার পালিয়ে গেল। আমার মন, আমার ভক্তিতে ওর প্রয়োজন ছিল না। কোনও প্রয়োজনই ছিল না। (লঘুকণ্ঠে) সে দেবতা ছিলই না। সে মানুষই ছিল। তার সব কিছু ছিল দেহের জন্য— দেহের— সীমানায়— ব্যস! আমার দেহ। (চিৎকার করে— এই দেহই সব গণ্ডগোল করেছে। (যন্ত্রণায় শরীর কুঁকড়ে ওঠে।)— এই দেহটাকে আমি ঘৃণা করি এবং ভীষণ ভালবাসি। এর প্রতি রাগ করি— কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনে করি—ও আছে, ও থাকবে— ও তোমারই থাকবে। তুমি ছাড়া ও কোথায় যাবে? ওকে অস্বীকার করে তুমিই বা কোথায় যেতে পার? ওর প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'স না। ওই-ই জ্বলতে জ্বলতে তোমাকে দিয়েছিল অতি সুন্দর অপার্থিব এক তৃপ্ত মুহূর্ত! ভুলে গেলি? ওই-ই তোমাকে ঊর্ধ্বে এক দেহাতীত দিব্যলোকে নিয়ে গিয়েছিল। অস্বীকার করবি? ওর মধ্যেই—লুকিয়ে রয়েছে সেই মুহূর্তটির সাক্ষী—একটি কোমল করুণ অঙ্কুর! তোমারই আগামী দিনের হাস্যমুখরিত নৃত্যরত জীবন— আমার ছেলের প্রাণের। হ্যাঁ, ওর জন্যই এই দেহটা এখন আমি চাই—ওর জন্য। (চোখ-বুজে আবেগে বিড়বিড় করতে থাকে) ওর মা চাই— নিজের অধিকারে বাবা চাই—ঘর চাই— নিরাপত্তা চাই— প্রতিষ্ঠা চাই—

(অন্ধকার। তারপর আলো। সেকেন্ডের কাঁটার টিক্-টিক্ শব্দ। বেনারে কাঠগড়ার মৃতবৎ। বাকী সবাই নিজের জায়গায়।)

কাশিকার।। (সামনে ধরা ঘড়ি শব্দ করে হাতে নামিয়ে নিয়ে।)— Time is up. আসামির কিছু বলবার নেই। বললেও কিছুমাত্র এসে যেত না। পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। Now judgement! রোকড়ে, আমার wig দে (রোকড়ে তাড়াতাড়ি ওটা দেয়, কাশিকার wig পরে। ধর্মবিধির বিধান দেয়।) মিস বেনারে, এদিকে মন দিয়ে শোন। যেসব কাজ তুমি করেছ, সেসব অতি ভয়ঙ্কর। সে কাজের ক্ষমা নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা রোধ করতেই হবে। সমাজের ন্যায়নীতি যাই হ'ক না, অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহপ্রথা সমাজধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। মাতৃত্ব চিরকাল মহীয়ান, মঙ্গলময় ও পবিত্র রাখতে হবে। সেটা ধ্বংস করার যে চর্চা তুই করেছিস, এই কোর্টের দৃষ্টিতে তা অতি ভীষণ। কোর্টের এটাই সুনিশ্চিত অভিমত যে এসব কাজ সহ্যের বাইরে। তার উপর এসব কাজের পরও সমাজের বুকে তুই যে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ তা সর্ব-প্রকারে ক্ষমার অযোগ্য।

অপরাধী আর পাপী নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেই গণ্ডিকে না মেনে তুই জীবনের পথে চলেছিস। তোর এই ঔদ্ধত্যের জন্য কোর্ট তার নিজের ক্রোধ প্রকাশ করছে। উপরন্তু ভাবী সমাজের ভবিষ্যৎ তোর হাতে ছিল। এটা তো আরও ভয়ঙ্কর অপরাধ। কোর্টের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে তোর ব্যবহারে যা-সব প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভাবীকালকেও তুই প্রভাবিত করেছিস। অর্থাৎ শুধু আজকের সমাজই নয়।—পরবর্তী সমাজের অস্তিত্বও তোর কুৎসিৎ কাজের জন্য বিপন্ন হচ্ছিল—একথা অনায়াসে বলা চলে, তোর চাকরি থেকে তোকে বরখাস্ত করে স্কুলের পরিচালকমণ্ডুলী এক পুণ্য কাজই করেছেন। ঈশ্বরের কৃপায় সব অন্ধকার দূর হয়েছে। তথাপি তোর বা অন্য কারোর দ্বারা এই অপরাধ যাতে পুনরায় সাধিত না হয় এবং তোর পাপের প্রমাণ যাতে ভাবীকালের জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে, সেইজন্য এই কোর্ট শাস্তি দিচ্ছে যে তোকে জীবিত রেখে গর্ভনাশ করা হবে।

বেনারে।। (অতি করুণভাবে)— না, না, না, আমি আপনাকে এটা করতে দেব না। এই সর্বনাশ ঘটতে দেবনা—আমি ঘটতে দেবনা— না, না, না।

(সবাই গম্ভীর, নিশ্চল প্রতিমার মত। বেনারে কাঁদতে কাঁদতে আসামির উকিলের নির্দিষ্ট টুলের কাছে আসে; ক্লান্ত হয়ে টুলে বসে পড়ে। নিস্তেজ হয়ে টেবিলে মাথা রাখে। যেন ক্লান্তির প্রতিমূর্তি। নিস্তব্ধতা। হলঘর প্রায় অন্ধকারে ডুবে যায়। প্রবেশদ্বারের শব্দ হয়। সবাই চমকে সেদিকে তাকায়। পাল্লা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়। একটা আলোর রশ্মি এসে পড়ে। দু’তিনটে মূর্তি প্রবেশ করে।)

একটি মূর্তি।। (ভেতরে দেখে নিয়ে)— ফাংশন কি শুরু হয়ে গেছে—সেই অভিরূপ বিচারালয়?

(কি যেন স্মরণ হওয়ায় সবাই একসঙ্গে চম্‌কে উঠে। নতুন করে বোধোদয় হয়। সামন্ত সুইচ টেপে। ঘরে আলো। সবাই খুব দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে)।

সামন্ত।। (এগিয়ে আসে) আঃ! এখনও না, এখনও না। এক্‌খুনি শুরু হয়ে যাবে। আপনারা একটু দাঁড়ান। চলুন, এই পাঁচ মিনিট, চলুন! (ওদের কোনও রকমে বাইরে নিয়ে যায়।)

কার্ণিক।। আরে—অনেক সময় নষ্ট হল।

মিসেস কাঃ। তাই তো, সময়ের খেয়াল ছিল না!

পোংশে।। What's the time? অন্ধকার হয়ে গেছে?

কাশিকার।। ফাংশনের সময় দেখবার কথা তোর না রোকড়ে? এতক্ষণ কি করছিলি? উজ্‌বুক কোথাকার!

সুখাৎমে।। ছেড়ে দিন কাশিকার, বেশ জমেছিল কিন্তু। একেবারে সত্যিকারের কেস-লড়াইয়ের মত লাগল।

কাশিকার।। চলুন, সবাই তাড়াতাড়ি তৈরি হই গিয়ে। চল, চল!

পোংশে।। I am always ready.

(বেনারেকে ইঙ্গিত করে। সবাই থম্‌কে যায়। স্তব্ধ, গম্ভীর। ওরা মৃতবৎ বেনারের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।)

মিসেস কাঃ।। (নিজের বেণী হাত দিয়ে ঠিক করতে-করতে) নিজের ওপর বড্ড টেনে নিয়েছে গো। বড় অভিমানী মেয়ে।

কাশিকার।। সেই কথাই তো বলছি। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে.... After all it was—

সুখাৎমে।। Just a game. তাছাড়া আবার কি। ব্যস্!

পোংশে।। A sheer game!

কার্ণিক।। বেনারে চলুন। উঠে পড়ুন। Show-র সময় হয়ে গেছে। Show must go on.

মিসেস কাঃ।। (বেনারেকে নাড়া দিয়ে)— ওঠ গো বেনারে, ওঠ! ফাংশন ঠিক সময় মতো শুরু করতে হবে। চল গো। আরে ওসব মিথ্যে ছিল। ওটা তো সত্যি ছিল না।

(সামন্ত প্রবেশ করে)

পোংশে।। সামন্ত, চায়ের arrangement করুন! বাঈয়ের চায়ের দরকার আছে।

কাশিকার।। (উঠতে উঠতে wig রাখে।— টেবিলের ওপর Tik-20 এর শিশিটা দেখতে পায়! মুহূর্তকাল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে সবাইকে তাড়া দেয়।) চলুন, চলুন হাত মুখ ধুয়ে নি সবাই, চলুন। যথেষ্ট খেলাধুলো হয়েছে। Now—to business চলুন!

(একসঙ্গে সবাই ভিতরে চলে যায়। মঞ্চে বেনারে মৃতবৎ। দরজার কাছ থেকে সামন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সম্ভ্রমভরা কুণ্ঠিতভাব। তারপর পাশ দিয়ে গিয়ে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে রাখা সবুজ টিয়া পাখিটা আস্তে তুলে নেয়। আবার সেইভাবে দরজার দিকে যেতে থাকে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ দ্রুত বেনারের কিছু দূরে এসে থমকে দাঁড়ায়। বেনারেকে দেখতে দেখতে ওর মন আকুল হয়ে ওঠে। কি করবে বুঝতে পারে না। অস্ফুটভাবে ডাক দেয়— 'বাঈ'!— বেনারে শুনতে পায় না। সামন্ত আরও কুণ্ঠা বোধ করে। আর কিছু ভাবতে না পেরে— কাপড়ে তৈরি সবুজ টিয়া পাখিটা, দূর থেকেই সম্ভ্রমভরে ও সস্নেহে—ধীরে-ধীরে বেনারের কাছে রাখে। তারপর ধীরে-ধীরে বাইরে চলে যায়। বেনারে দুর্বলভাবে একটু নড়ে ওঠে। তারপর আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বেনারের কণ্ঠে গান ভেসে ওঠে)

"টিয়া শুধায়, চড়ুই তোর চোখে কেন জল,
বল না আমায় বল।
কি আর আমি বলব তোরে,
মোর বাসা কেউ নিয়েছে কেড়ে,
তাইতো কাঁদি কিচিরমিচির চোখে আমার জল।
কাক দাদা গো কাক দাদা, একবার ফিরে চাও—
আমার বাসা দেখেছ কি বনেতে কোথাও?
না গো চড়ুই, তোমার বাসা কোথাও দেখি নাই—
তোমার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক তো নাই।—
তাই তো কাঁদি কিচিরমিচির চোখে আমার জল।"

(শুধু বেনেরের ওপর আলো। বাকী মঞ্চ অন্ধকার, ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)

।।সমাপ্ত।।

১০৭.৯ তৃতীয় অঙ্কের সারাংশ

তৃতীয় অঙ্কের সূচনা হয়েছে বেনারেকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে হেনস্থা করার তোড়জোড়ে। সুখাৎমে এবং মিঃ কাশিকার দুজনে যথাক্রমে নকল সরকারি উকিল এবং নকল জজ সাজার খেলায় মেতেছে। আর সাক্ষী সেজে অন্যরা বিধ্বস্ত করতে চেয়েছে বেনারেকে। একে-একে সাক্ষীরা এসেছে মিসেস কাশিকার, রোকড়ে, পোংশে, কার্ণিক, স্বয়ং কাশিকারও। রোকড়ের মতো ব্যক্তিত্বহীন মানুষ, যে অন্যের আশ্রয়ে ও অন্নে লালিত-পালিত হয়েছে সেও সুযোগ বুঝে বেনারের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় মিথ্যে কথা বলেছে— বেনারের বিবাহ, প্রস্তাব, এবং বেনারেকে চড় মারা— এমন সাংঘাতিক মিথ্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে রোকড়ের অতৃপ্ত বাসনা ও বিকৃত রুচি। পোংশে আরও একট উৎসাহিত হয়ে বেনারের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব এবং তার চারিত্রিক স্খলনের বৃত্তান্ত কোর্টে পেশ করেছে। পোংশে প্রথম থেকেই অতি নাটকীয় ভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করেছে বেনারের সঙ্গে নির্জন হোটেলের কেবিনে তার আলাপ-আলোচনা, বেনারের ব্যাকুলভাবে বিবাহ-প্রস্তাব দেওয়া, বেনারের অবৈধ মাতৃত্বের জন্য দায়ী প্রফেসর দামলের কথা—ইত্যাদি বিষয় পোংশেই প্রথম কোর্টকে জানিয়েছে। বেনারের বিবাহপ্রস্তাব-প্রত্যাখ্যানের দাবীও সে সদম্ভে সকলের মধ্যে জাহির করেছে এবং 'মাননীয় আদালতের' কাছে এই জঘন্যতম অপরাধের জন্য বেনারের কঠিনতম শাস্তিরও দাবী তুলেছে। এই নকল আলাদত বেনারেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না-দিয়েই তার গর্ভনাশের আদেশ জারি করেছে।

শেষ পর্যন্ত বেনারে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছে। এতক্ষণের মানসিক নিপীড়নে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত বেনারে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে তার সুদীর্ঘ জবানবন্দিতে জীবনের যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করেছে। বেনারের অপরাধ, সে জীবনকে ভালবেসেছিল, প্রিয়জনের উষ্ণ আশ্রয় চেয়েছিল। কিশোরী বেনারে তার মায়ের ভাইয়ের প্রলোভনে পড়ে তাকে ভালবেসে সমাজের চোখে হেয় হয়েছে। তারও অনেক পরে এক শিক্ষিত ধীমান পুরুষকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তার সহজ হৃদয়াবেগের প্রতিদানে বারে-বারেই তাকে অপমানিত হতে হয়েছে। জীবনের মধ্যপর্বে তার কঠিন অনুভব—প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা নয়, সত্যিই কেবল এই দেহ, সকলে তার দেহটিকেই উপভোগের সামগ্রী বানিয়েছে। তবু বেনারে জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি, স্কুলের ছোট-ছোট ছাত্রীদের সে শিখিয়েছে জীবনকে আর মানুষকে ভালবাসতে। কিন্তু সমাজ তাকে ক্ষমা করেনি, তার জীবনের একমাত্র আনন্দ যেটা সেই শিক্ষয়িত্রীর চাকরিও সে হারাতে বসেছে। তার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন বেদনাগুলি সব রকম আব্রু খুইয়ে নির্লজ্জ নগ্নতায় প্রকট হয়েছে। এই লাঞ্ছনা, অপমান বেনারে সহ্য করতে পারছে না, এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। নাটকের শেষে সকল পাত্র-পাত্রীদের নির্লজ্জতা ও জান্তব নিষ্ঠুরতা হাল্‌কা চালে উড়িয়ে দিলেও, মানুষের বর্বরতায় বেনারেকে দেখা যায় স্তব্ধ, হতবাক। নাটকটি শেষ হয়েছে একটি গানের মধ্যে দিয়ে—যেখানে বেনারের করুণ, আকুল প্রার্থনা— নিরাপত্তার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, উষ্ণ আশ্রয়ের জন্য।

১০৭.১০ নাটকের গঠন-বৈশিষ্ট্য

বিজয় তেণ্ডুলকরের এই নাটকটি বিষয় এবং আঙ্গিক, দুয়ের বিচারেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। পুরুষ-শাসিত সমাজে একটি উচ্চশিক্ষিত এবং আত্মনির্ভরশীল মেয়েও যে কতখানি নিরুপায়—একদিকে তার মর্মনিবিড় রূপায়ণ করেছেন নাট্যকার; আবার, অন্যদিকে এর কাহিনীকে এমনভাবেই বিন্যস্ত করেছেন তিনি, যে নায়িকা বেনারে বাঈয়ের জীবনকে সেখানে তিনটি পৃথক নাট্যস্তরে খুঁজে পাই। বিলিতি নাট্য-সমালোচনায় অনেক সময়ে 'ড্রামা

উইদিন এ ড্রামা' বলে একটি উল্লেখ মেলে : এ-নাটকে বস্তুতপক্ষে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ড্রামা উইদিন এ ড্রামা, উইদিন হুইচ দেয়ার ইজ অ্যানাদার ড্রামা।' এদিকে থেকে বিচার করলে এই নাটকটির আঙ্গিক-বিন্যাস একান্তই জটিল একটি বুননে তৈরি করা হয়েছে।

'চোপ্, আদালত চলছে' নাটকের সেই জটিল-বুনন যদি রেখচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে এই রকমের (রেখচিত্র ❑ এক) :

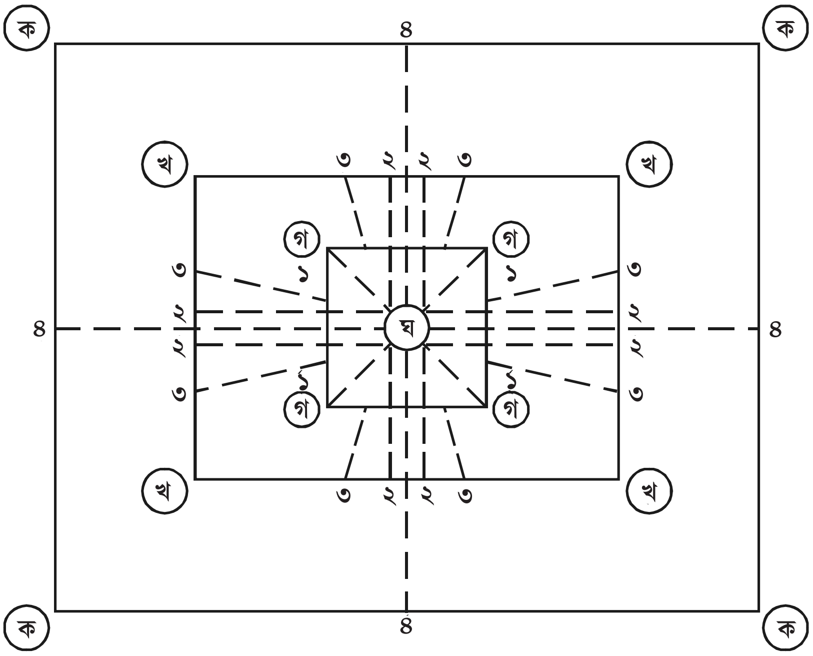

ক-ক-ক-ক. মূল যে নাটক প্রাথমিক ভাবে প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে;

খ-খ-খ-খ. মূল নাটকের অংশ হিসেবে যেটি নিয়ে কুশীলবেরা একটি তাৎক্ষণিকভাবে কল্পিত নাটকের মহলা দেবার খেলায় মেতেছে;

গ-গ-গ-গ. ঐ মহলার খেলা যেখানে বেনারে বাঈয়ের নিজের জীবনের বৃত্তান্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে;

ঘ. বেনারের গোপন-থাকা নিষ্করুণ বাস্তব জীবন, যা নাটক নয়; কিন্তু নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে

(১) - - - - (১) = গ → ঘ → গ

(২) - - - - (২) = খ → ঘ → খ

(৩) - - - - (৩) = গ → খ → গ

(৪) - - - - (৪) = ক → ঘ → ক

মূল নাট্যকাহিনী শুরুর কিছু পরেই 'খেলা' নাটকের মহলা শুরু হচ্ছে। সেই মহলা এবং মূল নাটক প্রথম দিকে খানিকটা একাকার হয়ে আছে। ধীরে-ধীরে খেলা নাটকের মহলা গাঢ়বদ্ধ হয়েছে। আব্ছাভাবে বেনারের জীবনবৃত্তান্তের আভাস এসে পড়ছে। ক্রমে তার জীবনের গোপন বেদনাগুলো মহলা থেকে মূল নাটকে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। শেষ পরিণামে বেনারের জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডিটাই দর্শকের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেল।

লীলা বেনারের বাইরের বহু-ব্যস্ত সামাজিক জীবনের আড়ালে যে-একান্ত নিঃসঙ্গ এবং ট্রাজিক অন্তর্জীবন লুকিয়ে আছে, সেটি উদ্‌ঘাটিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মূল নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটল বটে, কিন্তু দর্শকের কাছে সেই সমাপ্তি রেখে গেল এক অপরিতৃপ্ত অপূর্ণতার বোধও। বেনারের স্বগত-সংলাপ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ-নাটকের 'ক-খ-গ-ঘ' — সমস্ত পরতগুলি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল যেমন, ঠিক তেমনই আবার সেখানেই সূচিত হল নাটকের শীর্ষবিন্দু বা ক্লাইম্যাক্সও।

এর ফলে একটি দীর্ঘ নাটকের ধ্রুবপদী কাঠামো যেভাবে বিন্যস্ত হয় বলে সাধারণত আমরা ভেবে থাকি, এখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে নাটকের ক্লাইম্যাক্স যেখানে, তার অচিরকাল পরেই ক্যাটাস্ট্রোফি (বা, গতিক্ষান্তি) এসে উপস্থিত হল। সুতরাং, এই নাটকের গতিপথ নিঃসন্দেহে একপেশে হয়ে গেছে যে, একথা বলাই বাহুল্য। ব্যাপারটা হয়েছে ঠিক এই রকমের (রেখচিত্র ❑ দুই) :

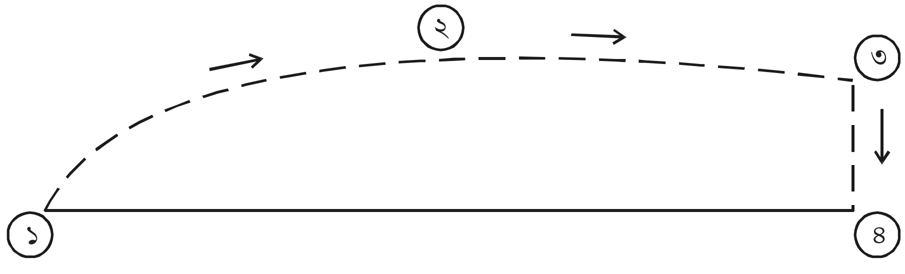

(১) → (২) → (৩) → (৪)

(১) নাটকের ভিতরের নাটক যেটি, তার মহলা শুরু ;

(২) মহলার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লীলা বেনারের গোপন কথাগুলির উন্মোচন হওয়া ;

(৩) লীলা বেনারের স্বগতোক্তির রূপে জবানবন্দী শুরু হওয়া;

(৪) নাটকের যবনিকা নেমে-আসা।

'রেখচিত্র ❑ এক' এবং 'রেখচিত্র ❑ দুই' একত্রে বিশ্লেষণ করে দেখলে, 'চোপ্, আদালত চলছে' নাটকের সামগ্রিক গঠনাঙ্গিকটিকে অনুধাবন করা সম্ভব। তবে একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই জটিল গঠনশৈলীকে এ-নাটকের পাঠকের পক্ষে উপলব্ধি করার যে-স্বচ্ছন্দ সুযোগ আছে (প্রয়োজনে তিনি বারবার নাটকের বইটির পাতা উল্‌টে-উল্‌টে বিচারের সুবিধে পাবেন যেহেতু), এ-নাটকের দর্শকের পক্ষে সেই সুবিধে কিন্তু কঠিনপ্রাপ্য। এর ফলে সাধারণভাবে এর আঙ্গিকগত জটিলতা, এই নাটকের অধিকাংশ দর্শকের পক্ষেই আয়ত্তগম্য হবে না।

১০৭.১১ নাটকের সংলাপ বিচার

নাটকের কাহিনীর গতিবিন্যাস ও চরিত্র বিকাশের জন্য অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল সংলাপ। সংলাপ শুধুমাত্র নাট্য চরিত্রের কথা নয়, সংলাপ নাট্যকারের অভিপ্রেত রসসৃষ্টি ও ভাব-উপলব্ধি প্রচারেরও প্রধান বাহন। এইজন্যই নাটকে সংলাপ এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে গণ্য। সংলাপ সার্থক হয়ে ওঠে তখনই যখন তা পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হয়। চরিত্রসত্তার সঙ্গে সংলাপের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির এক অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। সংলাপ চরিত্রের সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি। শুধুমাত্র ভাষার আড়ম্বর থাকলে বা স্থানকাল পাত্রের সঙ্গে তা সঙ্গতিবিহীন হলে চরিত্র সজীব হয়ে উঠতে পারে না। যেমন — 'নীলদর্পণ' নাটকে নবীনমাধব বিন্দুমাধব চরিত্র। এরই পাশাপাশি তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী তাদের অশুদ্ধ, গ্রাম্য, অমার্জিত ভাষার মধ্যে দিয়েই বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সামাজিক নাটকের সমস্ত চরিত্রগুলিই বাস্তব ও চেনা-পরিচিতি জগৎ থেকে নেওয়া হয় বলে, সংলাপের ভাষার মধ্যেও সচরাচর একটা সহজ স্বাভাবিকতা থাকে। অবশ্য চরিত্রের কোনও বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি উচ্চারণরীতির প্রয়োগও প্রায়শই করা হয়। 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের মুখের ইংরেজি উদ্ধৃতিগুলো বাদ দিলে চরিত্রটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। নাটকে ভাষাবৈচিত্র্য থাকলে তার সরসতা দর্শক/পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদিও 'চোপ, আদালত চলছে'—নাটকে সেই অর্থে ভাষাবৈচিত্র্য নেই, কিন্তু এক-একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে তাদের কথনভঙ্গিও ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিন্যস্ত, যেমন, সামন্তের সঙ্গে বেনারের সংলাপে সংকোচ ও দ্বিধা একদিকে, অন্যদিকে স্মার্টনেস—দুটি চরিত্রের নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলছে—

''বেনারে ❑.... ভাবলাম ওদের সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাই। আর আপনার সঙ্গে অনেকদূর কোথাও হেঁটে চলে যাই।

সামন্ত ❑ (ঘাব্‌ড়ে গিয়ে)—আমার সঙ্গে?

বেনারে— Yes, আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

সামন্ত— (লজ্জায় লাল হয়ে সসংকোচে)—কি যে বলেন! আমি তো—'' (প্রথম অঙ্ক)

এই সংলাপের মধ্যে বেনারের সাহসী ও খোলামেলা স্বভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি সামন্ত চরিত্রের বিহ্বলতাও ফুটে উঠেছে। আবার মিসেস কাশিকারের আশ্রিত রোকড়ের মধ্যে একটু মেয়েলি ভাবের লক্ষণ দেখা যায়। বেনারের কৌতুক পরিহাসে রোকড়ে বিরক্ত—

''রোকড়ে— ইঃ! কি হাসিরে বাবা! বেনারে বাঈ আর কত জোরে হাসবেন?'' (ঐ)

বেনারে পেশায় শিক্ষয়িত্রী। তার কথায় আচরণে মাঝে-মাঝে সেই শিক্ষক সুলভ একটা ভাবের প্রকাশ হয়ে পড়ে—
বেনারে—(মহা উৎসাহে) আচ্ছা একটা গল্প বলি।

(যেন ক্লাস রুমে) সবাই বসে পড়ো। একটা নেকড়ে ছিল, —'' (ঐ)

নাটকের শেষে তার দীর্ঘ জবানীতেও জীবনের যন্ত্রণা ও অতৃপ্তি প্রকাশিত হয়েছে অনেকটা ক্লাসরুমে লেকচারের ভঙ্গিতেই—

''বেনারে— অত চিৎকার কিসের?....বসে থাকুন সবাই। একচুল নড়বেন না। বেচারা! বাচ্চারা, এরা সবাই কে? বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের ধ্বংসাবশেষ। দেখুন তো একটা সুখ, কি রকম বর্বর মনে হচ্ছে।''
(তৃতীয় অঙ্ক)

সংলাপের ভাষা কেবল চরিত্র ও পরিবেশের অনুযায়ী হলেই চলে না, এই ভাষার মধ্যে দিয়ে আবেগ, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়। এই ভাষা শুধু ভাব প্রকাশকই নয়, গতিসঞ্চারীও। ছোট-ছোট বাক্যের মধ্যে দিয়েই বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতা আনা সম্ভব। যেমন— বেনারের বিরুদ্ধে নকল মামলা দায়ের করে তাকে ভ্রূণ হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা— ''কাশিকার—Now back to ভ্রূণহত্যা। আসামি মিস বেনারে, যে অভিযোগে আপনি অভিযুক্ত, আপনি কি তা কবুল করেন, না করেন না?

বেনারে— আপনার উপর যদি এই অভিযোগ আনা যায় আপনি কি কবুল করবেন? (সবচেয়ে বেশি হাসে সামন্ত)''
(দ্বিতীয় অঙ্ক)

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বেনারের হেনস্থা চরম হয়ে উঠেছে, 'জজ' কাশিকারও জজের চেয়ার ছেড়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন; নাটকের উৎকণ্ঠা এই পর্যায়ে চরম—সুখাৎমে ও কাশিকারের পারস্পরিক সংলাপে কৌতূহল ঘনীভূত হয়ে ওঠে—

''সুখাৎমে— আসামিকে আপনি চেনেন?

কাশিকার— চিনি? খুব ভাল করে চিনি। আমি বলে দিতে পারি, যে-সমস্ত নীতিজ্ঞান শূন্য কীট সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে ইনি তাদের মধ্যে একজন, আইবুড়ো ধাড়ি মেয়ে মানুষ।''

ছোট-ছোট সংলাপ নাটকীয় গতিবেগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হলেও দীর্ঘ সংলাপ ও বিশেষ-বিশেষ স্থানে সার্থক হয়ে ওঠে। কোনও গভীর জীবন দর্শন, জীবনের কোনও বেদনা ও ব্যর্থতার কথা দীর্ঘ সংলাপ না হলে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না। 'Julius Ceasar' নাটকে অ্যান্টনির বক্তৃতা দীর্ঘ না হলে শ্রোতারা আবেগমথিত হয়ে উঠত কি-না সন্দেহ। 'Macbeth' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ম্যাকবেথের দীর্ঘ উক্তির মধ্যে দিয়ে তার দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই নাটকে তৃতীয় অঙ্কের শেষ পর্যায়ে সরকারি উকিল হিসাবে সুখাৎমের দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে বেনারে তথা স্বাধীনচেতা নারীর প্রতি বিদ্বেষ, ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু বেনারের সুদীর্ঘ জবানবন্দিতে তার অতীতজীবন, তার হৃদয়াবেগ, বর্তমানের যন্ত্রণাময় অবস্থান, সমাজের অবমাননা এড়িয়ে গর্ভস্থ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ইচ্ছে ও অক্ষমতা—এ সবই প্রকাশ পেয়েছে ওই দীর্ঘ সংলাপে। লাঞ্ছিত, অপমানিত বেনারের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি এ পর্যায়ে চরম হয়ে ওঠে। বেনারের আকুল আবেদন সকলের প্রাণে সাড়া জাগায়—

''বেনারে.... হ্যাঁ ওর জন্যই এই দেহটা এখন আমি চাই—ওর জন্য, (চোখ বুজে আবেগে বিড়বিড় করতে থাকে) ওর মা চাই— নিজের অধিকারে বাবা চাই—সব চাই—নিরাপত্তা চাই— প্রতিষ্ঠা চাই—'' (তৃতীয় অঙ্ক)

নাটকের গতি ও আবেগ সৃষ্টির জন্য সংলাপই প্রধান, চরিত্রের পরিচয়ও বহন করে সংলাপ। কিন্তু নাট্যকার কখনওই চরিত্রগুলোর মুখে নিজের কথা বলবেন না। শেকসপীয়ার সার্থক নাট্যকার কারণ তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই তিনি মিশে আছেন। 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বাহক গোবিন্দমাণিক্য এবং মালিনী হলেও, রঘুপতি ও ক্ষেমংকরের মুখের সংলাপের তিনি কার্পণ্য রাখেননি। রঘুপতি ক্ষেমংকরের তেজস্বিতা, দৃঢ়চিত্ততা সার্থক হয়ে উঠেছে। এই জন্যই শিল্পরূপে নাটক দুটিতে তিনি সার্থক। বিজয় তেণ্ডুলকরের এ-নাটকেও সেই শিল্প-সাফল্য লক্ষণীয়। সমাজের এক বিশেষ অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি দিলেও এ নাটক কখনও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়নি।

১০৭.১২ কেন্দ্রীয় চরিত্র : লীলা বেনারে

মানুষের প্রতিদিনের জীবন অবলম্বন করেই নাটকের চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করা হয়। মানুষ মূলত চিরকালই এক। কিন্তু যুগে-যুগে তার সামাজিক রূপ ও অবস্থা আচরণ ও আদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তন হয়। প্রাচীন আমলে সংস্কৃত এবং গ্রিক নাটকগুলি প্রধানত বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। মহাকাব্যের চরিত্রগুলি বিশদ এবং গভীরভাবেই আমরা জানি; কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের দুর্বার ক্রিয়াকলাপ ও দুর্দমনীয় হৃদয়বৃত্তির পরিচয় আমরা পাই এলিজাবেথীয় নাটকে। রাজতন্ত্রের পর গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের রূপ বদলে গেল; সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ নাটকে স্থান লাভ করল। বর্তমানকালের নাটকের চরিত্র আর নিছক হৃদয়াবেগ-সঞ্জাত ভাব সংঘাতের মধ্যে পরিস্ফুট নয়, তত্ত্ব ও সমস্যার আঘাতে তার রূপ অত্যন্ত জটিল ও মননধর্মী।

এই নাটকে আমাদের সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ উদঘাটনই নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগ ও জীবনের সমস্যা ও অসঙ্গতিকে তিনি অননুকরণীয় ভঙ্গিতে নাটকে তুলে ধরেছেন। 'চোপ্, আদালত চলছে'—নাটকের উপজীব্য ব্যক্তি-সত্তা বনাম সমাজ--সত্তার দ্বন্দ্ব; এবং ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ নিষ্পেষিত হওয়ার মধ্যে দিয়েই নাট্যকার আমাদের মতো দেশের সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও সচেতন করেছেন। নাটকের এই মূল বক্তব্যটি যাকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয়েছে, সে হল—লীলা বেনারে, এর

নায়িকা। নাট্যকার নিজেই বলেছেন—''কেন্দ্রীয় চরিত্র বেনারেকে পেলাম একটি কবিতার মধ্যে। শ্রীমতী শিরিষ পৈ-এর এই সরস কবিতাটি কুমারী বেনারের মুখে প্রথম অঙ্কে আমি রেখেছি।'' বিজয় তেণ্ডুলকর গত শতকের ছয়ের ও সাতের দশকে লেখা তাঁর নাটকগুলিকে সমাজের ভণ্ড ও কৌশলী নাগরিক খোলসের অন্তরালে হৃদয়হীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে সুতীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। প্রচলিত সমাজরীতির বিরুদ্ধতা, নারীর মর্যাদা বিশেষ প্রশ্নমনস্কতা এবং যৌনজীবন সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর নাটকে বার-বার ঘুরে-ফিরে এসেছে। তাঁর কবিতাতেও যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে। নারীচরিত্রের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম নাটক 'শ্রীমন্ত' (১৯৫৫)-এ নায়িকা এক কুমারী মা আপসহীন প্রতিবাদে সোচ্চার। এ নাটকেও নায়িকা এক কুমারী মা তার শিশুর জন্য, সামাজিক স্বীকৃতির জন্য ব্যাকুল ও শেষ পরিণামে সোচ্চার হয়েছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর নিজস্বতাকে আঁকড়ে রাখা কতটা কঠিন, বেনারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমাজ তাকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে দিতে চায় না, কিন্তু বেনারে আদৌ দমিত না হয়ে প্রশ্ন তুলেছে—''কোন্ অপরাধে আমার চাকরি, আমার একমাত্র আনন্দ—কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? আমার ব্যক্তিগত চরিত্র আমার নিজের ব্যাপার।.... নিজেকে নিয়ে কি করব সেটা আমি স্থির করব।'' একজন প্রাপ্তবয়স্কা স্বাবলম্বী নারী যদি জীবনে কোনও পুরুষকে বরণ করতে চায়, যদি তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে চায়, তবে সমাজের আপত্তি কিসের? এমন ক্ষেত্রে পুরুষের বেলায় যদি তার সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি পায়, তবে একাকিনী নারীর বেলায় তাতে আপত্তি হবে কেন? অর্থাৎ সমাজের কঠোর অনুশাসন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ। আমাদের সামাজিক এই কঠিন অনুশাসনটি নাট্যকার তী্‌, তীব্র ভঙ্গিতে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। আসলে আমাদের রক্তে-মিশে-যাওয়া সংস্কার অতিক্রম করতে হলে যে চূড়ান্ত সহনশক্তি ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, একজন নারীর পক্ষে তা আরও মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর। কারণ—''মেয়েছেলে যখন আসামির কাঠগড়ায় তখন মামলাটা অন্য ধরনের রগড় হয়।'' সামাজিক এই নির্মমতাকেই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন।

এই নাটকে কৌতুকের ছলেই বেনারেকে ভ্রূণ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে উপলক্ষ্য করেই বার-বার আদর্শ মাতৃত্ব, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন এবং আধুনিক নারীর স্বাধীনচিত্ততার সমালোচনা হয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার পুরুষ সহকর্মীরা নানা কুৎসিত মন্তব্য করেছেন। যদিও তারা প্রায় প্রত্যেকেই বেনারের সঙ্গকামনা করেছে নিভৃতে। বেনারেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার বিচারের অছিলায় কিভাবে তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে তা নিপুণ কুশলতায় উপস্থাপিত হয়েছে এই নাটকে।

বেনারে স্বাধীন, স্বাবলম্বী, অবিবাহিতা। তবু এই পুরুষশাসিত সমাজ তাকে তার নিজস্ব জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে নারাজ। যাকে ভালবেসে, যার সন্তানধারণ করে সে সমাজে ধিক্কৃত, সেই বুদ্ধিজীবী মানুষটি এই কঠিন সময়ে বেনারেকে ত্যাগ করেছে। সন্তানের কোনও দায়িত্ব বা অস্তিত্বকে সে স্বীকার করতে চায়নি। বেনারে মরিয়া হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য একের পর এক অন্য পুরুষকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। নিজের সন্তানের পিতৃপরিচয়ের জন্য এই বাধ্যবাধকতা এতো আত্মহননেরই সামিল। সমাজ পুরুষকেই অধিকার দিয়েছে সন্তানের পরিচয়ের, তার পালিকা হলেও নারী সেই অধিকারে বঞ্চিতা। তাই বেনারে 'পুরুষতন্ত্রের আদালতে' দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। যে-সমাজ বলে ''মাতৃত্ব অতি মঙ্গলময়'', সেই সমাজই কিন্তু সন্তানকে মাতৃপরিচয়ে স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়, এবং ভ্রূণহত্যার নির্দেশ জারি করে। সমাজে এই দ্বিচারিতা, এই ভণ্ডামির খোলস নাট্যকার টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন।

বেনারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ ও শেষ পর্যন্ত সামাজিক শক্তির কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলেছে—''স্বীকার করছি আমি পাপ করেছি।'' তার প্রথম জীবনে 'মায়ের ভাইকে' ভালবেসে যে-পাপবোধ তার মধ্যে প্রথিত হয়েছে, পরবর্তীকালে জীবনের সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করতেই সে পেতে চেয়েছে কোনও এক উদার উন্নত উষ্ণ আশ্রয়। কিন্তু বারংবারই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে লীলা বেনারে উপলব্ধি করেছে, মন নয় দেহটাই একমাত্র সত্য। সমাজের পুরুষদের কাছে মানুষ হিসেবে তার একমাত্র পরিচায়ক তার মেয়েলি শরীরটা। বিধ্বস্ত,

ক্লান্ত বেনারে এই অবক্ষয়ের মূল্যবোধের কাছে নতি স্বীকার করেও জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেনি। সে অপেক্ষা করে আছে অচিন্ কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের, যেখানে তার সন্তান আপন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। বেনারের অন্তহীন এক অপেক্ষাতেই নাটকের পরিসমাপ্তি—

''আমার বাসা দেখেছ কি বনেতে কোথাও?''

১০৭.১৩ বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্র এবং নাটকে তাদের গুরুত্ব

'চোপ্, আদালত চলছে' নাটকের পার্শ্বচরিত্র যারা, তাদের সবার এই নাটকে প্রয়োজনীয়তা হল মুখ্য চরিত্র মিস লীলা বেনারের জীবনের জটিল এবং বেদনাময় রূপটিকে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে সহায়তা করা। এঁরা সকলেই একটি নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য এবং সেই সূত্রেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাটকের চরিত্রলিপিতে যেমন আছে সেইভাবে (অর্থাৎ, মঞ্চে প্রবেশের ক্রমানুসারে) এদের সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা গেল :

সামন্ত ❑ পুরো নাম রঘুনাথ ভিকাজী সামন্ত। এ দলে একেবারেই বহিরাগত। এর আগে কখনও নাটকে অভিনয় করেনি। স্বভাবে সরল প্রকৃতির। অবিবাহিত, ভাইদের সংসারে থাকে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। যে হলঘরে নাটকের মহলা হবার ব্যাপারটা ঘটেছে, সেটা যে-বাড়ির একতলায়, সামন্তকে তার কোয়ারটেকার বলে মনে করা যেতে পারে। নাটকের দলের লোকেরাও তাকে দিয়ে ফাই-ফরমাস খাটাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে চাইলেই সে ঘুমিয়ে পড়তেও পারে! এই সামন্তর মুখ থেকেই প্রফেসার দামলের সঙ্গে লীলা বেনারের গোপন-থাকা সম্পর্কের বিষয়ে সর্বপ্রথম কিছু 'তথ্য' শুনতে পাওয়া যায়—যদিও তার নিজের জবানি-অনুসারেই সে তাঁকে কখনও দেখেনি—লীলা বেনারেও এর আগে দেখেনি। তবু ঐ 'বিচারসভার' মহলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হাতে ধরা একটা গল্পের বইয়ের এমন কিছু অংশ যে গড়গড় করে পড়ে যায়, যা বস্তুত বেনারে বাঈয়ের জীবনের গভীরতম ট্র্যাজেডির সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যায়—যদিও নকল-কাঠগড়া থেকে নেমেই সামন্ত জানায় যে, সে যা বলেছে তা সবই ঐ বইয়ের গল্প থেকে নেওয়া। কিন্তু সামন্তর দেওয়া এই 'নকল-সাক্ষ্য' থেকেই বেনারের জীবনের 'আসল রহস্য' যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হল চকিতের জন্য, তাতে বলা যেতে পারে যে, এই নাটকে বাস্তব এবং কল্পনা যেমন অবিচ্ছেদ্য হয়ে থেকে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—সামন্তর এই বইপড়া সাক্ষ্য থেকে তার সূত্রপাত। পার্শ্বচরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই কারণে এ নাটকে সে বেনারের পরেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চরিত্র বলে গণ্য হবে নিঃসন্দেহে।

বালু রোকড়ে ❑ এই ছেলেটি এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান মিঃ কাশিকার এবং তাঁর স্ত্রীর আশ্রিত। নিঃসন্তান এই দাম্পতি তাকে এমন ভাবেই বড় করে তুলেছেন যে, (তাকে) ''শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়লেন।'' প্রকৃতপক্ষে সে তাদের ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে অবৈতনিক পরিচারকেই পরিণত হয়েছে বলা যায়। রোকড়ে যে তাঁদের খুব পছন্দ করে তা নয়, তবে নিজের অসহায়তার কথাটাই বোঝে বলেই, নিরুপায় ভাবে তাঁদের দাপট মানতে বাধ্য হয়। 'নকল বিচারসভায়' সাক্ষী হিসেবে রোকড়েই প্রথম দামলে এবং বেনারের নির্জনে বসে কথাবার্তা বলার প্রসঙ্গোল্লেখ করে। এরপরে তৃতীয় অঙ্কে, প্রথমে লুকিয়ে রাখলেও, রোকড়ে দ্বিতীয়বার 'সাক্ষ্য' দিতে উঠে বলে ফেলে যে দিন আষ্টেক আগে লীলা বেনারে নিজের গর্ভবতী অবস্থার কথা জানিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য ঝুলোঝুলি করে—যদিও রোকড়ে তার থেকে বয়সে বেশ ছোট এবং তার ঐ অবস্থার জন্য সে কোনওভাবেই দায়ী নয়। রেহাই পাবার জন্য বালু রোকড়ে বেনারে বাঈয়ের গালে একটা চড়ও মারে। সামন্তর 'সাক্ষ্যের' পর রোকড়ের এই 'সাক্ষ্য' লীলা বেনারের জীবনের বিপন্ন ট্র্যাজেডিটার ছবি আরেকটু স্পষ্ট করে দেয়।

পোংশে ❑ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং একটু বেশি ইংরেজিনবিশ সাজতে চাওয়া পোংশে আসলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও পাশ করতে না পেরে অবশেষে এই জাগৃতি সঙ্ঘ নামে নাট্যগোষ্ঠীতে এসে জুটেছে। বাড়ির অবস্থা সচ্ছল এবং সেটা সে মাঝে-মাঝে প্রকাশও করে ফেলে। একটু কুটিল চরিত্রের মানুষ। লীলা বেনারেকে নকল বিচারসভায় 'আসামি' সাজিয়ে তাকে বিব্রত এবং বিপন্ন করে তোলার মূলে সে-ই আছে। "লৌকিক মতে অবিবাহিত"—ইত্যাদি বলে বেনারেকে বিদ্রূপ করা এবং সে যে তার কাছে বান্ধবীর নাম করে নিজেই 'সাহায্য' চাইতে গিয়েছিল— সে কথা ফাঁস করে দেওয়া ইত্যাদি হীনতা থেকেই তার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বেনারের ব্যাগে 'Tik-20' -র শিশি থাকার কথাও প্রকাশ করে দেয় সে-ই। এবং অবশেষে 'সাক্ষী' হয়ে সে স্পষ্ট ভাবেই বলে দেয় যে, দামলের দ্বারা গর্ভবতী এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়েছে বলেই বেনারে তার পায়ে-পড়ে অনুরোধ করেছিল লোকলজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য বিয়ে করতে। সামন্ত এবং রোকড়ে বেনারের নিভৃত দুঃখের জীবনকে যেভাবে অনাবৃত করেছিল (সামন্ত খানিকটা অজান্তেই, খানিকটা জেনে, আর রোকড়েও চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে বেনারের কথাবার্তাকে যতটা সম্ভব গোপন রাখতে) পোংশের ব্যাপারটা তার থেকে আলাদা। সে প্রথম থেকেই যেন লীলা বেনারে যে একটি নষ্টচরিত্র মেয়ে, সেটি সাব্যস্ত করার জন্যই সক্রিয় হয়েছে। বেনারের জীবনের ট্র্যাজিক দিকটি সে যেন তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করেছে। ফলত, অন্যদের তুলনায় বেশি ধূর্ত এবং হীনচেতা বলেই বোঝা যায়।

সুখাৎমে ❑ আইনজীবী সুখাৎমে বাস্তবে "বার লাইব্রেরিতে একা একা মাছি তাড়ান আর নিজের বাড়িতেও একা বসে মাছি মারেন" (বেনারে বাঈয়ের মন্তব্য!) এবং জাগৃতি নাট্যগোষ্ঠীর নকল বিচারসভা—অভিরূপ বিচারালয়েও তিনি উকিলের ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। লীলা বেনারে সম্বন্ধে একটু গোপন আকর্ষণ যে তাঁর আছে, সেটাও খুব দুরূহবোধ্য নয়। নকল বিচারসভা বসিয়ে সময় কাটানোর প্ল্যানটা অবশ্য তাঁর মাথাতেই আসে— তবে তার পিছনে পোংশের মতো কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি-না, সেটা বলা কঠিন। মজা করার জন্য রোকড়ে, কার্ণিক, পোংশে, মিসেস কাশিকার সকলেই আসামি হতে রাজি হয়েছেন— কিন্তু সুখাৎমেই লীলা বেনারেকে আসামি সাজাতে আগ্রহী হন "আনকোরা নতুন" আসামি পাবার আগ্রহে। বেনারে 'আসামি' হবার পর তার উপর যে "সদ্যোজাত শিশু হত্যা"-র অভিযোগ আরোপ করা হয়, অন্যরা তাতে মজা পেলেও সুখাৎমে অবশ্য বলেছে "After all this is just a game, সবাই মজা করছি, ব্যাস। এত serious হচ্ছেন কেন?"

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, উকিলজনোচিত ভঙ্গিতে এক একজন 'সাক্ষী'-কে জেরা করবার অনুষঙ্গে সুখাৎমেই বেনারের জীবনের ট্র্যাজিক গোপন কথাটি প্রকাশিত করে দেবার ব্যাপারে ধীরে-ধীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। সামন্ত, রোকড়ে, পোংশে প্রমুখ ঐ "just a game"-এর সাক্ষীদের জবানিতে ক্রমে-ক্রমে সেই রহস্য যখন মোটামুটি উন্মোচিত হয়ে গেছে, তখন সুখাৎমেও আচমকা ভোল পাল্টে বেনারেকে শুধিয়েছেন ৩৪ বছর বয়স পর্যন্ত সে কেন অবিবাহিত রয়েছে। বলাই বাহুল্য, যে এই প্রশ্নে বেনারের মানসিক লাঞ্ছনা বেড়েছে বৈ কমেনি।

পোংশের সাক্ষ্যে সুখাৎমে যখন জেনেছেন যে, উকিলি পেশায় তাঁর ব্যর্থতা নিয়ে বেনারে আড়ালে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে, তখন থেকেই সুখাৎমের এই ভাবান্তর বা রূপান্তর। এরপরে, 'সাক্ষী'-দের মতোই তিনিও বেনারেকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন এবং হয়ত খানিকটা প্রতিহিংসার বশেই ঐ 'নকল' আদালতের চূড়ান্ত সওয়ালে বেনারের "অতি-ভয়ানক অপরাধের (সদ্যোজাত শিশুহত্যার) শাস্তিস্বরূপ কোর্টের কাছে কঠিনতম দণ্ডের জন্য" প্রার্থনা করেছেন! 'আসামিপক্ষের' উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে বেনারের হয়ে সাদামাটা দু-চারটে কথা বলেই ছেড়ে দিয়েছেন সুখাৎমে। ফলত, শেষ বিচারে তাঁর ভূমিকাটাও হয়েছে ঐ সামন্ত-পোংশে-রোকড়ের মতোই বেনারের পক্ষে বিপর্যয়কারী।

কার্ণিক ❑ 'চোপ্, আদালত চলেছে' নাটকের এই চরিত্রটিই তুলনামূলক ভাবে অন্যদের তুলনায় কিছুটা অকিঞ্চিৎকর। তবে তার মুখে এমন কিছু কথা শুনিয়েছেন নাট্যকার, যার অনুষঙ্গে অলক্ষ্যে এই নাটকেরও অভিপ্রেত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। যেমন : "জীবনে অর্থহীনতাই নাটকের বিষয়বস্তু" কিংবা "গোটা জীবনটাই আজকের

দিনে গোলমেলে হয়ে গেছে।'' পশ্চিম absurd নাট্যকার Jonesco-বেনারে, যে এ-নাটকের মুখ্যচরিত্র, তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ''জীবনের অর্থহীনতা'' তো খুবই বাস্তব একটা অবস্থান। যথা- অর্থে, একে absurd (বা, কিমিতিবাদী) নাটক অবশ্যই বলা যায় না, তবু যে-ভঙ্গিতে 'খেলা' করতে-করতে, 'মজা' করতে-করতে একটা ভয়ঙ্কর এবং ট্র্যাজিক সত্যকে এই নাটকে উদ্‌ঘাটিত হতে দেখা যায়, তাতে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রিত রসায়নে একটু অসম্ভাব্যতার আভাসই এতে বেশি লেগেছে। আর এই সবকিছুই চকিতে কখনও কখনও এই কার্ণিকের জবানিতে আভাসে ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যপক্ষে, বেনারের অসহায় ট্র্যাজেডি নিয়ে তাকেও 'খেলা' করতে দেখা গেছে। রোকড়ের সঙ্গে বেনারের যে-সব কথাবার্তা হয়, সেগুলো সেও প্রতিবেদন করে। কিন্তু বেনারের এক আত্মীয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে সে তার সম্পর্কে আরও এমন কিছু জেনেছিল (পনেরো বছর বয়সে নিজের মামার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে অন্যায়ের পথে বেনারের পা-বাড়ানো এবং তার অনুসূত্রে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করা), যা ঐ নকল বিচারসভায় পেশ করে সে লীলা বেনারের অবস্থাটা আরও বিপন্নই করে তোলে। বেনারের শুধু বর্তমান নয়, অতীতও যে 'মসিমাখা' এটা সাব্যস্ত করার পক্ষে কার্ণিকের এই 'খবর' খুবই তাৎপর্যময় ভূমিকা নিয়েছিল যে, তাতে সন্দেহ নেই!

মিঃ ও মিসেস কাশিকার ❑ এ-নাটকের পক্ষে এই দুটি চরিত্র তুলনামূলকভাবে অন্যসব পার্শ্বচরিত্রের চেয়ে কিছুটা কম গুরত্বপূর্ণ। এর কারণ এই দম্পতি সরাসরিভাবে লীলা বেনারের জীবনের কোনও গোপন রহস্যগ্রন্থির উন্মোচন করেননি, যদিও তার রক্তাক্ত হৃদয়কে প্রকাশ্যে উন্মোচিত করার ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতাই করেছেন। কাশিকার এই নাট্যদল চালনোর খরচের (সম্ভবত) মুখ্য জোগানদাতা। নিঃসন্তান এবং পুরোপুরি প্রৌঢ়া না-হওয়া স্ত্রীর সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নন (বেনারের টিপ্পনি স্মরণযোগ্য) এবং হয়ত সেজন্য 'পোষ্য' যুবক রোকড়ে সম্পর্কে একটু বেশিই রূঢ়। বেনারের মানসিক লাঞ্ছনা যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখন তিনি 'নকল' আদালতের 'জজগিরি' ঝেড়ে ফেলে বেমালুম 'সাক্ষী' বনে গিয়ে বেনারের স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কি-কি কথা আড়ি পেতে তিনি শুনেছিলেন, সেগুলো উগ্‌রে দিয়েছেন। লোকটি প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতাসম্পন্ন, বাল্যবিবাহ পুনঃপ্রবর্তনের প্রবক্তা। বিনা প্রমাণেই তিনি বেনারের নামে সদ্যোজাত শিশুহত্যার অভিযোগ তুলেছেন, আবার 'জজ' হিসেবে তিনি রায় দিয়েছেন বেনারের 'ভ্রষ্টাচারের শাস্তি' স্বরূপ তাকে গর্ভনাশ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর 'অভিযোগ' এবং 'রায়' পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন! তাছাড়া, আইনরক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে, আইনের চোখে গুরুতর অপরাধ (এই নাটকের রচনাকাল ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ভ্রূণহত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল; এখনও নানা শর্তসাপেক্ষেই আইন তেমন ব্যাপারটা অনুমোদন করে) ঠিক সেটাই নির্দেশ দিয়েছেন। 'শ্লথ'-চরিত্রের কারণে বেনারের চাকরি যাবার সম্ভাবনায় তাঁর জান্তব পুলকও লক্ষণীয়! মিসেস কাশিকার স্বামীর তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নত স্বভাবের। বেনারের বিদ্যা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তাঁর তুলনায় কম বয়স, পুরুষদের চোখে সে আকর্ষণীয়া—এসব কারণে তিনি তার সম্পর্কে যথেষ্টই ঈর্ষা পোষণ করেন। নিজেকে তরুণী এবং সুন্দরী ভাবতে তাঁর ভাল লাগে (নিম্‌ফোম্যানিয়া-গ্রস্ত!) এবং স্বামীর পয়সা থাকায় অলস এবং বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত তিনি। একজন নারী হিসেবে আরেকজন নারীর এমন লাঞ্ছনা দেখে তিনি বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, সমবেদনা পর্যন্ত দেখাননি। বরং, বেনারে 'কোর্ট'-ঘর ছেড়ে চলে যেতে চাইলে তাকে হিঁচ্‌ড়ে 'কাঠগড়ায়' ফের টেনে নিয়ে গেছেন। পুরুষশাসিত সমাজের 'নৈতিক' অনুশাসনে যে মেয়েরাও মেয়েদের চরম শত্রুতা করে থাকে, এই মহিলা তার খুব বড় এক নিদর্শন।

১০৭.১৪ সামগ্রিক মূল্যায়ন ও ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয়

'চোপ্, আদালত চলছে' নাটকের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ এক সামাজিক পটভূমিকায় গড়ে ওঠা নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্বিচার করেছেন বিজয় তেণ্ডুলকার— এমন কথা বললেন ভুল হবে না। আসলে সমস্যাটা শুধু মূল্যবোধেরই নয়, নৈঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্নতাজনিত মানসিক অসহায়তারও। লীলা বেনারের সুদীর্ঘ সংলাপটি তারই সুস্পষ্ট সংকেত দেয়।

এই নৈঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্নতার বোধ (বা অ্যালিয়েনেশ্যন) কিছুটা পরিমাণে আধুনিক নগরজীবনের আত্মস্বতন্ত্রতার বোধেরই বিকারজাত। একথা ঠিকই, লীলা বেনারের যে-নৈঃসঙ্গ্য—তা, তার মনের অন্তরঙ্গ মাত্রায় স্থিত। বহিরঙ্গে সে মিশুকে, চপল—হয়ত বা চটুলও—এমনভাবেই সবার কাছে পরিচিত। এই দ্বি-মাত্রিক মানসিকতাও হয়ত, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল পরিণাম।

পশ্চিমি জগতে যেমনভাবে ক্ষয়িষু(ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা এবং দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের লব্ধফল হিসেবে মানুষের মনে এক ধরনের অনিশ্চিতি এবং হতাশার সঞ্জনন ঘটেছে, আমাদের দেশে ঠিক তেমন একটা অবক্ষয়ী সামাজিক পরিমণ্ডলের সেভাবে কিন্তু এখনও সৃষ্টি হয়নি। তবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্রম-বিস্তারের অনুসূত্রেই প্রতিষ্ঠিত, ঐতিহ্যবাহী, নৈতিক এবং অন্যবিধ মূল্যবোধগুলি উত্তরোত্তর অবসন্ন হয়ে পড়ছে আমাদের সমাজেও। লীলা বেনারের মতো মেয়ে তারই ফলশ্রুতি। সে যখন বলে, ‘‘জীবন.... পড়্‌পড়্‌ করে ছিঁড়ে যায়, এমনি একটা জীর্ণ বই। জীবন নিজেকেই দংশন করে, এমনি ভীষণ বিষাক্ত সর্প। জীবন বিশ্বাসঘাতক। জীবন প্রতারক। জীবন নেশা, জীবন— নিরন্তর অর্থহীন প্রতীক্ষা’’— তখন তাকে হয়ত ফ্রানৎস কাফ্‌কার সৃষ্ট নায়কদের মতো হতাশ, প্রতিবেশ-বিচ্ছিন্ন, অবক্ষয়িত একটি ব্যর্থ চরিত্র বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কাফ্‌কার নায়কদের সঙ্গে বেনারে বাঈয়ের একটা খুব বড় পার্থক্যও রয়েছেঃ কাফ্‌কার ‘দ্য ট্রায়াল’-এর নায়ক জোসেফ কে. কোন্‌ অপরাধের জন্য দায়ী—তা সে নিজেও জানেনা বা পাঠকও বুঝতে অক্ষম হয়; তবু সেই ‘অজানিত’ (!) অপহ্নবের ‘শাস্তি’ হিসেবে তাকে আচম্‌কা খুন হতে হয় অচেনা ঘাতকদের হাতে। ‘দ্য ক্যাস্‌ল’- এর নায়ক কে. কে. নিয়োগপত্র পাওয়া সত্ত্বেও, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারল না কেন সে কাজে যোগ দিতে বাধা পেল এবং কার বা কাদের কাছে কেন সে অবাঞ্চিত বলে মনে হল! আর ‘মেটামর্ফোসিস’-এর নায়ক গ্রেগর সাম্‌সার সমস্যা ছিল পরিবারের সঙ্গে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্নতা, যার কারণ একদিন সে দেখল যে তার রূপান্তরণ ঘটেছে একটি শুঁয়োপোকাতে এবং ঐ অবস্থাতেই তার একসময়ে মৃত্যুও ঘটল; বাড়ির লোকেরা তাতেও রইল অনুৎকণ্ঠিত, অচঞ্চল।....

লীলা বেনারের সঙ্গে এদের মৌলিক ফারাকটা হল এইটেই যে, বেনারে জানে সে কেন মানসিকভাবে এতটা বিচ্ছিন্ন অন্যদের থেকে; এক-একবার এক-একজনকে অবলম্বন করে সে বাঁচতে চেয়েছে, অথচ প্রতিবারেই তার জুটেছে প্রতারণা এবং নিজের সমস্ত কিছু নিঃশেষে উজাড় করে দেবার পরে, স্বার্থকুটিল প্রত্যাখ্যান। এমনকি, নাটকের মহলা দেবার সময়েও তার সেই আঁকড়ে ধরার আকুলতা বজায় থেকেছে পুরোদস্তুরভাবে। তার গর্ভাস্থ ‘অবৈধ’ (?) সন্তানকে অবলম্বন করে সে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা করেছে, আর সেই জন্যেই কখনও প্রফেসর দামলে (যিনি ঐ অনাগত সন্তানের জন্মসূচনার জন্য দায়ী), কখনও পোংশে, কখনও বা রোকড়েকে বিয়ে করতে চেয়ে ঐ সন্তানকে ‘পিতৃপরিচয়’ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। অর্থাৎ, আন্তরিক অনুভবে সে বিচ্ছিন্নতাবোধে গ্রস্ত হয়নি। বরঞ্চ, সে চেয়েছে সামাজিক এবং পারিবারিক আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত ঠিকানাই। অথচ, বারংবার প্রত্যাখ্যাত এবং প্রতারিত হয়েছে সে, আর তারই পরিণাম, তার বিচ্ছিন্নতাবোধে গ্রস্ত হতে বাধ্য হওয়া।

।।২।।

বেনারে বাঈ তার চূড়ান্ত সংলাপের মধ্যে এক জায়গায় বলেছে ‘‘জীবন এক অর্থহীন প্রতীক্ষা।’’ আপাত-বিচারে এই উক্তির অন্তর্নিহিত ভাবনার সঙ্গে স্যামুয়েল বেকেটের ‘ওয়েটিং ফর গোডো’ নাটকের ভাববস্তুর তুলনাযোগ্যতা আছে, এমন কথাও মনে হতেই পারে। কিন্তু ‘গোডো’-তে অন্তহীন প্রতীক্ষার কোনও পূর্বপরম্পরিত সূত্র কিংবা কারণ মেলে না। কিমিতিবাদী-নাটক (তথা, অ্যাবসার্ড ড্রামা) হওয়ার জন্য সেখানে সেই কার্যকারণ সম্পর্ক থাকার প্রয়োজন বা প্রত্যাশা কিছুই নেই। কিন্তু ‘চোপ্‌, আদালত চলছে’ তো সম্পূর্ণভাবেই একটি রূঢ়, সামাজিক/ব্যক্তিক-সমস্যামূলক নাটক (তার গঠনাঙ্গিকে যতই জটিল অভিনবত্ব থাকুক না কেন!)—তাই সেখানে মুখ্য চরিত্রের জবানিতে যদি জীবন সম্পর্কে ‘‘অর্থহীন প্রতীক্ষা’’ কথাটা শোনা যায়, তাহলেও সেখানে কিমিতিবাদী-

অসংলগ্নতা আছে, এমনটা ধরে-নেওয়া যাবে না কখনওই। জীবনের "অর্থহীনতা" বেনারে বাঈ যে অনুভব করেছে, তার পেছনে সুস্পষ্ট উপলক্ষ রয়েছে—যা কিছু আগেই উল্লেখ করেছি।

ফলত, এই নাটকে বেনারের চূড়ান্ত সংলাপটি একটা অত্যন্ত জটিল মানসিক অবস্থাকেই সূচিত করেছে। সে জটিলতার উদ্ভব হয়েছে সামাজিক পরিমণ্ডলে; পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানকে নিয়ে বাঁচবার সামাজিক-গ্লানি থেকে রেহাই পেতেই লীলা বেনারে কোনও-না-কোনও একজন পুরুষকে অবলম্বন করতে চেয়েছে—কিন্তু তার পরিণামে সে ধীরে-ধীরে প্রতিপন্ন হয়েছে দুশ্চরিত্রা একটি নারী হিসেবেই—যা বস্তুতই সে নয়। সেই অবলম্বন করার মতো মানুষকে ধরে পেতে ব্যর্থ হবার কারণেই এই নাটকে একের পর এক পরত খসে পড়তে-পড়তে চূড়ান্ত পরিণামে শেষ সমাধান বলে তার কাছে মনে হল 'Tik-20'-র (পোকামারার জন্য জোরালো একটি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য) শিশিটিই!

পনেরো বছর বয়সের অপরিণতবুদ্ধি স্কুলপড়ুয়া মেয়ে লীলা তার নিজের মামার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রথমবার পা ফেলেছিল অন্যায়ের ফাঁদে—তারপরে প্রতারিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল সেই বুদ্ধিবিহীন বয়ঃসন্ধিকালের আবেগের বশেই। আর এখনও, যখন সে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত—তার সেই ভিতরের অস্থির সত্তাটি প্রায় একই রকমের অসহায়—এখনও যে প্রলোভনে পড়ে এবং প্রতারিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়। কৈশোরের সেই নিরুপায় আত্মহননের প্রয়াসই রূপান্তরিত হয়েছে এই 'Tik-20'-র শিশি ব্যাগের মধ্যে রেখে দেবার প্রতীকে!

আসলে, বেনারে বাঈকে উপলক্ষ করে নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের মতো সামাজিক পরিবেশে একজন 'একলা' মেয়ের—তা সে যতই শিক্ষিতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা হোক না কেন—অসহায়তা বা বিপন্নতা কাটে না, কাটতে পারে না! এর সঙ্গে-সঙ্গেই সেই মেয়েরও মনের অন্দরমহলে যে কোনও-একটি পুরুষকে অবলম্বন করে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা অনির্বাণ থাকে, সেটাও দেখিয়েছেন তিনি। বস্তুতপক্ষে, পুরুষ-প্রধান একটি সামাজিক অবস্থানে যে-নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে বা গড়ে তোলা হয়, সম্পূর্ণভাবে পুরুষেরই স্বার্থ এবং মর্যাদা-সংরক্ষক। নারীকে ভ্রষ্টা, নষ্টা বলে চিহ্নিত করে দিতে তার প্রবক্তাদের একটুও দেরি হয় না—সেই মেয়ের নিজের সপক্ষে কিছু বলার আছে কি-না, তার 'অপরাধ' বস্তুতই পুরুষের অপরাধের বেশি অথবা কম— সে-সব বিবেচনার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না— পুরুষরা তো বটেই, এমনকি অন্য মেয়েরাও! মিসেস কাশিকারই একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

।।৩।।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন ঃ *Shantata* is an intricate mosaic of several seminal themes. First, juxtaposing the two worlds of games and reality, it shows their areas of similarity and difference, thus raising the significant question of art and reality. The play also reveals several important facets of human psychology, emphasing how the basic instincts and impulses in man in a state of savegery continue to motivate human beings in a civilised society. These instincts and impulses include the herd-instinct and the gregarious impulse to hunt and dominate and hurt. Significantly enough, Benare, the 'victim', herself, on occasion becomes the 'hunter', as the ridicules some of the others, in the earlier part of the play. And the plight of a single woman in a male-dominated society is another noticable theme." (M. K. Naik in 'Masterpieces of Indian Literature', Vol. 2; 1999).

এই নাটকের নায়িকা বেনারের জীবনের ট্র্যাজেডির সকরুণ রূপটিকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে, শ্রী নায়েকের এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক অনুশাসনে, নারীকে প্রলুব্ধ এবং পথভ্রষ্ট করে যে-পুরুষ, সে বিচারের উর্ধ্বে থাকে। কিন্তু তাদের কারণে যে-মেয়ে (কিশোরী বা প্রাপ্তবয়স্কা যা-ই হোক না-কেন) 'পদস্খলিতা' হতে বাধ্য হয়, সমাজ-আইন-নীতিবোধ—সব কিছুর কাছে 'অপরাধী' বলে ধার্য হয় সে-ই। লীলা বেনারেকে ভ্রষ্টা-মেয়ে বলে সাব্যস্ত করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে-জান্তব পরিতৃপ্তি দেখা যায় জাগৃতি নাট্যগোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে— সেটা ঐ পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত যৌনমূল্যবোধেরই প্রতিক্রিয়া। তাদের কেউই কিন্তু প্রফেসর দামলে বা বেনারের লম্পট মাতুল সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না ধিক্কার জানাতে। বরং বেনারেকেই তাঁরা ভ্রূণহত্যার নির্দেশ দেন।

।।৪।।

এই নাটকের শিল্পগুণ পর্যালোচনা করতে গেলে, প্রতীক ব্যবহারের প্রসঙ্গেও কিছু বলা দরকার। দুটি অসামান্য প্রতীক এখানে খুব তাৎপর্যময় করে ব্যবহার করেছেন নাটকার : বন্ধ দরজা এবং খেলনা টিয়াপাখি। এই নাটকের মুখপাত এবং পরিসমাপ্তি—দু-সময়েই এই দুটি, গভীর কিছু বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করেছে। বন্ধ দরজার ব্যাপারটি দ্বিতীয় অঙ্কের শেষেও খুবই গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বন্ধ দরজাটা খুলতে গিয়ে নাটকের প্রথমেই বেনারে আহত হয়েছে এবং জং-ধরা পুরোনো ছিটকিনি খুলতে গিয়ে কেটে যাওয়া আঙুলটি মুখে পুরে তাকে মঞ্চে ঢুকতে দেখা যায়! আক্ষরিক এবং প্রতীকী—দুই অর্থেই এ হল তার 'licking the wound!' দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে বেনারে যখন 'নকল' বিচারকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে তার প্রতি অন্যায়-অসম্মান দেখানোর প্রতিবাদে, তখন ছিটকিনি পড়ে দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে : পালাবার পথ নেই। ফাঁদে-পড়া শিকারের মতোই যেন তার তখনকার নিরুপায় অবস্থা! এ-দরজা তো ঐ সামাজিক-অনুশাসনের পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রুদ্ধ কপাটেরই প্রতীক। নাটকের শেষে যখন বিধ্বস্ত বেনারেকে তার অচির-পূর্বকালের উৎপীড়করা "just a game" বলে ছদ্ম-সান্ত্বনা দিচ্ছে, তখন হঠাৎ বন্ধ দুয়ার ঠেলে মঞ্চে ঢোকে কয়েকটি নামবিহীন মূর্তি—যারা শুধোয় "ফাংশন" আরম্ভ হয়ে গিয়েছে কি-না। এই সমাজের কাছে, বেনারে বাঈয়ের ঐ চূড়ান্ত মানসিক নির্যাতনটা হয় "just a game" আর নয়ত (cultural) "function"— এটাই ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার তির্যক্‌ভাবে। বন্ধ দরজার ঐ প্রতীকী অস্তিত্ব শ্রী নায়েক-উল্লেখিত "herd-instinct" কিংবা "gregarious impulse"-এর দ্যোতনাই বহন করছে নিঃসন্দেহে!

খেলনা টিয়াপাখিটাও বস্তুতপক্ষে বেনারেরই প্রতীক-স্বরূপ। পাখিটা যদি জ্যান্ত হত, তাহলে তার ঠাঁই হত খাঁচার মধ্যে—'বন্দিনী' বেনারেরই প্রতিরূপ হত সেটা। আর যখন টিয়াটা প্রকৃতই একটা খেলনা—তখনও সেটা বেনারেরই মতো—পুরুষশাসিত সমাজের কাছে বেনারে তো বস্তুত একটা খেলনা ছাড়া কিছু না! তার মামা থেকে শুরু করে প্রফেসার দামলে অবধি—যার যতক্ষণ ইচ্ছে তাকে নিয়ে 'খেলা' করেছে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আবার, তাকে নিয়ে মানসিক উৎপীড়নের 'খেলা' খেলেছে পোংশে, রোকড়ে, সুখাৎমে, কাশিকারেরা। 'খেলা' ফুরোলে আবার তাকে প্রবোধ দিয়েছে "just a game" বলে!

।।৫।।

এই সূত্রেই বেনারের মুখের টিয়া-চড়ুইয়ের গান এবং আরও একটি ইংরেজি গান ও একটি কবিতার কথাও একটুখানি বলতে হয়। সামন্ত—এ নাটকের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একমাত্র সে-ই আছে, যে এতসবের পরেও বেনারের সম্পর্কে কিছুটা সংবেদনশীল— তার ভাইপোর জন্যে কেনা ঐ খেলনা টিয়া পাখিটাকে বেনারের কাছে রেখে চলে যায় যখন, তার পরেই "বেনারের কণ্ঠে গান ভেসে" উঠেছে :

"টিয়া শুধোয় চড়ুই কেন তোর চোখে জল,
বল না আমায় বল।
কি আর আমি বলব তোরে,
মোর বাসা কেউ নিয়েছে কেড়ে,
তাই তো কাঁদি কিচিরমিচির চোখে আমার জল।..." —ঠিক সেই মুহূর্তে গানটাও প্রতীকধর্মী হয়ে গেছে : তখন বেনারেই যেন ঐ গানের 'বাসা-খোয়ানো' চড়ুই পাখি—আর খেলনা-টিয়াটাই যেন তাকে শুধোচ্ছে কেন তার চোখে জল (মানুষেরা তো আর সে-ই প্রশ্ন করার মতো মনুষ্যত্ব দেখালো না!)— খেলনা আর মানুষ, গানের লিরিক আর বাস্তবের নীড়হীনতা— সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল নাটকের যবনিকা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে।

এই টিয়া-চড়ুইয়ের গানটি প্রকৃতপক্ষে বেনারের মুখে শোনা আগের একটি ইংরেজি গান এবং একটি কবিতারই ভাবানুসৃতি। প্রথম অঙ্কের প্রায় গোড়ার দিকেই লীলা বেনারে যে-গান গেয়েছে, তার মধ্যেও একটা প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ কথা লুকিয়ে আছে: ".... I have got a sweetheart / ....He plays in my doll's house." যে-দুটি 'প্রেমিক'-এর কারণে লীলা বেনারে দশের চোখে 'কলঙ্কবতী'—তারা কেউই তার জীবনসঙ্গী হতে চায়নি, 'নিছক পুতুলখেলার সহচর' হয়েই থেকেছে! নাটকের শুরুতে গানটি যখন দর্শকেরা শোনেন, তখন এতসব কথা কেউ ভাবতেও পারেন না অবশ্য; কিন্তু নাটক যখন শেষ হয় চড়ুই পাখির "বাসা" খোয়ানোর নিবিড় বেদনার মধ্যে, তখন ঐ "doll's house" আর এই হারানো "নীড়" যে আলাদা কিছু নয়, সেটারই প্রতীতি ঘটে দর্শকের মনে!

এই দুটি গানের ভাবকে একত্র সংহত হতে দেখি বেনারে ঐ প্রথম অঙ্কের মাঝামাঝি সময়ে যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছে তার মধ্যে। নাটকের মধ্যে নাটক তখনও শুরু হয়নি; তাই তখনও এই কবিতা যে আসলে লীলা বেনারেরই আত্ম-উন্মোচন, তা বোঝা যায়নি। কিন্তু এই কবিতাই (মারাঠি কবি শ্রীমতী শিরীষ পৈ-এর লেখা) যে বেনারে চরিত্র সৃষ্টির অনুপ্রেরণা তা বিজয় তেণ্ডুলকর নিজেই বলেছেন এ-নাটকের পূর্বভাষে : 'কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমারী বেনারেকে পেলাম একটি কবিতার মধ্যে।" নাটক সমাপ্ত হবার পরে, নাট্যকারের এই কথা গভীর তাৎপর্যটুকু উদ্ভাসিত হয় দর্শকের কাছে : এ তো যেন বেনারের নিজের জীবনেরই কাব্যছন্দে লেখা ইতিবৃত্ত! সত্যিই তো তার জীবনে বারবারই "ঢেউয়ের উপর ভেঙে পড়ে অন্ধ ঢেউ—/জ্বলে আর নেভে/মিশে যায়নিঃসীম আলোয় আঁধারে।" সারাজীবন ধরেই শুধু তার "বিচিত্র যুদ্ধ / শেষ যার শুধু পরাজয়ে।" ....লীলা বেনারের জীবনের ট্র্যাজিক ইতিবৃত্তই গাঢ় এবং সংহত বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করা আছে যেন এ কবিতায়।

।।৬।।

এই নাটকের মূল ভাবরূপটিকে প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক শম্ভু মিত্র খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এর বঙ্গানুবাদের মুখবন্ধে। আলোচনা সাঙ্গ করার আগে সেটির কিছুটা দেখা যেতে পারে : "আমাদের চারদিকের এই ভণ্ড, অক্ষম ও ঈর্ষাপূর্ণ লোকগুলোর মধ্যে আর একজন অনুভূতিসম্পন্ন লোকের— ভণ্ডামি বা ধাপ্পাবাজি যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তার জীবনে যে কি গ্লানি আসতে পারে তা এই নাটকে চমৎকারভাবে রূপায়িত। সেই চরিত্রটি এই নাটকে একজন মেয়ে হওয়াতে অবস্থাটার নির্দয়তা আরো বেশি করে বোঝা যায়। অথচ যে মেয়েটি বিদ্রোহিনী নয়। সে সমাজকে তুচ্ছ করে একলা চলতে চায়নি। সে একটা সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিল। সন্তান চেয়েছিল, এবং সন্তানকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একজন পিতা দিতে চেয়েছিল। এটাই তার অপরাধ। এবং সেই অপরাধের বিচার করে এমন কয়েকজন লোক, যারা সততায়, কর্মদক্ষতায়—সব দিক থেকেই তার থেকে নিকৃষ্ট। এই ঘটনাটাই আমাদের সামাজিক জীবনকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে যে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে উপলব্ধি করি যে আড়ম্বর করে যতো নীতিকথা ঘোষণা করা হয় আমাদের আজকের সমাজে, সে শুধু অপরের প্রতি দোষারোপ করার জন্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও সংবেদনশীল করবার জন্যে নয়।"

১০৭.১৫ অনুশীলনী

❑ **বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ**

১। ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকে পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে একটি মেয়ের অসহায় পরাভব চিত্রিত হয়েছে বলে মনে করেন কোনও-কোনও সমালোচক। এই ভাবনার যাথার্থ্য কতটা, বিশ্লেষণ করে দেখান।

২। লীলা বেনারের মতো মেয়েকে এক কথায় ভ্রষ্টা বা পদস্খলিতা বলে চিহ্নিত করা যায় কি? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৩। ‘চোপ্’ আদালত চলছে’ নাটকে পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন্‌টি, আলোচনা করুন।

৪। ‘‘লীলা বেনারের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকেই আসামির কাঠগড়ায় তুলেছেন।’’— এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন।

৫। ‘চোপ্ আদালত চলছে’ নাটকে বাস্তব এবং কল্পনা একত্রে মিশে গিয়ে বেনারে বাঈয়ের জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে উন্মোচিত করলেও, এর মূল প্রবণতা অ্যাবসার্ড বা কিমিতিবাদী নাটকধর্মী।— এই বক্তব্য কতটা মানা যায় বলুন।

৬। ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকের গঠনগত জটিল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান এবং এই বিচিত্র আঙ্গিক এর ভাবরূপ প্রকাশে কতটা সহায়তা বলুন।

৭। ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকের সংলাপরীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৮। এই নাটকে প্রতীক-ব্যবহার এর মূল সমস্যাকে কিভাবে ব্যঞ্জিত করেছে দেখান।

৯। গান এবং কবিতার মাধ্যমে লীলা বেনারের মুখে তার নিজের জীবনের প্রতিভাস ফুটে উঠেছে কিনা বিচার করুন।

১০। একজন সমালোচক এই নাটকের সঞ্চালিকা-শক্তি হিসাবে ‘‘herd instinct’’ এবং ‘‘gregarious impulse’’ শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন; এই নাটক সম্পর্কে এ-অভিধাদুটি কতখানি প্রযোজ্য, বিচার করুন।

১১। ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকের যে-ট্র্যাজিক অনুভব, তার উৎস কোথায়, দেখান।

১২। লীলা বেনারের চূড়ান্ত সংলাপটির প্রেক্ষিতে, তার সম্পর্কে শম্ভু মিত্র ‘‘একজন অনুভূতিসম্পন্ন লোক’ বলে যে মন্তব্য করেছেন, সেটির পুনর্মূল্যায়ন করুন।

১৩। ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকের সংলাপের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৪। ‘চোপ্ আদালত চলছে’ নাটকে সবচেয়ে কুটিল চরিত্র কার—মিঃ কাশিকার, না সুখাৎমে? বিচার করে দেখান।

১৫। দুজন মানুষ একবারও মঞ্চে না এসেও, কিভাবে এই নাটককে প্রভাবিত করেছেন, দেখান।

❑ **অবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ**

১। বেনারে বাঈ কিসের প্রতীকী চরিত্র?

২। মহারাষ্ট্র সরকারের মঞ্চাভিনয়-সংক্রান্ত আইন কেন বদলাতে হয়েছিল?

৩। ‘নকল’ আদালতে বেনারে-সম্পর্কে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং কি রায় দেওয়া হয়েছিল? সেখানে জজ, উকিল এবং সাক্ষী হিসেবে কে-কে ছিলেন?

৪। লীলা বেনারের জবানবন্দিমূলক স্বগতোক্তি ‘চোপ্, আদালত চলছে’ নাটকের ক্লাইম্যাক্স না, ক্যাটাস্ট্রোফি? কেন?

৫। মিঃ কাশিকার কেমন স্বভাবের মানুষ?

৬। লীলা বেনারে কার-কার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন? কেন?

৭। শ্রীমতী শিরীষ পৈ-এর কবিতাটি এ-নাটকে কেন ব্যবহৃত হয়েছে?

৮। তেণ্ডুলকরের প্রথম নাটক 'শ্রীমন্ত' এবং এই নাটকের মধ্যে মিল কোথায় আছে?

৯। লীলা বেনারের কর্মচ্যুতির পিছনে কি-কি যুক্তি দেখানো হয়েছিল?

১০। জবানবন্দিতে বেনারে "পাপ করেছি" সেটা কি সত্যিই সে মন থেকে বলেছে?

১১। বেনারে বাঈ কি নৈরাশ্যবাদী।

১২। "After all, this is just a game" কথাটা এ-নাটকে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে কোন্ কারণে?

১৩। মিসেস কাশিকার নিজে মহিলা হয়েও পুরুষদের ঐ "just a game"-এ মেতেছিলেন কি জন্যে?

১৪। "জীবন" সম্পর্কে লীলা বেনারের মুখে কি কি অভিধা শোনা যায়?

১৫। "Tik-20"-র শিশিটা এ-নাটকে কোন্ কাজে লেগেছে?

১৬। জং-ধরা-ছিট্‌কিনিতে-বন্ধ দরজা এবং খেলনা টিয়াপাখি— এদুটি এ-নাটকে কোন্ বক্তব্যের ব্যঞ্জনা এনেছে?

১৭। বেনারের মুখের শেষ গানে টিয়া, চড়ুই এবং কাক— তিনটি পাখির কথা শোনা যায়; এদের মধ্যে কোন্‌টি তার প্রতিভূস্বরূপ?

১৮। বেনারের মুখের ইংরেজি গানটিতে "doll's house" কথাটা কি ভাবনার সংকেত দেয়?

১৯। লীলা বেনারে কি সমাজকে উপেক্ষা করে চলতে চেয়েছিল?

২০। 'বাঁচতে' চাওয়া আর "Tik-20"-র শিশি নিয়ে ঘোরা—এদুটো ব্যাপার কি বেনারের চরিত্রের মধ্যে স্ববিরোধী ভাবনার সৃষ্টি করেছে?

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। এই বক্তব্যের মধ্যে ভুল থাকলে ঠিক করে লিখুন।

"শান্ততা, আদালত চালু আহে (১৯৬৬), সখারাম কোতোয়াল (১৯৬৮) এবং ঘাসিরাম বাইন্ডার (১৯৬৯) —এই তিনটিই হল ধোন্দো বিজয় তেণ্ডুলকরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক।"

২। এই নাটকে 'নানাসাহেব' কে?

৩। কোন্ পশ্চিমি নাট্যকারের নাম এ-নাটকে উল্লেখিত হয়েছে?

৪। মিঃ কাশিকারের মতে সমাজের সবচেয়ে ক্ষতি কে কে করেছেন?

৫। এ-নাটকে উল্লেখিত নাট্যগোষ্ঠীটির নাম কি?

৬। বেনারে বাঈয়ের জীবনে কোন্ বয়সে প্রথম বিভ্রান্তি ঘটেছিল?

৭। কোন্ বই হাতে নিয়ে 'নকল' আদালতে সবাই শপথ নিয়েছে?

৮। সামন্তর পুরো নাম কি?

৯। প্রফেসার দামলে কোথায় থাকতেন?

১০। কত নম্বর ধারা অনুযায়ী বেনারে অভিযুক্ত হয়?

১১। অভিরূপ বিচালয় কি?

১২। কোন্ মার্কিনি প্রেসিডেন্টের কথা এই নাটকে উল্লেখিত হয়েছে?

১৩। লীলা বেনারের বয়স কত?

১৪। 'নকল' আদালতে কোন্-কোন্ 'সাক্ষী' অনুপস্থিত ছিলেন?

১৫। পোংশে কেমন স্ত্রী চেয়েছিল?

১৬। কার্ণিক কোথায় গিয়ে "drama technique" শিখেছিল?

১৭। সামন্তদের বাড়িতে চায়ের অনুপান হিসেবে কি ব্যবহৃত হয়?

১৮। "The grass is green" কবিতাটির শেষ চরণ কি!

১৯। পোংশে কতদূর লেখাপড়া করেছে?

২০। সামন্ত স্কুলে কার বাণী শ্লোক হিসাবে শিখেছিল?

২১। সূর্যকান্ত ফাতরফেকার কে?

২২। মিঃ কাশিকার 'নকল' আদালতে 'জজিয়তি' করতে বসে অবিরাম কি করছিলেন?

২৩। রোকড়ে এবং বেনারের মধ্যে কে কাকে চড় মেরেছিল।

২৪। কার্ণিকের সঙ্গে বেনারের মাসতুতো ভাইয়ের কোথায় আলাপ হয়েছিল?

২৫। বেনারে পোংশের পায়ে ধরেছিল কেন?

১০৭.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। 'চোপ্, আদালত চলছে' ❑ বিজয় তেণ্ডুলকর (অনুবাদ : এস. বি. যোশী ও নীতিশ সেন) ❑ গ্রন্থপীঠ, কলকাতা ১৯৭৬

২। 'আধুনক ভারতীয় সাহিত্য' ❑ শান্তিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ❑ দীপায়ন, কলকাতা ❑ ১৯৫৪

৩। 'বাংলা নাটক : মারাঠি নাটক' ❑ বিপ্লব চক্রবর্তী ❑ রত্নাবলী, কলকাতা ❑ ১৯৯৮

৪। "A History of Marathi Literature' ❑ K. Deshpande & M. V. Rajadhyaksha ❑ Sahitya Akademi, New Delhi ❑ 1998

৫। "Encyclopaedia of Indian Literature' (Vol. 5) ❑ Ed. Mohan Lal ❑ Sahitya Akademi, New Delhi ❑ 1992

৬। 'Masterpieces of Indian Literature (Vol. 2) ❑ Ed. K. M. George ❑ National Book Trust, New Delhi ❑ 1997

৭। 'Who's Who of Indian Writers : End-Century Edition (Vol. II) ❑ Ed. K. C. Dutt, Sahitya Akademi, New Delhi ❑ 1999.

একক ১০৮ ❐ চেম্মীন/তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই মালায়লম উপন্যাস

গঠন ঃ

১০৮.১ উদ্দেশ্য
১০৮.২ প্রস্তাবনা
১০৮.৩ মালায়লম উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন ও 'চেম্মীন'
১০৮.৪ তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই (১৯১২-১৯৯৯)
১০৮.৫ কাহিনীর পাঠ-সংশ্লেষ
১০৮.৬ কাহিনীর নিবিড় পাঠসংশ্লেষ
১০৮.৭ চরিত্র বিশ্লেষণ
১০৮.৭.১ প্রধান চরিত্র
১০৮.৭.২ অপ্রধান চরিত্র
১০৮.৮ উপন্যাসের গঠন ও বিন্যাসের পর্যালোচনা
১০৮.৯ সামগ্রিক মূল্যায়ন
১০৮.১০ অনুশীলনী
১০৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১০৮.১ উদ্দেশ্য

তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লায়ের লেখা এই উপন্যাসটি (১৯৫৬) আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থানের অধিকারী। একালের মালায়লম সাহিত্যেরই শুধু নয়, সমুদ্রোপকূলবাসী মৎস্যজীবীদের নিয়ে লেখা এ-কাহিনী সামগ্রিকভাবে এদেশের আর্থ-সামাজিক সোপানের একেবারে নিচের তলার মানুষদের জীবনচর্যার একটা বিশ্বস্ত চিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে। বাংলা উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) কিংবা 'গঙ্গা' (সমরেশ বসু) প্রভৃতির সঙ্গে 'চেম্মীন'-কে ভাবে এবং রূপে বহু সময়েই তুলনা করা চলে। 'চেম্মীন' গ্রন্থের নিবিড় পাঠ তাই ভারতীয় জনজীবনের অন্তরঙ্গ এক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত যেমন করে, তেমনই আবার তুলনামূলকভাবে সাহিত্য-অধ্যয়নের জন্যও প্রয়োজনীয় কিছু উপাদানের জোগান দেয়।

১০৮.২ প্রস্তাবনা

নিঃস্ব, সর্বহারা মানুষের জীবনচর্যার এই রূপায়ণে, ঔপন্যাসিক শ্রী পিল্লাই নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবলম্বন করেই কলম ধরেছেন। আরবসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ধীবরদের জীবনকে তিনি খুব কাছের থেকেই দেখেছিলেন— 'পদ্মানদীর মাঝি'-র লেখক মানিক এবং 'গঙ্গা'-র রচয়িতা সমরেশের মতোই। এই জেলিয়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-সুখ, হীনতা-মহত্ত্ব, ঘৃণা-ভালবাসা, বিশ্বাস-সংস্কার, বশ্যতা-

প্রতিবাদ—সমস্ত কিছুই গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে এই কাহিনীতে। মূলত, দুটি ভিন্নধর্মাবলম্বী ছেলে-মেয়ের ব্যর্থ ভালবাসার ট্র্যাজেডি হিসেবে এ-কাহিনী গড়ে উঠলেও তার প্রেক্ষিতে ঐ বিশেষ অঞ্চলের সমস্ত অবর-বর্গের মানুষের জীবনেরই প্রতিবিম্বন ঘটেছে এতে। ব্যর্থ প্রেমের ট্র্যাজিক কাহিনী হলেও সংস্কারভাঙা এক প্রমুক্ত মানবীয় মহিমায় অন্বিত হয়েছে এর পরিসমাপ্তি।

১০৮.৩ মালয়ালম উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন ও 'চেম্মীন'

১৯শ শতাব্দীর ৮০-র দশকে মালয়ালম ভাষায় উপন্যাসের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল। ও চান্দু মেনন, সি.ভি রামন পিল্লাই, আপ্পু নেডুনগাডি প্রমুখ ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণ লেখকরাই ছিলেন এই ধারার প্রবর্তক। প্রথম উপন্যাস, নেডুনগাডির 'কুন্দলতা' (১৮৮২); এরপর মেনন লেখেন 'ইন্দুলেখা' (১৮৯৪), আর পিল্লাইয়ের উপন্যাসের নাম 'মার্তণ্ড বর্মা' (১৮৯১)। ঐতিহাসিক রোম্যান্স এবং সামাজিক কাহিনী—প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি প্রধানত এই দুটি ধারারই অন্তর্গত।

এঁদের এইসব এবং আরও কিছু লেখার মাধ্যমেই ১৯ শতকের মালয়ালম উপন্যাসকে জানতে হয়। ২০শ শতকের প্রথমার্ধে আরও বেশ কয়েকজন কথাকার লিখতে শুরু করেন; যেমন আপ্পান তাম্পুরন, টি. রামন নাম্বিসান, সর্দার কে. এম. পানিক্কার। এঁরা মূলত পূর্বতন ধারারই অনুসরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে পানিক্কারের 'কেরল সিংহম' (১৯৪৪) খুব বিখ্যাত বই। অন্যদিকে এঁদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরও ক'টি ক্ষীণতোয়া ধারার উৎসারণ ঘটে বর্ণনাধর্মী কাহিনী এবং গোয়েন্দা গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে। কে. নারায়ণ কুরুক্কাল, কে. অচ্যুত মেনন প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন এই ধারার লেখক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কয়েকজন সাহিত্যিক একযোগে উপস্থিত হন মালয়ালম উপন্যাসের ক্ষেত্রে। তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই, পি. কেশবদেব, ভৈকম মুহম্মদ বশির, এস. কে. পোট্টেকাট, পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণন্, জোশেফ মুণ্ডাসেরি, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, পারপ্পুরম, জি. বিবেকানন্দন, রাজলক্ষ্মী, ললিতাম্বিকা অনন্তরাজন প্রমুখ বহু লেখক-লেখিকা এই সময়কালের গল্প-উপন্যাসকে অনন্ত সমৃদ্ধ একটি স্তরে উন্নীত করেছেন। এঁদের মধ্যে তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের প্রসঙ্গে পরে বিস্তরিতভাবে বলছি। অন্যদের মধ্যে কেশবদেবের 'ওডেইল নিন্নু' (আঁস্তাকুড় থেকে, ১৯৪২), এবং 'নটী' (১৯৬৩), বশিরের 'বাল্যসখী' (১৯৪৪) এবং 'ন্‌তু উপ্পুপ্পাক্কোরানেন্দারানু' (দাদুর হাতি, ১৯৫১), বাসুদেবন নায়ারের 'নালুকেট্টু' (পুরোনো বাড়ি, ১৯৫৮), পারপ্পুরমের 'নিনামানিন্‌জা কালপ্পাটুকল' (রক্তাক্ত পদচিহ্ন, ১৯৫৫) অনন্তরাজনের 'অগ্নিসাক্ষী' (১৯৭৭) উপন্যাসগুলি শিল্পগুণে বক্তব্যের ঋদ্ধিতে এবং জনপ্রিয়তায় মণ্ডিত হয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই সাহিত্যিকদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তাঁদের গ্রন্থগুলি একটা বিশেষ মাত্রাও পেয়েছে।

১০৮.৪ তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই (১৯১২-১৯৯৯)

আধুনিক মালয়ালম কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই শুধু স্বদেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও খ্যাতকীর্তি। আইনশাস্ত্রে ত্রিবান্দ্রম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর অবশ্য ওকালতি

করার চেয়ে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করাই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেন। অবশ্য আরও কম বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যানুরাগ দেখা যায়, যার প্রেরণা ছিলেন তাঁর শিক্ষক কে. কুমার পিল্লাই। তিনি তরুণ তাকাষি শিবশঙ্করকে গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেন এবং সেই বাবদেই তাঁর সাহিত্যচর্চার 'হাতে-খড়ি' হয়। পরে ত্রিবান্দ্রমের 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক কে. এ. বালকৃষ্ণ পিল্লাইয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকাষি সন্ধান পেলেন পশ্চিমি সাহিত্যের। বিশেষত, মোপাসাঁ, জোলা এবং গোর্কির লেখার মধ্যে তিনি ডুবে গেলেন। এরই অবকাশে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ত্যাগাট্টিনেতে প্রতিফলম' (আত্মত্যাগের পরিণাম, ১৯৩৪)। গোর্কির লেখার প্রভাবে তিনি সত্যিসত্যিই 'নিচের মহল'-এর সর্বহারা মানুষের জীবন সম্পর্কে অন্বিষ্ট হয়ে ওঠেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে বামপন্থী রাজনীতির প্রতিও আকৃষ্ট হন তিনি। প্রগতি লেখক সংঘের কেরল শাখার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তাকাষি। মার্কসবাদী প্রত্যয় থেকে লেখা অনবদ্য কিছু ছোটগল্পও তিনি লিখেছিলেন এই সময়ে।

১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস, 'থোট্টিয়ুডে মাকান' (ধাঙড়ের ছেলে)। তার পরের বছর বেরোয় আরও একটি বিখ্যাত কাহিনী 'রন্টিটঙঙী ডাঙ্গাঝিনে' (দু-কুনকে ধান)। এই রাজনীতি-ভাবনায় সমৃদ্ধ উপন্যাসদুটি তাঁর লেখা পূর্ববর্তী সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-কাহিনী, 'পরমার্থঙ্গল' (বাস্তব, ১৯৪০) এবং 'পতিতপঙ্কজম' (ছিন্নশতদল, ১৯৪৪)-এর জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে গেল। ১৯৫৬-তে প্রকাশিত হয় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস, এই 'চেম্মীন' (চিংড়ি)। ভারতীয় ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় বইটি কয়েক বছরের মধ্যেই এবং তিনি আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাতিও অর্জন করেন এর সূত্রে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আমন্ত্রণ পেয়ে সেসব জায়গায় যান তাকাষি; এদের মধ্যে ছিল জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনাম, রাশিয়া, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তাকাষির অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল : 'ঔসেপ্পাইন মাক্কাল' (ঔসেফের সন্তান, ১৯৫৯), 'এনিপ্পাডিকাল' (মই, ১৯৬৪), 'চুকু' (শুকনো আদা, ১৯৬৭) এবং 'কয়ার' (দড়ি, ১৯৭৮)। সর্বশুদ্ধ ৩৭টি উপন্যাস এবং ২০টি ছোটগল্পের বই লিখেছিলেন তিনি। প্রায় পাঁচ দশক ধরে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন—যার অনেকটাই এখনও অসংকলিত রয়েছে।

তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের সাহিত্যসৃজনের একটা ক্রমোত্তরণ ঘটেছে। নিজের গ্রাম তাকাষি এবং তার সন্নিহিত কুট্টানাদ এলাকার দরিদ্র মানুষদের তিনি অত্যন্ত কাছের থেকে দেখেছিলেন যে, সেকথা একটু আগেই বলেছি। এই দেখাটাই ছিল একান্তই আন্তরিক এবং সংবেদনশীল। আইনব্যবসায় যুক্ত থাকা এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী হওয়া—এই দুই কারণে ঐ এলাকার নিরন্নপ্রায় মানুষেরা তাঁর কাছে বাংরবারই আসতেন সহায়তা পাবার আশায়; এবং তাঁরা কখনওই বিমুখ হতেন না। এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। নারীর মনকে অত্যন্ত সমবেদনাময়ভাবে অভিব্যঞ্জিত হতে দেখি তাঁর অনেক লেখায়। এটাও তাকাষির সৃষ্টি-দক্ষতার একটি বিশিষ্ট দিক।

'ধাঙড়ের ছেলে' উপন্যাসে আলেপ্পির হরিজন সমাজের মানুষেরা কীভাবে সচেতন হয়ে উঠছেন নিজেদের সামাজিক এবং মানবিক অধিকার সম্পর্কে, তার রূপায়ণ করা হয়েছে। বিপ্লবী একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পাশাপাশি বয়োবৃদ্ধ এক হরিজন সাফাইকর্মীর উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির বিভিন্নতাকে খুব বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন তাকাষি। 'দু-কুনকে ধান' উপন্যাসে কুট্টানাদের ঠিকে কৃষি-শ্রমিকদের সুসংহত অথচ মরিয়া এক জীবন সংগ্রামের বর্ণনা করা হয়েছে। জমির সঙ্গে কৃষকের নিবিড় একটি আত্মীয়তা থাকে যে, সেই পরম সত্যকে তাকাষি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ভাসিত করেছেন এখানে।

'চেম্মীন' আরও পরিণত রচনা। জমি নয়, সমুদ্রের সঙ্গে মৎস্যজীবীদের সম্পর্কের একটা ব্যাপ্ত চিত্রাঙ্কন করে দেখিয়েছেন এখানে ঔপন্যাসিক। তারই সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, গ্রাম্য সমাজের সযত্নপোষিত অজস্র সংস্কার, সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের উদ্বেল ওঠাপড়া, ধর্মীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করে গিয়ে মহৎ মানবীয় উদ্ভাস, সূক্ষ্ম-জটিল মনোবিশ্লেষণ—এই সব কিছুর সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন তাকাষি তাঁর 'চেম্মীন' উপন্যাসকে। স্পষ্টতই এর ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ঢের বেশি পূর্ববর্তী কাহিনীগুলির তুলনায়।

'ঔসেফের সন্তান'-কে সাগাধর্মী উপন্যাস বলে গণ্য করা উচিত। এক পরিবারের কয়েক প্রজন্মের জীবনকথাকে অবলম্বন করে এর সুদীর্ঘ সময় ব্যাপ্ত কাহিনীর সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিশাল ব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত 'দড়ি'। কুট্টানাদের জনজীবনে কুড়ি দশকের ইতিহাস এর কাহিনীর ক্রম-উদ্বর্তনের ফলে উন্মোচিত হয়েছে। অজস্র চরিত্র, অসংখ্য ঘটনা, ইতিহাসের বহুসব ছোট-বড় তথ্য, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরভুক্ত পরিবার, এবং মানুষে-পরিবারে-সমাজ ব্যবস্থায় যে-অসংখ্য পালাবদল সেখানে সম্পর্ক-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ দুই শতকের মধ্যে ঘটেছে, তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত দলিল এটি। সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, প্রচলিত লোকশ্রুতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিতের উপরে কল্পনা এবং বাস্তবের বিচিত্র বুননে এই বিশালায়তন উপন্যাস।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন করবার সময়ে তাঁর ছোটগল্পগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ না-করলে আলোচনা অপরিপূর্ণ থাকবে। তাঁকে সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অন্যতম সেরা ছোটগল্পকার বলে গণ্য করতে হবে। 'ভেল্লাপ্পোক্কাথিল' (বন্যার মাঝে), 'পাট্টলাক্করণ' (সৈনিক), 'কুরুদান্তে চরিত্রার্থ্যম' (এক অন্ধের পরিতৃপ্তি), 'কল্লুশোপিল' (সুঁড়িখানা) প্রভৃতি গল্প সমাজচিত্রণে এবং মনোবিকলনের সুদক্ষতায় প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি বলে গণ্য হবার দাবী রাখে।

গল্প এবং উপন্যাস, দুই ক্ষেত্রেই তাকাষির একটি নিজস্ব স্টাইল ছিল। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ভাষাতেও তিনি অত্যন্ত জটিল মনোকূটকে ব্যঞ্জিত করতে পেরেছেন। নিরলঙ্কৃত গদ্যভাষার মাধ্যমেও চমৎকার সব চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। তিনি। অথচ এর ফলে গদ্যের নিজস্ব রাঁধুনি কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই অনন্য গদ্যভাষার কারণেও তাঁকে মালায়ালম সাহিত্যের অন্যতম সেরা শিল্পী বলা হয়ে থাকে।

তাকাষি এই উপন্যাসের জন্য ১৯৫৭ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। কেরল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৫); 'সোভিয়েত দেশ' পুরস্কার (১৯৭৪) এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও (১৯৮৪) পান তিনি। ভারত সরকার পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন ১৯৮৫-তে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এছাড়া আরও বহুবিধ সম্মানসূচক পদ অলঙ্কৃত করেছেন তাকাষি, যার তালিকা সুবিশাল।

১০৮.৫ কাহিনির পাঠ-সংশ্লেষ

মালাবার উপকূলের নীরকুন্নাথ গ্রামের এক দরিদ্র জেলিয়া চেম্পনকুঞ্জের বড় মেয়ে কারুতাম্মা এবং সামুদ্রিক মাছের পাইকার মুসলিম তরুণ পারীকুট্টি পরস্পরের আবাল্য সাথী। একটা সঙ্গোপন অনুরাগও আছে দুজনের মধ্যে। তাদের মেলামেশাটা বড় হয়েও রয়েছে যথাপূর্ব এবং এ নিয়ে গাঁয়ের মেয়েমহলে কানাঘুষোও শুরু হয়েছে। ছোট মেয়ে পঞ্চমীর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে কারুতাম্মার মা চাকী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ওদিকে ধূর্ত চেম্পনকুঞ্জ মাছধরা-নৌকা আর নিজস্ব জালের মালিক হবার উদগ্র বাসনায় পারীকুট্টির কাছে টাকা ধার করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। পারীকুট্টি ওরফে ছোটমিয়া, নিঃস্বার্থভাবেই টাকাটা দেয় তাকে কারণ তার মনের গভীরে এটাই সঞ্জীবিত ছিল যে, চেম্পনকুঞ্জ হল সেই মেয়েটির বাবা, যাকে সে মনে-মনে ভালবাসে।

জাল-নৌকোর মালিক হয়ে চেম্পনকুঞ্জ স্বমূর্তি প্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে তাদেরই মতো গরিব এক প্রতিবেশী হঠাৎ এভাবে ধনী হয়ে ওঠায়, নীরকুন্নাথের অন্যান্য জেলেরা তার সম্পর্কে ঈর্ষিত হলেও, রোজগারের আশায় তাদের অনেকেই ঐ নৌকোয় চাকরি নেয়। এদিকে চেম্পনকুঞ্জ কিন্তু পারীকুট্টির টাকা তো শোধ করেই না, এমন কি তার কাছে মাছ বেচতেও গররাজি হয় অন্য পাইকারের কাছে বেশি দাম পাবার লোভে।

চাকী তার মেয়েকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভোগে; তাকে সতীত্ব-কৌমার্যরক্ষা ইত্যাদির সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের লোকবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারগুলির বিষয়েও অবহিত করে। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী গ্রাম ত্রিকুন্নাপুড়ার একটি ছেলের সঙ্গে কারুতাম্মার বিয়ের ঠিক করে চেম্পনকুঞ্জ। জামাই পালানিও অত্যন্ত গরিব, বাপ-মা, ভাই-বোন কেউই নেই তার। কিন্তু যেমন-তেমন করে হলেও, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হবার বাসনায় ঐ সম্বন্ধটাই পাকাপাকিভাবে ঘটিয়ে তোলে। বিয়ের আসরে কন্যাপণের টাকার পরিমাণ নিয়ে ত্রিকুন্নাপুড়া থেকে আসা বরযাত্রীদের সঙ্গে চেম্পনকুঞ্জের বিবাদ শুরু হলে, তাদের একজন কারুতাম্মার চরিত্র নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কটাক্ষ করে। এই ব্যাপারটার পরিণামে চাকী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও, বিয়ের পর পালানি খানিকটা জেদাজেদি করেই নতুন বৌকে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

ত্রিকুন্নাপুড়াতে এসে কারুতাম্মা চেষ্টা করে পারীকুট্টিতে ভুলতে। গরিব ঘরের বৌ হয়েও সে সুখী হবার প্রয়াসী হয় স্বামীকে ভালবেসেই। যথাকালে একটি মেয়েও হয় তাদের। কিন্তু ইতিমধ্যে অসুস্থ চাকীর জীবনাবসান ঘটে। তার মৃত্যুর খবর দিতে আসে পারীকুট্টিই এবং এর ফলে কারুতাম্মার নামে আবার কানাঘুযো শুরু হয় শ্বশুরবাড়ির গ্রামে।

এদিকে এক ধনী জেলিয়া কাণ্ডানকোরানের মৃত্যু হলে তার বিধবা পাপিকুঞ্জকে বিয়ে করে ঘরে আনে চেম্পনকুঞ্জ। পাপিকুঞ্জ এবং তার প্রথমপক্ষের ছেলে গঙ্গাদত্তনকে নিয়ে ক্রমশ সে বিব্রত এবং বিপন্নই বোধ করতে থাকে। অবশেষে টাকাপয়সা পর্যন্ত সরাতে শুরু করল যখন মা এবং ছেলে, বীতশ্রদ্ধ চেম্পনকুঞ্জ দুজনকেই তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে—যদিও তারা গেলনা! এবং অত সাধের জাল এবং নৌকো—দুইই ঘটনা-পরম্পরায় বেচে দিতে বাধ্য হয় চেম্পনকুঞ্জ।

ওদিকে পঞ্চমী এই ঘটনার পরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল দিদির কাছে। তাদের জীবনেও এক বিরাট অশান্তি ঘনিয়েছে ইতিমধ্যে। পারীকুট্টি চাকীর মৃত্যুসংবাদ দিতে আসার ফলে যে-ঘোঁট পাকানো শুরু হয়েছিল, তারই সূত্রে পালানিকে বস্তুত গোষ্ঠীচ্যুত করল অন্য জেলেরা : 'অসতী' মেয়ের স্বামীকে নিয়ে সমুদ্রে গেলে সাগরদেবী কাদালাম্মার রোষ পড়বে তাদের ওপরে—এই তাদের সংস্কারগত ভয়!

নিরুপায় হয়ে পালানি একাই একটি ডিঙি নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়, আর সেই মাছ শহরে গিয়ে বেচে আসে কারুতাম্মা। পালানি তার বৌকে বলে ভাল হয়ে, সাধ্বী হয়ে থাকতে! কারুতাম্মাও তাই চায়। সেই ভরসাটুকু নিয়েই রোজ রাতে সাগরে পাড়ি দেয় পালানি।

এমনই একরাত্রে দুই বোনে সুখ-দুঃখের কথা হতে থাকে। পারীকুট্টি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে শুনে ব্যথিত হয় কারুতাম্মা। ঠিক এই সময়ে ফিরে আসে পালানি; সমস্ত কিছু শোনে সে। ফলে পুরোনো কথা সব খুলে বলতেই হয় কারুতাম্মাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝড়ের আগের স্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করে। পরের রাতে পালানি যায় সমুদ্রে প্রতিরাত্রের মতোই। মধ্যরাত্রে কার আকুল ডাকে হঠাৎ ঘুম ভাঙে কারুতাম্মার। ....পারীকুট্টি! সে এসেছে এতদিন পরে। আত্মবিস্মৃত হয়ে পারীকুট্টির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কারুতাম্মা। ওদিকে মাঝসমুদ্রে এক হাঙর গেঁথেছে পালানি তার বঁড়শিতে। সেটার ঝটকায় নৌকো টলোমলো। হঠাৎ প্রবল বর্ষা, বাজ-বিজুলি। ঘূর্ণিতে ডুবে যায় নৌকো।

পরদিন ভোরে ত্রিকুন্নাপুড়ার জেলেরা ঝড়ের তাণ্ডবের পরে কী অবস্থা হয়েছে দেখতে এসে সমুদ্রতীরে

খুঁজে পেল আলিঙ্গনবন্দী এক যুগলের মৃতদেহ। পারীকুট্টি আর কারুতাম্মা। আর, বঁড়শিতে-বেঁধা একটা মরা হাঙর। যে তাকে গেঁথেছিল মাছ ভেবে, সে তলিয়ে গেছে সমুদ্রের অতলে। সাগর মা কাদালাম্মা তাকে নিয়ে গেছেন নিজের কাছে।

১০৮.৬ কাহিনির নিবিড় পাঠসংশ্লেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

কেরলের সমুদ্র উপকূলের এক মৎস্যজীবী গ্রাম নীরকুন্নাথ। সেই গ্রামের দুটি যুবক-যুবতী—যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাদের প্রণয়, কাহিনী সেই অসম সম্পর্কের পরিণতি এবং সেই সূত্রে গোটা গ্রামের তথা বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের সমগ্র জীবনচিত্র এই উপন্যাসের পটভূমি। কাহিনীর রোমান্টিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জেলেদের ধর্মীয় ও লৌকিক সংস্কার। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা পারীকুট্টি এবং কারুতাম্মার সঙ্গে পরিচিত হই। লেখক বিনা ভূমিকাতেই এই চরিত্রদুটিকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। পারীকুট্টি মুসলমান মাছের কারবারি আর কারুতাম্মা এক হিন্দু জেলে ঘরের মেয়ে যদিও হিন্দু সমাজে তারা অচ্ছুত। ছোটবেলা থেকে তারা পাশাপাশি বড় হয়েছে, একই সঙ্গে ঝিনুক কুড়িয়েছে, মাছের জাল থেকে কুচো মাছ সংগ্রহ করেছে, ঝগড়া করেছে। নিজেদের অজান্তেই তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, পারীকুট্টি এবং কারুতাম্মা দুজনেই জানে তাদের সম্পর্কের কোন পরিণতি নেই, তবুও তারা নিজেদের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। এই পরিচ্ছেদে কারুতাম্মা অকপটে ‘ছোটমিয়া’র কাছে তার বাবা চেম্পনকুঞ্জের জাল ও নৌকো কেনার টাকার কথা বলেছে। কথায়-কথায় অকারণ পুলক-আবেশ, কোন এক নাম-না-জানা অজানা অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হয়েছে, আবার হারিয়ে ফেলার ভয়ে অস্থির হয়েছে। বাড়ি ফিরে কারুতাম্মা পারীকুট্টির চিন্তায় মগ্ন হয়; তাঁর মা, চাকী তাকে বাস্তবের রুক্ষ্ম জমিতে আছড়ে ফেলে। কারুতাম্মার বোন পঞ্চমী অভিযোগ করেছে দিদি ‘ছোট মিয়া’র সঙ্গে হাসি-তামাশা করেছে। কারুতাম্মার এই আচরণে চাকী দিশেহারা হয়েছে রাগে। মেয়েকে বারংবার ওই ‘বিধর্মী’ ছেলেটির কাছ থেকে দূরে থাকতে বলে সে। চাকী তার যুবতী মেয়ের চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জেলে সম্প্রদায়ের বহুযুগাশ্রিত লৌকিক সংস্কারজড়িত এক পুণ্যবতী রমণীর গল্পকথা সে কারুতাম্মাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। জেলেদের আদিম বিশ্বাস, সমুদ্রের বুকে জেলেদেরজীবন বাড়িতে থাকা তাদের স্ত্রীদের চারিত্রিক শুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। সমুদ্রতীরের সমগ্র জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বিশ্বাস অনড়, অটল। বহুদিন পূর্বে এক জেলে একাকী সমুদ্রে গিয়েছিল, তার স্ত্রী সমুদ্রতীরে ব্রত করতে বসে। ভয়ানক ঝড়, তুফান, বিশাল আকৃতির তিমি, হাঙরের আক্রমণেও সেই জেলের নৌকোর এতটুকু ক্ষতি হয়নি বরং সে নিরাপদেই বিশাল একটা মাছ শিকার করে ফিরে আসে। এই অলৌকিক ঘটনা নাকি সম্ভব হয়েছিল তার জেলেনির একনিষ্ঠ প্রেম এবং কঠোর তপস্যার ফলেই। আজও জেলেরা সেই একই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে। চাকী তার মা-দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া এই আজন্মলালিত সংস্কার কারুতাম্মার মধ্যেও চারিয়ে দিতে চায়। পারীকুট্টির সঙ্গে কারুতাম্মার বিবাহ সম্ভব নয়, তাই কারুতাম্মা যাতে নিজের শুদ্ধ রাখতে পারে চাকী সেই চেষ্টাই করে যায় আপ্রাণ। এমনকি ভিন্‌দেশের জনমজুরি করতে-আসা মেয়েদের সম্পর্কেও কারুতাম্মাকে সাবধান করে দেয়। কারণ তাদের কোনও নৈতিকতা নেই, সাগর-মাকে তারা নোংরা করে, অশুদ্ধ করে, আর সেই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয় জেলে সম্প্রদায়কে। চাকী মেয়েকে ‘মুসলমান’ সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়। কারুতাম্মার মন যখন শুদ্ধ-অশুদ্ধের দ্বন্দ্বে অস্থির, ঠিক তখনই সমুদ্রতীর থেকে ভেসে আসে পারীকুট্টির গান। পারীকুট্টির গান কারুতাম্মার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে দিতে চায়। এই সূত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা স্মরণে আসে : রাধা যেমন কৃষ্ণের বাঁশির টানে কুল-মান সব ভাসিয়ে দিয়েছিল কারুতাম্মাও

তেমনি করেই তার ঘর-সংস্কার ভাসিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এতকালের জমাটবাঁধা সংস্কারের পুরু দেওয়াল ভেদ করার শক্তি কারুতাম্মার ছিল না। অবশ হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল সে। তার পরেই কানে ভেসে এল চাকী ও চেম্পনকুঞ্জের বাক্‌বিতণ্ডা। চাকী চেম্পনকুঞ্জকে বার-বার কারুতাম্মার বিয়ের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছিলো। কিন্তু লোভী স্বার্থপর চেম্পনকুঞ্জ কেবল নিজস্ব একটা জাল ও নৌকোর চিন্তায় বিভোর। তার বক্তব্য নৌকো হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এমনকি সে দিনমজুর ভেলায়ুধনের সঙ্গে কারুতাম্মার বিয়ের সম্ভাব্যতার কথাও চাকীকে জানায়। চাকী রাগে ক্ষোভে মুখর ওঠে। এমন মেয়ের জামাই হিসেবে সে ভেলায়ুধনকে মানতে নারাজ। স্বামীকে সে সাবধান করে পারীকুট্টি সম্পর্কে। কিন্তু চাকী চেম্পনকুঞ্জ জানে না কারুতাম্মা তার মনপ্রাণ ঐ ছোটমিয়াকেই সমর্পণ করে বসে আছে। মানসিক সমর্পণ যদি অশুদ্ধতা হয় তাহলে কারুতাম্মা তো অসতী হয়েই গেছে। তার উথাল-পাতাল মনের অলিন্দে নানান দ্বন্দ্ব আকুলি-বিকুলি করে বেড়িয়েছে—যার হাত থেকে পরিত্রাণের পথ তার জানা নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

পরের দিন কারুতাম্মা বাড়ি থেকে বেরোল না। একদিনেই তার মনের বয়স হঠাৎ এক ধাক্কায় বেড়ে গেছে। এক কিশোরী নিজের অজান্তেই যুবতীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাড়ির কাজকর্ম সেরে কারুতাম্মা বসে বসে পারীকুট্টির কথাই ভাবছিল। তার মনের অবচেতনে একটা সন্দেহ, অভিমান দানা বেঁধে উঠেছিল : ছোটমিয়া কি পুব থেকে-আসা মেয়ে মজুরদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করবে? পারীকুট্টির ভাবনা তার মনকে অস্থির করে তোলে। চাকী তাকে সাবধান করে দিয়ে গেছে। বাবা বাড়ি ফিরে খেতে বসেও তাকে একই কথা বলে। কারুতাম্মা মনে-মনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে চেম্পনকুঞ্জের মনের মধ্যেও একরাশ দ্বিধা—একদিকে তার সাধের নৌকো ও জাল অন্যদিকে মেয়ের বিয়ের চিন্তা। কোন্‌টাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে স্থির করতে পারছিল না। চাকীর কাছে পারীকুট্টি সম্পর্কে শোনার পর থেকেই সে নিজেও এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। সেদিন বিকেলেই কারুতাম্মা দেখে তার বাবা পারীকুট্টির সঙ্গে কথা বলছে। কারুতাম্মা নিশ্চিত হয় চেম্পনকুঞ্জ টাকা ধার চাইতে গেছে। সেদিন রাতেই তার ভাবনা সত্যি হয়ে দাঁড়াল। পারীকুট্টি নিঃশব্দে শুঁটকি মাছের ঝুড়ি তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। লজ্জায় কারুতাম্মা প্রতিবাদ করতে ভুলে যায়। পরের দিন সকালে চাকীকে জিজ্ঞাসা করলে সে কোনও সদুত্তর দেয় না। কিন্তু পারীকুট্টি কারুতাম্মাকে জানিয়ে যায় যে টাকা দিয়েছে। কারুতাম্মা তাকে অনেক না-বলা কথা বলতে চেয়েও চুপ করে যায়। পারীর অভিমানের জবাব সে দিতে পারে না। কিন্তু চোখের সামনে দেখে বাবা লোভীর মতো হাত বাড়িয়ে সেই টাকায় নিজের স্বপ্নপূরণের চেষ্টা করছে। মায়ের কাছে কারুতাম্মা প্রতিবাদের ঝড় তোলে, পারীকুট্টির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা পারীকুট্টিকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছে এই অভিযোগ শুনে চাকী মারমুখী হলেও, শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। কারণ স্বীকার না-করলেও সে জানে মেয়ের মুখ চেয়েই ছোটমিয়া তাদের টাকা দিচ্ছে। পরের দিন সে মাছ বিক্রি করতে না গিয়ে চেম্পনকুঞ্জকে আবার কারুতাম্মার বিয়ের কথা বলে। এমনকি পারীকুট্টির কাছ থেকে টাকা নেওয়া ঠিক হচ্ছে না একথাও মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু লোভী, নৈতিক-মূল্যবোধহীন চেম্পনকুঞ্জ কারো নিষেধ না শুনেই আবার টাকা নিয়ে আসে। বাবার এই লোভী অশ্রদ্ধেয় চেহারা কারুতাম্মাকে তার সংকল্পে স্থির হতে সাহায্য করে। এতদিন যে সাহস সে জুগিয়ে উঠতে পারেনি। চেম্পনকুঞ্জের হীন ব্যবহার তাকে বাধ্য করে বাবার বিরুদ্ধে কথা বলার, যাতে পারীকুট্টির মত সরল মানুষটাকে সর্বস্বান্ত হতে না হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

চেম্পনকুঞ্জ জাল আর নৌকো কেনার টাকা জোগাড় করে নৌকোর খোঁজে বেরোল। এদিকে জেলেসমাজে চেম্পনের এই হঠাৎ ভাগ্যোদয় বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোচুভেলু, আয়নকুঞ্জ, রামন সুম্পন এরা সকলে মিলে চেম্পনের ছেলেবেলার সঙ্গী এবং প্রতিবেশী আচ্চাকুঞ্জকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে—এই রহস্যের উৎস

কী? আচ্চাকুঞ্জ সহজ-সরল নিপাট ভালমানুষ বন্ধুর অবস্থার উন্নতিতে খুশি, সে অকারণ পরনিন্দা না করে, চেম্পনের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলে, কিন্তু সকলে তার কথা উড়িয়ে দেয়। এমনকি তার স্ত্রীও তাকে চেম্পনের সঙ্গে তুলনা করে ব্যস্ত হয় অপদার্থ, অকর্মণ্য প্রমাণ করতে। নীরকুন্নাথ গ্রামের বাকী জেলেরা চেম্পনের অবস্থার উন্নতিতে হিংসায় কারুতাম্মা সম্পর্কে আকথা-কুকথা বলতে শুরু করে। এমনকি এতখানি বয়স পর্যন্ত কারুতাম্মার বিয়ের চেষ্টা না করে সে যে-অপরাধ করেছে তার জন্য সমাজে তাকে একঘরে করার ব্যবস্থারও আলোচনা হয়। আসলে এই হতদরিদ্র সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের অঙ্গ হলেও উচ্চবর্গীয়দের কাছে এরা অস্পৃশ্য, তবুও হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি এরা নিষ্ঠাভরে মানে। হাজার-হাজার বছরের সংস্কার এদের মজ্জাগত। রামন সুপ্পন জেলেদের সম্প্রদায়গত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টায় সকলকে বোঝায় যে চেম্পন অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। একদিকে যুবতী মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেনি, অন্যদিকে 'মুকাওয়াল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও সে নৌকোর মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। একমাত্র 'ওয়ালাকারণ' জাতের লোকরাই নৌকোর মালিক হতে পারেন। চেম্পন মোড়লকে না জানিয়েই নৌকোর খোঁজে গেছে, এই স্পর্ধা গ্রামের লোক সহ্য করবে না। তারা নিয়ম অনুযায়ী মোড়লের কাছে অভিযোগ জানাতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। একমাত্র আচ্চাকুঞ্জ এই মতের বিরুদ্ধে চেম্পনের পক্ষ নিল। বাড়ি ফিরে সে চাকীর কাছে গ্রামের লোকেদের মনোভাব ব্যক্ত করে। এদিকে চাকী নিজেও চেম্পনের আসার আশায় ব্যাকুল। মনে-মনে সেও এক সুখী সচ্ছল গৃহকোণের স্বপ্ন দেখছে। মহাজনের কাছে টাকা ধার না নিয়ে পারীকুট্টির কাছে টাকা ধার নেওয়াতে তাদের ওপর চাপও কম, কারণ পারীকুট্টি কখনও টাকা উসুলের জন্য নৌকো বা জাল আটকে দেবে না। চাকীর এই বিশ্বাসটা কারুতাম্মাকে কষ্ট দেয়। সে জানে মা-বাবা পারীকুট্টির দুর্বলতার সুযোগেই নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছে। মাকে সেইজন্য কারুতাম্মা দোষারোপ করে। চাকী মেয়ের এ প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পারীকুট্টির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে বারবার প্রশ্ন করে। কিন্তু কারুতাম্মা নিশ্চুপ, সে কিছুই ব্যক্ত করে না। একদিকে সমাজের চাপ, অন্যদিকে মেয়ের অবাধ্যতায় দিশেহারা চাকী চেম্পনকুঞ্জের ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

গ্রামের মাতব্বরেরা সকলে মিলে মোড়লের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সাতটা তামাকের পাতা আর পণের টাকা নিয়ে তারা মোড়লের দরবারে আর্জি পেশ করল যে চেম্পনকুঞ্জ সোমত্ত মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করছে না, তার মেয়ের রীতচরিত্রও ভাল নয়, —একথায় মোড়ল তেমন আগ্রহ প্রকাশ না করলে, তারা আরো জানাল যে চেম্পন মোড়লের অনুমতি না নিয়েই নৌকো কিনতে গিয়েছে। এই কথায় মোড়ল অসন্তুষ্ট হল। কারণ তার অনুমতি ব্যতীত এ-গ্রামে কেউ নৌকোর মালিক হতে পারে না। আগেকার দিনে এই অপরাধে জেলেকে গ্রামছাড়া, সমাজচ্যুত হতে হত, এখন সেদিন না থাকলেও মোড়লের অসন্তুষ্টি জেলেদের জীবনে দুর্যোগের কারণ হতে পারে। মোড়ল গ্রামবাসীকে চেম্পনের নৌকোয় কাজ করতে নিষেধ করে দিল। আয়ানকুঞ্জ গ্রামের সকলকে সে খবর জানিয়ে দিল। গ্রামের চারিদিকে এই নিয়ে রসালো জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল, বিশেষ করে মহিলামহলে। একদিন কারুতাম্মা ও পারীকুট্টি সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্যে চাকী রাগে দিশেহারা হয়ে অন্য জেলেনিদেরকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালিগালাজ করে; তারাও ছেড়ে কথা বলেন; তারাও চাকীকে দুষতে লাগল। এই ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে দিয়ে কারুতাম্মার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়। লেখক নিজেও জেলে জীবনের লৌকিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কারুতাম্মার মনে হয়েছে জেলেনিদের সকলের জীবনেই যদি এক অন্ধকার দিক থাকে, তবে সেই সংস্কারের সত্যতা কোথায়? সাগর তো এই অনাচারে শুকিয়ে যায়নি, জেলেদের জীবন তো বিপন্ন হয়নি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান কারুতাম্মা মাকে এই নোংরা প্রসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু উত্তেজনার মাথায় চাকীর মুখে মুসলমান হওয়ার 'সুবিধা'-র

কথা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। এতদিন বাবা-মায়ের হেনস্থার জন্য সে নিজেকে দায়ী করছিল, এখন চাকীর কথায় তার মনে হয় এই ধর্ম-পরিবর্তনে কত সহজে তার জীবনটা সরল মসৃণ পথে চলতে পারে। মা-বাবাকেও সমাজের রক্তচক্ষু সহ্য করতে হবে না। কিন্তু মনের অবচেতনে কারুতাম্মা জানে এই অনড়, অটল, ধর্মীয় সংস্কারের জগদ্দল পাথর ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার শক্তি তার অতি-সাধারণ, ধর্মভীরু, বাবা-মায়ের মধ্যে নেই। মনের মধ্যের আশার মরীচিকা তাই ক্ষণিকেই বিলীন হয়ে যায়। চেম্পনকুঞ্জ পাল্লিকুন্নাথ গ্রামের কাণ্ডানকোরানের ‘পয়মন্ত’ নৌকো কিনে গ্রামে ফিরে আসে। সকলে তার এই সৌভাগ্যে ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়ে। আচ্চকুঞ্জ আনন্দে অধীর হয়ে বলে যে, পাল্লিকুন্নাথ গ্রামের লক্ষ্মী চেম্পনের সঙ্গে এই গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু গ্রামে ফিরেই সেখানকার পরিবেশ এবং চাকীর কথা শুনে চেম্পন চিন্তিত হয়ে পড়ে। চেম্পন জানে সে হাজার বছরের মেনে চলা নিয়ম ভেঙেছে— সে অপরাধ করেছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা তার বিরুদ্ধে যাবে এটা চেম্পন কল্পনাও করতে পারেনি। সে ভাবনা-চিন্তা করে চাকীর কাছ থেকে কিছু টাকা চাইল, মোড়লকে ঠাণ্ডা করতে কিছু সেলামি নিয়ে যেতে হবে। চাকী তার সর্বস্ব এই নৌকো কেনাতেই দিয়ে দিয়েছে। তার কাছে একটা পয়সাও নেই, কিন্তু তিরিশটা টাকার বড় প্রয়োজন। চেম্পন আবার পারীকুট্টির কাছে হাত পাতে। চাকী মনে-মনে সংকুচিত হলেও মুখে প্রতিবাদ করতে পারেনি। মোড়লের সঙ্গে দেখা করে চেম্পন তখনকার মত তাকে শান্ত করে এবং তার নৌকোয় কাজের জন্য গ্রামের লোকেদেরও পেয়ে যায়। কিন্তু এতকালের বন্ধু আচ্চকুঞ্জকে সে নিজের নৌকোয় কাজ করতে ডাকে না, আচ্চকুঞ্জ মনে-মনে দুঃখিত হয়, কিন্তু মেনে নেয়। চেম্পনের এই অহংকার ও স্বার্থপরতায় আচ্চকুঞ্জ বিস্মিত হয়ে যায়। চেম্পনের নৌকোর আয়োজন সম্পূর্ণ হলে জাল কেনার জন্য সে আবার পারীকুট্টির কাছ থেকে টাকা নেয়। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে সামাজিকতার কারণে তাকে জ্ঞাতি-ভোজন করাতে হবে। চেম্পন কারুতাম্মাকে পাঠায় পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামে তার আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করতে। এই যাওয়ার পথেই সে পারীকুট্টির মুখোমুখি হয়, পারীকুট্টি আগের মতোই তার সঙ্গে রসিকতা করতে চায়, তাদের সম্পর্ক যেমন দুর্বহ যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে তার থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু আগেকার কিশোরী কারুতাম্মা আজ যুবতী; তার মন গভীর; গম্ভীর পারীকুট্টি তল পায় না সেই অজানা রহস্যের। কারুতাম্মা কোন জবাব না দিয়েই পথ চলতে শুরু করে। তার মনে হয় ভয়, দ্বিধা, লজ্জা অন্যদিকে সংস্কার ভাঙার প্রবল আবেগ। পারীকুট্টির অপকট প্রশ্নে সে শেষপর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি, তার হৃদয়রহস্য মুহূর্তে উন্মোচিত হয়েছে, এই প্রথম সে পারীকুট্টির ভালবাসাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, অতীত-বর্তমান সব ভুলে কারুতাম্মা সাড়া দিয়েছে, বিধর্মী' পারীকুট্টির হৃদয়ের আমন্ত্রণে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

নীরকুন্নাথ গ্রামের সব জেলেরা ভোররাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়েছে। চেম্পনের নৌকো আজ জলে নামবে। লোকাচার-অনুযায়ী অন্যান্য নৌকোও একই সঙ্গে যাত্রা করবে। কয়েকটি লৌকিক অনুষ্ঠানের পর চেম্পনের নৌকো যাত্রা আরম্ভ করল। যারা এতদিন হিংসে করছিল, তারাই আজ এগিয়ে এসে চেম্পনের সহযোগিতা করছে। চাকী আয়ানকুঞ্জ ও সুপ্পনের কাছে গিয়ে নৌকোর হালচাল জানতে চাইল। সকলেই চেম্পনের নৌকোকে একবাক্যে পয়মন্ত বলছে। সেদিনের আবহাওয়ায় মাছ ধরার পক্ষে অনুকূল। চাকী, কারুতাম্মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অন্যান্য জেলেনিরাও চাকীর কাছে এসে অনুরোধ করতে থাকে, যাতে তাদেরকে চেম্পন মাছ বিক্রি করে। নৌকোর মালিক হয়ে চাকী এখন তাদের সমীহের পাত্রী। কিন্তু চাকী তাদের কথা দিতে পারে না, কারণ চেম্পন তার কথা শুনবে না। পঞ্চমীও বাবার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। তারও একঝুড়ি মাছ চাই, সেই মাছ বিক্রি করে টাকা জমাবে। চেম্পন মাছ নিয়ে ফেরার আগেই সুসংবাদ এসে পৌঁছোয়। সিন্ধুচিলের দল ‘মাতি’ মাছ মুখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জেলেদের বিশ্বাস ‘আয়েলা’ বা ‘মাতি’ মাছ জালে ওঠা সৌভাগ্যের লক্ষণ।

চেম্পন নৌকো নিয়ে ফিরলে মাছের কারবারি আর জেলেনিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সকলেই চেম্পনের কাছে মাছের আশায় দৌড়ে যায়। সে দলে পঞ্চমীও ছিল। চেম্পন কিন্তু নৌকো নিয়ে ফিরে যেন অন্য মানুষ, নিজের মেয়েকেও সে খেয়াল করে না। পঞ্চমীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। দরিদ্র মানুষগুলিকে তার নৌকোর কাছে ঘেঁষতে বারণ করে দেয়। এমনকি যে পারীকুট্টির সাহায্য ছাড়া তার নৌকো কেনা সম্ভব হত না, তাকেও মাছ বিক্রি করতে অস্বীকার করে। এই নতুন চেম্পন কেবল টাকা চেনে, পারীকুট্টি নগদ দিতে পারবে না, কিংবা দিলেও তার টাকা কেটে রাখবে। এই আশংকায় সে পারীকুট্টিকে যেন চিনতেই পারে না। সে 'কাদের মিঞা'র সঙ্গে নগদে কারবার করল। বাড়ি ফিরে চেম্পন নতুন মানুষ, হাওয়ায় ভেসে ফিরে এল নতুন উদ্যম, আনন্দে। চাকী কিন্তু তার আনন্দের অংশীদার নয়। সে নিজে থেকে পারীকুট্টিকে জোর করেছে টাকা ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন চেম্পন অন্য ব্যবহার শুরু করল। সে পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেওয়ায় উৎসাহী নয়। পারীকুট্টির ব্যবসা যে তার জন্যই বন্ধ হয়ে গেছে একথা জানার পরও তার মনুষ্যত্ব বোধ বা বিবেকযন্ত্রণা নেই। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান টাকা। চেম্পনের এই নির্লজ্জ ব্যবহারে দুঃখ পায় চাকী, কারুতাম্মা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার আবাল্যের সঙ্গী আচ্চকুঞ্জ। টাকার নেশাতেই সে বন্ধুর সংস্রব ত্যাগ করেছে। পড়শি জেলেদের দূরে ঠেলে দিয়েছে, এমনকি মেয়ের প্রতি মুসলমান ছেলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। (এই পরিচ্ছেদে চেম্পনের অন্তরঙ্গ হিংস্র রূপটির সঙ্গে পাঠক পরিচিত হয়।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ

নৌকো কেনার পর থেকেই চেম্পনের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন। তার জালে যত বেশি মাছ ওঠে তা আর কারুর জালেই ওঠে না। একটু-একটু করে সে সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে—এখন তার স্বপ্ন একটুকরো জমি ও বাড়ির। এখন চাকীকে সে কাণ্ডানকোরানের সুন্দরী স্ত্রীর মতো করে তুলতে চাইছে। এতদিনের দুঃখ-দারিদ্র্যের পর সে এখন একটু আয়েশে দিন কাটাতে চাইছে। কিন্তু তারই মধ্যে চাকী তাকে বার-বার পারীকুট্টির টাকার কথা মনে করিয়ে দেয়। চেম্পন বারে-বারেই চাকীকে আশ্বস্ত করে, পরে ফেরত দেবে। কিন্তু পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই তার নেই। এদিকে পারীকুট্টির বাবা আবদুল্লা ছেলের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারুতাম্মার জন্য পারীকুট্টি যে এত টাকা নষ্ট করেছে সেইজন্যই তার ব্যবসা নষ্ট হয়েছে। কারুতাম্মা একথা শুনে লজ্জায় ঘেন্নায় কুঁকড়ে যায়। চেম্পনের এই সুখের সময়ের মধ্যেই হঠাৎ সমুদ্রের নীল জল রঙ পাল্টাতে শুরু করে গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে। জেলেদের বিশ্বাস এসময়ে 'সাগর মা' ঋতুমতী থাকেন, এসময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। দু'চারদিনেই চেম্পন অস্থির হয়ে ওঠে—সে তার নৌকোর অন্য জেলেদের সমুদ্রে বঁড়শি ফেলার জন্য বলল, জেলেরা রাজি নয়। চেম্পন এবার তাদের হুমকি দিল যে এবার থেকে আর সে টাকা ধার দিতে পারবে না, সকলে উপোস করুক। মাছের মরশুমে যদিও ক'টা টাকা হাতে জমেছিল, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদেরকে আবার কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিল। একে-একে জেলেনিরা চাকীর কাছে এসে ধর্না দিল, কেউ থালা, কেউ গ্লাস, কেউ বা বাচ্চার কানের দুল বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে চায়। চাকীর হাতেই বা এত পয়সা কোথায়? কিন্তু জেলেনিরা কেউ বিশ্বাস করল না। তারা অভিমানে চাকীর সঙ্গে ঝগড়া করল, চাকীও এতটুকু সহানুভূতি না দেখিয়েই তাদের অনাহার-ক্লিষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিল। কারুতাম্মা বাবা-মায়ের এই হৃদয়হীন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। কিন্তু তার কিছু করার নেই। চেম্পন এবং চাকী দুজনেই এই অভাবের সদ্ব্যবহার করে ঘরে প্রচুর বাসনপত্র, সোনাদানা তুলে ফেলল। এমনকি একটা ভালো খাটও সস্তায় কিনে ফেলল। চেম্পন যেন সবাইকে ঠকিয়ে বাকী জীবনটা আরামে কাটাতে উৎসুক সেজন্য তার কোন অপরাধবোধ নেই। পারীকুট্টি যে তারই কারণে সর্বস্বান্ত হয়েছে—এ চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে না। একদিন গ্রামের 'ওয়ালাকারণ' রামনকুঞ্জ চেম্পনের কাছে এল টাকা ধার করতে। চেম্পনও বিনা কোনও প্রশ্নেই তাকে টাকা ধার দিয়ে দিল। রামনকুঞ্জ চলে যাওয়ার পর চেম্পন খুশিতে উছলে ওঠে। চাকীকে সে বলে ক'দিনের মধ্যে রামনের নৌকো তার হাতে এসে পড়বে। একদিন চেম্পন জোর করেই জেলেদের

সমুদ্রে নিয়ে গেল, মাঝসমুদ্র বঁড়শি ফেলবে বলে, কিন্তু সেদিনের উত্তাল সমুদ্র দেখে গাঁয়ের সবাই ভয় পেয়ে গেল। সন্ধেরাত্রি পর্যন্ত চেম্পনের নৌকো ফেরত না আসায় সকলে উৎকণ্ঠিত; জেলেনিরা চাকীকে দোষ দিতে শুরু করে, যেন চাকীই তাদের দুর্দশার কারণ। কিন্তু সেদিনও চেম্পন খালি হাতে ফেরে না, একটা বিশাল হাঙর নিয়ে ফিরে এসে জেলেনিদের কাছে অল্পদামেই বিক্রি করে দিল। সকলে ধন্য-ধন্য করল যে, চেম্পনের সাহসের জন্যই তাদের উনুন জ্বলল। সব জেলেরা সুদিনের আশায় ব্যবস্থা করল জাল নৌকো মেরামতের। কেবল পারীকুট্টি এই মরসুমেও কেনাবেচার কোনও চেষ্টাই করল না। তার বাবা তাকে আড়তের ঝাঁপ ফেলে, অন্য ব্যবস্থা করতে বলল। কিন্তু পারীকুট্টি অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে আর কিছু ব্যবস্থা করতে রাজি নয়। আবদুল্লার অবস্থাও ভালো নয়, তার জমি বন্ধক দেওয়া আছে, মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। উড়নচণ্ডী ছেলের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে উঠল সে। কারুতাম্মা কিন্তু সবাই বুঝতে পারছিল, কেন ছোটমিঞা আড়তদারির কোনও ব্যবস্থা করছে না, তা তো তার কাছে জলের মত স্পষ্ট। সে চাকীকে জোর করতে থাকে পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য, এমনকি বাবাকে সব কথা বলার জন্যও প্রস্তুত হয়। চাকী তাকে কোনরকমে নিবৃত্ত করে, চাকী জানে চেম্পন সব কথা জানলে অনর্থ ঘটে যাবে। কারুতাম্মা এই দুর্বহ বোঝা আর বইতে পারে না। পারীকুট্টিই তার জীবনের একান্ত আপনজন তাকে ঘিরে কারুতাম্মা স্বপ্ন দেখে, আবার সমাজ ও লোকনিন্দার ভয়ে তাকে ভুলেও যেতে চায়। পারীকুট্টিকে নিজের জীবন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলার পথে প্রধান অন্তরায় তার দেওয়া টাকা। যে টাকা তার বাবা ফেরত দিতে চাইছে না। ছোটমিঞার এই দুর্দশার জন্য নিজেকেই দায়ী করে কারুতাম্মা মনে-মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ

সমুদ্রতীরের প্রতিটি পরিবারই অপেক্ষা করছে : কবে মাছের মরসুম আসবে, কবে তাদের অভাবের দিন ঘুচবে। সকলেই ধার-বাকিতে কাজ চালাচ্ছে, আর অপেক্ষা করে আছে মাছের মরসুমের জন্য, যখন হাতে পয়সা আসবে আর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে রাখতে পারবে। চাকীরও সাধ হয়েছে কারুতাম্মার জন্য কিছু গয়না গড়িয়ে রাখার, তার বিয়েতে লাগবে। কারুতাম্মা কিন্তু মরীয়া হয়ে মাকে পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেবার জন্য বলে। পারীকুট্টিও আশা করে, সে এই মরসুমে মহাজনের টাকা শোধ করে বোনের বিয়ের জন্য টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে। আচ্চকুঞ্জও স্বপ্ন দেখছে আউসেপের কাছে টাকা রেখে নৌকো ও জাল কেনার। এইবারে শুরু হল বহু-প্রতীক্ষিত বৃষ্টি, ভয়ানক ঝড়বৃষ্টিতে জেলেদের ঘরবাড়ি সব যেন ভেসে যায়। বৃষ্টি থামল, সমুদ্র শান্ত টল্‌টলে। সমুদ্রতীরে সাজো-সাজো রব : মাছের কারবারিরা, হোটেলওয়ালারা, জামা-কাপড়, গয়নার পশরা সাজিয়ে দোকানিরাও আসন্ন মরসুমের প্রতীক্ষায় উন্মুক্ত। মরসুমের প্রথমদিন থেকেই চেম্পন ভাল মাছ তুলল। আসলে চেম্পন যেমন অকুতোভয়, তেমনি সমুদ্রের প্রতিটি রংবদল তার চেনা, সে উৎসাহী ও অভিজ্ঞ। নৌকোর অন্যদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের কৌশল তার করায়ত্ত। তাই তার নৌকোতেই সবচেয়ে বেশি মাছ ওঠে। প্রথমদিন নৌকো-বোঝাই চিংড়ি মাছ এনে হাজির হয় চেম্পন, পারীকুট্টি তার সঙ্গে দরদাম করতে এগিয়ে আসে, চেম্পন এবারও তাকে ফিরিয়ে দেয়। পারীকুট্টির হাতে টাকা বেশি নেই, সে শেঠের দালাল পাঁচু পিল্লাই-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে কাদের মিঞা চেম্পনের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল। পারীকুট্টি অন্য নৌকোর সঙ্গে দরদাম শুরু করে। চেম্পন অক্লান্ত ভঙ্গিতে নৌকোর অন্য জেলেদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে বিকেলে আরেক খেপ মাছ ধরার জন্য, আচ্চকুঞ্জ একথা শুনে বাধা দেয়, একদিনে দু'বার মাছ ধরার রীতি নেই তাদের সম্প্রদায়ে। চেম্পন এসব মানতে চায় না। পরের দিনও চেম্পনের নৌকোই সবার আগে ফিরছিল, কিন্তু এবার তার সঙ্গে একইভাবে পাল্লা দিয়ে আসছিল ত্রিকুন্নাপুড়া থেকে আসা একটি নৌকো, যার হাল ধরেছিল একটি সুস্থ-সবল জোয়ান ছেলে। তীরে নৌকো ভিড়তেই চেম্পন আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে সাবাসী দিল—এই প্রথম চেম্পন মাছের বেচাকেনায় হেরে গেল। ছেলেটির নাম পালানি। মা-বাপ-মরা ছেলে, কেউ কোথায় নেই—চেম্পনের মনে ধরল ছেলেটিকে। চাকীর পরামর্শে তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়াল। পরস্পরের আলাপে জানতে

পারল যে পালানি অনাথ, ত্রিকুন্নাপুড়ায় একলা-একলাই বড় হয়েছে। কেউ তাকে স্নেহ-সেবা-মমতায় বড় করে তোলেনি। চাকীর মমতামাখা ব্যবহার তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এমন করে কেউ তাকে কখনও রেঁধে খাওয়ায়নি। কেউ তার ভাল-মন্দের খবর রাখেনি, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়নি। আসলে তার জীবনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই; আজ চাকী প্রথম তার জীবন সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে তাকে স্নেহের বাঁধনে জড়িয়েছে। কারুতাম্মার সঙ্গে তার বিবাহ-প্রস্তাবে সে সম্মতি জানিয়েছিল। তবু চাকীর মনে একটা কাঁটা বিঁধেই থাকল—এমন চালচুলোহীন, বাউণ্ডুলে ছেলের সঙ্গে মেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে তারা কি ঠিক করছে? কথাটা চেম্পনকে বলতেই সে তৎক্ষণাৎ নস্যাৎ করে দিল, এবং পালানির সঙ্গেই যে কারুতাম্মার বিবাহ স্থির একথা বলে জানিয়ে দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ

এই মরসুমের শুরুতে নীরকুন্নাথে মাছের কারবার জোর কদমে চলছিল, হঠাৎই প্রকৃতি বাধ সাধল। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং প্রবল বর্ষণে মাছ ধরা অসম্ভব। মাছ ধরলে পাইকারের কাছে চাহিদা নেই, তাই মাছের দাম পড়ে যাচ্ছে। গুদামে মজুত স্তূপীকৃত মাছ পচে যাচ্ছে। এরই মধ্যে পারীকুট্টির দারুণ বিপদ—তার মাছ ভাল করে শুকোয়নি বলে শেঠেরা অভিযোগ করেছে। তারা পয়সা ফেরত দিয়ে মাছ নিয়ে চলে যেতে বলছে। পারীকুট্টির শেষ সম্বল টাকা ক'টা সমুদ্রতীরেই পচে গলে যাচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রামনকুঞ্জের—তার নৌকোর অন্য জেলেদের ধার দেওয়ার জন্য তার হাতে একটি পয়সাও নেই। সে নিরুপায় হয়ে এল চেম্পনের কাছে এবার চেম্পন সহজে টাকা দিল না। নানা ভণিতার পর জানাল নৌকো বাঁধা রাখলে তবে টাকা দিতে পারে—এভাবেই রামনের অভাবের সুযোগে চেম্পন তার নৌকো হস্তগত করল। রামনকুঞ্জের নৌকোটা যেদিন চেম্পন হস্তগত করল সেদিন চাকী আবার তাকে পারীকুট্টির টাকার কথা মনে করিয়ে দিল, এবার কারুতাম্মাও যোগ দিল। চেম্পন তাদের কথায় পাত্তা দিল না। কারুতাম্মার মনে কিন্তু অশান্তির আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছেই, তার হাত থেকে কারুতাম্মার মুক্তি নেই। বাবাকে রাজি করাতে না পেরে, সে মাকে গিয়ে বলল, ছোটমিঞার টাকা তার বিয়ের আগে যেমন করে হোক ফেরত দিতেই হবে, তা নাহলে সে আত্মহত্যা করবে! চাকী মেয়ের মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা জানে; তার ভয়, হয় কারুতাম্মা বোধহয় কোনও অঘটন ঘটিয়ে বসবে। চাকী নিরুপায় হয়ে মেয়েকে শান্ত করতে চায়, কিন্তু কারুতাম্মা মাকে শুধোয়, যদি ছোটমিঞা তার বিয়ের দিনে পথ আটকায়, তার কাছে টাকা চায় তবে কারুতাম্মা কী করবে? চাকী সেই দৃশ্য কল্পনা করে কেঁপে ওঠে। সে কারুতাম্মার কাছে শপথ করে পারীকুট্টির টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। সংসারের টাকা চেম্পন চাকীর হাতে দেয় না। চাকী বাধ্য হয়ে চেম্পনের টাকার বাক্স থেকে একটু একটু করে টাকা সরাতে শুরু করল। বাড়িতে কয়েকটা শুঁট্‌কি মাছের ঝুড়ি আছে সেগুলো বিক্রি করেও কিছু টাকা আসবে। চেম্পন একদিন টাকা নিয়ে ফিরলে চাকী তাকে জিজ্ঞেস করে কত টাকার বিক্রি হল? চেম্পন তার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে টাকা গুনতে শুরু করে। মা-মেয়ে ভয়ে কাঁটা, যদি বাবা বুঝতে পারে টাকা চুরির কথা, কিন্তু চেম্পন চাকীর এই চুরির ব্যাপার ধরতে পারল না দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যদিও মাত্র সত্তর টাকা জমেছে, তবুও তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটু-একটু করে পারীকুট্টির ঋণ শোধ করতে। কারুতাম্মাও নিজের বিবেক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তার নতুন জীবনে সে এই ঋণের ছায়া রাখতে রাজি নয়। পারীকুট্টিকে সে কথা দিয়েছে ঋণের টাকা ফিরিয়ে দেবেই, কারণ সে জানে ছোটমিঞা তার কথাতেই বাবাকে টাকা ধার দিয়েছিল। তার বিয়ে স্থির হওয়ার পর সে পারীকুট্টিকেও সংসারী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এদিকে পালানি পণ না দিয়ে বিয়েতে রাজি হওয়ায় চেম্পন যেমন খুশি, চাকী তেমনি উদ্বিগ্ন। মেয়ের এমন বিয়েতে তার মায়ের মন নিশ্চিত হতে পারছে না। লোভী চেম্পন এতই খুশি সে তার নিজের সুখভোগের চিন্তায় মশগুল হয়ে যায়।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ

কারুতাম্মার বিয়ের ব্যবস্থা সব পাকা। চেম্পনকুঞ্জ প্রথম মেয়ের বিয়েতেও তেমন ঘটাপটা কিছু করতে চাইল না, তার কেবল টাকা-পয়সার দিকে নজর। একদিক দিয়ে তার সুবিধেও হয়েছে, পালানির আত্মীয়-পরিজন কেউ না থাকায়, তাদের দাবি-দাওয়াও নেই; চেম্পন পালানির সঙ্গে গিয়ে তার গাঁয়ের মোড়লকে দক্ষিণা দিয়ে এসেছে, নিজের গাঁয়ের মোড়লকেও দক্ষিণা আর পান-সুপারি দিয়ে শান্ত করেছে। কেবল চাকীর মনেই শান্তি নেই। একে তো চালচুলোহীন জামাই, আবার পারীকুট্টির টাকাটাও চেম্পন শোধ করছে না। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াও হয়ে গেল। চেম্পনের খুব ইচ্ছে পালানিকে ঘরজামাই করে রাখে। চাকীরও অমত নেই, তবু তার সন্দেহ কোনও আত্মসম্ভ্রম থাকা মানুষ কি এই প্রস্তাবে রাজি হবে? তাদের সম্প্রদায়ে এই প্রথা নেই। কারুতাম্মা নিজেও এই প্রস্তাবে রাজি নয়, এই নীরকুন্নাথ গ্রাম, সমুদ্রতীর, পরিচিতজনদের ছেড়ে দূর গাঁয়ে যেতে তার কষ্ট হবে, তবু বিয়ের পর সে এই পরিবেশে থাকতেও রাজি নয়, কারণ পারীকুট্টির উপস্থিতি তাকে যন্ত্রণা দেবে, তার দাম্পত্যজীবনে অশান্তির ঝড় উঠবে—এই ভয়েই সে নীরকুন্নাথ ছেড়ে চলে যেতে চায়। তার মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়—যখন মায়ের কাছে সে খারাপ মেয়েদের গল্প শুনতে চেয়েছে—এমন কোনও জেলেনির কথা, যে অন্যজাতের ছেলেকে ভালবেসেছে। এই পর্যায়ে কারুতাম্মা মানসিক যন্ত্রণায় দীর্ণ, কিন্তু কাউকে বলার উপায় নেই। মায়ের কাছে নিজের কথা উজাড় করে দিতে চেয়েছে সে, তার ভালবাসা এক বিধর্মীর প্রতি—এই অন্যায়বোধ তাকে ভীত করেছে। হাজার-হাজার বছরের সংস্কার তার মানসিকতার কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে।

কারুতাম্মা এক অজানা আশংকায় দিন গুনেছে। চাকী কিছুটা হলেও তার মানসিক অবস্থা অনুমান করতে পারে। তাই বিয়ের পরেই তাকে ত্রিকুন্নাপুড়ায় পাঠিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেছে। এদিকে বিয়ের দিন যত এগিয়ে এল পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারা তাকে নানা উপদেশ দেয়। কারুতাম্মা চুপ করে শোনে। কেবল একটি প্রশ্ন তাকে তাড়া করে ফেরে—সমুদ্রতীরে কোনও জেলেনি কি অন্যজাতের ছেলেকে ভালবেসেছে, তার পরিণতি কী হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই, হয়ত তারা মিশে আছে সমুদ্রের বাতাসে, কিংবা সুদীর্ঘ সব নারকেল গাছের পাতায়-পাতায় বইছে তাদের দীর্ঘশ্বাস, কিংবা বালির স্তূপে চাপা পড়ে রয়েছে তাদের অস্বিত্ব। কারুতাম্মার মনোজগতে এক অদ্ভুত ওঠাপড়া চলছে। ধীরে-ধীরে সে তার পরিচিত জগতের প্রতিটি বস্তুর কাছেই বিদায় নিল। শেষে এল সেই চাঁদনি রাত, আর দুখজাগানিয়া বাঁশির সুর। শেষবারের মতো কারুতাম্মা পারীকুট্টিকে বিদায় জানাতে গেল, লোকলজ্জা, সংস্কার তাকে পারল না বেঁধে রাখতে। অনেক কথা, অনেক ব্যথা জমে আছে—কিন্তু তারা নীরব। কারুতাম্মা শেষে পারীকুট্টিকে সংসারী হতে অনুরোধ করল, তাদের সম্পর্ককে ভুলে যেতে বলল। সে ছোটমিঞার সুখের জন্য প্রার্থনা করবে—কথাটা বলেও সম্পূর্ণ করতে পারল না, কারণ জেলেনির উচিত শুধু তার জেলের মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করা। দুজনেই মূক হয়ে বসে রইল সেই জ্যোৎস্না-স্নাত সমুদ্রতীরে, কেবল দীঘশ্বাস ফেলল তাদের হারানো দিনের জন্য। পারীকুট্টি তাকে সান্ত্বনা দিল, পালানির সঙ্গে সুখে সংসার যেন সে করে, এই কামনাই করল। এই একটু কথাতেই কারুতাম্মার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে, সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পারীকুট্টি শপথ করে সে এই সমুদ্রতীরে বসেই চিরকাল গান গাইবে, সুরের মধ্যেই সে কারুতাম্মাকে স্মরণ করবে। একদিন এইভাবেই তার মৃত্যু হবে। কারুতাম্মাও ভাবল, সেই গানের সুরেই নিমজ্জিত হয়ে সেও মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তাদের আত্মা সমুদ্রের হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। লেখক অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে এই পার্থিব অনুভূতিকে অসামান্যভাবে অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে গেছেন। কারুতাম্মা-পারীকুট্টি নীরকুন্নাথের অতি সাধারণ মানব-মানবীর পরিবর্তে যেন রহস্যময় সুরলোকের বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। তাদের শেষ বিদায়ের দৃশ্য তাই পার্থিব যন্ত্রণার বদলে এক অপার্থিব, অনাস্বাদিত অনুভূতির রেশ জাগায়।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ

মেয়ের বিয়েতে বেশ আড়ম্বরের ইচ্ছে ছিল চাকীর, পাড়া-প্রতিবেশীদের খাওয়াবে, সাজাবে। চেম্পনের কিন্তু টাকা খরচের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও তার বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল। মোড়লকে দক্ষিণা দিয়ে খুশি করতে হল। বিয়ের দিন দশ-পনের জন বরযাত্রী নিয়ে পালানি বিয়ে করতে এল। সকলেই অবাক হয় যে একজন মহিলাও বরযাত্রীদের সঙ্গে আসেনি। চেম্পন এত টাকা থাকা সত্ত্বেও কেন এমন ঘরে-বরে বিয়ে ঠিক করল, তা সকলেরই কৌতূহল ও বিস্ময়ের বিষয়। কেরলের জেলেদের মধ্যে একটা নিয়ম প্রচলিত আছে—বিয়ের সময় কনের গ্রামের মোড়ল বরকে একটা টাকার পরিমাণ বেঁধে দেয়। বর সেই টাকা দিলে মোড়ল এবং কনের বাবা সেটা ভাগাভাগি করে নেয়। কারুতাম্মার বিয়েতে মোড়ল পঁচাত্তর টাকা পণ বেঁধে দিল। বরকর্তা অচ্যুতন এতগুলো টাকার কথা শুনে গেল রেগে। পালানি এতগুলো টাকা কোথা থেকে দেবে! এদিকে মোড়লও ক্ষুব্ধ, সে চেম্পনকে দোষারোপ করল এমন পাত্র স্থির করার জন্য। তার তো উচিত ছিল নিজের মতো অবস্থাপন্ন ঘরেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া। গ্রামের লোকেদেরও একই মত। বরপক্ষের লোকেরা ক্ষুব্ধ, তারাও চেম্পনকে দোষ দিল। এরই মধ্যে বরপক্ষের একজন—পাপু, কারুতাম্মার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল, তার মতে মেয়ের কোনও দোষ আছে, তাই মা-বাপ তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে দিয়ে গাঁ-ছাড়া করতে চাইছে। পাপুর কথায় কেউ আমল না দিলেও, কারুতাম্মার চরিত্র সম্পর্কে প্রথমেই কালিমা লেপন হয়ে গেল। তার শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে প্রথম থেকেই সে কৌতূহল ও অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠল। চাকী এই গণ্ডগোলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পালানি টাকা দিতে রাজি হওয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠান সমাধা হল বটে, কিন্তু গ্রামের মহিলারা পালানির জাত সম্পর্কে সংশয়ী হওয়ায় না খেয়েই বিদায় নিল। বরপক্ষও খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়। এদিকে অসুস্থ চাকীকে নিয়ে চেম্পন মহা-বিপদে পড়ে। সে বার-বার মোড়লকে অনুরোধ করে—মেয়ে-জামাই যাতে দুটো দিন থেকে যায়। চাকী সুস্থ হলে মেয়েকে সে পাঠিয়ে দিবে। বিয়ের পর মেয়ের পক্ষে বাপের বাড়ি থাকা নিয়মবিরুদ্ধ। পালানি বা তার গ্রামের লোকেরাও রাজি নয়। কারুতাম্মা যেতে চাইছিল না, কিন্তু চাকী অপবাদের ভয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য জোর করল। চেম্পন অপমানে দিশেহারা হয়ে কারুতাম্মাকে ত্যাজ্যকন্যা বলে সম্বোধন করে মুখ ফিরিয়ে নিল। কারুতাম্মার বিদায়বেলায় কেউই মঙ্গলপ্রার্থনা করল না। কেবল অপবাদ আর অপমান কুড়িয়ে সে এক অজানা পথে পাড়ি দিল, পিছনে পড়ে রইল তার বাল্য-কৈশোরের স্বর্ণময় স্মৃতি, প্রিয়জন এবং পরিচিত পরিমণ্ডল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ

এ-উপন্যাস নীরকুন্নাথ গ্রাম ছেড়ে ত্রিকুন্নাপুড়া গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে কারুতাম্মার সঙ্গে-সঙ্গে, কারুতাম্মা পালানির সঙ্গে ঘর করতে এসেছে। এই গ্রামের চরিত্র তার নিজের গ্রাম থেকে ভিন্ন। নীরকুন্নাথ গ্রাম কারুতাম্মার নিজস্ব ভূমি, কিন্তু এখানে সে পরবাসে। ত্রিকুন্নাপুড়া গ্রামের লোকেরা তাকে সাদরে আহ্বান করে ঘরে তোলেন। পালানির বউ দেখতে এসে গ্রামের মহিলারা সকলেই বিস্মিত—যার বাবার দুটো নৌকো তার মেয়েকে এমন চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কারণ সন্ধানে তারা নানান জল্পনা-কল্পনা করেছে। তারা সকলেই একমত যে মেয়ের নিশ্চয়ই কোনও দোষ আছে, সে ভ্রষ্টা—তাই মা-বাবা যেমন তেমন করে তাকে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে এসে বিনা অপরাধেই কারুতাম্মা দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেল। পালানির পিতৃ-মাতৃহীন সংসারে কারুতাম্মা প্রথম থেকেই গৃহিণী। অগোছালো, ছন্নছাড়া সংসারে সে দিশেহারা—একটা হাঁড়ি আর হাতা ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই। প্রথমদিনই নববধূর লজ্জা ত্যাগ করে পড়শির বাড়ি থেকে বাসন, মশলা চেয়ে এনে খাবার জোগাড় করতে হয় তাকে। পালানি ফিরে এলে অতি সংকোচে সে পরিবেশন করে, এবং সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষ কিনে আনতে অনুরোধ করে। নববিবাহের লজ্জা-আবেগ নয়,

প্রাত্যহিকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যেই তার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। পালানিকে এখানে এক সংবেদনশীল মানুষ বলেই মনে হয়েছে। কারুতাম্মার কথামত সে সংসারে উন্নতি বিধানে উৎসাহ দেখিয়েছে, বাড়িঘর মেরামতের কথা বলেছে। কারুতাম্মা প্রাণপণে খাঁটি থেকে পালানির এবং সংসারের সেবায় মন দিয়েছে। বাবা-মায়ের সংগ্রামের সে প্রত্যক্ষদর্শী, তার নিজের সংসারকেও সেইভাবেই গুছিয়ে তুলতে চেয়েছে। বেহিসেবি পালানির কাছে মাছের ভাগ জানতে চেয়েছে, কারণ এক-এক জায়গায় ভাগ এক-এক রকমের। পালানি যাতে হিসেব করে চলতে পারে সেদিকে সজাগ হতে চেয়েছে। পালানি ও কারুতাম্মার নিজস্ব দাম্পত্যজীবন শুরু হয়েছে মসৃণ অন্তরঙ্গতায়। কারুতাম্মা এক পুরুষকে ভালবেসেছিল মনে-প্রাণে, আরেক পুরুষের সবল আলিঙ্গনে সেই স্মৃতি ভুলে যেতে চেয়েছে। তার মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে আবেগ-আনন্দ আবার ভয়, হয়ত পালানি এই সমর্পণে নির্লজ্জতা খুঁজে পাবে। আসলে পারীকুট্টির অস্তিত্ব তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারেও পালানি কঠোর, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পালানি নারাজ। কারুতাম্মা কষ্ট পেলেও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি। এইভাবে ভয়, লজ্জা-সংকোচ ও আবেগে তারা পরস্পরের কাছে এসেছে। এই পরিচ্ছেদে জেলেদের আরেকটি সংস্কার সম্পর্কেও জানা যায়। বিবাহিত পুরুষরা সমুদ্রে যাওয়ার আগে স্নান সেরে শুদ্ধ শরীর ও মনে নৌকোয় যায়। এই সংস্কার হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়ার রীতির সঙ্গে তুলনীয়। জেলেদের কাছে সাগর-মাও তাদের ধাত্রী, জননী ও দেবী!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ

কারুতাম্মা অল্পদিনেই সুগৃহিণী হয়ে উঠেছে একদিনেই এক অপরিচিত পুরুষ তার একান্ত অন্তরঙ্গ। তার ভালমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কারুতাম্মার ভবিষ্যৎ। পালানি দুপুরে ফিরবে বলে সে অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু পালানির দেখা নেই। সমুদ্রতীরে গিয়ে পড়শির কাছে জানতে পারে আজ মাতি মাছ প্রচুর উঠেছে। তাই জেলেরা সব আরিপাঠ শহরে ফুর্তি করতে গেছে। তার গ্রামেও জেলেরা এভাবেই আলেপ্পী শহরে যেত, সমস্ত পয়সা নষ্ট করত। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে জানত না। কারুতাম্মা ক্ষুব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, পালানি বাড়ি এলে কারুতাম্মা তাকে ঠাট্টা করে পালানির মধ্যে কোনও রসবোধ ছিল না। সে সিন্ধের 'নেরীদ' কারুকে দেখায়, কারুতাম্মা যখন বাসন কেনার কথা বলে তখন পালানি অবলীলায় বলে যে, মেলায় যাওয়ার জন্য সে কাপড় কিনে এনেছে। এই অযাচিত উপহারে কারুতাম্মা আপ্লুত। বউকে ভালবেসে সে উপহার দেয়; সংসারের প্রয়োজন তো চিরকালের। কারুতাম্মা পালানিকে জাল ও নৌকো কেনার প্রস্তাব দিলে, পালানি তার নিজস্ব যুক্তিতে বোঝায় যে জেলেরা সাগর-মার সন্তান, তাদের সামনে সাগরের অপার সম্পদ। কিন্তু নিরীহ জীব শিকার করার অপরাধে তাদের ভাগ্যে সম্পদ নেই। পালানি এ-প্রসঙ্গে কারুতাম্মার বাবার লোভের প্রতিও কটাক্ষ করে। তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আবার তার চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করে পালানি। কারুতাম্মা একেই অপরাধবোধে জর্জরিত, পালানির সন্দেহ সে সহ্য করতে পারে না। পালানিকে সে সব কথা খুলে বলতে চায়, কিন্তু এক অজানা আশংকা তার কণ্ঠরোধ করে। তাদের দাম্পত্যজীবনকে গ্রাস করে সন্দেহ, অবিশ্বাসের কালো ছায়া। যেদিন মাছ ধরতে নৌকোর হালে বসে পালানি, সেদিন সে যেন অন্য মানুষ। তার মানসিক বিপন্নতা অস্থির হালচালনায় প্রকাশ পেয়েছে। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে নৌকো চালিয়েছে, আসলে তার পৌরুষ আহত হয়েছে। নৌকোর অন্য সঙ্গীরা তাকে সাবধান করেছে, শেষে নিরুপায় হয়ে হাল ছিনিয়ে নিয়েছে। পালানির এই ভূতগ্রস্থ দশার জন্য তার স্ত্রীর অশুচিতার প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে তারা। (এই পরিচ্ছেদ থেকেই তাদের ক্ষণিক দাম্পত্যজীবনে অশান্তির গভীর গহ্বর হাঁ করে তাদের অস্তিত্বকে সংকটময় করে তুলেছে।)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ

এই পরিচ্ছেদে উপন্যাস আবার একটা জটিল বাঁক নিয়েছে। কারুতাম্মার বিয়ের পর তাকে শ্বশুরবাড়ি

নিয়ে আসার কথা চেম্পন একবারও উচ্চারণ করে না। মেয়েকে চারদিনের দিন বাপের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার যে রেওয়াজ জেলে-সমাজে রয়েছে, তা পালন করা না হলে সমাজে নানা কথা উঠবে, মেয়েরও হেনস্থা হবে। অসুস্থ চাকী চেম্পনকে অনুরোধ করে কারুতাম্মাকে নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু নির্দয় চেম্পন চাকীর মুখ চেয়েও কন্যাকে ক্ষমা করে না। তার অহংকারী মন মেয়ের মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তায় ব্যথিত হয় না। এমনকি অসুস্থ চাকীর কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থাও সে করেনি। অন্যদিকে কারুতাম্মার শ্বশুরবাড়ির গ্রামেও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। হতদরিদ্র পিতামাতাও মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যায়, কারুতাম্মার বাবা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে নিতে কেউ এল না, এ ব্যাপারে সকলেই কৌতূহলী। কারুতাম্মার চারিত্রিক শুচিতা সম্পর্কে সন্দেহ আরো গাঢ় হয়েছে এই অস্বাভাবিক ঘটনায়। কারুতাম্মা নিজে থেকে নীরকুন্নাথ যেতে চেয়েছে, কিন্তু পালানির প্রবল ও রূঢ় আপত্তিতে তা সম্ভব হয় নি। চাকী মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তায় দিন-দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে, পরিত্রাণের উপায় তার জানা নেই। চেম্পনও শরীরে-মনে ভেঙে পড়ছে। তার কর্মঠ হিসেবি মন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। আসলে চাকীর পরামর্শ ও সাহচর্য তাকে জীবনের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চাকীর অসুস্থতা তাকেও নিরুৎসাহ করেছে। চাকীর অস্থিরতা, আকুলতা চেম্পনের মনে কোনও দাগ কাটতে পারেনি। চেম্পন যদি একটু সমব্যথী হত, তাহলে উপন্যাসের পরিণতি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু লেখক চেম্পনকে একই রঙে রাঙিয়েছেন আর সে রঙ কালো। পারীকুট্টি চাকীর অসুস্থতার খবর শুনে তাকে দেখতে আসে। চাকী পারীকুট্টিকেও ছোটবেলা থেকেই জানে, চেনে। তাকে চাকী স্নেহ করে, আবার পারীকুট্টির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং অপরাধরোধেও সে কুণ্ঠিত ; পারীকুট্টিকে দেখে তার মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়েছে। কারুতাম্মার বিয়ে যে সুখের হয়নি, সেকথা জানিয়ে পারীকুট্টির ওপর নিজের মেয়ের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছে। আসলে জলে-ডোবা নিরাশ্রয় মানুষ যেমন করে খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে চায়, তেমনি চাকী এই মুসলমান অনাত্মীয় ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। চাকী জানে পারীকুট্টি কারুতাম্মাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা কোনও প্রতিদান চায় না। কিন্তু চাকী এই নামগোত্রহীন সম্পর্ককে ভয় করে, সমাজ-নিষিদ্ধ সম্পর্কের প্রতি সমর্থন জানানোর মতো মানসিক জোর তার নেই। তাই পারিকুট্টিকে কারুতাম্মার 'ভাই' সম্বন্ধে বেঁধে সে বাঁচতে চেয়েছে। এক অসম্ভব সম্পর্ককে সামাজিক সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে। পারীকুট্টি চাকীর এই আচরণে দুঃখিত, কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিনী এক মাকে সে কষ্ট দিতে পারেনি, স্বীকৃতি জানিয়েছে এই অসম্ভব সম্বন্ধকে। এই পরিচ্ছেদের শেষে চাকীর মৃত্যুতে উপন্যাসের একটি পর্ব শেষ হয়েছে। চেম্পনের অসম্ভব বেশি কর্মস্পৃহা, তার সুসামঞ্জস্যময় জীবন চাকীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে, নির্মূল হয়ে গেছে কারুতাম্মার নীরকুন্নাথ ফেরার উপায়। তার বাপের বাড়ি ফেরার রাস্তা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল পারীকুট্টির হৃদয় আবার আন্দোলিত হয়েছে, সে-আবেগ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, চাকীর ভাব-বেদনা সেই আবেগ-উষ্ণতাকে উস্‌কে দিয়ে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে এর ফল ভোগ করতে হয়েছে তাদেরকে জীবনের বিনিময়ে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ

চাকীর মৃত্যু চেম্পনকুঞ্জের জীবনে আকস্মিক দুর্যোগ হয়ে দেখা দিল। চাকী অসুস্থ, শয্যাশায়ী তবু চাকীর অস্তিত্ব তার কাছে স্বস্তির বিষয় ছিল, আজ তার মৃত্যুতে চেম্পন যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মাতৃহীন পঞ্চমী নাল্লপেন্নের আশ্রয়ে সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু সকলেই চাকীকে কবর দেওয়ার আগে কারুতাম্মাকে খবর দেওয়ার জন্য চেম্পনকে অনুরোধ করে। চেম্পন মেয়েকে আনতে যাওয়ায় অনিচ্ছুক। তার মতে কারুতাম্মাই চাকীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। যে মেয়ে অসুস্থ মা, অসহায় বোনকে ছেড়ে, বাবার অনুরোধ উপেক্ষা করে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে পেরেছে তাকে খবর দেওয়া নিরর্থক। গ্রামবাসীরাও চেম্পনের সঙ্গে একমত। একমাত্র পারীকুট্টিই বিচলিত— তার মনে হয়েছে কারুতাম্মাকে খবর না দিলে, চাকীর আত্মা তার ওপর অসন্তুট হবে। 'ভাই' হিসেবে তার উচিত এই শোকসংবাদ ত্রিকুন্নাপুড়ায় পৌঁছে দেওয়া। মাঝরাতে অস্থিরভাবে ঘুম থেকে উঠে সে রওনা দেয় কারুতাম্মার

গ্রামের উদ্দেশে। ঘটনাচক্রে গ্রামের এক জেলে কোচ্চুনাথনকে সে পালানির বাড়ির হদিশ জিজ্ঞাসা করে। কোচ্চুনাথন কৌতূহলী হয়ে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে, এক অনাত্মীয় ভিন্‌ধর্মী যুবক এমন এক শোকসংবাদ বহন করে এনেছে তা অবিশ্বাস্য ঠেকে তার কাছে। পালানির অনুপস্থিতিতেই পারীকুট্টি তার ঘরে উপস্থিত হয়। আসলে সামান্য বাস্তববুদ্ধি থাকলে সে এমন কাজ করতে পারত না, কিন্তু হৃদয়ের আবেদন অস্বীকার করার শক্তি তার ছিল না। কারুতাম্মাও তার উপস্থিতিতে অমঙ্গলের আশংকায় কেঁপে উঠেছে। পারীকুট্টি তাকে নানাভাবে অনুরোধ করলেও সে শোনেনি, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করেছে। পারীকুট্টি চাকীর সঙ্গে তার সর্বশেষ কথাবার্তার উল্লেখ করে। যখন সে বলেছে 'ভাই'-এর কর্তব্য করতে এসেছে, তখন কারুতাম্মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। চাকীর মৃত্যুসংবাদ দিয়েই পারীকুট্টি ফিরে গেছে। কিন্তু গ্রামে কারুতাম্মার নামে কলঙ্ক কুৎসা উঠেছে চরমে। পালানিকে জেলেরা অমঙ্গলের আশংকায় নৌকো থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এই প্রথম পালানি কারুতাম্মার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছে—কারুতাম্মা স্বভাবতই কিছুটা আড়াল, কিছুটা আবছায়া রেখে তাদের সম্পর্কের কথা স্বামীকে জানিয়েছে। বলেছে অতীত জীবন ভুলে সে খাঁটি জেলেনি হয়েই বাঁচতে চায়। পালানির প্রতিক্রিয়া দুরূহ রহস্যময়তায় আবৃত। তবে তার আচরণে স্ত্রীর বাবা-মায়ের সম্পর্কে ঘৃণা ঝরে পড়েছে। পালানি এক গভীর দোলচলে মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলল—স্ত্রীকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে সে সংসার করতে চেয়েছিল, বাস্তব ঘটনা তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। (এই পরিচ্ছেদ থেকে তাদের দাম্পত্য অসন্তোষ চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ

কারুতাম্মা স্বামীর কাছে কিছুই লুকিয়ে রাখেনি। পারীকুট্টির সঙ্গে তার বাল্যসম্পর্কের কথা স্বামীকে জানিয়েছে। পালানি তাকে কিছু না বললেও, আগের মতো সহজ হতে পারছে না। স্ত্রীকে একান্ত আপনজন বলে তার আর মনে হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এদিকে সংসারের আর্থিক অবস্থাও দুর্বিষহ। পাপুর সঙ্গে পালানির মারপিটের ফলে গ্রামের লোক পালানিকেই দোষী করল। পালানি হালে বসে না, মাছ উঠছে কম তাই ভাগও কম পায়। বাধ্য হয়ে কারুতাম্মা মাছ ফেরি করতে পথে বেরোল। তার অনভ্যস্ত আচরণ, অনভিজ্ঞতার ফলে প্রথমদিনই সে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অন্য জেলেনিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। দ্বিতীয় দিন সে কয়েকটি বাঁধা খদ্দের ঠিক করে আসে। সংসারের শ্রী ফেরানো দূরে থাক, পরনের কাপড়টুকু জোটানোও অসম্ভব হয়ে উঠছে। কারুতাম্মা মাছ ফেরি শুরু করাতে অন্য জেলেনিদের জিভের ধার আরও তী্ হয়ে ওঠে। তারা এই নিরীহ, ভাগ্যহীন মেয়েটির আচার-আচরণ এবং খদ্দেরের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে। নিরুপায় কারুতাম্মা আবার ঘরে বসে যায়, বিনা অপরাধে কঠিন শাস্তি সহ্য করে যেতে হয় তাকে। এদিকে পালানির অবস্থাও তথৈবচ! অন্য জেলেরা তাকে নৌকোয় রাখতে ইচ্ছুক নয়, কেউ-কেউ যদিও এই প্রাচীন সংস্কারের বিরোধিতাও করেছে। তবে পালানির অনুপস্থিতিতে অনেকেই তার স্ত্রীর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে, নৌকোর মালিক কুঞ্জন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে একমত। পালানির অনুপস্থিতিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় পালানিকে নৌকোয় নেওয়া হবে না। কুঞ্জন প্রথমে আপত্তি জানায় কারণ পালানি তার নৌকোয় ছোটবেলা থেকে কাজ করছে, কিন্তু সকলের সমবেত ইচ্ছের কাছে তাকে হার মানতে হয়। পরের দিন পালানিকে না জানিয়েই নৌকো সাগরে ভাসে। পালানি সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখে তার সঙ্গী-সাথীরা কেউ নেই। তাদের ফেরার জন্য আওয়াজ দিয়েও সাড়া পায় না। পালানি সর্বহারা—জল যার জীবন, নৌকার হালের কর্তৃত্ব যার পৌরুষের প্রতীক, সব হারিয়ে পালানি পাগলের মতো আচরণ করেছে। স্ত্রীর আনুগত্যের চেয়েও তার কাছে অধিক প্রিয় সমুদ্রবিহার। তার জীবনসমুদ্রের ঢেউও এর সঙ্গেই গাঁথা হয়ে আছে। পালানির সঙ্গীদের এই নিষ্ঠুর নির্মম আচরণে আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে সাগর-মার সন্তানের।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ

পালানি ঘরে ফিরে তার রাগ-ক্ষোভ, অসন্তোষ উগ্‌রে দেয় কারুতাম্মার ওপর। এই প্রথম সে সরাসরি কারুতাম্মাকে দোষী করে নিজের অবস্থার জন্য। তার এই রূঢ় আচরণে কারুতাম্মা ভেঙে পড়ে, তার আন্তরিক চেষ্টা এবং আনুগত্য মিশে যায় ধুলোয়। পালানি অবশ্য নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে—কারুতাম্মার বাবা-মাকে এই অঘটনের জন্য দায়ী করে এবং অনাগত সন্তানকে যে সে নিজের মতো করে মানুষ করে তুলবে সেকথাও জোরের সঙ্গে বলে। কারুতাম্মা এক আশ্চর্য স্বস্তিতে হয়ে ওঠে ভরপুর। স্বামীর কাছে সন্তানের স্বীকৃতি তাদের দাম্পত্য-জীবনের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দেয়। অসীম সাহসী পালানি কারুতাম্মাকে আশ্বস্ত করে : তাকে সাগর-মার কৃপা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই। তার একটিমাত্র দাবি, স্ত্রী যেন শুদ্ধাচারে থাকে। পালানির এই অধিকারবোধ কারুতাম্মাকে প্রকৃত অর্থে স্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেয়। তাদের হারানো সুখ ফিরে আসে। পালানি মাঝরাতে লুকিয়ে অন্যের নৌকো নিয়ে বঁড়শিতে মাছ ধরতে শুরু করে। কারুতাম্মার জমানো টাকায় এবং তার গহনা দিয়ে একটা ছোট নৌকো ও বঁড়শি কিনে নতুন করে জীবন-সংগ্রাম শুরু করে। হাসি-কান্নায় তাদের দিন কাটে। সন্তানের জন্মের পরে পালানি আরো বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে কারুতাম্মার প্রতি। তার আচরণে রূঢ়তা নেই; কেবল নিজের জীবন নিয়ে তার নিঃশব্দ হাহাকার। সমুদ্রে মাছ-মরা নৌকোগুলো তার স্নায়ুতন্ত্রীকে উত্তেজিত করে তোলে, সে স্বপ্ন দেখে আবার মাছ শিকারে যাওয়ার। সংসারে সন্তান তার শূন্য, অবশ হৃদয়কে ভরিয়ে রাখে। কিন্তু এই শান্তি ক্ষণস্থায়ী—কারুতাম্মা নীরকুন্নাথ যেতে চাইলে, অতীত স্মৃতি পালানিকে বিক্ষুব্ধ করে। সে কারুতাম্মাকে পারীকুট্টির সম্পর্কে অশ্লীল ইঙ্গিত করে। বিচলিত কারুতাম্মা ভাবে কোন্ উপায়ে এই সন্দেহের কালো মেঘকে তাদের জীবনের আকাশ থেকে দূর করতে পারে? কবে সে স্বামীর কাছে পূর্ণরূপে বিশ্বাযোগ্য হয়ে উঠতে পারবে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ

এই দুই পরিচ্ছেদে কাহিনী আবার ফিরে এসেছে নীরকুন্নাথ গ্রামে। চেম্পনকুঞ্জ চাকীর মৃত্যুতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তার সংসার কাণ্ডারীহীন নৌকোর মত এলোমেলো চলছে। আচ্চকুঞ্জের পরামর্শে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আনল কাণ্ডানকোরাণের বিধবা স্ত্রী পাপীকুঞ্জকে। আসলে কাণ্ডানকোরাণের জীবনযাত্রার প্রতি লোভ এবং তদ্‌জনিত হীনম্মন্যতাই এই বিয়ের কারণ। বড় ঘরের মেয়ে পাপীকুঞ্জ চেম্পনের সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারল না। পঞ্চমীও তাকে স্বীকার করেনি, তার নিজের ছেলে গঙ্গাদত্তনও এ বিয়েতে অখুশি। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই সে এই বিয়েতে সম্মতি জানিয়েছিল। এখন চেম্পনের অবস্থাও ভালো নয়, তার ব্যবসা মন্দা, তার নৌকো অকেজো। সে কথায়-কথায় চাকীর সঙ্গে তুলনা করে পাপীকুঞ্জের আত্মগ্লানি আরো বাড়িয়ে দেয়। একদিন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে আউসেপের কাছে টাকা ধারের বন্দোবস্ত করে নৌকো বন্ধক রেখে; এই সর্বনাশা কাজ করতে চেম্পনও নিরস্ত হল না। এদিকে গঙ্গাদত্তন মাকে ক্রমাগত টাকার জন্য চাপ দেওয়ায়, পাপীকুঞ্জ বাধ্য হয়ে আউসেপের টাকা থেকে ছেলেকে কিছু টাকা দেয় লুকিয়ে। পঞ্চমী একথা বাবাকে বলায় রাগে দিশেহারা চেম্পন পাপীকুঞ্জকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পাড়া-প্রতিবেশী এই অসহায়া রমণীকে আশ্রয় দিয়ে মোড়লের কাছে নালিশ করে। মোড়ল চেম্পনের এই বিয়েতে আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিল, তার প্রাপ্য প্রণামী চেম্পন দেয়নি। এবার সে চেম্পনেকে ডেকে পাঠিয়ে এর বিহিত করতে চাইল। চেম্পন মোড়লকে এবং সমাজের ভয়কে অগ্রাহ্য করে পাপীকুঞ্জকে তার রক্ষিতা বলে ঘোষণা করল এবং তাকে চোর সাব্যস্ত করল। মানুষ কতখানি নীচ-হীন হলে এভাবে একজনের অসহায়তার সুযোগ নিতে পারে চেম্পন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। নিজস্ব স্বার্থচিন্তা ছাড়া কোনও আবেগ কোনও সম্পর্ক তাকে নাড়া দিতে পারে না। মোড়লের ওপরও সে চোখ রাঙিয়েছে, আবার পাপীকুঞ্জকে আশ্রয়ও দিয়েছে। এই ক্ষোভ ও দুঃখে পাপীকুঞ্জ যখন কারুতাম্মার সম্পর্কে কুৎসার কথা বলেছে তখন চেম্পন

বিচলিত হয়ে স্বাভাবিক হারিয়েছে। কারুতাম্মার এই কলঙ্ক তার পিতৃহৃদয় সহ্য করতে পারেনি। তাই তার শেষ আশ্রয়স্থল চাকীর কবরে জবাবদিহির জন্য কৈফিয়ৎ তলবের জন্য ছুটে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ

উপন্যাস দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাপীকুঞ্জ ঘর ছেড়েছে। চেম্পনের অবস্থার দিন-দিন অবনতি হচ্ছে। আউসেপের কাছে টাকা নিয়েও সে টাকার সদ্ব্যবহার সে করতে পারছে না। আসলে কারুতাম্মার নামে কুৎসা তাকে পাগল করে তুলেছে। গ্রামের লোকেরাও চেম্পনের এই অবস্থায় কষ্ট পাচ্ছে। এদিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা জীবন-সে জীবন পারীকুট্টির। উদ্দেশ্যহীন নিঃসঙ্গ পারীকুট্টির ব্যবসা ধসে গেছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই, দুবেলা দুমুঠো জোটাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্যম হারিয়ে সে কেবল সমুদ্রবেলায় তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে অনুসন্ধান করে। এমনিভাবে একদিন সে মুখোমুখি হয় চেম্পনের। চেম্পন তার কাছে এসে নিজে ঋণের পরিমাণ জানতে চায়। এই প্রশ্ন আসলে চেম্পনের নিজের বিবেকের প্রতি, অবচেতনে সে মানে, পারীকুট্টি টাকা দিয়েছে কারুতাম্মার প্রতি দুর্বলতায়। পারীকুট্টির দুরবস্থার জন্য দায়ী সে নিজে। কিন্তু বাইরে সে-কথা স্বীকার করতে চায় না। তাই পারীকুট্টিকে দোষারোপ করে সে তার সংসার-ধ্বংসের জন্য, যেন পারীকুট্টিই তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। উপন্যাসের এই শেষ পর্যায়ে চেম্পন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত, অস্বাভাবিক। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েছে। আউসেপের দেওয়া টাকা সে পারীকুট্টিকে ফেরত দিয়ে ঋণমুক্ত হয়েছে। পারীকুট্টির কাছে এই টাকা মূল্যহীন। কারণ টাকার জৌলুসে ভুলে সে কারুতাম্মার ভালবাসার সওদা করেনি।

পঞ্চমী নীরকুন্নাথ ছেড়ে দিদির কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কারুতাম্মা এতদিন পর বোনকে কাছে পেয়ে আবেগে ভেসে গেছে। পঞ্চমী বাড়ীর কথা, গ্রামের কথা সব বলে হাল্কা হতে চায়। পঞ্চমী দিদির ওপর রাগ, অভিমান করে। বাবার কথা শুনে কারুতাম্মার মন ভারাক্রান্ত হয় বিষাদে। আরো অনেক কথা সে জানতে চায় কিন্তু পালানির উপস্থিতিতে সেকথা বলতে চায় না। পালানি পঞ্চমীর এই আসাটাকে ভালো মনে নিতে পারে না-কারণ পঞ্চমীর সঙ্গে বয়ে এসেছে নীরকুন্নাথের বাতাস, যা পালানির সংসারে অশান্তির কারণ। কারুতাম্মা তাড়াতাড়ি পালানির জন্য খাবার ব্যবস্থা করে। পালানি চলে গেলে দুই-বোনে সুখ-দুঃখের কথায় মগ্ন হয়, অবশ্যম্ভাবী রূপেই পারীকুট্টির প্রসঙ্গ আসে। ছোটমিয়ার দুর্দশায় সে উদ্বেল হয়। পঞ্চমীকে সে বলে ছোটমিয়া তার কথা জানতে চায় কিনা। ঠিক সেই মুহূর্তেই পালানি ঘরে ফেরে। আসলে সন্দেহের বীজ তার মনে, স্ত্রীর আচরণ যাচাই করার জন্যই সে বেরিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসেছে। এতদিনের অব্যক্ত, অজানা অনুভূতি, যা কারুতাম্মা আড়াল করে রেখেছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোনও আড়াল রইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে দুটো ঘটনা ঘটেছে—পালানি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মাদপ্রায় অবস্থায় সমুদ্রে গেছে। অন্যদিকে নিঃস্ব রিক্ত পারীকুট্টি এসেছে কারুতাম্মার কাছে আশ্রয় সন্ধানে। মাঝসমুদ্রে ডিঙি নৌকোয় পালানির প্রাণপণ সংগ্রাম, হাঙর ধরা (হেমিংওয়ের) 'Old Man and the Sea' উপন্যাসের হাঙর শিকারের চিত্রকল্প মনে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অক্লান্ত জীবনসংগ্রাম। হেমিংওয়ের মানব-আত্মা জয়ী, কিন্তু এই উপন্যাসের পালানি হারিয়ে গেছে সামুদ্রিক ঘূর্ণিতে, সাগর-মার সন্তান আশ্রয় পেয়েছে তার কোলে। পালানির জীবন-যন্ত্রণার অবসান হয়েছে সমুদ্রের অতল গহ্বরে। এই মৃত্যু, আত্মহত্যাই—এছাড়া অন্যকিছু সম্ভবও ছিল না। অহংকারী পৌরুষ অপমানে নিজের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। এর সঙ্গে লেখক আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন জেলেসমাজের লোক সংস্কারকে। স্ত্রীর অপবিত্রতা, অশুচিতা স্বামীর অমঙ্গলের কারণ—এই বিশ্বাসও এখানে প্রাণ পেয়েছে। তবে লেখক পরিণতিকে নাটকীয় করে তুলতেই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। সামুদ্রিক ঝড়, ঘূর্ণি,

পালানির সংগ্রাম, শেষমুহূর্তে ঘূর্ণির ভেতর সাগর--মার রাজপ্রাসাদ—এই টুকরো টুকরো ছবি ও বর্ণনা—পালানির মৃত্যুকে যেন রহস্যময় কোনও এক অতীন্দ্রিয়তায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

কারুতাম্মা এবং পারীকুট্টি জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো মিলিত হয়েছে। এতদিনের সংযমী প্রেম শরীরী আশ্রয় খুঁজেছে। কারুতাম্মার মানসিক বিপর্যয়ের সেই মুহূর্তে পারীকুট্টির আহ্বানকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তারা একে অপরকে আশ্রয় দিতে চেয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার পরিণতি তাদের অজানা নয়। পারীকুট্টির জীবনের ধ্রুবতারা—কারুতাম্মা। আর কারুতাম্মার জীবনের আসল আশ্রয়ও পারীকুট্টি। পালানি তাকে ত্যাগ করে গেছে। সমাজ তাকে একঘরে করেছে। 'বিধর্মী' প্রেমিকের সংসারে গৃহিণী হওয়ার সাহস তার নেই। তাই মৃত্যুর মধ্যেই মিলন চেয়েছে সে। তাদের মৃত্যু তাদের আত্মিক বন্ধনকে আবদ্ধ করেছে এক মহান গ্রন্থিতে। তারা আশ্রয় পেয়েছে চিরশান্তির দেশে। উপন্যাসটি শেষ পর্যায়ে প্রাত্যহিক তুচ্ছ আবেদনের গণ্ডী অতিক্রম করে এক অনির্বচনীয় অনুভবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

১০৮.৭ চরিত্র বিশ্লেষণ

১০৮.৭.১ প্রধান চরিত্র

পারীকুট্টি

টি. শিবশঙ্কর পিল্লাই-এর 'চেম্মীন' উপন্যাসের মূল উপজীব্য—দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যুবক-যুবতীর ব্যর্থ, করুণ প্রেম এবং কেরলের জেলেসমাজের সামগ্রিক জীবনায়ন। জেলেদের আর্থ-সামাজিক, লৌকিক জীবন উপন্যাসের ব্যর্থ প্রেমের সমান্তরালে রচিত। কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির প্রেমের ব্যর্থতা ও উপন্যাসের পরিণতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে এক লৌকিক সংস্কার। হাজার বছরের প্রাচীন লোকগাথা যে-সংস্কারের উৎস। মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যেমন সত্য, তেমনই সত্য ধর্ম, সমাজ-প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রমের ইচ্ছে। যদি তারা দুজনের কেউ-ই এই সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারে না, কারণ সেই শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে নেই। ধর্মীয় বিভেদকে অতিক্রমের কোন চেষ্টা পারীকুট্টির তরফ থেকেও ছিল না।

উপন্যাসটি মূলত নায়িকা-কেন্দ্রিক। পুরুষ চরিত্রদুটি তাকে ঘিরেই আবর্তিত। কারুতাম্মাই মূল চালিকা শক্তি। এরা দুজনেই ছোটবেলা থেকে সমুদ্রতীরে হেসে-খেলে বড় হয়েছে, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের প্রান্তে এসে পরস্পরের হৃদয়-বিনিময় অস্বাভাবিক নয়, বরং এখানে মানবধর্ম তথা হৃদয়ধর্মের জয়ই স্বাভাবিক। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রণয়ের অনুষঙ্গেই পরবর্তীকালে বারবণিতা রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত ত্যাগ করেনি, বরং সমাজবিধি, লোকনিন্দা ও সংস্কারের ভয় জয় করে রাজলক্ষ্মীর পাশে থেকেছে। ভবঘুরে শ্রীকান্তের মতো এই চারিত্রিক দৃঢ়তা পারীকুট্টির ছিল না। সামাজিক নিয়মে তাদের মিলন সম্ভব নয় জেনেও বাঁশির সুরে কারুতাম্মার হৃদয়ে ঝড় তুলেছে সে। কিন্তু সেই ঝড় প্রশমনের উপায় তার কাছে নেই। পাত্র হিসেবে সে কাঙিক্ষত হলেও সে বিধর্মী, তাই তার সাহায্যে নৌকো-জাল কেনা হলেও, মেয়েকে তার হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারে না চেম্পন। পারীকুট্টিও প্রেমিকার অনুরোধেই চেম্পনকে সাহয্য করেছে, কোনও কিছু প্রাপ্তির আশা তার ছিল না। মিলনের মাধুর্যে তার প্রেম ভরে উঠবে না, তা জেনেও সে দেউলে হয়ে গেছে। মাছের কারবার তার বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তবু কখনও চেম্পনের কাছে টাকা ফেরত চায়নি। কারুতাম্মার বিয়ের আগে বিদায়ের মুহূর্তেও সে মুখর হতে পারে না অলক্ষ্য আবেগে। তার শপথ, সে বাঁশির সুরে স্মরণ করবে তাদের স্বপ্নময় কৈশোরবেলা। যদি সে কোনওভাবে কারুতাম্মাকে পেতে চাইত, তাহলেও আমরা তাকে স্বার্থান্বেষী ভাবতে

পারতাম। কিন্তু কোন প্রত্যাশা না রেখেই সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তার চরিত্র দেব-দুর্লভ এক মহিমায় অন্বিত হয়ে উঠলেও 'বাস্তব' মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি সে।

পারীকুট্টি নিশ্চেষ্ট চরিত্র, কুৎসা বন্ধ করার কোনও চেষ্টাই সে করেনি। বরং তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলেও তার নীরকুন্নাথে অবস্থান—সেই কুৎসার তুষের আগুনকে ধিকি-ধিকি জ্বালিয়ে রেখেছে। অসুস্থ চাকীকে দেখতে এসে সে কারুতাম্মার 'ভাই' বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রিণীকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু চাকীর মৃত্যুর খবর মাঝরাতে কারুতাম্মাকে জানাতে যাওয়ায় যে অবিবেচনা ও হঠকারিতা করেছে, তার সঙ্গে পূর্বের পারীকুট্টিকে মেলানো যায় না। কারুতাম্মার নিন্দার ভয় না করেই সে ত্রিকুন্নাপুড়ায় গিয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ পর্যায় আমরা তার মধ্যে থেকে এক বাস্তব-মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখি। এক ঝড়ের রাতে 'পরাণসখা' পারীকুট্টি অভিসারের আতীব্র আবেগে ভেসে এসেছে কারুতাম্মার আশ্রয়ে। আসলে এক হাল-ভাঙা দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক, আশ্রয় চেয়েছে 'সবুজ দারুচিনি দ্বীপে'। তার মানস আশ্রয় সে খুঁজতে এসেছে মানসী কারুতাম্মার কাছে। তার যন্ত্রণা, বেদনা, মূক আবেগ এতদিনে নির্ঝরিণী হতে চেয়েছে। দুই প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তপ্ত আবেগে ভেসে গেছে সংস্কার, সমাজ, দায়িত্ববোধ। এর পরিণাম যে মৃত্যু তা বলাই বাহুল্য। জীবনে সেই মিল সম্ভব হয়নি, মৃত্যুর পরপারে অবিনশ্বর, আত্মার চিরমিলন সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের শেষে তাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ 'রোমিও-জুলিয়েট', 'হীর-রন্‌ঝা' বা 'সোহিনী-মহীয়ালের' মত অমর জুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শেষের এই মানব-পারীকুট্টি শিল্প-মহিমায় মহিমান্বিত ; এতক্ষণের সরল চরিত্র এখানেই বাঁক নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্যায়ের পারীকুট্টির অনির্বচনীয়, অপার্থিব ভালবাসার পরিবর্তে শেষ পর্যায়ের রক্তমাংসের পারীকুট্টি এই ট্র্যাজিক উপন্যাসটিকে এক অনন্য বাস্তব মাত্রা দান করেছে।

কারুতাম্মা

'চেম্মীন' উপন্যাসের চালিকাশক্তি কারুতাম্মা। কারুতাম্মাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে কারুতাম্মা ঝরঝরে স্বাভাবিক এক যুবতী, গল্প যত এগিয়েছে ততই সে গম্ভীর ও জটিল হয়েছে। পারীকুট্টির প্রতি তার হৃদয়াবেগ সে কাউকে জানাতে পারেনি। বাবা যে তাকে সামনে রেখেই পারীকুট্টির কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করেছে—একথা সে জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। চেম্পনের বিরুদ্ধে কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মাকে সে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করেছে ছোটমিঞার টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে। আসলে ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী মুসলমান পারীকুট্টিকে সে যে ভালবেসেছে—একথা সে ভাবেনি। যখন অনুভব করেছে, তখন এই সম্পর্কের পরিণতির যন্ত্রণায় সে গুমরে মরেছে। এই অব্যক্ত যন্ত্রণাই তার মধ্যে গভীরতা এনেছে।

কারুতাম্মার বিয়ের আয়োজন এবং চাকীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক জটিলতা পরিণত হয়েছে সামাজিক সমস্যায়। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস করার সহজাত প্রবণতা থাকে। যে পুরুষ এই কলঙ্কে বিশ্বাস করে না তার মধ্যে এক মহৎ গুণ লুকিয়ে থাকে। কারুতাম্মার স্বামী পালানি তেমনই এক পুরুষ। কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাদের বিরুদ্ধে গেছে। কারুতাম্মা পারীকুট্টিকে ভালবেসেছিল—কিন্তু বিয়ের পর সে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতেই চেয়েছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে সে মেনে নিয়েছিল। স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও মায়া-মমতায় কোনও খাম্‌তি তার ছিল না। যদিও এক অজানা আশঙ্কা তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। পারীকুট্টি তার জীবনে 'দিঘির জল' আর পালানি যেন প্রতিদিনের 'ঘড়ার

জল'। তবু তার কলঙ্ক কেন? এ হল মানবচরিত্রের এক বিচিত্র হীনতা। আধুনিক শিক্ষিত-মনস্কতার নিরিখে তাকে অসতী আখ্যা দেওয়া অন্যায়। আসলে 'সতী' বা 'অসতী' শব্দ দুটি আপেক্ষিক। যদি কোনও নারীর জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যেখানে প্রেমিক বা স্বামীকে রক্ষা করতে সে অন্য কারো কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় তখন তাকে অসতী বলা যায় না। কারুতাম্মা বিয়ের পর পারীকুট্টির অস্তিত্বকে অসম্পূর্ণ, অস্বীকার করে স্বামীর প্রতি মনোযোগী হয়েছে। সে যদি বিয়ের পরও পারীকুট্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখত তবেই তাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলা যেত। আমরা কিরণময়ী বা সাবিত্রীকে অসতী বলিনা। রাজলক্ষ্মীর প্রতি রয়েছে আমাদের অপরিসীম মমতা ও সমর্থন।

কারুতাম্মার প্রতি প্রথম অবিচার করেছে তার বাবা, দ্বিতীয় অবিচার করেছে আমাদের সামাজিক কাঠামো, যেখানে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে জীবনের পথে হাতে হাত ধরে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প'-এ কমলা অনেক বেশি সাহস দেখিয়েছে— সে নিজধর্মে স্থিত থেকেও তার প্রাণরক্ষাকারী ভিন্ধর্মী পুরুষকে জীবনে বরণ করে নিয়েছে। কারুতাম্মার এই আত্মশক্তি নেই; তার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাদের প্রতিনিয়ত অপমানে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অকারণে তাদেরকে সমাজ একঘরে করেছে। স্বজন-বান্ধবহীন কারুতাম্মার হৃদয়ের-আশ্রয় পায়নি। কেবল পালানির মধ্যেই এক আশ্চর্য দৃঢ়তা দেখা গেছে। সে কারুতাম্মাকে ত্যাগ করেনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, টানাপোড়েন চলেছে, তবু পালানি মমতা, সহানুভূতি ও সাহচর্যে কারুতাম্মাকে আশ্রয় দিয়েছে। এই দিক দিয়ে সে নিশ্চিত, তার ফলে পালানিকে চূড়ান্ত জীবন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। সন্তানসম্ভবা কারুতাম্মাও স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে।

পারীকুট্টি এসেছে তার মার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে, এসময়ে কারুতাম্মার চরিত্র আরও জটিল হয়েছে। হৃদয়ে আবেগের সমুদ্র, বাইরে সে নিশ্চল পাথরের মূর্তি। বিগতদিন তাকে উদ্বেল করে তুলেছে। বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কিন্তু স্বামীর প্রতি সে বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারেনি।

শেষদৃশ্যে তার স্বামী ঝড়ের রাতে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। পারীকুট্টি জীবনে প্রথমবার এক আতীব্র উন্মাদনায় তার কাছে ছুটে এসেছে। এই মানবিক আকুলতাই পরিপূর্ণতা এনেছে গল্পে। জেলেদের প্রাচীন সংস্কার উপন্যাসের পরিণতিকে প্রভাবিত করেনি—কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির মিলন এবং পালানির ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত সমুদ্রে হারিয়ে-যাওয়া নিত্যন্তই কাকতালীয়। পরিণতিতে নাটকীয় চমক আনতেই এইভাবে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। আসলে উপন্যাসের পূর্ণতারোধের জন্যই চরিত্রের পরিণতি প্রয়োজন। এই উপন্যাসে কারুতাম্মা যদি পারীকুট্টির সঙ্গে গৃহত্যাগ করত, তাহলে পাঠকের সহানুভূতি হারাত। যদি পারীকুট্টি এই রাত্রের আবেগ-উপশমে অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করত তাহলে এটি দেবদাস-পার্বতীর কাহিনীতে পরিণত হত। উপন্যাসের ট্র্যাজিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে এই তিনটি মৃত্যুই অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী ছিল। এই মৃত্যুগুলি কাহিনীকে এক অনন্য মাত্রা দান করেছে।

১০৮.৭.২ অপ্রধান চরিত্র

চেম্পনকুঞ্জ

চরিত্র-চিত্রণে পিল্লাই অসম্ভব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসে প্রয়োজনীয় চরিত্রসংখ্যা বেশি নয়। তবে পার্শ্বচরিত্র রূপে তিনটি চরিত্রকে মূলত চিহ্নিত করা যায়—চেম্পনকুঞ্জ, চাকী এবং পালানি। চেম্পনকুঞ্জের চরিত্রে কোনও ওঠাপড়া নেই, উপন্যাসের আলো-আঁধারি রেখাপথ চেম্পনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে একইরকমভাবে দেখা গেছে। যদিও শেষ পর্যায়ে তাকে অনেকটা ভগ্নদূত বলে মনে হয়। অতি দরিদ্র অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কারণ তার ধনের লালসা ছিল। একটা

নৌকো ও জালের জন্য টাকা রোজগারের পথে নীতিবোধ, মূল্যবোধ তার কাছে তুচ্ছ। অনাহারে অর্ধাহারে সে টাকা জমিয়েছে, জমানো টাকায় না কুলোতে অন্য পথ নিয়েছে। শেক্সপীয়ারের 'শাইলক'-এর যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল, চেম্পনের মধ্যে সেই জোরের অভাবে সে ব্যক্তিত্বহীন। চাকীর ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।

পারীকুট্টির কাছে টাকা ধার নিয়ে জাল, নৌকোর ব্যবস্থা করেছে সে। রাতের অন্ধকারে শুঁটকি মাছের ঝুড়ি এনেছে পারীকুট্টি আড়ত থেকে, সেই মাছ বিক্রি করে টাকা ঘরে তুলেছে। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন জাগেনি, কেন পারীকুট্টি তাকে এতগুলো টাকা অযাচিতভাবে সাহায্য করল। নৌকো কেনা হলে তার ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন, তখন সে আর পারীকুট্টির দিকে ফিরেও চায়নি—মাছের কারবারও সে করেনি তার সঙ্গে—কারণ নগদ চাই! চেম্পনকে সাহায্য করাতেই পারীকুট্টি নিঃস্ব হয়েছে—কিন্তু স্বার্থপর চেম্পন হাতে-টাকা আসা সত্ত্বেও সে-টাকা ফেরত দেওয়ার গরজ দেখায়নি। তার মধ্যেকার পিশাচ-সত্তা তার পিতৃহৃদয়কেও আড়াল করেছে—প্রথমদিন মাছ ধরে ফেরার সময় তাই পঞ্চমীকেও চিনতে পারেনি লোভের অন্ধত্বে। চাকী এবং কারুতাম্মা তাকে বারংবার পারীকুট্টির টাকা ফেরত দিতে অনুরোধ করেছে, সে কথায় চেম্পন কর্ণপাত করেনি। তার লোভ-লালসা এই উপন্যাসের জটিলতাকে আরো গভীর করেছে। পারীকুট্টির সঙ্গে প্রতারণা করে সে নিজেকে সচ্ছল করে তুলেছে। পালানিকে জামাই হিসেবে পছন্দ করার কারণও তার অর্থলিপ্সা। বাউণ্ডুলে পালানির তিনকুলে কেউ নেই; সে নিঃসহায় সুতরাং এমন সুবর্ণ-সুযোগ কাজে লাগিয়ে সে দায়মুক্ত হয়েছে। বিয়ের মুহূর্তে শুধুমাত্র অনুরোধ উপেক্ষা করার অজুহাতে সে কারুতাম্মাকেও ত্যাজ্য করেছে। নিজের সমপর্যায়ের ঘরে-বরে বিয়ে দিতে খরচ হবে বলে সেপথে পা বাড়ায়নি। পারীকুট্টির আসক্তি ভাঙিয়ে তার সচ্ছলতা এসেছে, কারুতাম্মার আনুগত্যকে ভাঙিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়িয়েছে।

কারুতাম্মার বিয়ের পর চাকীর অসুস্থতা তাকে বিপন্ন করেছে। চাকী ছিল তার চালিকা শক্তি, কিন্তু তার প্রতিও চেম্পনের কোনও মমত্ববোধ ছিল না। অসুস্থ চাকীকে সুস্থ করে তোলার কোন উদ্যোগ সে নেয়নি। চাকীর মৃত্যুর পর কাণ্ডানকোরাণের সুন্দরী বিধবাকে সে বিয়ে করে এনেছে। যাদের দাম্পত্যজীবন তার মনেও রঙিন স্বপ্ন জাগিয়েছিল, তারই স্ত্রীকে দখলের মধ্যে দিয়ে একধরনের হীনম্মন্যতাই কাজ করেছে। পাপীকুঞ্জের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক অস্বীকার করে তাকে রক্ষিতা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আসলে মোহ কেটে গেলে চেম্পন এর হাত থেকেও মুক্তি চেয়েছে। তবে উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পারীকুট্টিকে টাকা ফেরত দেওয়ার মধ্যে দিয়ে মনে হয় যেন তার মধ্যেও কোথাও অনুতাপ অনুশোচনার জ্বালা ছিল। আসলে চেম্পন আদ্যন্তই এক আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র।

চাকী

এক অতি দরিদ্র পরিবারের সংগ্রামী গৃহিণী, অর্থাভাব তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। স্বামীর সঙ্গে সমানতালে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সে সংসারটাকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছে। দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সে মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। পারীকুট্টির সঙ্গে কারুতাম্মার ঘনিষ্ঠতায় চাকী আতঙ্কিত হয়েছে। সে মেয়েকে 'পাপের' পথে চলা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে—হাজার বছরের সংস্কারজাত মূল্যবোধ মেয়ের মধ্যে রোপণ করার চেষ্টা করেছে। স্বামীর প্রতি কর্তব্যে কোনও ত্রুটি নেই—স্বামীর অন্যায় কাজেও সে সঙ্গী হয়েছে, যদিও অহরহ অপরাধবোধ তাকে ক্ষীণ্ন করেছে। কারুতাম্মা ও পারীকুট্টির সম্পর্ক সে জানত, তাদের প্রতি সহানুভূতিও ছিল, কিন্তু যে অনড় অটল ধর্মীয় সংস্কারের বন্ধনে আমাদের সমাজ আবদ্ধ, তাকে লঙঘন করার শক্তি চাকীর ছিল না। তাই কারুতাম্মার কথায় চেম্পনের টাকা চুরি করে পারীর ঋণ শোধ করে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। পারীকুট্টির প্রতি স্নেহ তাকে কঠোর হতে দেয়নি।

জামাই হিসেবে পালানি তার মনোমতো ছিল না। কিন্তু চালচুলোহীন এই নিঃসঙ্গ যুবক তার মাতৃহৃদয়কে আপ্লুত করেছিল। তার মেয়েকে বিয়ের পক্ষে পালানি উপযুক্ত নয়, তবু চেম্পনের বিরুদ্ধে যাওয়ার শক্তি তার ছিল না। একদিকে সমাজের অপবাদের ভয়, মেয়ের ভবিষ্যৎ-জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং কারুতাম্মার জীবন নষ্টের দায়—এই সবের মিলিত অভিভব তাকে অসুস্থ করে ফেলে। মৃত্যুশয্যাতেও সে পারীকুট্টিকেই কারুতাম্মার সবচেয়ে আপনার জন ভেবে, তার হাতেই মেয়ের জন্য ভাবনাচিন্তার ভার তুলে দিয়েছে। চাকীর চরিত্র সহজ সরল হলেও তার মৃত্যুকালীন অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে অনন্য কিছু মাত্রা দান করেছে।

পালানি

'চেম্মীন' উপন্যাসের সবচেয়ে রহস্যময় চরিত্র পালানি। অপার সমুদ্রের রহস্যময়তার মানবরূপ যেন সে। তারমধ্যে কতকগুলো মৌলিক গুণও ছিল। প্রথম দর্শনেই পালানি সমুদ্রের রুদ্র, গম্ভীর রূপকেই প্রতিফলিত করে। চেম্পনকে সে ক্ষমতায় ও কৌশলে পরাজিত করেছে। কারুতাম্মার সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাব তাকে তেমন করে উজ্জীবিত করেনি। চাকী যখন তাকে তার বাল্য-কৈশোর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে তখন সে অবলীলায় বলেছে নির্জন পৃথিবীতে সে একাই বড় হয়ে উঠেছে—'আমার জন্য কেউ কষ্ট পায়নি ও আমি আপনিই বড় হয়েছি'— কোনও পারিবারিক বন্ধনে সে বড় হয়ে ওঠেনি, তাই স্নেহ-মমতার স্বাদ তার জানা নেই। তবু পৌরুষের অহংকারে সে স্ত্রীকে কষ্ট থেকে আড়াল করতে চেয়েছে। স্ত্রীর জীবনে প্রথম প্রেমের প্রতিভাস অস্তিত্বময় থাকলেও সে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারেনি। সমাজ তাকে একঘরে করেছে। তার পৌরুষের অহংকার তার ব্যক্তিজীবনের একমাত্র অবলম্বন মাছ-ধরাও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবু পালানি হার মানেনি। সমুদ্র যেমন শান্ত, স্নিগ্ধ আবার মুহূর্তে প্রলয়ংকর, পালানিও তেমনি একদিকে দায়িত্ববান, প্রতিরোধকারী—অন্যদিকে অবিশ্বাসী, কুটিল এবং রূঢ়। স্ত্রীকে আগলে রাখলেও কারুতাম্মার বাপের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে সে কঠিন, কঠোর। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে লৌকিক সংস্কার কিংবা পরিস্থিতির প্রভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল—তাদের বিবাহিত জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির এই একটিই পথ উন্মুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও বলা যায় স্বামী এবং পিতা হিসাবে বাউণ্ডুলে বেহিসেবি পালানি তার কর্তব্যের কোনও ত্রুটি করেনি।

গ্রামের বয়স্করা এবং জেলে সম্প্রদায় : গোষ্ঠীজীবন

নীরকুন্নাথ ও ত্রিকুন্নাপুড়া গ্রামদুটিকে অবলম্বন করে এক প্রাচীন-পরম্পরাশ্রিত কৌমজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-রীতি-নীতি অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্বও অস্ফুটভাবে আভাসিত। চেম্পন 'ওয়ালাকারণ' জাতিভুক্ত না হয়েও নৌকো ও জাল কিনেছে। মোড়লকে প্রাপ্য প্রণামী না দিয়ে একঘরে হয়েছে। আয়ানকুঞ্জ, রামনসুপ্পনরা চেম্পনের বিরোধিতা করেছে। চেম্পন মোড়লকে প্রণামী দেওয়াতে তার বিচার প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। সমুদ্রে দুবার মাছ ধরতে যাওয়ার যে নিষেধ রয়েছে চেম্পন তা অস্বীকার করেছে। 'ঋতুমতী' সাগরে নৌকো নামানো অন্যায়— এই সংস্কারকেও অস্বীকার করে সে জোর করে মাছ ধরতে গেছে। কিন্তু তবুও সমাজ তার বিরুদ্ধে যায়নি। যারা এতদিন তার বিরুদ্ধে ছিল, তারাও চেম্পনের কাছে কোনও-না-কোনওভাবে উপকৃত হয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে। তবে লোভী অহংকারী চেম্পন ও সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায়নি।

ত্রিকুন্নাপুড়া গ্রাম সম্প্রদায় পালানির বিয়েতে দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু কারুতাম্মার চারিত্রিক বিচ্যুতির কুৎসায় তার কঠোর ভূমিকা নিয়েছে। পালানি তাদের প্রিয়, তবু তাকেও একঘরে করেছে ভ্রষ্টা স্ত্রীকে আশ্রয় দেবার

অপরাধে। ভ্রষ্টা স্ত্রী স্বামীর অমঙ্গলের প্রতীক—এই সংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায়। অচ্যুতন, পাপু—এরা সকলে পালানির দুর্দশার জন্য দায়ী। পালানি এবং সন্তানসম্ভবা কারুতাম্মার প্রতি সমাজ সহানুভূতিশীল হয়নি। উপন্যাসের কাহিনী পরিণতিকেও ত্বরান্বিত করেছে কৌমজীবন। তাদের বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি মেনেই পারীকুট্টি-কারুতাম্মা এবং পালানির জীবন ট্র্যাজেডির পথে এগিয়েছে।

১০৮.৮ উপন্যাসের গঠন ও বিন্যাসের পর্যালোচনা

উপন্যাস যেহেতু সামগ্রিক জীবনের শিল্পরূপ, তাই কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদানের সমন্বয়েই উপন্যাস সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সুনির্দিষ্ট প্লট, চরিত্র, সংলাপ, প্রতিবেশ এবং লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন—এই পাঁচটি স্তম্ভকে ভিত্তি করেই উপন্যাসের পরিচয় রূপায়িত হয়। কোনও-কোনও উপন্যাস প্লট-সর্বস্ব, কোথাও বা বর্ণনা ও সংলাপের কারুকার্য। কোথাও লেখকের গম্ভীর গভীর জীবনবোধ উদ্ভাসিত। বঙ্কিম-উপন্যাসে নাটকীয় উপাদানের আধিক্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রাণ তার গভীর জীবন-অন্বেষণ। বহিরঙ্গের প্লটের তুলনায় পাত্র-পাত্রীদের মানস-বিশ্লেষণই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে— 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে'-তে বাইরের ঘটনার চমক তেমন নেই, আছে জীবনজিজ্ঞাসা, মানবমনের দুরূহ জটিল পথপরিক্রমা।

'চেম্মীন' উপন্যাসের বহিরঙ্গে ঘটনার ব্যক্তি বা চমক প্রথম পর্যায়ে নেই। লেখক প্রথম থেকেই এক অসম্ভাব্য সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে পারীকুট্টি-কারুতাম্মার অন্তরঙ্গ আলাপ পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। একটু-একটু করে এগিয়েছে মাছমারাদের সামাজিক জীবনের মধ্যে, যেখানে ব্যক্তির পরিচয় গৌণ, সে শুধু সমাজেরই অঙ্গ। 'চেম্মীন' উপন্যাসের সর্বত্রই এই সমষ্টিজীবনের চিত্র। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ সমাজের নিক্তিতে ওজন করা হয়েছে। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যদিও দ্বিতীয়টিতে লেখকের মধ্যবিত্ত-মানসিকতাই প্রতিফলিত চরিত্রগুলির মধ্যে; কুবের-কপিলা-হোসেন মিঞা ঠিক জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেনি। সে ব্যাপারে পারীকুট্টি, কারুতাম্মা, পালানি—প্রকৃত অর্থেই নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। যে শিক্ষা, রুচি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জোরে তারা সেই আদিম সংস্কারকে পিছনে ঠেলে দিতে পারত—তার কোনওটাই তাদের নেই, তাই উপন্যাসের প্লট জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। চরিত্র-বিন্যাসও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারুতাম্মা বা পারীকুট্টি যদি অন্যরকম আচরণ করত, তাহলে সেটা তাদের সমাজ-প্রতিবেশে বেমানান হয়ে পড়ত। কেরলের সমুদ্র উপকূলের জেলে সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-সংস্কারের পরিমণ্ডলেই তারা লালিত-পালিত। হাজার বছরের প্রাচীন বিশ্বাসকে তারা অস্বীকার করতে পারেনি। তাই 'বিধর্মী' পারীকুট্টিকে ভালবাসলেও বিয়ের পর কারুতাম্মা খাঁটি জেলেনি হয়েই স্বামীর ঘর করতে চেয়েছে। 'সাবিত্রী' বা 'কিরণময়ী'র মতো সাহস তার ছিল না, শিক্ষিতা 'অচলা'র দোলাচলবৃত্তিও তার মধ্যে স্থান পায়নি। তবে উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পারীকুট্টির আগমন, এবং তার আহ্বানে কারুতাম্মার আবেগে ভেসে যাওয়ার পেছনে কতকগুলো কারণ অনুঘটকের কাজ করেছে। প্রথমত, পালানির রূঢ় আচরণ, দ্বিতীয়ত, শ্বশুরবাড়ির গ্রামে তার মিথ্যা অপবাদ, তৃতীয়ত, পঞ্চমীর মুখে বাপের বাড়ির ও পারীকুট্টির দুরবস্থা জানা এবং চতুর্থত, বহুদিনের অদর্শনে তার মধ্যেকার আবেগে মুক্তি পেতে চেয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে তাদের এই মিলন আরোপিত নয়। লেখক একটু নাটকীয়তা আনার জন্য পালানির সমুদ্র-অভিযান এবং মৃত্যু ও কারুতাম্মা-পারীকুট্টির মিলনকে একই সূত্রে গ্রন্থিত করেছে। কোনও বিশেষ সংস্কারের বশতবর্তী হয়ে এ-উপন্যাসের পরিণতি সুনিশ্চিত হয়নি।

উপন্যাসটির প্রথম দশটি পরিচ্ছেদ নীরকুন্নাথ গ্রাম-কেন্দ্রিক। একাদশ থেকে ষোড়শ পরিচ্ছেদে ত্রিকুন্নাপুড়া গ্রামে স্থান পেয়েছে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আবার কাহিনী ফিরে এসেছে নীরকুন্নাথ গ্রামে— চেম্পনের পরিণতি লক্ষিত হয়েছে। অষ্টাদশ থেকে বিংশ পরিচ্ছেদের মধ্যে কাহিনী দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। এই দ্রুত পরিণতি প্লটের টান-টান বিন্যাসকে শিথিল হতে দেয়নি। উপন্যাসের চরিত্র এবং গতি প্রকৃতি রেখচিত্রের সাহায্যে সরলীকৃত করা যায় :

রেখাচিত্র এক
কাহিনীর বিন্যাস

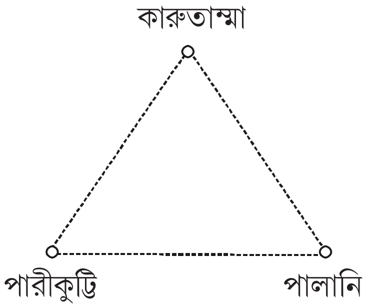

রেখচিত্র দুই
কাহিনীর গতি

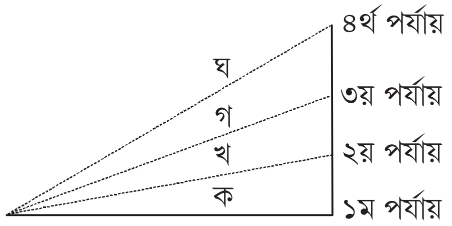

রেখচিত্র ঃ এক কাহিনীর বিন্যাস তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। কারুতাম্মা এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্র। তাকে ঘিরে আবর্তিত দুটি পুরুষের আবেগ। এরই অনুষঙ্গে এসেছে সমাজ-প্রতিবেশ, ধর্মীয়-সংস্কার এবং লৌকিক বিশ্বাসের অনবচ্ছিন্ন সংশ্লেষ।

রেখচিত্র ঃ দুই (ক) কাহিনীর গতি প্রথম পর্যায়ে, প্রাত্যহিক জীবন বর্ণনা (১-৬ পরিচ্ছেদ)

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে পালানির আগমন থেকে কারুতাম্মার বিয়ে— কাহিনীতে জটিলতার সূত্রপাত (৭-১০ পরিচ্ছেদ)।

(গ) তৃতীয় পর্যায়ে ত্রিকুন্নাপুড়ায় কারুতাম্মার লাঞ্ছনা—কাহিনীকে জটিলতর করেছে, (১১-১৮ পরিচ্ছেদ)।

(ঘ) চতুর্থ পর্যায়ে কাহিনী দ্রুত ও অন্তিম লয়ে পৌঁছেছে। লোকনিন্দা, যন্ত্রণা, পালানির সন্দেহ এবং অবিশ্বাস যেন এক প্রবল আবেগে ফেটে পড়েছে। অন্যদিকে কারুতাম্মার মানসিক স্থৈর্য, সতীত্বের সংস্কার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। উপন্যাসের গতি দুর্বার হয়ে অন্তিমের মৃত্যুদৃশ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাঠক যেন প্রবল ঝঞ্ঝা ও উৎকণ্ঠার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক নিস্তরঙ্গ তীরভূমিতে উপনীত হয়েছেন। সমুদ্রের বাতাসে মিশেছে নারকেল পাতার দীর্ঘশ্বাস; উদ্দাম আবেগ ঢাকা পড়ে গেছে অন্তহীন ধূ-ধূ বালির স্তূপে (১৯-২০ পরিচ্ছেদে)।

১০৮.৯ চেম্মীন ঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন ও রসবিচার

মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক পি. কে. পরমেশ্বরন নায়ার ‘চেম্মীন’ প্রসঙ্গে কয়েকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যেগুলি এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। নায়ার লিখছেন ঃ

"(এই) উপন্যাসের পটভূমিকা ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলবর্তী অম্বালাপুরা ত্রিকুন্নাপুড়া অঞ্চলের জেলেদের ঘরগুলি আর এই চরিত্রগুলি হচ্ছে সমুদ্রের অবিশ্বাস্য রকমের সাহসী জেলে-জেলেনিরা। এরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিমুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। এই উপন্যাসে কোনো শ্রেণীসংগ্রাম নেই। মনে হয় যেন লেখক তাঁর বদ্ধ সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। তার বদলে এই উপন্যাসে আমরা আশ্চর্য, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য একটা প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য দেখতে পাই। এখানে একদল সাদাসিধা সরলমনা লোক বাস করে। প্রেম ও নৈতিকতা সম্বন্ধে তাদের সব অদ্ভুত ধারণা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের অনন্ত সংগ্রাম এবং সর্বোপরি তাদের হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনার অবর্ণিত সংগ্রাম এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাসের কাহিনী এইসব জেলেদের অনেক রকম অন্ধ বিশ্বাসের একটির ওপর ভিত্তি করে লেখা। তারা বিশ্বাস করে যখন কোনো স্ত্রীর স্বামী সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় তখন সেই নারী যদি পরপুরুষে আসক্ত হয় তাহলে সমুদ্র মায়ের রোষ সেই মেয়ের নির্দোষ মানুষটির ওপর এসে পড়ে। এই রকম একটা ধারণা বিশ্বাস করা যায় কি-না সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতার সঙ্গে এই বিশ্বাস এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, একে অবিশ্বাস করা যায় না। এছাড়া এই বইয়ের বিরুদ্ধে আর একটা সমালোচনা করা হয় যে, জীবনের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে এই রকম অযৌক্তিক বিশ্বাস মিশালে তাতে পরস্পরবিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়; এটা আধুনিক উপন্যাসের নিয়ম কানুনের সঙ্গে ঠিক মতো মেলে না। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে গল্পটি সেই সব লোকেদের কাছে নিয়ে যাদের কাছে অন্ধবিশ্বাস সত্য এবং তা এড়ানো অসাধ্য তখন এই সমালোচনার যথার্থতা অনেকাংশেই হারিয়ে যায়। আর এর চরিত্রগুলোর ট্র্যাজেডি, যেটাকে সমুদ্র মায়ের ক্রোধ বলে দেখানো হয়েছে সেটাকে দৈব ঘটনা অথবা আধিদৈবিক শক্তি ধরলে এটা যে সম্ভব হতে পারে সেটা বিশ্বাস করা যায়।....

তাকাষি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে চলিত প্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত একটি সম্প্রদায়ের জীবন আলেখ্য, তাদের আবেগ অনুভূতি সব কিছু বাস্তবতার সঙ্গে এঁকে দেখিয়ে পাঠকের মনকে প্রভাবিত করতে চান। তিনি দুইভাবে এটি করতে সফল হয়েছেন। তিনি তার শৈলী ও দক্ষতা দিয়ে গল্পটিতে বাস্তবতার আবহাওয়া আনতে পেরেছেন এবং সূক্ষ্মভাবে অন্ধবিশ্বাস ব্যবহার করে তাঁর গল্পের তীব্রতা বাড়িয়েছেন।" ('মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস' : পি. কে. পরমেশ্বরন নায়ার; সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি; ১৯৮৬; পৃঃ ১৪৩-৪৫)

এই অভিমতের থেকে অনেকটাই পৃথক আরেকটি বক্তব্যও এর পাশাপাশি উল্লেখ করতে হবে। কে. আয়াপ্পা পানিকার 'এনসাইক্লোপীডিয়া অব ইন্ডিয়ান লিটেরেচার'-এ (সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী ; ১৯৯২) লিখছেন :

"*Chemmeen* tells the love-story of Pareekutty and Karuthamma. They belong to different religions and castes, and the obduracy of Karuthamma's father, Chemban Kanju, complicates the issues. There is no formula of over-simplification of human relationships in this novel; problems of class-war are forgotten for the time being. But it is wrong to think that *Chemmeen* is a mere idyllic tale of the failure of romantic love; the rise and fall of Chamban Kunju has a tragic dimension that might loom larger than the fate of the star-crossed lovers. The melodramatic ending of the tale obscures the critical perspective, especially in the wake of its successful and popular film-version.... Thakashi was working within the structure of the short-story, and could not easily adopt to the larger amplitude and complexity of the novel." (Vol. V; p. 4117).

এই দুজন অগ্রগণ্য সমালোচক 'চেম্মীন' সম্পর্কে অত্যন্ত বিদগ্ধ কিছু বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পর্যবেক্ষণ যে সামগ্রিক নয়, এই কথাটা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মানতেই হবে। তাঁরা কেউই কারুতাম্মা-পারীকুট্টির

জীবনের ট্র্যাজেডির উৎস সন্ধান করেননি। একটি 'হিন্দু' মেয়ে (মালাবারের অতি-রক্ষণশীল সামাজিক অবস্থানে যে কিন্তু 'অস্পৃশ্য' ও বটে!) আর একটি 'মুসলিম' ছেলের মধ্যে আবাল্য যে-হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাকে তাদের সমাজ-পরিবেশ মেনে নিতে পারেনি কেবলমাত্র ঐ 'ধর্মের' ফারাকটুকুর কারণেই! এক কথায় যদি, এ-কাহিনীর রস-পরিণাম ট্র্যাজিক কেন—এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে, সেই কারণ হল 'ধর্ম' সম্পর্কে সামাজিক-অন্ধতা।

যদি পারীকুট্টি মুসলিম না-হয়ে হিন্দু পরিবারের সন্তান হতো, তা হলে অবশ্যই চাকী-চেম্পনকুঞ্জ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা বা আপত্তি করত না। বরং, তার পারিবারিক সাচ্ছল্যের জন্য সে খুব বাঞ্ছিত জামাতা বলেই ধার্য হতো তাদের কাছে। দুজনের প্রেম নিয়ে এত কানাঘুষো করতেও আগ্রহী হতো না গাঁয়ের লোকজন।

এই ধর্মান্ধতার সঙ্গে তাকাষি সুদক্ষভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন মালাবারী ধীবরসমাজের একটি বিচিত্র লৌকিক সংস্কারকেও। এই ব্যাপারটা তাঁর শিল্পশৈলীর একটি প্রামাণ্য সূচকও অবশ্যই। সমুদ্রে পাড়ি যে-মাছমারা দিচ্ছে, তার গৃহলক্ষ্মীকে অবশ্যই নিজের দৈহিক শুচিতা-পবিত্রতা আগলে রাখতে হবে, নইলে তার 'পাপে' বিলুপ্ত হয়ে যাবে তার স্বামী, ডুবে যাবে সাগর-মায়ের রোষের বলি হয়ে—সমুদ্রের অতল-তলে। এই সংস্কারকে 'বাস্তব' সম্ভাব্যতায় রূপান্বিত করেছেন বলে তাকাষির সমালোচনা করা যেতেই পারে, কিন্তু এর ফলে বাস্তবে-অবাস্তবে সমাপতন ঘটে যে বিচিত্র একটি রসের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সংশয় নেই।

এ-কাহিনীর পরিণতি অন্যরকমও হতে পারত। হতেই পারত এই রকম যে, ঐ 'ঝড়ের রাতের অভিসারে' কারুতাম্মা চলে যেতে পারত তার প্রেমিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। পরদিন ভোরে পালানি শূন্য ঘরে ফিরে এসে, শিশুকন্যাটিকে কোলে তুলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে সমুদ্রের উপকূলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে—এরকমটা হলে হয়ত 'বাস্তবতা'-র রূঢ়, নির্মম মূর্তিটা অনাহত থাকত। কিন্তু তাতে কারুতাম্মার প্রতি পাঠকের মমত্ববোধ এক মুহূর্তেই যে নিঃশেষ হয়। তার চরিত্রের করুণ সৌন্দর্যটুকু যেত ঘুচে। পারীকুট্টি সম্পর্কেও বিলুপ্ত হতো পাঠকের সমস্ত সমবেদনা। পারীকুট্টি আত্মহত্যা করে 'দেবদাস'-এর তুলনাযোগ্য হতে পারত! কিন্তু এ উপন্যাসের শিল্পিত-সমাপ্তি ঘটত না তাহলে। 'দেবদাস'-সুলভ চড়া ট্র্যাজেডি না-হয়ে 'রোমিও-জুলিয়েত'-ধর্মী করুণ পরিণাম এর মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে বলেই এর ঐ শিল্পিত ব্যঞ্জনাটির উদ্ভাস ঘটতে পেরেছে।

।।২।।

'চেম্মীন' উপন্যাসের মধ্যে তাকাষি তাঁর মনোবিশ্লেষণ দক্ষতার একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান তিনটি চরিত্র, পারীকুট্টি-কারুতাম্মা-পালানি এদের তিনজনের ক্ষেত্রেই তাঁর এই বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে। ধরুন, কারুতাম্মার কথা। একদিকে অন্তরের অমোঘ আবেগ, অন্যদিকে, যুগার্জিত সামাজিক সংস্কার—এ দুয়ের টানাপোড়েন তার জীবনের অন্দরমহলে, যেখানে সে একেবারে নিঃসঙ্গ—একটা গভীর ট্র্যাজেডির বীতংস সৃষ্টি হয়ে থেকেছিল পালানিকে ভালবেসে সে ভুলতে চেষ্টা করেছে পারীকুট্টিকে; কিন্তু বাপের বাড়ির গ্রাম ছেড়ে এসেও তার রেহাই মেলেনি কলঙ্ককলিত রটনার হাত থেকে। ফলে সেই ঝড়ের রাতে যখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে দাঁড়িয়েছে পারীকুট্টি, তখন কারুতাম্মা বিহ্বল হয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে—যাকে কবির ভাষায় হয়ত এই বলে ব্যাখ্যা করা চলে; ''একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা, প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।'' ('শাশ্বতী' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

ঐ ''মানুষী দুর্বলতা'' বিজড়িত স্মৃতি পারীকুট্টিকেও টেনে এনেছিল সেই ঝড়ের রাতে। প্রেমের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে—এমনকি প্রেমিকাকেও—অথচ বিনিময়ে পেয়েছে শুধুই নিঃস্বতা— প্রেমিকা জীবনে শান্তি পেয়েছে (সুখ না পাক!), এটুকু জানলেও সে নিজের মনোগহনে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারত। ঐ সামাজিক-উচাটনই তার ক্ষেত্রেও একমাত্র না-হলেও প্রধানতম বিড়ম্বনা হয়ে সুস্থিত থাকতে দেয়নি তাকে। ফলে ট্র্যাজেডি ত্বরান্বিত করতে —হয়ত বা নিজের অগোচরেই—সেই রাতে পারীকুট্টিও ছুটে গিয়েছিল ত্রিকুন্নাপুড়ার সমুদ্রতীরে কারুতাম্মার ভাঙা ঘরের দরজার সামনে।

আর পালানি? স্ত্রীর প্রতি প্রেম এবং দায়িত্ববোধ তার গভীর। অথচ লোক-কলঙ্কযন্ত্রণা তাকেও বিধ্বস্ত করেছে, জীবিকাবিচ্যুত করেছে। একটা দৃঢ়ব্যক্তিত্ব তার মধ্যেও দেখেছি আমরা। অথচ, ঘটনা পরম্পরায় পঞ্চমী-কারুতাম্মার স্মৃতিসংলাপ যখন সে নিজের কানে শুনল, ঠিক তখন থেকেই তার সমস্ত দৃঢ়তার ভিত গেল ধসে। বাইরের ঝড় আর মনের ভিতের ঝড় একাকার হয়ে গিয়ে সে যেন স্বেচ্ছায় ছুটে গেল মরণের সন্ধানে। পারীকুট্টিকে যদি ভুলতে পারত কারুতাম্মা, সমাজ যদি তাকে সেই অবকাশ দিত, তাহলে ছোটবোনের সঙ্গে ঐ 'বেদনার বালুচরে' সে পদচারণা করতে যেত না—পালানির শুনতে পাবার কোনও উপলক্ষ থাকত না সেই সংলাপ। নিজের মনের মধ্যে যে-এক বিশ্বাসের, আস্থার জগৎ গড়ে রেখেছিল সে, এক লহমায় সেটা গেল ভেঙেচুরে ছন্‌ছত্তর হয়ে।

কারুতাম্মা-পারীকুট্টি-পালানি, তিনজনের মনোগভীরের অসীম যন্ত্রণার উদ্বেলতাকে সুদক্ষভাবে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে তাকাষি যেভাবে ট্র্যাজিক-পরিণাম সূচিত করেছেন এ-উপন্যাসের, তাঁর ফলে যদি কেউ একে মনোবিশ্লেষণধর্মী কাহিনী বলতে চান, তাঁর কথায় আপত্তি করা যাবে না একটুও।

।।৩।।

সমুদ্র এ-কাহিনীতে কতখানি গুরুত্ব পেয়েছে, সে জিজ্ঞাসার নিরসন হওয়াও দরকার। যে-মানুষগুলি উপন্যাসের কুশীলব, এক অর্থে তারা তো সবাই-ই সমুদ্রের সন্ততি। সাগর মা-র সন্তান। তিনি তাদের অন্ন জোগান, লালন করেন, ভরসা দেন, শাসন করেন, তাঁর অনুশাসন ভাঙলে চূড়ান্ত শাস্তিও দেন। তাঁকে উপলক্ষ করে একইসঙ্গে বাস্তব এবং কল্পনার এক বিচিত্র মেশামিশি হয়ে আছে তার 'সন্তান'-দের মনে। ফলে নায়িকা কারুতাম্মা এ-কাহিনীকে যতটাই ব্যাপ্ত রাখুক, মুখ্য দুই পুরুষচরিত্র পারীকুট্টি এবং পালানির মধ্যে নায়কত্বের দাবি কার কতখানি, তা নিয়ে যে দ্বিধাই থাকুক পাঠকের মনে, সমুদ্র যে অমোঘ এক চরিত্র হয়ে এই উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতের অলক্ষ্যে, তাতে কোনও সংশয় নেই। সমুদ্র এবং মানুষ, এই কাহিনীর মধ্যে যে-বিচিত্র এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম-আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলছেন তাকাষি, যার সঙ্গে একমাত্র আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপন্যাস, নোবেলজয়ী 'ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সী' (১৯৫২)-রই হয়ত তুলনা করা চলে। তবে সেখানে সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বৃদ্ধ ধীবর সান্তিয়াগো জয়ী হয়েছিলেন; মৃত মার্লিন মাছের কঙ্কালটা সেখানে তাঁর সেই বিজয়ের ঘোষণা সূচিত করেছে। আর এখানে সমুদ্রের সঙ্গে বাস্তবে-এবং-কল্পনায় লড়াই করার পরিণামে ঝঞ্ঝা এবং সংস্কার—দুই বিপর্যয়ের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তিনটি তরুণপ্রাণ। সেই পরাভবের দ্যোতক হয়ে গল্পের সমাপ্তিতে দেখি বালিয়াড়ির ওপরে পড়ে আছে বঁড়শি-বেঁধা মরা হাঙর-কাহিনীর চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির সংকেতই যেন বহন করেছে সেটা!

এরই সূত্রে 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'গঙ্গা'—এই দুটি উপন্যাসেরও একটু প্রসঙ্গোল্লেখ হয়ত বাঞ্ছিত হবে। মানিক এবং সমরেশ—দুজনেই তাকাষির মতো মৎস্যজীবী মানুষদেরকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছিলেন এবং

তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ পরিচয় লেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'গঙ্গা' এই দুটি উপন্যাসে সমাজের চেয়ে 'ব্যক্তি'-ই মুখ্যতর হয়ে উঠেছে। কুবের-কপিলা-হোসেন মিঞা— যে তিনজন 'পদ্মানদীর মাঝি'-র প্রধান চরিত্র, তারা প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এবং তার অবিচ্ছেদ্য যে-মৎস্যজীবী গ্রাম—দুয়ের ক্ষেত্রেই মানসিকভাবে বিলগ্ন অনেকটা পরিমাণেই। তাদের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলটার কিছু আভাস মেলে ঠিকই, কিন্তু রীতিনীতি, সামাজিক সংস্কার-অনুশাসন বিশেষভাবে চিহ্নিত নয় 'চেম্মীন'-এর মতো। বরং হোসেন মিঞার স্বপ্ন সম্ভব 'এলডোরাডো' ময়নাদ্বীপ ঐ কাহিনীতে ধীরে-ধীরে সর্বময়ী একটা অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে—যা পদ্মানদী এবং তার মাঝিদের চিরাভ্যস্ত অবস্থান থেকে অনেক-অনেক দূরে; শুধু ভৌগোলিক-হিসাবেই নয়, ভাগবত রূপেও। 'চেম্মীন'-এ কিন্তু মুখ্য পাত্রপাত্রীরা অমোঘ-সামাজিক অনুশাসন এবং সংস্কারকে গৌণ করে তোলেনি। কাহিনীর শেষে হৃদয়াবেগের জোয়ারে কারুতাম্মা-পারীকুট্টির সমস্ত সংস্কার ভেঙে গেছে ঠিকই, কিন্তু কুবের-কপিলার মতো হিসেবী-অনিবার্যতায় ঘর ছেড়ে ঐ ময়নাদ্বীপে পালানোর সঙ্গে সেটাকে তুলনা করা যাবে না। হোসেন মিঞার মতো অমোঘ নিয়তিতুল্য কোনও একক মানুষও 'চেম্মীন'-এ অনুপস্থিত।

আনুপাতিকভাবে রূপে ও অভিভবে 'গঙ্গা' এবং 'চেম্মীন' বরং কিছুটা কাছাকাছি রয়েছে। যদিও হিমি-তেঁতলে বিলেসের প্রেম পারীকুট্টি-কারুতাম্মার ভালবাসার মতো দুর্মর সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধায় বিধ্বস্তপ্রায় নয় তবু সেটাও ব্যর্থ প্রণয়। মানসিক টানাপোড়েনের ব্যাপারটিও সমরেশ বসুর কাহিনীতে অনেক তীব্র ভাবে চিহ্নিত, যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মেলেনা। এ-কাহিনীতেও সমুদ্রের এক অমোঘ-অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এদিক থেকেও 'চেম্মীন'-এর সঙ্গে 'গঙ্গা'-র একটা চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে। লোকজীবনের বিশ্বাস-সংস্কার এবং আর্থ-সামাজিক দুর্দশা 'গঙ্গা'-কেও ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করেছে 'চেম্মীন'-এর মতো। আর্থ-সামাজিক প্রতিভাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে একেবারেই যে নেই, এমন নয়; তবে 'গঙ্গা'-য় সেটার অভিঘাত অনেক বেশি।

।।৪।।

এই কাহিনীতে সমুদ্রের সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতিরই একটা সাংকেতিক ব্যঞ্জনা 'চেম্মীন' নামটির মধ্যে মেলে। সমুদ্রের প্রতীক হয়ে এসেছে এখানে চিংড়িমাছের ঝাঁক। এই চিংড়িই হল তাদের জীবিকা; এর ওপর নির্ভর করেই তাদের মরণ-বাঁচন। ঐ চিংড়ির সন্ধানেই জেলেডিঙি বেয়ে পালানি ঝড়ের রাতে ভেসে গিয়েছিল গভীর সমুদ্রে। তারই পরিণামে তার অতলে তলিয়ে যাওয়া; কাহিনীর চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির একটি অংশ প্রমূর্ত হওয়া। পারীকুট্টি-কারুতাম্মার সমুদ্রের উত্তাল জোয়ারে ভেসে যাওয়ার ঘটনায় ঐ ট্র্যাজেডির বাকিটা ঘটেছে। ঐ সমুদ্র এবং তার 'ফসল'-স্বরূপ চিংড়িমাছের ঝাঁক যেন অমোঘ-নিয়তি হয়ে পালানিকে টেনে নিয়ে গেছে মরণ-ঘূর্ণিতে। আর 'সাগর-মা' কোদালাম্মার অনুশাসন ভুলে গিয়ে পারীকুট্টি-কারুতাম্মা যেভাবে পরস্পরের কাছে ধরা দিয়েছে—তারই দণ্ড স্বরূপ যেন তিনি তিনজনকেই চরম পরিণামে নিক্ষিপ্ত করলেন। তাঁর ঐ শাসনের সংকেত, মরা হাঙরটা; আর শাসনের অভিজ্ঞান— চেম্মীনের ঝাঁক, যার খোঁজে গিয়েছিল পালানি।

এই কাহিনীর ট্র্যাজেডির উৎসে আসলে যা আছে—ধর্মীয় অন্ধতা ও সামাজিক আচ্ছন্নতা, তাকে ঢেকে ফেলেছে সমুদ্রজননীর অনুশাসন-ভিত্তিক এক অলৌকিক-প্রতীতিকেন্দ্রিক সংস্কার। ঐ চিংড়িমাছের ঝাঁক তারই প্রতীক। এই বইয়ের নাম 'চেম্মীন' হবার মধ্যে তাই একটি শিল্পিত সংকেতই যে আছে, সমস্তটুকু আলোচনার শেষে সেটাই বলার কথা।

১০৮.১০ অনুশীলনী

❑ **বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ**

১। ‘চেম্মীন’ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পটভূমিকাটির পরিচয় দিন।

২। একটি আধুনিক মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসরূপে ‘চেম্মীন’-কে গণ্য করা যায় কি-না, আলোচনা করুন।

৩। ‘চেম্মীন’ উপন্যাসের গঠনাঙ্গিকটি বিশ্লেষণ করে দেখান।

৪। ‘চেম্মীন’-এর মধ্যে সমাজবাস্তবতা এবং লোকবিশ্বাসের কিভাবে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় ঘটেছে, দেখান।

৫। এই উপন্যাসের নায়িকা কারুতাম্মার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৬। এই উপন্যাসের নায়ক কে— পালানি, না পারীকুট্টি? আলোচনা করে দেখান।

৭। ‘চেম্মীন’ কাহিনীর অপ্রধান চরিত্রগুলির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন এবং কাহিনীতে তাদের গুরুত্ব কতটা বিচার করে দেখান।

৮। ‘চেম্মীন’-এ সমুদ্রের যে-বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে, সেটি বিশ্লেষণ করুন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রকেও এর অন্যতম প্রধান চরিত্র বলা যায় কি-না, বিচার করুন।

৯। ‘চেম্মীন’ উপন্যাসের মধ্যে ধর্ম-সংস্কারমুক্ত এক উদার মানবিকতার রূপায়ণ কেমনভাবে করা হয়েছে, দেখান।

১০। দারিদ্র্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধ-কুসংস্কার এবং গ্রাম্য কুটিলতা—এত সব কিছুর সঙ্গে সংগ্রাম করেও পারীকুট্টি এবং কারুতাম্মার প্রেম কেমন করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠেছে কাহিনীর পরিণামে, তা বিশ্লেষণ করে দেখান।

১১। ‘চেম্মীন’-কে নায়িকা-প্রধান উপন্যাস বলা যাবে কি-না বিচার করে দেখান।

১২। ‘চেম্মীন’ নামটি এই উপন্যাসের পক্ষে কতখানি শ্রেয় বা তাৎপর্যপূর্ণ বিচার করুন।

❑ **অবিস্তৃত প্রশ্ন ঃ**

১৩। নীরকুন্নাথের জেলেরা চেম্পনকুঞ্জের সঙ্গে প্রথমে শত্রুতা করেও পরে যে তারই নৌকোয় কাজ করতে শুরু করে—এর ফলে কাহিনীর স্বাভাবিকভাবে হানি ঘটেছে কি?

১৪। সমুদ্রতীরবর্তী জেলিয়াদের জীবনে লোকসংস্কারের প্রভাব কতখানি?

১৫। কারুতাম্মা-পারীকুট্টি-পালানির জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে বা কী বা কারা?

১৬। চাকীর মৃত্যু এ-কাহিনীতে কতখানি অভিঘাত ফেলেছে?

১৭। পঞ্চমী এই কাহিনীতে কতটা প্রয়োজনীয় চরিত্র?

১৮। সাধারণভাবে (এবং স্থানীয় সামাজিক বিধি-সংস্কার অনুযায়ী) কারুতাম্মাকে ভ্রষ্টা বলে মনে করা হলেও, বস্তুতপক্ষে সে কি তাই?

১৯। মালাবারের জেলিয়াসমাজে মোড়লদের গুরুত্ব কতটা?

২০। পালানি-কারুতাম্মার সন্তানটি এই উপন্যাসের কোন প্রয়োজনে লাগে কি?

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

২১। পাপীকুঞ্জের প্রথম স্বামীর নাম কী?

২২। গঙ্গাদত্তন কে?

২৩। মুণ্টু এবং নেরীদ কাকে বলে?

২৪। সাগর-মা কে? তাঁর নাম কী?

২৫। কারুতাম্মা কোথায় মাছ বেচতে যেত?

২৬। মরা-হাঙরটা কোন্ সংকেত বহন করে?

২৭। কাণ্ডানকোরাণের নৌকো এবং জাল কেন কিনেছিল চেম্পনকুঞ্জ?

২৮। চেম্পনকুঞ্জ পাপীকুঞ্জকে কেন বিয়ে করে?

২৯। কারুতাম্মার বিয়ের আসরে কী নিয়ে বিবাদ বাধে?

৩০। পারীকুট্টির কিসে দক্ষতা ছিল?

১০৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। **‘চিংড়ী’** ঃ তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই; সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি/কলকাতা, ২০০০।

২। **‘মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস’** ঃ পি. কে. পরমেশ্বরন নায়ার; সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৬।

৩। **‘আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য’** ঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; দীপায়ন, কলকাতা, ১৯৫৪।

৪। ‘Sahitya Akademi Award : Books and Writers 1955-1978’; Sahitya Akademi; 1990.

৫। ‘Encyclopaedia of Indian Literature’, Vols. I/IV/V; Chief Editor : Amaresh Dutta/ Mohanlal; Sahitya Akademi, 1987/91/92.

৬। ‘Masterpieces of Indian Literature’ (Vol. I; Chief Editor : K. M. George; National Book Trust, New Delhi/Kolkata, 1997.

৭। ‘Who’s Who of Indian Literature’, : End-Century Edition Vol. 2; Compiled & Edited by K. C. Dutt; Sahitya Akademi, 1999.

৮। ‘Comparative Indian Literature’, Vol. I; Chief Editor : K. M. George; Kerala Sahitya Akademi; Trichur, 1984.

Notes

Notes